—ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পঁচিশ-বছরের রজত-জয়ন্তী-অর্ঘ্য—

জনগণমন-অধিনায়ক

ভারতের 'জাতীয়-সংগীত'-রচনা-কাহিনীর নাট্যধর্মী বিচিত্র-আলেখ্য

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

পারমিতা-প্রকাশন
কলেজ রোড
পোঃ বোলপুর, জেলা বীরভূম
পশ্চিমবঙ্গ

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীসত্যজিৎ রায়

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

জাতীয়-সংগীতের

পুস্তক-সংস্করণ :
প্রথম-প্রকাশ—সেপ্টেম্বর ১৯৬২

পরিবেশক
পারমিত-প্রকাশন
কলেজ রোড
পোঃ বোলপুর, বীরভূম,
পশ্চিমবঙ্গ

মুদ্রণ
ভগবতী প্রেস
১৪।১, ছিদাম-মুদি লেন
কলকাতা-৬

—প্রাপ্তিস্থান—

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলকাতা-১২

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
৬।১ এ, ধীরেন ধর সরণী
কলকাতা-১২

মূল্য কুড়ি টাকা

লেখক ও রবীন্দ্রনাথ

উৎসর্গ

"ভারতের মহাজাতীয়-উদ্বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দকে"

—প্রণাম।

"যে-ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎ-শক্তিপুঞ্জদ্বারা ধীরে-ধীরে এইরূপে বিরাট-মূর্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, সমস্ত আঘাত-অপমান সমস্ত বেদনা যাহাকে এই পরম-প্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহা-ভারতবর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতনভাবে কে করিবেন, কে একান্ত অবিচলিত ভক্তির সহিত সমস্ত ক্ষোভ-অধৈর্য-অহংকারকে এই মহা-সাধনায় বিলীন করিয়া দিয়া ভারত-বিধাতার পদতলে নিজের নির্মল-জীবনকে পূজার-অর্ঘ্যের ন্যায় নিবেদনঃ করিয়া দিবেন। ভারতের মহাজাতীয়-উদ্বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দ কোথায়। তাঁহারা যেখানেই থাকুন, একথা আপনারা ধ্রুবসত্য বলিয়া জানিবেন,—তাঁহারা চঞ্চল নহেন, তাঁহারা উন্মত্ত নহেন, তাঁহারা কর্মনির্দেশশূন্য স্পর্ধা-বাক্যের দ্বারা দেশের লোকের হৃদয়াবেগকে উত্তরোত্তর সংক্রামক-বায়ুরোগে পরিণত করিতেছেন না; নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি হৃদয় এবং কর্মনিষ্ঠার অতি অসামান্য-সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানের সুগভীর শান্তি ও ধৈর্য এবং ইচ্ছাশক্তির অপরাজিত বেগ ও অধ্যবসায়—এই উভয়ের সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে।

—পথ ও পাথেয়, রবীন্দ্রনাথ

JANAGANAMANA-ADHINAYAKA

A Work on the National Anthem of India

by Sri Sudhir Chandra Kar [Born 1906 April]
Bhubandanga, P.O. Bolpur,
Dist. Birbhum, West Bengal.

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ

রবীন্দ্র-সাহিত্যে যদি কোনো নিশ্চিততম ভিত্তি থাকে তবে তা বাংলাদেশ বা বিশ্ব নয়—ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষকে একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড ব'লে মনে করলে ঠিক হবে না, ভৌগোলিক-ভূখণ্ডের সমান্তরাল বহু-হাজার বছরের সাধনায় একটি সত্তার সৃষ্টি হয়ে উঠেছে ভৌগোলিক যার ভিত্তি, আধিদৈবিক যার অবয়ব, আধ্যাত্মিক যার অন্তরাত্মা—রবীন্দ্রনাথ তাকেই ভারত-বোধ বলেছেন। ভারতোপলব্ধি বলতে এই সত্তাকে আত্মস্থ করবার চেষ্টা ;—তবে শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, এদেশ যাঁদের মহাকবি পদবী দান করেছে, ধর্মগুরু ব'লে স্বীকার করে নিয়েছে, তাঁরা সবাই ভারতোপলব্ধির সাধক, সবাই ভারত-পথিক। রামায়ণ মহাভারত, কালিদাসের কাব্য, তুলসীদাসের রামচরিত-মানস প্রভৃতি যাবতীয় মহাকাব্য ভারত-বোধকে শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করছে। সেই ধারাই আজ প্রোজ্জ্বল ও পূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে, পৌরাণিক-কাল থেকে প্রবহমান-ভাবধারার আধুনিকতম-মূর্তি রবীন্দ্রনাথে। এক-সময়ে ভারত-বোধের সাধনা সহজ ছিল, তখন ভারতীয়-জীবনে উপাদানের জটিলতা বা বিরোধ ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগের পর-থেকে প্রথমে ইসলাম ও পরে খ্রীস্টান এসে পৌঁছবার ফলে সে-সাধনা কঠিন হয়ে উঠেছে ; তার উপরে আবার আমাদের স্বকৃত-ব্যাধি আছে—প্রাদেশিকতা-বোধ। এতগুলি বাধা ভেদ ক'রে ভারতের মূর্তি দেখতে পাওয়া সহজ নয়, কল্পিত ও অবান্তর বিতর্কের ধূলি-ঝঞ্ঝা আবহাওয়া এমনি আবিল ক'রে দিয়েছে যে, খুব ভালো ক'রে ঠাহর করলেও সে-মূর্তি চোখে পড়তে চায় না, ফলে অনেকেই ভারতের আধ্যাত্মিক-সত্তায় অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। ঐতিহাসিকগণ এই সত্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন, বলেন, অতীতে এ-কখনো ছিল না ; অকেজো-লোকের দল বলেন, ভবিষ্যতে এ-কখনো হবে না ; কেননা বর্তমানে এ-বোধ নেই। অপরপক্ষে, মহাকবি, ধর্মাচার্য, মনীষী ও মহাশিল্পী-গণ এই বোধের বোধিক্রম-তন্ত্রের সাধক, এই রসের রসিক, এই ভাবের ভাবুক—ভারতোপলব্ধিই তাঁদের সাধনার ধ্রুব-বিন্দু। এখন এ-দু'য়ের মধ্যে কার কথা বিশ্বাস-যোগ্য তা রুচি, শিক্ষা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপরে নির্ভর করে। রামায়ণ-মহাভারতের দিগ্বিজয়ী রাজারা রাজসূয় ও অশ্বমেধ-উপলক্ষ্যে যে এদেশ পরিক্রমা করতেন তা কি

কেবল সেকেন্দার-শা'র "শৌখিন দিগ্বিজয়" মাত্র? আচার্য শঙ্কর দেশের চার-প্রান্তে যে চার মঠ স্থাপন করেছিলেন তা কি তাৎপর্যহীন? মহাপ্রভু যে নাম-প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারত-প্রদক্ষিণ করেছিলেন তার কি কোনো গভীরতর অর্থ নেই? মহামতি-আকবর হিন্দু ইসলাম জৈন প্রভৃতি ধর্মায়-উপাদান মিলিত করবার যে চেষ্টা করেছিলেন তা কি কেবল রাজনৈতিক চাল-মাত্র? আর, বিবেকানন্দ ও গান্ধীজির ভারত-ভ্রমণ এ কি নিরর্থক। আর, সর্বোপরি, এ যুগের বেদব্যাস-তুল্য মহাকবি কেন বারে-বারে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন? হেন প্রদেশ নেই, হেন উল্লেখযোগ্য নগর নেই, যেখানে না গিয়েছেন, ব'সে কিছু-না-কিছু না লিখেছেন! এ কি কেবল কবিজনোচিত শৌখিন বিলাস-মাত্র! কায়েন মনসা বাচা।—মনের দ্বারা অনুভব, বাক্যের দ্বারা প্রকাশ, আর কায়ার দ্বারা স্পর্শ,—সাধনার এই তিন-প্রকার উপায়। রবীন্দ্রনাথ মনের দ্বারা অনুভব করেছেন তাকে, আর, অবশেষে দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ ক'রে কায়ার দ্বারা তাকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করেছেন। পূজা সাঙ্গ করবার পর এ হচ্ছে দেবতার মন্দির-প্রদক্ষিণ;—যার অভ্যন্তরে বিগ্রহরূপী ভারত-ভাগ্যবিধাতা, তাঁরই মন্দির এই ভারতবর্ষ। এ ভৌগোলিকও বটে আবার তার চেয়ে অনেক বেশিও বটে। 'আনন্দমঠে' এই ভারত-বোধের উদ্বোধন। অনেকের ধারণা 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম্'-সংগীত বঙ্গদেশ-সম্পর্কিত। লেখক বাঙালী ব'লেই ঘটনা-স্থান বাংলাদেশ, কিন্তু 'আনন্দমঠে'র নায়ক ও পরিচালক বাঙালী নন, হিমালয়বাসী কোনো মহাপুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্র ভারত-বোধকে প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে স্থাপিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে স্থাপিত করেছেন ভৌগোলিক-ভারতের ঊর্ধ্বে। আধুনিক যুগের প্রথম ভারতীয়-নাগরিক গোরা রক্ত-সূত্রে আদৌ ভারতীয় নয়—তবু তার চেয়ে বেশী ভারত-বোধের সার্থক-সাধক আর কে আছে? একজন আছেন। তিনিও রক্ত-সূত্রে ভারতীয় নন—ভগিনী নিবেদিতা। আনন্দমঠ ও গোরা উপন্যাসের বক্তব্য এই যে, ভারতোপলব্ধির সঙ্গে ভৌগোলিক-ভারতের সম্বন্ধ নিতান্তই আকস্মিক। মধ্যযুগে যে-মনীষী-ব্যক্তি ভারত-বোধকে আত্মস্থ করতে চেষ্টা করেছিলেন সেই মহামতি-আকবরের ধমনীতে ভারতীয় রক্ত এক বিন্দুও ছিল না। ভারতবর্ষের হিমালয়ের মতোই গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্রের মতোই ভারত-বোধ সনাতন। এ-যুগে রবীন্দ্রনাথে এসে তা একসঙ্গে যুগোচিত ও যুগোত্তর অক্ষয় বাণী-মূর্তি লাভ করেছে। (কমলাকান্তের আসর, আনন্দবাজার-পত্রিকা ২৯শে বৈশাখ, ১৩৭৬)

আশীর্বাদ

১

'জনগণ-মন' গানটি ভারতের 'জাতীয়-সংগীত' হয়ে ভারতবাসীর কণ্ঠে-কণ্ঠে আজ সর্বত্র গীত হচ্ছে। এই সংগীতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার যে সার্বজনীন-আদর্শ প্রকাশ করেছেন, তা কোনো বিশেষ জাতির বা সম্প্রদায়ের নয় - বিশ্বজাতির সঙ্গে আত্মিক-সংযোগে সে-জাতীয়তার মুক্তি ; এবং সে-মুক্তি শুধু দলের নয়, গোষ্ঠীর নয়,—সে-মুক্তি সমস্ত-মানুষের মুক্তি, সর্বজনের মনুষ্যত্ব-বিকাশেই সে-মুক্তির সার্থকতা। কেবল দেশের মুক্তি, রাষ্ট্রের মুক্তি বা ধনের মুক্তি নয়,—মনের মুক্তি, সামাজিক-মুক্তি সবই রয়েছে সেই মুক্তির অন্তর্গত হয়ে। মানুষ স্বাধীন,—সমস্ত জগতে মানব-মুক্তির এই জয়গাথা ধ্বনিত হচ্ছে আমাদের এই 'জাতীয়-সংগীতে'। ভারতের মুক্তির আদর্শ এতদূর প্রসারিত যে, শুধু মানুষ কেন,—চেতন-অচেতন জড়-জীব-সর্বকালের সকলের এবং জল-স্থল-অন্তরীক্ষব্যাপ্ত সর্বলোকের সব-কিছুরই হয়েছে সে মুক্তিকামী। মুক্তির পরম-প্রেরণাবাহী এই সংগীতকে মহান-নেতা জওহরলালজীর নেতৃত্বে জাতি সেদিন সর্বোচ্চ-রাষ্ট্রমর্যাদায় 'জাতীয়-সংগীতে'র পবিত্র-আসনে করল প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর, এ'কে গভীর ও ব্যাপকভাবে আরো-জনপ্রিয় করবার জন্য সুষ্ঠ-ব্যবস্থার এক সংকল্প কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-দপ্তর থেকে হয়েছে প্রচারিত। কবির সাধনা-স্থল শান্তিনিকেতনেও এ-বিষয়ে একটু চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। গুরুদেবের বহুদিনের-অনুচর শ্রীসুধীরচন্দ্র কর মহাশয় গুরুদেবের বইগুলি থেকে (১৯১১ সন অর্থাৎ 'জনগণমন'-গান-রচনার আগ-পর্যন্ত) বাণী চয়ন ও সংযোজন ক'রে অতি নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে একটি পালা রচনা করেন। প্রথমত, তিনি গানটির রচনা-কালের বিখ্যাত 'স্বদেশী-যুগ' নিয়ে কাহিনীর পরিকল্পনা করেন, ক্রমে সেকালের সুপরিচিত ব্যক্তিদের আভাস-যুক্ত নানা-চরিত্রের ও লিপিবদ্ধ-করা নানা-ঘটনার সমবায়ে আলেখ্যটিকে বর্তমান-রূপ দেন। এ'তে তিনি নিজে কিছুই বলেন-নি,—সকলে সোজাসুজি তাদের কবিকেই যাতে কাছে পায়, তাঁরই ভাষায়, তাঁরই কথা শোনে, তাঁরই কথা ভাবে সংলাপে সেজন্য সংগৃহীত তাঁরই বাণী সাজিয়ে সব বলেছেন। নাটকে এ-রীতি বোধ হয় অভিনব। এর আরো-বিশেষত্ব এই, —গুরুদেবের আদর্শের ব্যাখ্যাই যে এতে মিলবে তা নয়, দেখা যাবে যে, তথ্যের সঙ্গে চরিত্রগুলিও প্রকাশ পেয়েছে অনেকটা বাস্তবানুগ হয়ে। আকারে তারা ছায়া-রূপে থাকলেও চালে-চলতিতে চিনতে তাদের কোনোকালেই বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ; সেকালের হয়ে যেন তারা একালেরও ; সুখদুঃখ-সমস্যা-সংঘাত নিয়ে আজও তাদের আনাগোনা এই আশেপাশেই ; আর, নাটকীয়-আবর্তনের মধ্য দিয়ে দৃশ্যে-দৃশ্যে চলেছে যারা মুক্তি-সন্ধানে, দর্শক-রূপে-তারাই যেন চলেছি আজ জীবনের প্যাঁকে-জড়িয়ে আমাদের-কালের সমাধানে। ভাবে-ভাষায় কার্য-কলাপে যথাসম্ভব গুরুদেবেরই আদর্শের ভারসাম্য রক্ষা ক'রে তারা হয়েছে আমাদের চিরসঙ্গী। সঙ্গে আছে কবির

সেকালের গানগুলি। উপরন্তু, আনন্দের বিষয়, শুধু আদর্শ নয়, কবির অপূর্ব-ব্যক্তিত্বের মধুর-ব্যঞ্জনাও উদ্দীপনাময় হয়ে লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে সর্বত্র হবে অনুভূত।

'জাতীয়-সংগীত' সকলের জিনিস। শুরু থেকেই দেখি, যেখানে যেভাবে পেরেছেন—লেখকের মূল লক্ষ্য রয়েছে—সকলের অনুভবে বিষয়টিকে মিলিয়ে দেওয়া। পদ্ধতির বাঁধাবাঁধি বা কোনো সুর-বিশেষের উপভোগ্যতার ঝোঁক এ'তে প্রাধান্য পায়নি। 'স্বদেশী-যুগ', 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'জাতীয়-সংগীত',—একাধারে এই তিনটি-জিনিসের সংগতি রেখে আলেখ্যটি গড়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, বিষয়টি মহৎ,—করে তুলতে পারলে এর প্রদর্শনী হবে তেমনি একটি মহৎ কাজ—দ্রষ্টার চোখে এ'র সেই সম্ভাবনাটুকু এড়াবার নয়।

জিনিসটা যখন তথ্যালেখ্য, তখন তথ্যের আলেখ্য এঁকেই গ্রন্থের কাজ মেটে বটে, কিন্তু দৃশ্যকাব্য নাটকের মতো আলেখ্যের সার্থকতাও অপেক্ষা রাখে প্রদর্শনীর। এর নাট্য বা চিত্ররূপ ফুটিয়ে-তোলার সে-কাজটি করবেন সৃষ্টিকুশল-কোনো-বহুদর্শী শিল্পী-জাদুকর। আপামর সকলের-উপযোগী ক'রে এর রূপ-দেওয়া সহজ নয়। কতটুকু ছেড়ে কতটুকু জুড়ে কোথায় কীভাবে কী দিয়ে কী করবেন—জমিয়ে-তোলার সেই জাদু শুধু গুণী-প্রযোজকই জানেন। এক্ষেত্রে কেবল এইটুকুই বলার,—তথ্যালেখ্যটি লোকসমাজে তথা পল্লীপ্রাণ-ভারতের পল্লীতে-পল্লীতে—যারা কিছু জানে না, খবরও রাখে না,—তাদের মধ্যে সাড়া-জাগাবার বিশেষ আবশ্যকতা রাখে। কেননা, তারাই জনগণের অধিকাংশ। সেদিক থেকে গুরুত্ব আছে এর প্রারম্ভিক 'মুক্তিক্রন্দন'-নামক অংশটিরও। কারণ, সংক্ষেপে আগে তার থেকে শুরুতেই ভারতের ঐতিহাসিব-ধারাটি না বুঝে নিলে কাহিনীর কাল-নির্ণয়ে ও পরবর্তী-ঘটনা-অনুসরণে কারো-কারো একটু অসুবিধা হতে পারে। পক্ষান্তরে, ছায়াছবি বা মূকাভিনয়ে সেটুকু প্রস্ফুট দেখতে পেলে গল্পের বাকি-অংশ ও গুরুদেবের বাণীধারা সকলের পক্ষেই বোঝা সহজ হবে এবং আশা করা যায় যে, তার থেকে গুরুদেবের আদর্শানুযায়ী লোকচরিত্র-গঠন ও সংস্কৃতি-বিস্তারের কাজও কিছু-কিছু ক'রে নানা অঞ্চলে না-চলতে পারে এমন নয়। সেইজন্যেই শহরে গ্রামে শিক্ষিত ও সাধারণের মধ্যে নানাস্থানে নানাভাবে এর বহুল-প্রচার বাঞ্ছনীয়। লেখাটি প'ড়ে ভালো লেগেছে—আশীর্বাদ করি, সুধীরবাবু তাঁর প্রয়াসে সফলকাম হবেন।

প্রতিমা দেবী

২

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর অল্প-বয়সেই 'অভয়-আশ্রম' থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন। প্রথমে এসে আশ্রয় পান বিশ্বভারতী-লাইব্রেরিতে আমার কাছে। তখন থেকেই তাঁকে জানি—সে আজ কত বৎসর হয়ে গেছে। তখন তাঁর বিদ্যার পুঁজি ছিল অল্প—কিন্তু একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দিয়ে সব অভাব পূরণ করে নেন। কালে বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে—বিশেষ ক'রে রবীন্দ্র-সাহিত্যে নিজের স্থানটুকু ক'রে নিয়েছেন। তবে এই সাহিত্য-পরিচয় ছাড়াও আর-একটি পরিচয় আছে, তা সর্বজনবিদিত নয়। অভয়-আশ্রমের গান্ধী-শিক্ষা তাঁকে একদিন রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের সাথে সমন্বিত করেছে। শান্তিনিকেতনে অতি-দীনভাবে যে 'সংস্কার-সমিতি' স্থাপিত হয়, সুধীরচন্দ্র ছিলেন তার নীরব-কর্মী—প্রাণ-স্বরূপ। জনগণের মধ্যে মিলেমিশে তাদেরই একজন হয়ে ছিলেন। মনে পড়ছে, এই ভুবনডাঙা-গ্রামের অত্যন্ত সাধারণ-মানুষদের নিয়ে তিনি নানা-কর্মে নিজেকে ব্রতী করেছেন। তাদের রবীন্দ্র-সংগীত শিখিয়ে দল বেঁধে ঘুরেছেন গ্রামে, শহরে,—উদ্দেশ্য কবির বাণী-প্রচার। আজ তিনি প্রৌঢ়ান্তে উপনীত, আমি তো অতি-বৃদ্ধের কোঠায় এসেছি। তাঁর সাহিত্য-সাধনা সার্থক হোক—এই আমার আশীর্বাদ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

ভারতবর্ষের জাতীয়-সংগীত "জনগণমন-অধিনায়ক"-গানটি গুরুদেব-রবীন্দ্রনাথের একটি আকস্মিক-রচনা নয়। তাঁর কবিচিত্তের বহুমুখী-প্রতিভার স্ফুরণ একদিনে হয়-নি। তাঁর মানসিক-ক্রমবিকাশের একটি সুদীর্ঘ-ইতিহাস পরিলক্ষিত হয় তাঁর নানা-রচনার মধ্যে। জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ঠাকুর-বাড়ীর মধ্যে যে একটি নির্মল আবহাওয়া নিত্য-প্রবহমান ছিল সেকথা সকলেই জানেন। সে-বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাদেশীকতার যে প্রেরণা ছিল তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় তখনকার-দিনের "স্বদেশী-মেলা'র অনুষ্ঠান থেকে। রবীন্দ্রনাথও যে সেই স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজে বহু রচনায় ও বক্তৃতায় বলে গিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ-জনিত স্বদেশী-আন্দোলনের উতলা-হাওয়া যে তৎকালীন যুবক-ছাত্রদের মধ্যে আশা ও উদ্দীপনা সৃজন করেছিল তা সর্বজনবিদিত। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পল্লীগ্রামের অধিবাসীদের দৈনন্দিন সুখদুঃখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ-আত্মীয়তা। এই সকল ঘটনার সমাবেশে কবিচিত্তের যে ক্রমবিবর্তন ঘটেছিল তার নিখুঁত-ছবি দেখতে পাওয়া যায় গুরুদেবের কবিতায়, গানে ও নানা-প্রবন্ধে। গুরুদেবের মনোলোকের ক্রমবিকাশ যে চরম-পরিণতি লাভ করেছিল তাঁর 'জনগণমন-অধিনায়ক'-গানে তাতে সন্দেহের অবকাশই নেই। সুতরাং, ঐ-জাতীয় সংগীতের মর্মার্থ উপলব্ধি ক'রে তার সুগভীর রসসম্ভোগ করতে গেলে সেই গানের প্রাচীন-ইতিহাসের কিঞ্চিদধিক জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। আমাদের সহকর্মী শ্রীসুধীরচন্দ্র কর আমাদের জাতীয়-সংগীতের পটভূমিকার সঙ্গে জনগণের প্রত্যক্ষ-পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে গুরুদেবের বাণী ও গীত চয়ন ক'রে এই তথ্যালেখ্যটি রচনা করেছেন। লেখক, কবিচিত্তের ক্রমবিকাশটিকে পরম্পরায়-ক্রমে কবিরই ভাষায় পরিস্ফুট ক'রে তুলবার প্রয়াস করেছেন। আমাদের জাতীয়-সংগীতটি যে গুরুদেবের স্বদেশ-প্রীতির ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি সে-কথাটি সর্বসাধারণের জ্ঞান-গোচরে আনার জন্যে শ্রীযুক্ত করের প্রয়াস যে বহুলাংশে সফল হয়েছে তাতে সন্দেহমাত্রও নাই। গানখানির রস-গ্রহণে জনসাধারণকে সহায়তা ক'রে শ্রীযুক্ত কর আমাদের সকলেরই ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

গ্রন্থকারের নিবেদন

বিশ্বের জনগণের যিনি অধিনায়ক, তিনি আর কেহ নন,—ভগবান। দেশে-কালে তিনি জনে-জনে বিচ্ছিন্ন হয়েও, জনে-জনের মধ্যে আবার সংহত-রূপে-ও তিনি-ই হয়ে আছেন এক অখণ্ড-অনন্ত-সত্তা। তিনি সকল-দেশের মতো ভারতেরও 'ভাগ্য-বিধাতা'।—একই-কালে বিচ্ছিন্নতা ও সংহতির এই মিলিত-আদর্শ এবং এই আদর্শের উদ্গাতা—রবীন্দ্রনাথকে ও তাঁর মহান-দানকে ভারতবাসী-আমরা আমাদের প্রতিদিনের-জীবনে একই-কালে একত্রে মিলিয়ে সবচেয়ে সহজে পাই কোথায়?—পাই তাঁর 'জনগণ-মন'-গানে, পাই আমাদের ঐ 'জাতীয়-সংগীত'-টিতে।

ভারতের 'জাতীয়-সংগীতে'র এই পুস্তক-সংস্করণ প্রকাশের সময়, এস্থলে প্রসঙ্গত একটি-কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সংগীত নিয়ে একটা-কিছু-করার আদি-পরিকল্পনার ছোটো একটা খসড়া প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বরের দৈনিক 'সত্যযুগ' পত্রিকার রবিবারীয় দুটি সংখ্যায়। আর তারপরে ১৩৭০ সনের ৭ই ও ৮ই পৌষে শান্তিনিকেতনের বার্ষিক-উৎসব ও মেলা এবং তার সঙ্গে বিশ্বভারতীর অনুষ্ঠানও চলছিল। 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী'-রও তখন উদ্‌যাপন-পর্ব। প্রতিষ্ঠানের 'সমাবর্তন'-আচার্যরূপে ভারতের তৎকালীন জাতীয়-সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জহরলাল নেহেরু এসেছিলেন তাঁর নিয়মিত বার্ষিক-শান্তিনিকেতন-পরিক্রমায়। ইতি-পূর্বে 'জনগণ-মন'-সংগীতকে তিনি ভারতের রাষ্ট্র-সংগীতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবারে দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও বিশ্বভারতীর-আচার্য জহরলালের হাতে লেখক-রচিত রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী-অর্ঘ্য—'জনগণের রবীন্দ্রনাথ' ও 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা'—এই দু'খানি-গ্রন্থেরই সদ্য-মুদ্রিত ২য়-সংস্করণের দু'খানি কপি অর্পণ ক'রে শ্রদ্ধানিবেদনের যে-সংকল্প মনে-মনে এতদিন পোষণ ক'রে আসছিলাম, অনুগ্রহ ক'রে আশ্রম-কর্মীকে তা পূর্ণ করবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন তৎকালীন-উপাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস মহাশয়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়,—প্রচ্ছদ-পট ও বাঁধাইয়ের অসম্পূর্ণতার হেতু শেষ-মুহূর্তে উক্ত-গ্রন্থদ্বয়ের পরিবর্তে নিরুপায়ে আমারই সদ্য-প্রকাশিত আরেকখানি গ্রন্থ (কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ) এবং 'জনগণের রবীন্দ্রনাথে'র ফাইল-কপি এই-দু'খানিই-মাত্র উত্তরায়ণ-প্রাঙ্গণে স্বল্পাবকাশের মধ্যে নেহেরুজীর হাতে উপহার দেওয়া হল। সেই সঙ্গে শেষোক্ত গ্রন্থ-শেষে-মুদ্রিত 'জাতীয় সংগীতে'র তথ্যালেখ্য-রূপ একটি অধ্যায়-আকার ক্ষুদ্র-আংশিক-স্কেচ্‌টির কথা-ও উপাচার্যমশায় মুদ্রণাংশ দেখিয়ে অবস্থার আকস্মিক-বিপর্যয়ের বিষয় নেহেরুজীকে সব বুঝিয়ে

বললেন। ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু এ-গ্রন্থের আদি-পর্বে এটি ঘটে আছে বেদনাদায়ক হয়ে। বহুদিনের হলেও সেই একটি-দিন নেহেরুজীর হাতে প'ড়ে তাঁর শুভেচ্ছাময় স্মিতহাস্যমাখা সেই প্রসন্ন-দৃষ্টি-আলোর স্পর্শটুকুতে ধন্য-হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল গ্রন্থ-শেষে সন্নিবিষ্ট এখানকার তুলনায় স্বতন্ত্রাকার ঐ ক্ষুদ্র স্কেচ্‌খানিও। বইটি বের হলে, পাঠিয়ে-দেবার কথা উপাচার্যমশায় যদিও নেহেরুজীকে সে-সময় ব'লে রেখেছিলেন, কিন্তু, তার-পরেই দৈবের দুরন্ত-বাধায় চিরতরেই সে-দেওয়া রইল অদেয় হয়ে। কেবল, অতি-বেদনার মধ্যেও তখন থেকেই সেদিনকার সামান্য এই ঘটনা অন্তরে অবিস্মরণীয় এক পুণ্যস্মৃতি হয়ে বিরাজ করছে ; এবারে,—ক্ষুদ্র বা আংশিক-স্কেচ্‌ নয়, তথ্যালেখ্যটির এই পূর্ণাঙ্গ-গ্রন্থ প্রকাশের-ক্ষণে আমি সেটুকু স্মরণ ক'রে স্বর্গত সেই মহানায়কের উদ্দেশে আমার প্রণতি জানাচ্ছি। দীর্ঘ ন'বছর পরে দর্শকদের পত্রে সম্প্রতি জানলাম, যা দিয়েছিলাম, দিল্লীতে ত্রিমূর্তি-ভবনে মহানুভব-নেহেরুজীর ব্যক্তিগত-গ্রন্থাগারে সে-গ্রন্থ (কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ) আজো সুরক্ষিতই আছে।

কিন্তু, দ্বিতীয়-সংস্করণ ,জনগণের রবীন্দ্রনাথ'-গ্রন্থখানি ছিল রবীন্দ্র-কেন্দ্রীক মূলত প্রবন্ধেরই গ্রন্থ ; তার শেষ-অধ্যায়ে-সন্নিবেশিত উক্ত অংশিক-স্কেচ্‌-আকারী 'তথ্যালেখ্য'টি-ও সাময়িক-পত্রে বিশেষভাবে উল্লেখিত ও প্রশংসিতই হয়েছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় জানানো ছিল যে, "—শেষোক্তটি স্বতন্ত্র-গ্রন্থাকারেই প্রকাশিত হবার বিষয়।" সাপ্তাহিক 'অমৃত' লেখেন, "কবির বাহির ও অন্তর্জীবনের কর্ম ও ভাব যে গানের উৎসস্থলে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, লেখক তার পরিচয়-দানের চেষ্টা করেছেন। প্রাসঙ্গিক হলেও এই অংশটুকু মূল-গ্রন্থ থেকে ভিন্ন ক'রে প্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত হত মনে করি।" (২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১) 'আনন্দবাজার-পত্রিকা' লেখেন, "('ভারত ভাগ্য-বিধাতা'-নামক) তথ্যালেখ্যটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে এ-গ্রন্থের মূল বক্তব্য। সামাজিক তাৎপর্যের ভিত্তিতে রবীন্দ্র-সমালোচনায় এই তথ্যালেখ্যের গুরুত্ব অসামান্য হয়ে রইল।" (১৭ই জানুয়ারি, ১৯৬৫)।—আজ এই—উপলক্ষ্যে আমি এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমান পূর্ণাঙ্গ-পুস্তক-সংস্করণটিও তাঁদের প্রীতি-অর্জনে সমর্থ হলে ধন্য হব।

উপরোক্ত মন্তব্যাদির থেকে দেখা যাচ্ছে—স্কেচ্‌-আকারে হলেও উক্ত প্রবন্ধ-সংস্করণটি রচনা-স্বাতন্ত্র্যে উল্লেখযোগ্যই হয়েছে। এমনিতেও মুদ্রিত-আকারে স্কেচ্‌টি দেখে কেউ-কেউ বলেন, বিষয়টি 'জাতীয়-সংগীত' ব'লে এটি সর্বভারতীয়-আগ্রহের জিনিস। সুতরাং, এটিকে বৃহত্তর-আকারে পূর্ণাঙ্গ ক'রে সর্বত্র-দর্শনীয় এবং নানা রূপে ও রসে মনোরঞ্জনীয়-তর ক'রে জনগণের দৃষ্টি-আকর্ষক-ভাবে রূপান্তরিত করা

আবশ্যক। আমি সেই জন-আগ্রহের নির্দেশ-অনুসারেই এবারে নানা-আঙ্গিকের প্রসাধনে সাজিয়ে তথ্যের ভিত্তিতে কাহিনীর আরো সম্প্রসারণে, গোটা-গ্রন্থকে সোজাসুজি জাতীয়-সংগীতেরই দ্রুত ও স্পষ্ট বিজ্ঞপ্তির সহায়ক নব-নামে ও নব-মানে 'জনগণ-মন-অধিনায়ক'-করে গড়ে তুললাম। অবশেষে আকারে-প্রকারে বিচিত্র হয়ে সকল-কিছুরই প্রকাশ ঘটল এই পুস্তক-সংস্করণে। এ-সংস্করণটির সবটাই হল মূলক নাট্যধর্মী।

'স্বদেশী-আন্দোলনে'র-সময়কার কবির ভাষাতেই কবির মনের-কথাগুলি সকলে যাতে শুনতে পায়, জনগণের সঙ্গে সোজাসুজি সেই রবীন্দ্র-বাণীর সংযোগ-সাধনই এই 'আলেখ্য'-রচনার বেলায় লেখকের ছিল একান্ত-সংকল্প। ১৩১৮ সন পর্যন্ত লিখিত কবির নাটক, চিঠিপত্র, গান, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও সম্পাদকীয় ইত্যাদি নানারকমের-রচনা থেকেই এসমস্ত বাণী সংগৃহীত হয়েছে। তথ্যালেখ্যের কাহিনী ও প্রযোজনার-নির্দেশক-অংশগুলি গ্রন্থকারের।

সাধারণ-রসিক-সমাজের নিকট কাহিনীর সুসংগতি ও তার নাটকীয়-উপস্থাপনা মিলে' নাটকের রসোত্তীর্ণতাই হবে মুখ্য-বিচার্য; তার-উপর, কারো-কারো থাকতে পারে রবীন্দ্র-উদ্ধৃতির নির্দেশিকা-সংযোজনের প্রশ্ন। কিন্তু, এমনিতেই লেখাটির আকার হয়েছে (নাটক-হিসাবে) অতি-বৃহৎ, এর পরে প্রামাণিকতার জন্য এর পিছনে উদ্ধৃতির নির্দেশিকা দিতে গেলে বইখানি দামে ও দর্শনে মাপ ছাড়িয়ে যাবে, —এই আশঙ্কায় বাধ্য হয়ে সে-কাজে নিবৃত্ত থাকা গেল। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তেই প্রায়-সব-উদ্ধৃতির উদ্দেশ মেলারকথা। তাতে অন্ততবড়-বড় উদ্ধৃতিগুলির খোঁজ মিললে, আনাচ-কানাচের টুকিটাকি কয়েকটা নাটকীয়-ধর্‌তা-বুলির পাঠ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। বলা-বাহুল্য, সেটুকুর দায় গ্রন্থকারেরই। নাটকের প্রয়োজনে স্থল-বিশেষে যোগ-বিয়োগের এরূপ স্বাধীনতা লেখকের আছে এবং তা চিরদিনই সর্বজন-স্বীকৃত।

তথ্যালেখ্যটি ইতিহাস ও নাটক এই দু'য়েরই উপকরণ ও ভঙ্গির সংমিশ্রণে রচিত। ঐতিহাসিক-নাটক তো চিরকালই চ'লে আসছে। এ-শ্রেণীর রচনাকে কতকটা নাটকীয়-ইতিহাসের পর্যায়ে ফেলা চলে কিনা বিবেচ্য। বিস্তৃত স্থান, কাল, পাত্র-পাত্রী ও ঘটনাবলী নিয়ে নানা বাধার মধ্য দিয়ে যথাসম্ভব গ্রন্থনার সংগতি এবং সে-সঙ্গে গতিবেগও বজায় রেখে চালিয়ে নিতে হয়েছে 'এই সপ্ত-পর্বে-পরিব্যাপ্ত এর সমগ্র-কাহিনীটিকে। এতে, পরিকল্পনার বিস্তৃতি ও বাঁধুনি থেকে এর প্রকাশ, পরিবেশনা-পর্যন্ত সর্বস্তরেই যে কী-দুরূহ প্রয়াস, ধৈর্য, শ্রম, ও বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করতে হয়েছে তা কিছু-না-কিছু সকলেরই কাছে অনুমেয় হবে, মনে করি।

গ্রন্থখানিকে আশানুরূপ সম্পূর্ণতা দিতে গিয়ে জাতীয়-সংগীত-'জনগণ-মন'-রচনার পূর্ববর্তী—(১) জাতীয়-ইতিহাসের আনুপূর্বিক ধারা,

(২) জাতীয়-সংগীত রচনার সমসাময়িক পটভূমি, তথা 'স্বদেশী-আন্দোলন',

(৩) জাতীয়-সংগীত-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ,

(৪) রবীন্দ্রনাথ-রচিত তৎকালীন অন্যান্য স্বদেশী-সংগীতমালা,

(৫) 'জনগণমন'-সংগীত-রচনা ও জাতীয়-কংগ্রেসে জনগণের মধ্যে এই সংগীতের প্রথম-প্রকাশ্য-পরিবেশনা,

(৬) 'ভারতীয়-গণপরিষদে' জাতীয়-সংগীতের স্বীকৃতি-লাভ ও বিশ্ব-জনীন শ্রদ্ধার্ঘের অনুষ্ঠান-বিবরণ,

(৭) ভারত-রাষ্ট্রের ভাবাদর্শের প্রেরণা এবং বাস্তবে সেই প্রেরণার জনসামাজিক প্রতিষ্ঠা-সাধনার উপযোগী রবীন্দ্র-পরিকল্পনার রূপায়ন,

এতগুলি বিষয় নিবদ্ধ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাতে গ্রন্থখানির আকারও স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়।

এ-সবের সমাবেশ ক'রে গ্রন্থটিতে দাঁড়ায় প্রায়-স্বয়ং-সম্পূর্ণ সাতটি-পর্ব। যথা—

(১) মুক্তি-ক্রন্দন
(২) রাখী-বন্ধন
(৩) মাল্য-চন্দন
(৪) জয়-স্যন্দন (জয়-রথ)
(৫) অভিবন্দন
(৬) দিক্-স্পন্দন
(৭) মর্ত্য-নন্দন : ১ম অংশ—লোকমাতা
২য় অংশ—ভুখা-ভগবান

গ্রন্থের প্রথম-পর্ব 'মুক্তি-ক্রন্দনে' দেখা যাবে, রাষ্ট্রিয়-বহিঃ-শক্তির দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে মুক্তিকামী-ভারতবাসীর মনের বিচ্ছিন্ন চাপা-ক্রন্দন এখানে-ওখানে ক্রমবর্ধিত হচ্ছে। দ্বিতীয়-পর্ব 'রাখী-বন্ধনে' দেখা যাবে, সেই ঘনীভূত বর্ধিত রুদ্ধ-বেদনা-থেকে বঙ্গদেশে 'স্বদেশী-আন্দোলনে'র উদ্ভব হয়েছে। তৃতীয়-পর্ব 'মাল্য-চন্দনে' দেখা যাবে,—সরকারী-আইন-অমান্যের অভিযানে সংঘবদ্ধ-গণশক্তির যাত্রা-প্রস্তুতি। চতুর্থ-পর্ব 'জয়-স্যন্দনে' দেখা যাবে,—স্বদেশীদল ও সরকারী-পক্ষে সংগ্রাম বেধেছে, এবং

স্বদেশীদলে শেষে জয়োৎসবের-উদ্যোগ হচ্ছে। পঞ্চম-পর্ব 'অভি-বন্দনে' দেখা যাবে,—কলকাতায় কংগ্রেসের-অধিবেশনে স্বদেশীদলের-বিজয়োৎসবের জয়গীতি-রূপে "জনগণ-মন-অধিনায়ক"-এর প্রকাশ্যে আদি-আবির্ভাব। ষষ্ঠ-পর্ব 'দিক্-স্পন্দনে' আছে, 'জাতীয়-সংগীতে'র এই আবির্ভাবকে ভারতীয়-গণপরিষদে সরকারী-স্বীকৃতি দান এবং গানটির প্রতি দেশবিদেশেরও শ্রদ্ধার্ঘ-দান-অনুষ্ঠানের বিবরণী। আর, সর্বশেষ সপ্তম-পর্ব 'মর্ত্য-নন্দনে' মিলবে,—জাতীয়-আন্দোলনের মূল-প্রেরণার-অনুসারী একটি দুই-অংশে-বিভক্ত রূপক-নাট্যোপাখ্যান।

গোটা-তথ্যালেখ্যটিতেই বাস্তবকে অনুসরণ করা হয়েছে ইঙ্গিত-মাত্রে,—শুধু সুদূর-অতীতের তৎকালীন সম্ভাব্য-সূত্রটুকু মনে-পড়িয়ে-দেবার জন্য। কারণ এটি একখানি 'আলেখ্য'। কবিই একস্থলে বলেছেন,—"আলেখ্য ফোটো নহে, আভাস মাত্র।" এটিও তথ্যের-আভাস দিতেই, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সব-কিছু মিলিয়ে গানটির একটি ভাবমূর্তি গ'ড়ে-তুলতেই,-লেখা এবং তদনুযায়ী নানা-আঙ্গিকে লেখা। কবির লেখাগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট ক'রে কারো নাম-ধামের তেমন উল্লেখ না-থাকলেও এ-তথ্যালেখ্যে অভিনয়-রসসৃষ্টির সহায়তা ও দর্শকদের অভিনয়-উপভোগের সুবিধার্থে প্রধান-প্রধান পাত্রপাত্রীদের আভাসিক-ভাবে ছায়া-নামযুক্ত করা হল। তাদের মধ্যে মূল নামী-ব্যক্তিদের আদল কিছুটা মিলবে আশা করা যায়। শুধু ব্যক্তি নয়—ব্যক্তিগুলির মতো অনেকস্থলে অনেক ঘটনাও একেবারে বাস্তবত যথাযথ না-হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা হল ব্যক্তি বা ঘটনাবলম্বনে রূপক-আঙ্গিক-মূর্তিধারী এক-একটি ভাব (Idea personified)। যাঁরা বিশেষজ্ঞ বা তথ্যানুসন্ধানী হবেন নিশ্চয়ই তাঁরা 'আভাসে'র কুয়াশা সরিয়ে ভাবচ্ছায়া-রূপী পাত্র-পাত্রীদের প্রকৃত-পরিচয় অনুমান করতে পারবেন, বা, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁদের এ-সম্পর্কিত অনুসন্ধানও ফলপ্রদ হতে পারে।

এ-গ্রন্থের যেখানে যে-সংলাপ বা ঘটনা-বিন্যাস ঘটেছে, তাদের সকলের মূল এবং বর্তমান-আহৃতাংশ, এই-উভয়-ক্ষেত্রের ভিত্তিতেই যে একই-রূপের মিল,—সর্বত্র তা না-ও থাকতে পারে; কিন্তু ভাবে-রূপে কিছু-না-কিছু আভাসিক-মিল পাওয়া অসম্ভব নয়; কারণ, তা না হ'লে, সংহৃত-সংলাপগুলি যথোপযুক্ত-ভাবে পাত্র-পাত্রী, পরিবেশ ও ক্রিয়া-কলাপেতে গল্পাংশের-আবশ্যকীয়-বাস্তবের-আভাসটুকু জোগাবে কী ক'রে?

তবে,—খুব-বেশী-একটা বাস্তব-মিলের অভাব-ই কোথাও যদি থাকে, তা নিরর্থক নাও হতে পারে। কারণ, সেই অভাবটাই আবার আরেক-রকমের কাজও দিতে পারে।—যেহেতু তাতে বিষয়ের শুধু ইঙ্গিতটুকু থেকেই, পাঠক ও দর্শক-সাধারণ নিজ-নিজ কল্পনা খেলিয়ে পুরো-সত্যটাকে আবিষ্কারের একটা চমক-উপভোগের সুযোগও যে

অনেক-সময় পেয়ে থাকেন কিনা। আর, বলা-বাহুল্য না-বলাটাও যে অনেক-সময় বলার চেয়ে বেশি-অর্থবহ হয়ে থাকে। সেই আবেদন-তাৎপর্যেই তো সংসারে হালের ধরনটা হচ্ছে সর্ববিষয়েই একটু রেখে-ঢেকে বলা। কেননা, এই ঝাপসা-আব্‌ছায়ার উপরেই চলে আধুনিক-ব্যঞ্জনাময়-ঝিলিমিলি-খেলা। আধুনিক-কাব্য তো বটেই, এমন কি, নাটকের-নাট্যটিও 'অ্যাব্‌সার্ড' এই ঝিলিমিলি-আঙ্গিকের অধিকারেই ক্রমশ চলে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের গানেও যে রয়েছে,—

আমার না-বলা বাণীর ঘন-যামিনীর মাঝে

কবির প্রত্যক্ষগত, শ্রুত, পঠিত, বা আলোচিত—নানা উপায়েই-লব্ধ নানা-ঘটনা দিনে-দিনে ক্রমে কবির ধারণাতে, স্মৃতি-বিস্মৃতিতে, ভাবনা-চিন্তায় পাক খেয়ে-খেয়ে, বা, স্বপ্নে-ধ্যানে জারিত হয়েও তাঁর প্রেরণা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগুলিকে নানা সময়ে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছে এবং সোজাসুজি-মৌলিক-ভাবে বা রূপান্তরিত-মিশ্রিত-ভাবে-ও সাহিত্যের সর্ববিধ-রচনায় বিচিত্র-ভঙ্গিতে সে-সব-উপলব্ধি প্রকাশ-ও পেয়েছে। —তাই, সে-সকলকে শুধু সাহিত্য-বিলাসের অবাস্তব-উপাদান ব'লে উড়িয়ে দেওয়া কিংবা সে-সব থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে অন্য-কারো পক্ষে সাহিত্যের-কাজে-ও তা ব্যবহার করা চলে কিনা, বলতে পারবেন তা তথ্যনিষ্ঠ বিদগ্ধ রসিক-সমাজই।

তবু, আপাতত 'জনসাধারণ'-আমরা-আমাদের অভ্যস্ত স্থূল-বাস্তবের পথ ধ'রে-ধ'রে কবির সৃষ্ট 'লিপিকা'-র 'ভুল স্বর্গে' উঠে' মাঝে-মাঝে যদি বদ্ধ-মনে একটু মুক্তির-হাওয়া লাগিয়ে নেই আর তাতে যদি ভ্যাপসা-গুমোট থেকে একটু বেঁচেই যাই, তাতে কার কী ক্ষতি? এসঙ্গে স্মর্তব্য কবিরই 'স্বর্গ হইতে বিদায়' এবং 'ভাষা ও ছন্দ'-কবিতার পংক্তিগুলি। 'রামায়ণ'-রচনার শুরুতেই বাল্মীকি, নারদ-মুনিকে যখন বললেন—

ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে,
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই,—এই ভয় জাগে মোর মনে।

তখন নারদ বাল্মীকিকে আশ্বাস দিয়ে তাঁর দ্বিধা-সমাধানে বললেন—

সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

রামের এই ভাবমূর্তির সাহিত্যিক-সত্য দিয়ে কালে-কালে আদি-মহাকাব্যের সঙ্গে অনুমান-নির্ভর হয়ে যদি দূর-ঐতিহাসিক-আভাসের কাজও আজপর্যন্ত সমাজে চ'লে আসতে পারে, তবে, সেই রীতি ধ'রেই কিছুটা কি আশা করা চলবে না যে,

একালের এই আভাস-আঙ্গিক তথ্যালেখ্য,—সে যতই তুচ্ছ হোক, তা-থেকেও 'জাতীয়-সংগীত'-বিষয়ে জনগণের কিছু উপলব্ধি এবং উপভোগের কাজটাও একেবারে অচল না-ও হতে পারে।

'রামায়ণে'র কাব্য-দলিলটি লিপিবদ্ধ হবার আগে, 'সাহিত্যের-সত্যে'র সনাতন-রায়টি-সম্বন্ধে নারদের জবানীতে নিজস্ব-অভিমতের পূর্বোক্ত কাব্যিক-প্রকাশ যিনি করে গেছেন, তাঁর জীবন ও বাণী-সংপৃক্ত বিচিত্র এই তথ্য-কাহিনীতে বাস্তব-সত্যের যাচাই-স্থলে কোন্ দৃশ্য, কোন্ পাত্রপাত্রী বা কোন্ ঘটনাকে কে কী-ভাবে নেবেন, তার দায়িত্ব জনগণের নিজেদের জ্ঞান ও রুচির উপরেই ছেড়ে দেওয়া শ্রেয় মনে করি।

তবু এ-দ্বিধা-দ্বন্দের মীমাংসা-ক্ষেত্রে, সাহায্য-স্বরূপ, একাধারে সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক এক প্রখ্যাত-শিক্ষাবিদ্-এর এ-গ্রন্থের-ই 'শুভেচ্ছা'-অংশে-যুক্ত বিশিষ্ট-অভিমতটির উল্লেখ ক'রে রাখা যেতে পারে। তাঁর মতে, পাঠক-দর্শক-সকলের পক্ষে প্রথম-থেকেই স্মরণীয়, এ-গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর পরিবেষণাটি 'জীবনী'-আঙ্গিক নয়, —তা 'নাট্যাঙ্গিক'।

তবে, সেই পরিবেষণা নয়, বিষয়ের মহিমা বা বিশেষ-আঙ্গিক-ও নয়, আসল হচ্ছে —ভাবমূর্তিটির উদ্ভাস, যা-থেকে নির্ঝরিত-প্রোৎসাহ নিয়ত অনুভূতিকে এক-লক্ষ্যে আকর্ষিত ও আপ্লুত করে চলেছে। কবির সেই নেপথ্যগত অদৃশ্য বিদেহী-সত্তাই আমাদের মতো মূককে বাচাল করেছে আর পঙ্গুকেও গিরি-লঙ্ঘনের দুশ্চেষ্টায় প্রবৃত্ত করেছে; তার ফল কী হয়েছে, তা গ্রন্থ প'ড়ে গুরুদেবের প্রিয়-'জনগণ'ই বিচার করবেন।

এই তথ্যালেখ্য-রচনার সেই চেষ্টায় প্রকৃত-পক্ষে কবিই হয়েছেন আমার দিশারী। কবির ভাষায় বলতে গেলে "তথ্যের মধ্যে সত্যকে প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।" আমি এই তথ্যালেখ্যে যথাসম্ভব সত্যের সেই-প্রকাশের ধারাই অনুসরণের চেষ্টা করেছি মাত্র।

দৃশ্যবিভাগ, সংলাপ ও নির্দেশনাদি দেখে অনেকে ধরে নেবেন, এটি একটি রীতি-মাফিক নাটক। সবিনয়ে জানাতে চাই, এটি ঠিক সেই-শ্রেণীর নয়। তাই বিশুদ্ধ-নাট্য-আঙ্গিকের বাঁধা-মাপকাঠিতে এর বিচারও যথোচিত হবার নয়, বরং হলে তাতে কিছুটা এর উপর অবিচারই-বা হয়ে পড়তে পারে। যে-রীতিতে এটি রচিত হয়েছে তার আদর্শ মোটামুটি একরকম ধরা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথেরই সুবিখ্যাত সংলাপ-প্রধান-নাট্যোপন্যাস—সেকালের 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', আর, একালের 'মালঞ্চ'।—যাদের থেকে পরবর্তীকালে দুটি-নাটক তৈরী হয়েছে,—যথাক্রমে সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চসফল 'চিরকুমার-সভা' ও অধুনা-প্রকাশিত নাটক-'মালঞ্চ'। প্রয়োজন-বোধে, স্থলবিশেষে এ-গ্রন্থে

নাটক-ছাড়াও ছায়াছবি, গীতি-ও-নৃত্যনাট্য, লোকনাট্য-যাত্রা এমন কি, মাঝে-মাঝে কোথাও-কোথাও অল্পবিস্তর কবি, কীর্তন, ছড়া, বাউল, ভাটিয়ালী-আদির আমেজ ও কোথাও আবার বৃন্দ-বাদ্য-গীত-সহযোগে রণনৃত্যোপযোগী কুচ্-কাওয়াজের-প্রদর্শনী—প্রভৃতি বিবিধ-আঙ্গিকেরই আশ্রয় গ্রহণের দ্বারা যে-ভাবে হয় ভাব-প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। কালের ধারায়, সুকুমার-শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের সাম্প্রতিক-প্রবণতা এই-দিকেও যে কিছু প্রবাহোন্মুখ, তা বিশ্বজয়ী ভারতীয়-স্রষ্টা-শিল্পীদের সদ্য-পরিবেশিত-অনুষ্ঠানাদি থেকে-ও অনুমিত হতে পারে।

এ-সঙ্গে আর-একটি কথাও বলতে হয়,—"স্বদেশী-আন্দোলনে"র পটভূমিতে স্থান, কাল, পাত্রপাত্রী ও ঘটনাবলী-গত আরও-অনেক ঐতিহাসিক-উপাদানের সমাবেশ এবং নানাদিক দিয়ে নানারকমেই অনেকের অনেক-আরো বিশিষ্ট ভূমিকা আর গৌরবময় মূল্যবান দান সুস্পষ্ট ছিল, যা খুবই উল্লেখযোগ্য। এ-গ্রন্থে ঐতিহাসিক-সর্বাঙ্গীণতা-বিচারে সে-সবের অনুল্লেখ অনেকের কাছে পরিলক্ষিত হবে এবং গুরুতর-অঙ্গহানির বিষয় ব'লেই-বা মনে হবে। কিন্তু, তেমনি তাঁরা দয়া ক'রে এক্ষেত্রে সে-সময় একবার স্মরণ করবেন যে, তৎসাময়িক রবীন্দ্র-সাহিত্যেও সে-সব বিষয় অনুল্লিখিত আছে ব'লেই যথা-রীতি এ-গ্রন্থেও তাদের সংযোজনার আগ্রহ সংযত করতে হয়েছে। বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ করেন 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। এই জাতীয়-সংগীত—"জনগণ-মন"-এর রচনার-তারিখ-প্রসঙ্গে তাঁর কাছ-থেকে এ-ও জানা যায় যে,—অদ্যাবধি তাঁর অনুসন্ধানে নির্দিষ্ট-একটি-কোনো বিশেষ তারিখ না-পাওয়া গেলে-ও ১৯১১ সনের ১২ই থেকে ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে কোনো-একদিন এ-গানটি যে রচিত হয়েছিল সে-বিষয়ে নানাদিকের তথ্যবিচারে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

বৃহৎ-বৃহৎ-ব্যাপারে কিছু-না-কিছু খুঁত-থাকা বিচিত্র নয়, এ-গ্রন্থেও তা থাকা-ই স্বাভাবিক। কিন্তু তা-সত্ত্বেও, যদি দেখা যায়, সব-কিছু ছাপিয়ে তথ্যালেখ্যে প্রকাশ পেতে চাচ্ছে—ঘটনার-পটে-মূর্তি-ধ'রে প্রত্যাশিত-প্রেরণাটি, আর, প্রেরণার-অনুসারী ইঙ্গিত ও সংগতি রক্ষা ক'রে দৃশ্যে-দৃশ্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে চাচ্ছে বাহ্যিক-বিচিত্র স্থূল-ঘটনাগুলি,—তবেই হল। কারণ, সেইভাবেই কিংবা ঐ-রীতিতেই, এ-গ্রন্থে ফোটাতে চাওয়া হয়েছে গানের রচয়িতা-রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিটিকে, চাওয়া হয়েছে তাঁর জীবন ও বাণীর প্রাণ-কেন্দ্রস্বরূপ তাঁর '**মহাগীত**'—(কবিরই উক্তি—"তবে, ধন্য হবে মোর গান, শত-শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ")—এই '**জনগণ-মন-অধিনায়ক**'-গানেরও ভাব-মূর্তিটিকে। কবি ও তাঁর মহাগীতের অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত-রূপ উদ্‌ঘাটনের

এই প্রচেষ্টা চলছে এর-প্রতি জনগণ-মনের আকর্ষণ উদ্দেশ্য ক'রে,—এবং তা চলছে সহজ-সুবোধ্য নাট্যধর্মী-প্রকরণকে ভিত্তি ক'রে আনুষঙ্গিক আরো নানা-আঙ্গিকের সহযোগে। তা করতে গিয়ে এতে ঐতিহাসিকতার সঙ্গে সাহিত্যিক-সত্যের যেখানে যা বুনট চলেছে তার সবই ঘটেছে সুপরিচিত শাস্ত্রনির্দেশ মেনেই, যথা,—সত্যকে অপ্রিয় থেকে কিছুটা প্রিয় ক'রে বলবার জন্যই। আর, জিনিসটা নাট্যধর্মী ব'লেই সে-পথে এসে-গেছে রুক্ষ-রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে কিছু-কিছু সরস-শোভন রম্যতার-ও সংযোজনা।

মোট কথা,—সপ্ত-পর্বিক এই গ্রন্থের প্রথম টানা-ছয়টি-পর্বের ঘটনাস্থল,—প্রধানত ইংরেজি ১৯০৫—১৯১১ সনের বাংলাদেশ। সপ্তম-পর্বের ঘটনাস্থল, অতীত-ভারতের অনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-শতাব্দীর কাছাকাছি-সময়ের আঞ্চলিক-গণতন্ত্রী-ঐতিহ্যবাহী—বৈশালী তথা 'বৃজি' বা 'বজ্জি' এবং অন্যটি তাপ্তি-নদীর দক্ষিণস্থ—বিদর্ভ-রাজ্য। আর, যদিও এর রচনারীতি অনেকটা আভাসিক রূপক-জাতীয়, তাহলেও সেটা তেমন কূটতাত্ত্বিক দুর-অন্বয়ী বা দুর্বোধ্য-প্রতীকী-কিছু নয়। সময়, ঘটনা, ভাষা ও চরিত্রের হেরফেরের মধ্যেই সেই রূপকের রূপটি সীমিত ও আভাসিত। অত্যাবশ্যকীয় যোগ-বিয়োগ অদল-বদল যেটুকু করা হয়েছে সবই পূর্ব-অনুসৃতরীতিতে—মূলের-উপাদান-অভাবে ; কিন্তু, করা হয়েছে তা মূলেরই-মতো-ক'রে যতটা-পারা-যায়-ভাবে ;—বাস্তব-সত্যের-কাছাকাছি স্বপ্নাভাসিক তার ভাবমূর্তি। গোটা'মর্ত্যনন্দন'-পর্বটিও সেই স্বপ্নাভাসিক-ইঙ্গিতবাহী হয়ে ভাবী-পরিণত-ভারতের ভাব-মূর্তিটিকে দেশবাসীর গোচরে এনে আবির্ভূত করেছে।

অন্যদিকে, ইতিপূর্বে সাধু-কথ্য-নির্বিচারে মূলে যেখানে-যেরূপ ভাষার দেখা মিলেছে, প্রামাণিকতা-রক্ষার দায়ে গ্রন্থের সংলাপে অবিকৃতভাবে তা-ই রেখে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কার্যত তা অচল দেখে, কোনো-কোনো স্থলে—বিশেষ ক'রে ক্রিয়াপদেই, যথা 'করিলেন' স্থলে বদলে 'করলেন' 'আমাদিগকে' স্থলে 'আমাদিকে' ক'রে দিয়ে, আগাগোড়া-সর্বত্র এবার সব-ই কথ্য-ভাষায় একই-রকমে সামান্যতম-রূপান্তর সাধন করা হয়েছে। ভাষার মতো কাহিনীরও অধিকাংশ-ঘটনাই হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে সংগৃহীত। সেক্ষেত্রেও সুদীর্ঘ-পালার স্থলে-স্থলে ঘটনার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ফাঁক-পূরণের-প্রয়োজনে উপাদানে খাদও-কিছু-যে না-মেশাতে হয়েছে এমন নয়, তবে, এ-মেশানোটাও হয়েছে সেই-পরিমাণেই যা স্বর্ণশিল্পীরা-ও মিশিয়ে থাকে তাদের শিল্পসম্ভারের সৌষ্ঠব ও টেকসই-র দিক চেয়ে। এসব করতে গিয়েই, বিষয়ে ও ভাষাভঙ্গিতে গ্রন্থখানি এই-বিষয়ক-পূর্ব-রচনাদির থেকে যেমন হয়েছে বিবিধ-রকমেই বড়ো-আকারের, স্বাদে-সৌকর্যেও হয়েছে তেমনি স্বতন্ত্র-ধরনের।

এবারের সমগ্র-রচনাটি জাতীয়-সংগীত 'জনগণমন'-কেন্দ্রিক হওয়ায় সংগীতকার রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনার কথা প্রাসঙ্গিকভাবে এতে স্বতই এসেছে বেশি ক'রে। "কবিকে জানার পথে 'জন-গণ'-গানকে জানা দরকার, কিন্তু, জাতীয়-সংগীত 'জন-গণ' গানকে জানার জন্য কবিকে জানা বোধ হয় আরো-বেশি দরকার।" এবারে 'বোধ-হয়' নয়, লিখতে গিয়ে দেখা গেল উক্ত-কথাটি কাজেও কত সত্য। এ-থেকেই বোঝা যাচ্ছে,—কেন-যে এই গ্রন্থ একটি ক্ষুদ্র স্কেচ্ বা একটি অধ্যায়-এর মধ্যে নয়,— "স্বতন্ত্র-গ্রন্থাকারেই" একটি "বৃহৎ পুস্তক সংস্করণেই প্রকাশিত হবার" দরকার ছিল।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য,—এই গীতিকার-রবীন্দ্রনাথ এমনি-একজন অনন্ত-স্রষ্টা,—অজস্র রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে যাঁর রচিত বিশেষ-দুটি গান আজ স্বতন্ত্রভাবে দুটি-দেশের দুটি জন-সমাজের 'জাতীয়-'সংগীত'-রূপে গৃহীত হয়েছে। ভারতের "জনগণ-মন"-এর মতো আজ বাংলাদেশের জাতীয়-সংগীত "আমার সোনার-বাংলা"-গানটিও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এখন বিশ্ববিদিত ও সুবন্দিত। অপূর্ব কথায় ও সুরে সাতকোটি-জনগণের মনোহরণ ক'রে প্রাণে-প্রাণে ঐক্য, স্বাধীনতা ও নবসৃষ্টির উদ্দীপনা জাগিয়ে নবোদ্ভূত-বাংলাদেশবাসীকে এক মহাজাতি-গঠনে উদ্বোধিত করে চলেছে এই—'সোনার বাংলা'-গান। আর, বিশ্বে যারা আজ জাতি-গঠনের অন্যতম-ভিত্তি ব'লে বিশেষ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, সেই মাঠ-ঘাটের খেটে-খাওয়া এককালের অবজ্ঞাত সামান্য গেঁয়ো মাঝি-মাল্লা "রাখাল-চাষী"-র কথা ("আমার রাখাল আমার চাষী") কী আন্তরিকতা দিয়েই না উল্লিখিত হয়েছে কত আগে এই "সোনার বাংলা" গানে— সেই দরদের কি তুলনা আছে? এইভাবে ক্ষুদ্র-ও সেদিন বৃহতের সঙ্গে, তুচ্ছ-ও সেদিন উচ্চের সঙ্গে বিশ্ব-মানবতার-মূল্যে সম-গৌরবে এই-গানে সম্বর্ধিত হয়েছে। আর, এই গানে আজ কোটি-কোটি জন কোটি-কোটি কণ্ঠ মিলিয়ে, 'জাতি-সংঘে'র বিশ্বমানব-মেলায় শক্তিমান, প্রাণবান অন্যতম-এক সুযোগ্য-অংশীদার-রূপে মাননীয়-সভ্যের আসন-গ্রহণে হয়েছে অগ্রসর। মূলত, একই-বাংলার একই-বাঙালী, রাষ্ট্র-বিপর্যয়ে ভৌগোলিক-সীমায় বাহ্যিক দ্বিধা-বিভক্ত হলেও, এই-একটি গানের মরমী একটু সুরের টানে দুই বাংলাবাসীই দুই যমজ-ভাইয়ের মতোই একই নাড়ীর-টান অনুভব ক'রে চলছে।

উল্লেখযোগ্য যে, দুটি গানই একই গীতস্রষ্টার হাতে প্রায়-সমকালেই রচিত হয়েছে। এ ঘটনা-ও যে একটা ইতিহাস। আর, এটা এমনি-একটা জ্যান্ত-ইতিহাস যা কোনো কালে কোনোদেশে আজ-অবধি এমন ক'রে রচিত হয়নি। তার অপূর্বতা আরো এইখানে যে, মামুলি অস্ত্র-ঝংকৃত-সংগ্রামের রক্ত-ক্ষরী পথে নয়,—অন্তর-মথিত

মৈত্রী-সংগীতের উদাত্ত-আহ্বানের পথেই এ-সংগীতের ঐন্দ্রজালিক-সক্রিয়তা প্রমাণিত হয়ে-রয়েছে।

শুধু, দেশের জল-মাটির বাস্তব-সূত্রে নয়,—সাংগীতিক-রেশের অবাস্তব এক মায়িক-ভাব-সূত্রে-ও দু'টি জন-সমাজকে আত্মার-আত্মীয়-বোধে 'এক-পৃথিবীর এক-পারিবারিক' এক-জাতিতে একাত্ম ক'রে চলেছে পরস্পরের দুটি 'জাতীয়-সংগীতে'। আর, রাজনীতির নানা জটিলতার মধ্যে কত-না-সহজে এই 'এক'-জাতিত্বের স্রষ্টা হয়ে চলেছেন গীতিকার-রবীন্দ্রনাথ। এমন কি,—বংশধারার ঐতিহ্যের দিক দিয়েও অংশ-সত্তায় হয়ে আছেন ঐ-কবি দুই বাংলারই আপন-জন।

আত্মীয়তার-'পুণ্যতীর্থ-মহাভারতে'র মহামিলনবাদী অনন্তযাত্রী-পথিক রবীন্দ্রনাথের 'বিবিধের মধ্যে একত্ব'-সৃষ্টির বাস্তব এক মহা সত্য-নিদর্শন ঘটিয়েছে এই দুই-জাতীয় সংগীতের মহৎ-ঘটনা। আর, সেই ঘটনার মহিমা-কীর্তনেই এই গ্রন্থের উৎপত্তি।

এখন এই দেশ ও মানুষের সর্বাত্মীয় এই-রবীন্দ্রনাথের-রচিত জাতীয় জয়-গাথা এবং সে-সঙ্গে কিছু 'মহাকবি-কথা'-ও বলতে গেলে, কবিগুরু-বাল্মীকিরই মতো,—সত্য লিখতে গিয়ে সত্যের কাছাকাছি পূর্বোক্ত এক-আধটু স্বপ্নাভাসের সেই মিশোলও যদি তাতে এসে পড়ে—কিছুই আশ্চর্য নয়।

সে যা হোক এদিকে কিন্তু, দিনে-দিনেই বাস্তবে ফল গড়াচ্ছে উল্টোপাল্টা। বহুদিন বিগত হলেও 'জাতীয়-সংগীতে'র উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি-সম্বন্ধে আজও বিশেষ-কিছু জানার সহজ-সুযোগ না পেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সংগীতটি-সম্বন্ধে রাগে-বিরাগে প্রতিক্রিয়া-মূলক নানা-গণ-অপ্রিয়তার লক্ষণই ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছে। এমন কি, তার প্রতিবিধানে কিছুদিন-পূর্বেও সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়-স্তম্ভে, প্রবন্ধে এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে নানা-সময়ে নানা কথা আলোচিতও হয়েছে। পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠেছে যে, সরকারী-মহল-হতে আইন-প্রণয়ন-কল্পে বিল-উত্থাপনের কথাও শোনা গেছে, এবং সংবাদপত্রের সংবাদ এই যে,—কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে কয়েক-জনকে 'জাতীয়-সংগীতে'র প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে অবহেলার-দরুণ হাজতে-পুরতেও বাধ্য হয়েছেন। চারদিকের এই গোলমালের মধ্যে গত ১।৩।৬৯ তারিখের 'আনন্দবাজার-পত্রিকা'-তে জনৈক পত্র-লেখক—শ্রীমানসরঞ্জন সেনগুপ্ত, নিউ-সপ্তগ্রাম, বর্ধমান,—এক-পত্রে লেখেন, "আমার ধারণা,—'জনগণমন-অধিনায়ক' বা আমাদের জাতীয়-সংগীতের প্রকৃত-অর্থ অনেকে হৃদয়ংগম করতে পারেন-নি। সকলের মনে, দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে হলে সংগীতের অর্থ ও তাৎপর্য প্রচার করা দরকার।" এ-ছাড়াও, জাতীয়-সংগীতের

মর্যাদা-বিষয়ে ১৯.৯.৭২ তারিখের 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'য় শ্রীসুনীত মুখার্জি লিখিত প্রবন্ধ এবং ৫.১০.৭২ তারিখে 'আনন্দবাজার-পত্রিকা'য় প্রকাশিত শ্রীপার্থপ্রতিম দাস-লিখিত পত্রখানিও দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, আমি বহুপূর্ব-থেকেই এম্‌নি-একটি প্রয়োজনের-তাগিদে 'জাতীয়-সংগীতে'র 'অর্থ ও তাৎপর্য-প্রচার'-কল্পে প্রায় বাইশ-বছর যাবৎ (সত্যযুগ,—নভেম্বর ১৯৪৯) এ-গ্রন্থ-রচনায় ব্যাপৃত আছি। এবারে তার ফলে রচিত এই পূর্ণাঙ্গ-গ্রন্থখানি ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পঁচিশ-বছরের রজত-জয়ন্তী-উৎসবের উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রকাশ ক'রে জাতীয় একটি পুণ্যক্ষণে দীর্ঘ-দিনের সংকল্পিত-ব্রত সমাধা করলাম। আরো উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বভারতীয় সদাশয়-কর্তৃপক্ষ একাজে আমাকে পূর্বাপর অনুমতি দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন, এতে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

এতে-ব্যবহৃত সমুদয় রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরলিপি 'স্বরবিতানে' প্রাপ্তব্য। (বাদে, দু'টি গান—"আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে যে যেখানে থাকে"—'রাখীবন্ধন'-পর্ব পৃঃ ৬২; এবং "অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে"—'জয়-স্পন্দন'-পর্ব পৃঃ ২৪১। -মূলেই গান-দু'টি সুরহীন) আর, সর্বশেষ সপ্তম-পর্ব 'মর্ত্য-নন্দনে'-ব্যবহৃত "সখি, কী যেন দেখেছি কবে"-গানটি মূলত গ্রন্থকারের-লেখা, কিন্তু পরিমার্জনে গানটির দ্বিতীয়ার্ধ-সম্পূর্ণ-ই হয়ে-আছে রবীন্দ্রনাথ-কৃত। ঐ-পর্বের 'ভুখা-ভগবান'-অংশে "অনুগত-জনে কেন কর এত প্রবঞ্চনা"-গানটি যে সুবিখ্যাত-নিধুবাবুর কৃত, তা বলাই বাহুল্য। 'মর্ত্য-নন্দন'-পর্বে যে দুটি-অংশ আছে, যথা, 'লোকমাতা' ও 'ভুখা-ভগবান'—এদের মধ্যে ঐ-ভাবে ভাগ-টানা হয়েছে শুধু,—কাহিনীর দু'টি-পর্যায়-ভাগ-বোঝাবার উদ্দেশ্যে। স্বেচ্ছায়-আরোপিত নানাদিকের নানা-সীমাবদ্ধতা নিয়ে গ্রন্থে যেখানে যেটুকু-যা-করবার করা হয়েছে, কিন্তু, অভিনয়-ক্ষেত্রে প্রয়োজন-মতো প্রযোজনায় দুটি বা টানা-একটি পালায়ও এদের সাজিয়ে-নেওয়া,—অভিপ্রেত। অভিনয়ে,—সংঘাত, ঔৎসুক্য, রহস্য, যথাযোগ্য-ভাষা, দৃশ্য, ছন্দ, গতিবেগ ও অভিনয়ের, মনোহারিতা ইত্যাদি আনবার জন্য—নাট্যোপযোগী প্রসাধনিক-কাজ যথাসম্ভব গ্রন্থের—প্রতিপাদ্য প্রামাণিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এ-সবই করা চলবে—স্থান-কাল-পাত্রের সুবিধা বুঝে'। আর, আগের বা পরের বর্জনীয়-অংশের ঘটনা-ধারা নেপথ্য-ঘোষণায় ধারা-বিবরণীতে দর্শকদের জানিয়ে দিলেই পালার কাহিনী-অনুসরণে তাদের সুবিধা হতে পারে। এই রীতি এ-গ্রন্থের সর্বত্রই নাট্য-প্রয়োগের প্রয়োজনে প্রযোজ্য হতে পারে কিনা, মাননীয়-প্রযোজকেরাই তার বিচার-ব্যবস্থার সুযোগ্য-অধিকারী। তবে, যা-ই

করা হোক, গ্রন্থকারকে জানিয়ে তার অনুমতি-গ্রহণ সর্বক্ষেত্রেই আবশ্যিক, কেননা, গ্রন্থের সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার-কর্তৃক সংরক্ষিত।

এরই সঙ্গে 'জাতীয়-সংগীতে'র ইতিহাস ও মর্মকথা যাতে সকলে আরও ভালো ক'রে যত-বেশি জানতে পারে, এজন্য শ্রদ্ধেয়-মনীষী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ('দিক্-স্পন্দন'-পর্ব) ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, ('রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ') যথাক্রমে বিশ্বভারতী ও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন-দুইজন রবীন্দ্র-অধ্যাপকের অভিমত এবং সারগর্ভ দুটি রচনা এ-গ্রন্থে সংকলিত হল। গ্রন্থের প্রতি তাঁদের এই দাক্ষিণ্য আমাকে চিরকৃতজ্ঞ ক'রে রাখল। প্রচ্ছদখানি শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায় কৃত। এই মহান-শিল্পী এবং বহু-আরো সহৃদয়-বন্ধুবান্ধব, বহু বিশিষ্ট ও সাধারণ-জনের আরো উপদেশ-নির্দেশ, অভিমত, আগ্রহ-প্রোৎসাহ এবং ত্রুটি-প্রদর্শনও যত-যা পেয়ে আসছি, তা কখনো ভুলবার নয়। এই-প্রসঙ্গে অনেকের নামই করতে হয়। বিশেষ ক'রে অধ্যাপক ডঃ আনন্দমোহন বসু কবির খুলনায়-সাক্ষ্যদানের ঘটনা-প্রসঙ্গে হীরালাল রায়-রচিত **"হুঙ্কার"**-গ্রন্থ-সম্বন্ধীয় লুপ্ত-তথ্য সরবরাহ ক'রে এবং অন্যান্য অনেক তথ্যসহ ১৯০৫ সালে ভারতের রাজধানী যে কলকাতায় অবস্থিত ছিল এদিকে দৃষ্টি-আকর্ষণ ক'রে আমাকে কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ করেছেন। এ-প্রকার আরও দু-একটি তথ্য এবং নানা-সাহায্যের জন্য বিশ্বভারতীর প্রাক্তনকর্মসচিব শান্তিনিকেতনস্থ শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন, শ্রীহরি মিত্র, শ্রীভুজঙ্গ-ভূষণ মিত্র, শ্রীমান চপল তালুকদার, বোলপুর-নিবাসী উকিল শ্রীবিভূতি-ভূষণ মুখার্জি, শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীকুশল চৌধুরী, শ্রীস্বপন মণ্ডল, ভুবনডাঙানিবাসী স্বর্গত কবি-ভোলানাথ সেন, শ্রীহিরন্ময় নাগ, শ্রীপ্রভাকর হাজরা, শান্তিনিকেতন-প্রেসের ম্যানেজার শ্রীসিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য, এ-গ্রন্থের-কপিকারক শ্রীদ্বিজপদ হাজরা, কলিকাতার সঙ্গীতাচার্য শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক, আমার ভগ্নী অধ্যাপিকা শ্রীমতী সাধনা কর, কন্যা শ্রীমতী শুভ্রা কর, আত্মীয় শ্রীসুকুমার ঘোষ, ছায়াছবি-পরিচালক স্নেহাস্পদ শ্রীঅমল দত্ত, অগ্রজোপম শ্রীপরমানন্দ দত্ত এবং স্বর্গত বিমল দত্ত-এর নাম উল্লেখযোগ্য। বাকী-সবই সুষ্ঠুভাবে উল্লেখের জন্য, সম্ভব-হলে আগামী-সংস্করণের আশায় উহ্য রাখা গেল। এঁদের সকলেরই ঋণ চিরদিন আমাকে কৃতজ্ঞ ক'রে আমার অন্তরে এঁদেরকে বরণীয় ও স্মরণীয় ক'রে রাখবে। সর্বশেষ, গ্রন্থের-পরিবেশক 'পারমিতা-প্রকাশন' ও 'ভগবতী-প্রেসে'র-কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে,—সদাশয়-'জনগণে'র সপ্রীতি-আনুকূল্য প্রার্থনা করছি।

বিশেষ আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা,—দেশের নাট্য-আন্দোলনের পুণ্য-শত-

বার্ষিকী-বর্ষের মধ্যে 'জাতীয়-সংগীতে'র-রচনা-কাহিনীর এই নাট্যধর্মী-বিচিত্র-আলেখ্যটিকে রচনা এবং প্রকাশ করতে পেরে কৃতার্থ হলাম।

পরিশেষে বক্তব্য, আজ সাম্য, শান্তি ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠার জন্য 'জাতিসংঘে' নানা-দেশ সমবেত হচ্ছে। আর,—কোন্ মতে ও কোন্ পথে নব-এক বিশ্ব-সমাজ-সৃষ্টির কাজ সিদ্ধ হতে পারে, তাই নিয়ে দেশে-দেশে মানুষের মধ্যে উদ্যোগের সাড়া পড়ে গেছে। ভারতবর্ষ-ও বসে নেই। একাজে ডাইনে-বাঁয়ে মিলিয়ে তারও চেষ্টা-চরিত্রের অন্ত নেই। বিশ্বজনের গ্রহণ-যোগ্যতার-বিচারে শ্রেষ্ঠ হবার পক্ষে, সকল-দেশের মতো ভারতের প্রতিও একটি আদর্শ-সমাজ-সৃষ্টির 'ফরমুলা'-উপস্থাপনের ডাক আছে। এজন্য সর্বাগ্রে স্বদেশে সেই ফরমুলা-আবিষ্কার এবং জন-জীবনে সেই ফরমুলা-প্রয়োগের-পরীক্ষায় সফল হওয়া—সকলেরই একান্ত প্রয়োজন। এই সফলতা-লাভের অনিবার্যতা দেশ ও দলমত-নির্বিশেষে উহ্য রয়েছে সকলেরই নিকটে। এবং সেজন্য প্রত্যেক দেশের সকলেরই তা সর্বক্ষণ স্মরণ, মনন ও আচরণের বিষয়। ভারতের পক্ষে সৌভাগ্যই বলতে হবে, রবীন্দ্রনাথের "জনগণ-মন"-গানটিতে নিহিত রয়েছে সেই বিশ্বসভায়-উপস্থাপনীয় শাশ্বত-ফরমুলাটি,—যেটি সর্বত্র, সর্বকালের, সর্বজনের সর্বার্থ-সাধনে শক্তিদাতা এক পরম-প্রেরণার উৎস। আর, ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনের অভ্যন্তরে সেই প্রেরণার প্রতিষ্ঠা-উপযোগী প্রাত্যহিক ধ্যান ও আচরণ-নির্দেশক একটি উদাত্ত-আহ্বান-দীপ্ত-কাহিনীর-আলেখ্যও সন্নিবিষ্ট রয়েছে গ্রন্থ-শেষের "মর্ত্যনন্দন"-পর্বে। তার-পরেই ঘটেছে সমগ্র-গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

এদিকে বাইরে মন্দার-বাজারে, আকার ও পর্ব-বাহুল্যের জন্য এ-গ্রন্থ-প্রকাশ করা ক্রমেই কঠিন হচ্ছিল। কিন্তু, স্বাধীনতা-উৎসবের কথা শোনা-মাত্র—ভিতর থেকে তেমনি-আবার আর-সব-চিন্তা-ছাপিয়ে আমার অনন্ত-লক্ষ্য হয়ে উঠল আর-কিছু নয়—একটি জিনিস—সেটি গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর অমূল্য ও অনন্ত মহিমাটি। বইটির পিছনে বহু-ব্যাপারে বহুদিন বহু-কাজে কাটিয়ে-এসে বেশি ভালো করতে আরো-বেশি-কিছুর অপেক্ষায় না-থেকে তখনই যে-ক'রে হোক, আসন্ন 'রজত-জয়ন্তী-বর্ষে'র মধ্যেই জনগণের হাতে এ-গ্রন্থ তুলে-দেবার কাজে আমাকে তৎপর করল আমার আন্তরিক-ঔৎসুক্যের নিরন্তর-তাগিদ। কেন-না, এইটিই বারবার মনে হতে লাগল—গানটিকে কেবল বিশেষ দেশকালের-সীমায় আবদ্ধ ক'রে দেখার নয়, এটি যে অর্থ-তাৎপর্যে বিশ্ব-জাতীয়-সংগীতের-ও উদ্দীপনায় মহান। সুতরাং, সেই মহান-তাৎপর্যেও ভারতের জনগণকে অবহিত করা একান্ত আবশ্যক।

এই ভেবে, মাত্র ৫০০ কপির জন্য স্বল্প-সম্বল উৎসর্গ ক'রে একাধারে একাই

গ্রন্থকার ও প্রকাশক হয়ে কাজে নামলাম। কাজে-নামার মুখে, গ্রন্থের মুদ্রণ ও পরিবেশনের-ব্যবস্থায় পরামর্শের সাহায্য নিয়ে এলেন তখন বোলপুর-কলেজের পূর্বোক্ত প্রধান-সাহিত্য-অধ্যাপক ডঃ শ্রীআনন্দমোহন বসু।

এখন, ভারতের গণতন্ত্রী-সরকার-রূপী মাননীয়-'জন-গণেশে'র নিকট সহৃদয় বিবেচনার জন্য সানুনয়ে এই নিবেদনটি এখানে করে রাখছি যে,—'জাতীয়-সংগীতে'র এই বিশেষ-ফরমুলা-তাৎপর্য-প্রচারে অচিরেই তাঁরা উদ্যোগী হলে তা সময়োচিত একটি সুষ্ঠু কাজ করা হয় কি-না। কেননা, মনে হয়,-এই প্রচার থেকে, জনগণ-মন' গানটির মান-উত্তুঙ্গতার কথা খানিকটা উপলব্ধি ক'রে গানটির প্রতি যেমন সকলের শ্রদ্ধা বাড়তে পারে, তেমনি, জাতীয়-এরূপ-জন-কল্যাণময়-কাজে-উদ্যোগী-সরকারের প্রতি প্রীতি-বিশ্বাসের দৃঢ়তা-ও যে সাধারণের কিছু না-বাড়বে এমন নয়।

এ-সঙ্গে আজ বিশেষ ক'রেই স্মর্তব্য, কলকাতায় আসন্ন-নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ বার্ষিক-অধিবেশনের কথাটি-ও;—কেননা, একষট্টি বছর আগে ১৯১১ সনের ডিসেম্বরে ভারতীয়-কংগ্রেসের এই পূর্ণাঙ্গ-অধিবেশনেই ঘটেছিল আজকের জাতীয়-সংগীত এই 'জনগণমন'-গানটির প্রথম প্রকাশ্য-আবির্ভাব।

তা-ছাড়া, নানা-আঞ্চলিক্ স্কুল-কলেজ-লাইব্রেরী-বিশ্ববিদ্যালয়-সংঘ-সমাজ-সমিতি প্রভৃতি শিক্ষা ও জাতীয়-কর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতে রজত-জয়ন্তী এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেসের এই পূর্ণাঙ্গ-অধিবেশনের-উৎসব-উপসংহারে পবিত্র স্মারক-উপহার-রূপে জন-সাধারণকে বিলোবার-মতো-মেলানি-হিসাবেও এ-বইটিকে দেখা যেতে পারে কিনা—বিবেচ্য। ২৫ বছর ধ'রে জাতীয়-সরকারই হয়তো এতদিন খুঁজে এসেছেন এই জাতীয় একটা-কিছু। এরূপ গ্রন্থ-দান-যজ্ঞের দ্বারা যথা-অর্থে সার্থক হতে পারে অন্যান্য আরো-অনেক-সময় আরো-অনেক জাতীয়-মহোৎসব; আর, হতে পারে তা কবি-আকাঙ্ক্ষিত বৃহত্তর-বিশ্ব-মিলন-মেলারই সূত্র হয়ে। এই মেলার কথা অতঃপর কবির বাণীতেই শোনা যাক:

"...আমার বাণীর পথ রোধ করবে এমন সাধ্য কারো নেই। সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার দেশ ব'লে বরণ করে নিয়েছি। এরাও তো সকলে আমাকে গ্রহণ করেছে,...... বেশি ক'রে আপন-লোক বলে জেনেছে। পৃথিবী থেকে যাবার আগে সমস্ত-পৃথিবীর সঙ্গে আমার আপন-সম্বন্ধ অনুভব ও স্বীকার ক'রে যেতে পারলুম—এইটেতেই আমি আমার জীবন সার্থক ব'লে জানছি। আমাদের বাংলাদেশের কোণে একটা বিশ্বপৃথিবীর হাওয়া উঠেছে—এইটে আমাদের সকলের অনুভব করা উচিত। এইখানে রামমোহন রায় সর্বজনীন ধর্মের আলোকে জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন

—সেই প্রভাতের আলোকেই বাংলাদেশের নবজাগরণের প্রথম-উষালোক। সেই আলোকে যে বিশ্বের সুর বেজেছে সেই সুরই আমাদের সুর—সেই সুরই মানব-ইতিহাসের আসন্ন-ভাবিযুগের-সুর।

একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণব করেছিলেন,—সেই বৈষ্ণবের জাত নেই কুল নেই—আর-একদিন রামমোহন রায় আমাদের ব্রহ্মলোকে উদ্বোধিত করেছেন—সেই ব্রহ্মলোকে-ও জাত নেই দেশ নেই। বাংলাদেশের চিত্ত সর্বকালে সর্বদেশে প্রসারিত হোক, বাংলাদেশের বাণী সর্বজাতি সর্বমানবের বাণী হোক। আমাদের '**বন্দেমাতরং**'-মন্ত্র বাংলাদেশের মন্ত্র নয়—এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা, সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী-যুগে একে-একে সমস্ত-দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।…তালপাতার ভেঁপু যারা বাজিয়ে বেড়াচ্ছে তারা কোনোমতেই বুঝতে পারবে না,—আমাদের দেশের সত্যকার সাধনা কী। আমরা যত দুঃখ যত দারিদ্র্য যত অপমানই পাই না কেন, মাথায় করে নেব—এই সমস্ত দুঃখ-অপমান আমাদের মাথার মানিক হয়ে উঠবে যদি আমরা মানব-ইতিহাসের সর্বোচ্চ সিদ্ধিকে স্বীকার করতে পারি।

…আমরা আরামে থাকব না, আমরা আলোকে বাস করব—এইজন্যে যে, **মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ ব'লে গ্রহণ করব**। আমাদের জন্যে সম্পদ নয়, মুক্তি। যাই হোক আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের বৈরাগীরা বিশ্বের পথে-পথে ছড়িয়ে পড়বে—কোণের মধ্যে আমাদের জায়গা হবে না। ঐ দেখো না, এত কোণ এত বন্ধনের মধ্যেও জগদীশ বোসকে কেউ ধরে রাখতে পারল না। তাঁর বিজ্ঞানের মন্ত্র কুনো-বিজ্ঞানের মন্ত্র নয়—তিনি জড় ও চেতন, বস্তুবিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞান সমস্তকে একত্র মিলিয়ে বন্ধনমুক্ত জ্ঞানের মহা-সংকীর্তন পূর্ব-পশ্চিমে ধ্বনিত করে তুলেছেন। এই যে তিনি দ্বার খুলে বেরিয়েছেন এ-দ্বার সহজে আর বন্ধ হবে না, তাঁর দলের লোক আরো আসছে, পথে আর জায়গা হবে না।……কেননা অন্তরতম সাধনলোকে সিদ্ধিদাতার আহ্বান এসে পৌচেছে।….ইতি, ১০ কার্তিক ১৩২৩"—(চিঠিপত্র ২)

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

জনগণমন-অধিনায়ক

পর্ব-সূচী

১ মুক্তি-ক্রন্দন

২ রাখী-বন্ধন

৩ মাল্য-চন্দন

৪ জয়-স্যন্দন (জয়রথ)

৫ অভিবন্দন

৬ দিক্-স্পন্দন

৭ মর্ত্য-নন্দন : প্রথম অংশ—লোকমাতা
দ্বিতীয় অংশ—ভুখা-ভগবান

চরিত্র-সূচী

(দ্বিতীয়-পর্ব '**রাখী-বন্ধন**' থেকে পঞ্চম-পর্ব '**অভিবন্দন**' পর্যন্ত)

পাত্র

কবি

অরবিন্দ (শিক্ষাচার্য)

লর্ড কার্জন (ভারতের বড়লাট)

বিশ্ববান্ধব উপাধ্যায় (দেশাত্মা বৈদান্তিক সন্ন্যাসী)

আনন্দমোহন (দেশসেবী নেতা)

চৌধুরী, বাঁড়ুয্যে (নরমপন্থী নেতৃ-দ্বয়)

মৌলবী-লিয়াকৎ (স্বদেশী-প্রচারক)

মুকুন্দ (প্রবীণ-দেশভক্ত গায়ক-কর্মী)

ব্রতীন্দ্র (দেশকর্মীদল-নায়ক)

ক্ষুদিরাম (উগ্রপন্থী স্বদেশসেবী-কর্মী)

কুমার (ছাত্র-কর্মী)

বীরেন, অরুণ, অশোক, নির্মল (দেশসেবী যুবককর্মী)

মিশনারী সাহেব (খ্রীস্টান ধর্মযাজক)

সার্জেণ্ট (সংঘর্ষ-পর সরকারী-শাসন-যন্ত্রের প্রতীক)

পাত্রী

নিবেদিতা (নারীকর্মী-নায়িকা)

রানী (চাষী-রঘুনাথের মেয়ে)

ফরিদা (চাষী-ফকুর স্ত্রী)

বিনি (কিশোরী-কর্মী)

মাসী (বিনির আত্মীয়া)

রুক্মিণী (বস্তি-বাসিনী)

উদ্বাস্তু-নারীদল ও তাহাদের শিশুদল ইত্যাদি।

ফরু-সর্দার (চাষী)
তমিজ (ঐ পুত্র)
বিশু ও হারু (সরকারী-গুপ্তচরদ্বয়)
মাধব চাটুয্যে (মহাজন)
রামচরণ (নাপিত)
রহিম (চাষী)
রমজান (চাষী)
রঘুনাথ (চাষী)
কিশোর (ঐ পুত্র)
জনার্দন (মজুতদার)
পাঁড়েজী (স্বদেশানুরাগী-পুলিস, পরে ১নং দারোয়ান)
তেওয়ারি (২নং দারোয়ান)
ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস-সাহেব, জেলর ও সহকর্মী, ওয়ার্ডার, মেথর, জনৈক ভদ্রলোক এবং তাহার শিশু-ছেলে ও মেয়ে. পুলিসদল, স্বদেশী-কর্মীদল, জেলেদল, মজুর ও শ্রমিকদল, পল্লীবাসীদল, জনকয়েক মুসলমান, তরুণদল, উদ্বাস্তুদল ইত্যাদি।

মর্ত্য-নন্দন

বৈশালীরাজ
বিদর্ভরাজ
শিলাদিত্য, জয়সেন, উদয়ভাস্কর, যুধাজিৎ } অমাত্যবৃন্দ
সুবন্ধু—বিদর্ভরাজের বাল্যবন্ধু
বিদর্ভের-সেনাপতি
কুঞ্জলাল—বিদর্ভ-বাসী চাষী-সর্দার
মহাজন
ক্ষ্যাপাচাঁদ—উদাসীন
হারু—পথে-পরিত্যক্ত বালক
অনুচরদ্বয়—শিলাদিত্যের দেহরক্ষী

ঐন্দ্রিলা—বৈশালী-রাজকন্যা, পরে বিদর্ভের রানী
চন্দ্রা—চাষী-কুঞ্জলালের বোন
মানদা—কুঞ্জলালের স্ত্রী
সরলা—দরিদ্র-গ্রাম্যবধূ

জনতা, গ্রামবাসীগণ, নর্তকীদল ইত্যাদি

পর্বের সার-সংক্ষেপ

১

মুক্তি-ক্রন্দন (তথ্যচিত্র)

ইং ১৮৫৬ সনে বীরভূমে সাঁওতাল-বিদ্রোহ। ইং ১৮৭৬ সনে ন্যাশন্যাল-মেলা। ইং ১৮৯৭ সনে পুনায় প্লেগ, গুপ্তবিপ্লবীদলের ক্রিয়াকাণ্ড। ইংরেজ ও ভারতীয় মহানুভব-ব্যক্তিদের প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় ভারতে নবযুগের সূচনা।

২

রাখী-বন্ধন (নাট্য)

ইং ১৯০৫ (বাং ১৩১২) সনে ইংরেজ-সরকার-কর্তৃক বাংলাদেশকে-পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ—এই দুই ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব গ্রহণ। ইতিপূর্বেই সরকারের 'সুকঠিন পীড়নে' সারা ভারতে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। এইবার তার উপর দেশভাগ করার প্রস্তাবে বাংলায় দেখা দিল সরকার-বিরোধী এক প্রবল গণ-আন্দোলন। ইতিহাসে এরই নাম হয়—'স্বদেশী-আন্দোলন'। সরকারী বঙ্গবিভাগ-বিলের প্রতিবাদে জনতার বিক্ষোভ-মিছিল চলে। শহরে ও মফঃস্বলে তেমনি চলে জনসাধারণের উপর বিদেশী সরকার ও দেশীয় ধনিক-শ্রেণীর অত্যাচার। সে-সঙ্গে সরকার-ঘেঁষা মহাজনী-শোষণ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাব-ও ঘটে। স্বদেশ-সেবকদল হয় বিক্ষুব্ধ আর প্রতিকারপন্থা-সন্ধানে হয় তারা অধৈর্য। কিন্তু অত্যাচার অব্যাহত থাকায় দেশের আনাচে-কানাচে শুরু হয় প্রতিক্রিয়াশীল-শাসক ও শোষকদলের বিরুদ্ধে সহিংস সক্রিয় এক গুপ্ত-আন্দোলনের প্রচেষ্টা। ওদিকে-ও তেমনি সরকার-পক্ষ চালাল ধর-পাকড়, জেল, বেত্রাঘাত ও ক্রমে দিতে লাগল চরমশাস্তি—ফাঁসি। ইতিমধ্যেই সরকার ঘোষণা করেছিল বঙ্গভঙ্গের নির্দিষ্ট-তারিখ। সরকার-ঘোষিত সেই ১৬ই অক্টোবর, বাং ৩০শে আশ্বিনে কবি-রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব এবং নেতৃমণ্ডলীরও সিদ্ধান্ত-ক্রমে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ঐক্য-রক্ষার জন্য সমগ্র-বাংলাব্যাপী অনুষ্ঠিত হল সম্প্রীতিমূলক বিখ্যাত "রাখী-বন্ধন"-উৎসব। তখন থেকেই বিক্ষোভ ও গোলযোগের পরিস্থিতিতে চলতে লাগল বাংলায় কবি-প্রবর্তিত সেই 'রাখী-বন্ধন'-এর ঐক্যবাণী-প্রচার।

৩

মাল্য-চন্দন (নাট্য)

ক্রমে পল্লী-অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করল সাধারণের উপর সরকার ও কুঠিয়াল-সাহেবদের-কৃত অত্যাচার। শহরে তার উপরে দেখা দিল প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ। স্বদেশ-কর্মীদলের দ্বারা 'দুঃস্থ-সেবা-সমিতি'-ও নানা কেন্দ্র স্থাপিত হল। দুর্গত-উদ্ধারে কবি এবং নেতারাও নেমে পড়লেন। সেবা ও সামাজিক-সংস্কারের বিচিত্র-কর্মপথে উদ্বাস্তু ও শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে 'স্বদেশীদলে'র-ও প্রভাব-বিস্তার ঘটতে লাগল। তেমনি তার প্রতিক্রিয়াতে ক্রমশ আরো বাড়তে লাগল সরকারী-অত্যাচার। ফলে, বঙ্গ-ভঙ্গ-রদ ঘটাতে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধেও এবার আন্দোলন অগ্রসর হল নূতনরূপে—স্বয়ং-প্রবুদ্ধ গণ-অভিযানে।

৪

জয়-স্পন্দন (নাট্য)

দেশে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার আগ্রহে শুরু হল স্বাধীনতা-আন্দোলন। তার আঁচ পেয়েই সরকার-পক্ষের রণকৌশল-ও নিল অনুরূপ। বাহিরে নির্যাতনের সঙ্গে ভিতরে-ভিতরে চলতে লাগল দিল্লীতে রাজ-দরবার ডেকে বিলাত-থেকে সম্রাটকে এনে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন। সেই দরবারেই শেষে ঘোষিত হল—বঙ্গভঙ্গ-আইন-প্রত্যাহার। তখন স্বদেশী-পক্ষে-ও তুমুল-উৎসাহে ঘোষিত হল—বিজয়োৎসব-অনুষ্ঠানের কথা।

৫

অভি বন্দন (নাট্য)

কলকাতায় ভারতীয় জাতীয়-মহাসভার অধিবেশন। সভার দ্বিতীয় দিনের উদ্বোধনেই, এ-উপলক্ষে জাতির জয়-সংগীতরূপে-রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ-মহাসংগীত "জনগণমন-অধিনায়ক"-গান সর্বপ্রথম সমবেতকণ্ঠে প্রকাশ্যে গীত হল।

৬

দিক্-স্পন্দন (তথ্যচিত্র)

দিল্লীতে স্বাধীন-ভারতীয়-গণপরিষদের অধিবেশন। 'জাতীয়-সংগীতে'র প্রতি দেশবিদেশের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদনের অনুষ্ঠান।

মর্ত্য-নন্দন (নাট্য)

'মর্ত্য-নন্দন'-নাট্যোপাখ্যানটির মূল-প্রেরণা জুগিয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই রচিত 'দীনদান' ও 'নগরলক্ষ্মী'-নামক দুটি কবিতা। আর, রবীন্দ্রনাথেরই রচিত তৎকালীন সুবিখ্যাত 'স্বদেশী-সমাজ', 'পথ ও পাথেয়' এবং 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'-নামক কয়েকটি ভাষণ-নিবদ্ধ সমাজ-সংস্কারী-পরিকল্পনার প্রভাবও এতে কাজ করেছে। দেশসেবা-ক্ষেত্রে পথ ও পাথেয় নিয়ে যখন মতে ও কাজে নেতাদের মধ্যে জটিলতা দেখা দেয়, কবি তখন তাঁর লেখায় উক্ত-পরিকল্পনাগুলি পুস্তক ও পত্রিকা-মাধ্যমে দেশের সামনে ধরে রেখে দিয়ে নীরবে স্বয়ং পূর্ববঙ্গের শিলাইদহের পল্লী-অঞ্চলে গিয়ে 'স্বদেশী-সমাজে'র-ধারায় পল্লীপঞ্চায়েতী-মতের-উজ্জীবনে ও শিক্ষা এবং জনসেবার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। পরিকল্পনাতে উল্লিখিত আছে, খেটে-খাওয়া চাষীমজুরদের বাসস্থল বস্তি-অঞ্চলে গিয়ে কর্মীরা যেন জনগণের মধ্যে অন্ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যাংক, ব্যায়ামাগার, শালিসী-সভা গঠন ও পরিচালনা ইত্যাদি কাজে ব্রতী থাকেন। আর, সেই সঙ্গেই বিবিধ এরূপ কর্মবিস্তারের মতো গুরুত্ব দিয়েই জন-আনন্দ-বিতরণের-ও নানা-আয়োজন তাতে রাখেন। এজন্য এই নির্দেশের মধ্যেই বিশেষভাবে আছে একটি নির্দোষ-আমোদেরও-কেন্দ্র-স্বরূপ **'মিলনগৃহে'র** উল্লেখ।

সেখানে মিলিত হয়ে জনগণ যাতে একত্রে ব'সে শিক্ষা ও আ: ন্দ-ভরা নাট্যাভিনয়ের সাহায্যে অন্তরে রস-সংগ্রহের কিছু সুযোগ পায়, সেইজন্যেই এই-গ্রন্থে 'জাতীয়-সংগীতে'র ঐক্য-প্রেরণার-অনুসারী বিবিধ ঘটনা ও রসপূর্ণ দুটি পালা-নাট্যেরও অবতারণা করে রাখা গেল। কাহিনীতে ভিন্ন হয়ে, সেকালের সামন্ত-তন্ত্রীয় কাঠামোর মধ্যে ঘোরা-ফেরা করলেও কাহিনীটি বক্তব্য-বিষয়ের দিকে 'জাতীয়-সংগীতে'র সঙ্গে সুর-বাঁধা। এর মত ও পথ বিশ্ব-ঐক্যবোধের রণনে অনুরণিত। এরও মুখ্য-বিষয়টি হচ্ছে, সর্বকালীন মানবীয়-সত্য,—কালে-কালে এবং একালে এবং ভাবীকালে-ও যার উপযোগিতা উপেক্ষণীয় হবার নয়। এতে বলা হচ্ছে,—নিদারুণ প্রলয়ংকর-সংকটেও সহ-অনুভবযুক্ত সম্প্রীতি ও সংহতিবদ্ধ সহজ-মানবিক একাত্ম-প্রেরণাই দেশকে নানা 'সুকঠিন পীড়ন'-এর দুরবস্থা থেকে সমৃদ্ধিতে উদ্ধার করতে পারে। হিংসাতে শুধু হিংসাই ডেকে এনে ধ্বংস ঘটাতে পারে, আর, সেক্ষেত্রে প্রীতিতে যা পারে সে-পারা শুধু সাময়িক নয়, মানুষের প্রীতি-ভিত্তিক বুদ্ধি ও মেধা মানুষকে নব-নব সৃষ্টির কাজে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলে' আনন্দময় পরম-মুক্তি-সম্পদের স্থায়ী-অধিকারীও করতে পারে।

সপ্ত-পার্বিক এই গোটা-গ্রন্থের মূল-অবলম্বন হচ্ছে ভারতের 'জাতীয়-আন্দোলন'। ২য়-পর্বে রয়েছে ঐক্যের 'রাখী-বন্ধনী-গানে' "এক হউক, এক হউক এক হউক, হে ভগবান", আর, গ্রন্থের সর্বশেষ এই 'মর্ত্য-নন্দন'-পর্বে 'লোকমাতা'-অংশের শেষ-গানে আছে তেমনি—"জাগো জাগো আছ যারা আজো অচেতন, জানো না-কি জনে-জনে রাজে একই জন।" নাটকে এই প্রেরণার-আবিষ্কারের পরেই দেখা দিল রাজ্যে শান্তির সূচনা। আর, পরবর্তী 'ভুখা-ভগবান'-অংশে দেখা গেল ঐক্যের সেই বিশেষ-প্রেরণাটিকে বাস্তবে-প্রয়োগের দ্বারা ক্রমে মানুষের আত্মিক-পরিণতির বিচিত্র-চিত্র। এ-সবেরই মধ্যে অনুস্যূত রয়েছে আমাদের 'জাতীয়-আন্দোলনে'র ক্ষেত্রে প্রয়োগ-যোগ্য প্রেরণা এবং কর্মনীতির-ও ক্রমপর্যায়।

আগাগোড়াই 'জাতীয়-সংগীতে'র তথ্যালেখ্যতে রয়েছে যে-সব ঘটনা, তার অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের জীবনে বা সাহিত্যে হয়েছে কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে কোনো-না-কোনোরকমে সংঘটিত। আর, এই 'মর্ত্য-নন্দনে'র ঘটনাগুলির কিছু-কিছু যদিও সে-রকম রবীন্দ্রসাহিত্য-থেকে হয়েছে আহরিত, কিন্তু এখানে আখ্যান, সংলাপ, সংগীত ও নির্দেশনার বিষয়ের অধিকাংশই হল স্বয়ং-গ্রন্থকারেরই-পরিকল্পিত ও রচিত। যেটা বাস্তবে তখন-তখনই ঘটেনি সেটা-ও সাহিত্যের লেখার-রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসে কখনো-কখনো বাস্তবে বিরাট এক-একটা সৃষ্টি-

প্রলয় যে ঘটিয়ে থাকে, তা কারো অবিদিত নেই। তাই, যা ঘটেনি, কিন্তু একদিন ঘটলেও-বা ঘটতে পারে, এই শুভেচ্ছা-বাহিত একটি স্বপ্ন-জগতের আইডিয়াকে জন-মনে একটু স্থান দেবার যে-প্রয়াস এই গোটা-গ্রন্থে নানাভাবে করা হয়েছে তাতে অতীতের বাস্তব আর ভাবী-কালের প্রত্যাশার ছবি মিলিয়ে ভারতের জাতীয়-আন্দোলন ও জনগণ-জীবন-জগৎকে আপাতত সম্পূর্ণ-ক'রে দেখারও হয়তো কিছুটা উপলক্ষ্য ঘটতে পারে। আর-কিছু না হলেও, এটিকে সমাজ-পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের বাণীকে ভিত্তি ক'রে রূপকথার একটি রূপায়নী-উপকরণ-রূপেও দেখা চলবে আশা করি।

মুক্তি-ক্রন্দন

"আমাদের মধ্যে যে-শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে , কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। বিধাতা সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।"

সুকঠিন-পীড়ন

১৮৫৫ খৃঃ বীরভূমে সাঁওতাল-বিদ্রোহ

নেপথ্যে পাঠ। ১৮৫৫ খৃঃ মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেণ্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরেজ সাঁওতালগণকে ভালো করিয়া চিনিত না। তাহারা কী চায়, কেন বাহির হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। এদিকে পথের মধ্যে পুলিস তাহাদের সহিত লাগিল, আহারও ফুরাইয়া গেল—পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গবর্মেণ্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।

উপরিউক্ত সাঁওতাল-উপপ্লবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমতো সমাধা করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরাজরাজ হতভাগ্য বন্যদিগের দুঃখ-নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আওয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভালো করিয়া শুনিলেন, তখন বুঝিলেন তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে। তখন তাহাদের আবশ্যক-মতো আইনের সংশোধন, পুলিসের পরিবর্তন এবং যথোপযুক্ত বিচারশালার প্রতিষ্ঠা করা হইল।

কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-সম্প্রদায়ের উষ্মা তখনো নিবারণ হইল না। বিদ্রোহীদের প্রতি নিরতিশয় নির্দয় শাস্তিবিধান না করিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইতে চাহে না। বিদ্রোহী-জেলার অধিবাসীবর্গকে একেবারে সর্বসমেত সমুদ্রপারে দ্বীপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিলেন।

মূকাভিনয়ে

(ক)

হিসাবের খাতা-হাতে মহাজনদের সাঁওতাল-বস্তিতে প্রবেশ। কুটিরের জিনিসপত্র শস্যাদির বস্তা কাড়িয়া নেওয়া। সাঁওতালদের মহাজনের হাতে-পায়ে ধরা ; মেয়ে-ছেলে ও শিশুদের কান্নাকাটি।

(খ)

দূর হইতে শোনা যাইতেছে, শিঙা, নাকাড়া, ঢাক ও ঝাঁঝরের বাজনা ; শব্দ ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছে, দেখা গেল, দা-কাটারি-তীরধনুতে-সজ্জিত দলবদ্ধ সাঁওতালদের বিক্ষুব্ধ অভিযান। খাদ্যাভাবক্লিষ্ট সাঁওতালদল-কর্তৃক পথিকদের সর্বস্ব লুটপাট।

(গ)

পথে ইংরেজ-পুলিসসাহেব-পরিচালিত পুলিসদলের সহিত সাঁওতালদের সংঘর্ষ। পুলিসের তরবারি ও বন্দুকের গুলির আঘাতে সাঁওতালেরা হতাহত, বন্দী ও পলাতক।

(ঘ)

১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী-বিদ্রোহ

দাঁতে-টোটা-কাটা লইয়া লড়াই বাঁধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল। ক্রমে ব্রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহ-বহ্নি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্তরশ্মিতে ভারতবর্ষের দূর-দূরান্তর হইতে যে-সকল বীরমূর্তি ক্ষণে-ক্ষণে দেখা যাইতেছিল হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল।

আমরা একদিন মনে করিয়াছিলাম যে, সহস্রবর্ষব্যাপী-দাসত্বের নিপীড়নে রাজপুতদিগের বীর্যবহ্নি নিভিয়া গিয়াছে ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের দেশানুরাগ ও রণকৌশল ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেদিন বিদ্রোহের ঝটিকার মধ্যে দেখিয়াছি কত বীর-পুরুষ উৎসাহে প্রজ্জলিত হইয়া স্বকার্য-সাধনের জন্য সেই-সকল গোলমালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশে-প্রদেশে যোঝাযুঝি করিয়া বেড়াইতেছেন। তখন বুঝিলাম যে, বিশেষ-বিশেষ জাতির মধ্যে যে-সকল গুণ নিদ্রিতভাবে অবস্থিতি করে এক-একটা বিপ্লবে সেই সকল গুণ জাগ্রত হইয়া উঠে।

(ঙ)

১৮৭৬ খৃঃ ন্যাশন্যাল-মেলা

(মেলার মধ্যে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কবি-কিশোর কবিতা-পাঠে রত)

কিসের তরে গো ভারতে আজি
সহস্র হৃদয় উঠিছে বাজি ?
যতদিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহাশ্মশান।
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে সম্মান ভারত জাগিয়া উঠিছে আজি ?

(চ)

১৮৭৭ খৃঃ কলিকাতায় গুপ্তসভার সূচনা

নেপথ্যে পাঠ। দুর্ভিক্ষ ভূকম্প মহামারীর প্রলয়-পীড়নে অন্য-কোনোদেশ আসন্ন-মৃত্যুর ভীষণ-নৈরাশ্যে উদ্দাম হইয়া উঠিত; ভারতবর্ষ তাহা অবিচলিত ধৈর্যসহকারে সহ্য করিয়াও কর্তৃপক্ষের করুণা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দেশের এই পরম দুঃসময়ে গবর্মেণ্ট উপর্যুপরি তাঁহার কঠোরতম বিধি ও শাসনের দ্বারা ভারতবর্ষীয় সহিষ্ণুতার অগ্নিপরীক্ষা সৃজন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মারীগ্রস্ত পুণা। গোরা-সৈন্যের আতঙ্কে মুহুর্মুহু কাতরোক্তি প্রকাশ। গোরা-সৈন্যের শিকার-উপলক্ষে দেশী-গ্রামবাসী হত্যা। মাদ্রাজে ঘণ্টাকুলের হত্যা। সমস্তিপুরে দরিদ্রের বিবাহ-উৎসবে হত্যাকাণ্ডের হাহাকার। সেই অবজ্ঞাই গোরা-বিভীষিকাগ্রস্ত মারীপীড়িত দুর্ভাগাগণের অন্তিম অনুনয় হইতেও কর্তৃপুরুষ-দিগকে বধির করিয়া তুলিয়াছিল। হাওড়ায় য়ুরোপীয়-হত্যা,—ইংরাজেরও প্রজার সামান্যমাত্র চাঞ্চল্যের প্রতি রুদ্ররূপ। কিন্তু নিজে প্রতিদিন ঔদ্ধত্য ও অবমাননার দ্বারা প্রজাসাধারণকে নানা-আকারে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছেন। তাহার বিষময়তা প্রশ্রয় পাইয়া বিরাট মূর্তি ধারণ করিতেছে। তাঁহারা পথে চলিতে চাবুক তুলিয়া সেলাম শিখাইতে-শিখাইতে অগ্রসর হন। ইহাকেই বলে প্রজাবিদ্রোহ। এবং নিয়ত এই বিদ্রোহেই প্রজার হইয়া প্রজাপতির কালাগ্নি উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতে থাকে।

(ছ)

১৮৯৭ খৃঃ

পুণায় প্লেগ। গুপ্ত-বিপ্লবী-ক্রিয়াকাণ্ডের সূত্রপাত, 'নিখিল-ভারতীয় জাতীয়তা-বোধের প্রথম-স্পন্দন'।

(জ)

স্ট্রেচারে প্লেগের রুগী হাসপাতালে বহিয়া লইয়া যাওয়া।

(ঝ)

পথের পাশে গাছতলায় দেবী-প্রতিমা। মারাঠী মেয়েরা পূজার সম্ভার লইয়া সমবেত। রুদ্রমূর্তি-সাহেব-অফিসারদ্বয় আসিয়া মেয়েদের হাতের অর্ঘ ছিনাইয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, মেয়েদের ঘাড়ে ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়া প্রতিমাকে লাথি মারিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া চলিয়া গেল।

(ঞ)

মারাঠী-যুবক-ভ্রাতৃদ্বয়-কর্তৃক উক্ত অত্যাচারী ইংরেজ-অফিসারদ্বয়কে অনুসরণ করিতে-করিতে রাজপথে গুলি করিয়া হত্যা। সদলে পুলিস-সাহেবের প্রবেশ। হত্যাকারীদের পশ্চাদ্ধাবন। (নেপথ্যে ক্রুদ্ধস্বরে পাঠ)

"ধরো, নাটুভাই-দুটোকে, দাও তিলককে জেলে, দেশের সম্পাদকগুলোকে এক-একটা তৃণের মতো উৎপাটন করো। ভারতবর্ষে ইংরেজের গায়ে যারা হাত তোলে, তারা যাতে কোনোমতেই নিষ্কৃতি না পায়, সেইজন্য সতর্ক হতে হবে।"

(ভিন্নকণ্ঠে বিকৃত ব্যঙ্গস্বরে)

আর, যে-সকল ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কেবলই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া ব্রিটিশবিচার-সম্বন্ধে চিরস্থায়ী কলঙ্কের রেখা আগুন দিয়া ভারতবর্ষের চিত্তে দাগিয়া-দাগিয়া দিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে কি সতর্ক হইবার কোনো প্রয়োজন নাই? কেবল ইংরেজের রক্তচক্ষু পিনালকোডেই ভারতবর্ষে শান্তি বর্ষণ করিতে পারে এত শক্তি ভগবান ইংরেজের হাতে দেন নাই।

(ছায়াছবি-পটে, বৈদেশিক-ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি-প্রদর্শন)

এ-সকল বিদ্রোহ ক্ষণিক। কারণ, পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্যভাবেই মিলিতে হইবে এবং তাহার যাহা-কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না-করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই। সকলদিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভালো হয়, তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভালো হইবে না, আমরা মনুষ্যত্ব-দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়া লইব। বাহিরে 'পায়োনিয়রে'র-স্তম্ভে রাজকর্মচারীদের প্রকাশ্য ও গোপন কার্য-প্রণালীর মধ্যে ইংরেজের যে অনুদারতার পরিচয় পাইতেছি—এদিকে দুর্ভাগ্য দরিদ্র-জাতির জন্য হিউমের সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন, ইউল বেডারবর্ণের জ্যোতির্ময় সহৃদয়তা আমাদের অত্যন্ত নিকটে থাকিয়া আমাদের অন্তরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। এদিকে ইংরাজি-সাহিত্যে আমরা ইংরাজি-চরিত্রের উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই, অথচ সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ইংরাজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই না। এমন-সময় হিউম, ইউল, বেডারবর্ণ কংগ্রেসকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সেই নষ্ট বিশ্বাস উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি-গণের মধ্যে অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারত-রাজ্যতন্ত্রে প্রজাসাধারণের দ্বারা মন্ত্রি-নির্বাচন কোনো-না-কোনো উপায়ে প্রবর্তিত করা যুক্তি-

সংগত। এ সম্বন্ধে লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড রিপন, লর্ড ডফারিন, স্তর রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতির কথা কতদূর শ্রদ্ধার যোগ্য তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদের উপরে আমাদের আর নূতন যুক্তি দেখাইবার আবশ্যক করে না। ভগিনী-নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। বস্তুত তিনি ছিলেন—লোকমাতা। তিনি যখন বলিতেন—'Our people' তখন তাহার মধ্যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত, আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এদেশে যাহা-কিছু বিপ্লব-বিরোধ, আমাদের যাহা-কিছু দুঃখ-অপমান। এই যে প্রকাশ পাইতেছে না, এমন-কি প্রকাশ বিকৃত হইয়া যাইতেছে সেজন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। ইংরেজকে ছলে-বলে ঠেলিয়া-ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টার যোগ সাধন হইবে। তখন বর্তমানের ভারত-ইতিহাসের যে-পর্বটা চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীর মহত্তর-ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।

রাখী-বন্ধন

“বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান॥”

রাখী-বন্ধন

দৃশ্য ১

(কলিকাতা। মধ্যাহ্ন। বড়লাটের অফিসকক্ষ। লর্ড কার্জন সরকারী-কাগজপত্র পড়িতে ব্যস্ত। দেওয়ালে অবিভক্ত-বাংলাদেশের মানচিত্র টাঙানো। পদস্থ আমলা ও সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি সকলে জরুরি-আদেশের অপেক্ষারত। দ্বাররক্ষী সিপাহীর নির্দেশ-অনুসরণে বাংলার-প্রতিনিধি-স্বরূপ, বাঁড়ুয্যে-সহ, আবেদন-পত্র হাতে করিয়া, নরমপন্থী চৌধুরীর প্রবেশ। কক্ষদ্বারে আবেদনপত্রের প্রতি দ্বারী মূক-ইশারায় অঙ্গুলি-নির্দেশ করিলে —)

চৌধুরী। আবেদনপত্র। (সঙ্গীকে চোখের ইশারায় লর্ড কার্জনকে দেখাইয়া জনান্তিকে)—লর্ড কার্জন, আমাদের বড়লাট-সাহেব। (উভয়ে কক্ষের ভিতরে অগ্রসর হইতেই লর্ড কার্জন উহাদের দিকে চোখ ফিরাইলেন। উহারা উভয়ে একসঙ্গে সেল্যুট দিল ও আবেদন-পত্রটি লইয়া কার্জনের হাতে পেশ করিল। খাম হইতে আবেদন পত্রখানি বাহির করিয়া তাহাতে একটু ভ্রুকুঞ্চিত-দৃষ্টি বুলাইয়াই কার্জন তাহা নরমপন্থীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। রুদ্রমূর্তি-কার্জন তখনই টেবিল হইতে ছুরি তুলিয়া লইয়া দৃঢ়পদক্ষেপে দেওয়ালে-টাঙানো ম্যাপের কাছে গিয়া ম্যাপের মাঝামাঝি ছুরি চালাইয়া দিলেন, মানচিত্র দুইভাগ হইয়া ঝুলিতে থাকিল)

কার্জন। (দাপটে) Partition of Bengal is a settled fact! (কলম লইয়া খস্-খস্ করিয়া সই দিয়া অন্য আর-একটি পত্র কর্মচারীকে ফেরৎ দিলে আমলারা ও সৈন্যাধ্যক্ষ-প্রভৃতি সকলে গট্-গট্ করিয়া একে-একে গম্ভীরভাবে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল)

জনৈক অফিসার। (বাহির হইয়া যাইতে-যাইতে সঙ্গী-অফিসারকে জনান্তিকে) পার্টিশন নিশ্চিত! আবেদন-নিবেদনে কোনো ফল হবে না।

সঙ্গী-অফিসার। তা ঠিকই। যে-রকম দেখছি—বঙ্গচ্ছেদের বিল পাশ হবেই।

(উভয়ে প্রস্থানোন্মুখ)

বাঁড়ুয্যে। (চলিয়া যাইতে যাইতে) দেশের এই পরম দুঃসময়ে এমন কঠোর বিধি ও শাসন ?— আশ্চর্য।

চৌধুরী। আজ থেকে শুরু হল ভারতীয়-সহিষ্ণুতার অগ্নি-পরীক্ষা।

(উভয়ের প্রস্থান)

কার্জন। (কক্ষের মধ্যে পিঠের দিকে মুষ্টিবদ্ধ-হাতে থম্‌থমে-মুখে গভীর চিন্তিতাবস্থায় স্বগত)—Settled fact, Settled fact (পায়চারি)

দৃশ্য ২

(কলিকাতা। স্বদেশ-সেবা-সমিতির কক্ষ। সকালের কর্মারম্ভে প্রার্থনা-অনুষ্ঠান। দেওয়ালে অখণ্ড-ভারতের মানচিত্র টাঙানো। সম্মুখে আলপনা ও পত্র-পুষ্প-শোভিত মঙ্গল-কলস। মানচিত্রের প্রতি যুক্তকর হইয়া উপাধ্যায়-বিশ্ববান্ধব ও কর্মীবৃন্দ আসীন)

গান

প্রবীণ গায়ক-কর্মী মুকুন্দ। ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।

(সকলের প্রণাম)

তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥

বিশ্ববান্ধব। (সকলকে) কী গান গাইছে কবি, শোনো—শোনো (গ্রন্থ হইতে পাঠ)

কী দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে—
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ-কোলাহল
দিতেছে মানব-মনে বিষ মিশাইয়া।
কত কোটি-কোটি লোক অন্ধ-কারাগারে
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর-ক্রন্দনে।
দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার ক'রে
মাথায় বহন করে পর-প্রত্যাশীরা!
একের দাসত্বে রত অযুত মানব!
ভাবিয়া দেখিলে মন উঠে গো শিহরি—
ভ্রমান্ধ-দাসের জাতি সমস্ত মানুষ।
এ অশান্তি কবে দেব, হবে দূরীভূত।
বলো বলো কবে দেব, হবে সেইদিন
যেদিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ।

শোনো, কবিই আবার কী বলছেন,—

সেদিন আসিবে দেব, এখনই যেন
দূর-ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক-প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি-কোটি মানব-হৃদয়।

(এই স্থলে গ্রন্থ বুজাইয়া উপাধ্যায় বিশ্ববান্ধব বলিয়া উঠিলেন)

বিশ্ববান্ধব। মিলবে মিলবে। একদিন-না-একদিন মিলবে। দেখো এ-মিলন সম্ভব হবেই।

(উক্তিরত কর্মী ক্ষুদিরামের প্রবেশ)

ক্ষুদিরাম। ও-সব কবির স্বপ্ন।—কবে সত্য হবে বলা কঠিন। মোটেই সত্য হবে কিনা, কে জানে!

(গীতরত কর্মীদল-নায়ক ব্রতীন্দ্রের প্রবেশ)

গান

ব্রতীন্দ্র। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

(খবরের-কাগজ-হাতে উক্তিরত নরমপন্থী চৌধুরীর প্রবেশ)

নরমপন্থী চৌধুরী। তোমরা "সোনার বাংলা সোনার বাংলা" করছ (ক্ষুব্ধ-হাস্যে), ওদিকে যে আকাশে-বাতাসে বেজে উঠছে,—কী, জানো?—বাঁশি নয়, বেজে উঠেছে —"পার্টিশন পার্টিশন।" এই দেখো কাগজে কী লিখেছে—(পত্রিকা-প্রদর্শন) —"বঙ্গব্যবচ্ছেদ"!

সকলে। (উচ্চকিত হইয়া) বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ?

বিশ্ববান্ধব। (উদ্বেগে) এ-কী সংবাদ! (বলিতে বলিতে চিন্তান্বিত হওয়া)

(চৌধুরীর হাতের কাগজ টানিয়া নিয়া সকলের মনে-মনে পড়া ও সমস্বরে উক্তি)

সকলে। এখন উপায়?

চৌধুরী। উপায়?—(সরহাস্যে) সকলে মিলে আবার একবার আবেদন-নিবেদন করা!

ক্ষুদিরাম। ধিক্।

ব্রতীন্দ্র। তাই তো! (সকলের দিকে চাওয়া)

বিশ্ববান্ধব। কী করা যায়! (যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখভাব। ক্ষণপরে হতাশায় গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত "তাইতো" বলিয়া আনমনায় হাতের গ্রন্থখানির পাতা উলটাইয়া যাইতে-যাইতে সহসা যেন আশার উল্লাসে) ঠিক, ঠিক—উপায়? একমাত্র উপায় হল—কী, জানো?—উপায় হল—কোনো-একজনকে আমাদের অধিনায়ক করা। দেশকে চলতে হবে, চলতে গেলে চালক চাই।

ক্ষুদিরাম। ঠিক ঠিক,—চালক চাই।—যুদ্ধ করতে গেলে যেমন সেনাপতি চাই।

চৌধুরী। (সরহস্যে) নতুবা?

মুকুন্দ। নতুবা? নতুবা এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবল ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি হাঁকাহাঁকিতেই নষ্ট হতে থাকবে। (সহসা কক্ষ অন্ধকার হইয়া আসিল। দম্‌কা-বাতাস ও মেঘের গুরু-গুরু গর্জনের মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝলকে দেখা গেল, মঞ্চের পিছনে নীলপর্দার গায়ে ভারতের অখণ্ড মানচিত্রটির স্থলে বাংলাদেশের দ্বিধাবিভক্ত মানচিত্র ঝুলিতেছে। নেপথ্যে—"বঙ্গবিভাগ—বঙ্গবিভাগ"—ধ্বনি। কোলাহলের মধ্যে হঠাৎ একদল নরনারী পুরবর্তিনী পতাকাধারিণী সেবিকাদল-নায়িকা নিবেদিতার নেত্রীত্বে কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। তাহারা বলিতে লাগিল—)

আগন্তুক-একজন। বঙ্গবিভাগ?—আমরা এর প্রতিবাদ করি, আমরা প্রতিবাদ করি। এ হতেই পারে না।—বলো ভাই,—

সকলে। বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম। ঝড় উঠল ঝড়।—আন্দোলনের ঝড়। মরা-গাঙে আজ বান এসেছে। চাই আন্দোলন।—প্রবল আন্দোলন। বঙ্গচ্ছেদ-নিরোধ আন্দোলন।

(নিবেদিতার পরিচালনায় সমবেত-সংগীত)

গান

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
জয় মা ব'লে ভাসা তরী।
ওরে রে ওরে মাঝি কোথায় মাঝি প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি,
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি॥
দিনে-দিনে বাড়ল দেনা ও-ভাই করলি না কেউ বেচাকেনা,
হাতে নাইরে কড়াকড়ি।
ঘাটে-বাঁধা দিন গেল রে মুখ দেখাবি কেমন ক'রে
ওরে দে খুলে দে পাল তুলে দে যা হয় হবে বাঁচি মরি॥

("বন্দেমাতরম্" ধ্বনি দিতে-দিতে সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ৩

(কলিকাতা। কবির গৃহ। সকাল। কাজের কক্ষ। একপাশে চাদর-ঢাকা খাটের উপর লিখিবার ডেস্ক। ডেস্কের একধারে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক-পত্রিকা, অন্যধারে বই, খাতাপত্র ও প্রুফ ইত্যাদি ছড়ানো। অদূরে দেয়াল-ঘেঁষিয়া একটি পিয়ানো বসানো রহিয়াছে। ডেস্কের উপর মেলা রহিয়াছে লেখার কাগজ।

(প্রেসের পিয়নের প্রবেশ)

প্রেসের পিয়ন। হুজুর,—প্রুফ্। (পিয়ন ঘরে ঢুকিয়া কবির হাতে প্রুফ দিলে ডান-হাতে কলম ও বাঁ-হাতে প্রুফ লইয়া কবি খাট হইতে মেঝেতে নামিয়া আসিয়া প্রুফ পড়িয়া দেখিতে-দেখিতে এধার হইতে ওধারে ক্ষুব্ধভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। সঙ্গে একদল অভিনয়-কারী যুবক লইয়া উক্তিরত ব্রতীন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রতীন্দ্র। (কবিকে) আমাদের সেই রিহার্সেলটা ?

কবি। বোসো তোমরা। (কিছুক্ষণ চিন্তন ও পুনরায় ডেস্কে বসিয়া লিখন ও ও উঠিয়া পূর্বানুরূপ পায়চারি করিতে করিতে প্রুফ-পাঠ) "যখন দেখিতে পাই পৃথিবীটাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নিজের কবলে পুরিবার জন্য সর্বপ্রকার বাধা অমান্য করিতে মানুষ প্রস্তুত,—যখন দেখিতে পাই—ক্লাইভ, হেস্টিংস হচ্ছেন তাহাদের নিকট মহাপুরুষ! (নেতা আনন্দমোহনের প্রবেশ। হাতের ইঙ্গিতে তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে কবির নির্দেশ ও প্রুফ পড়িয়া-যাওয়া)—তখন ভাবি শ্রেয়ের পথ কোন্ দিকে ?—পিয়ন! (ডাকিয়া কবি প্রেসের-লোকের-হাতে প্রুফ দিলে লোকটি বিদায় লইল)

আনন্দমোহন। (একটু হাসিয়া) ক্লাইভ, হেস্টিংস হল মহাপুরুষ!—আর, ঐ যে লর্ড কার্জন ?

(উক্তিরত উপাধ্যায় বিশ্ববান্ধবের প্রবেশ)

বিশ্ববান্ধব। লর্ড কার্জন আজ কর্তৃত্বের নেশায় উন্মত্ত।

আনন্দমোহন। পুণা-শহরের বক্ষের উপর গোরা-সৈন্য আজ দুর্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল। রুদ্ধবাক সব সংবাদপত্র।

ব্রতীন্দ্র। ঐ তো, সিডিশন-বিল! তার মানে—এখন থেকে স্বদেশী-প্রচারটা তবে অপরাধ ?

কবি। (উত্তেজনায়) সে কী ? কণ্ঠরোধ ? স্বদেশের হিতসাধন-অধিকার যে ঈশ্বর-দত্ত!

আনন্দমোহন। বিপ্লব!—বিপ্লব করতে হবে। চাই আজ বিপ্লবই!

বিশ্ববান্ধব। (বিস্ময়ে) বিপ্লব?—শক্তি কোথায়?—আমাদের তো সে-শক্তি নেই।

আনন্দমোহন। কিন্তু, দল বাঁধলেই তো বল লাভ করা যায়।

কবি। (অস্থিরভাবে পায়চারি) দল? দল বাঁধলে বলছ—বললাভ? সে-কী?—আমরা আবার বাঁধব দল? আমাদের হল—

মর্মে যবে মত্ত আশা সর্প সম ফোঁসে—
তখনো ভালোমানুষ সেজে বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে খেলিতে হবে ক'ষে।
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব—
জন-দশেকে জটলা করি তক্তপোষে বসে!

—দল? দল বাঁধলে বললাভ?—তাই যদি হত!

(উত্তেজনায়) ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব-বেদুইন!
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি জীবনস্রোত আকাশে ঢালি'
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি' চলেছি নিশিদিন।
বর্শা-হাতে ভরসা-প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল-বাধা-হীন।

(নিজেকে সংযত করিয়া লওয়ার মুখে থামিলেন)

বিশ্ববান্ধব। (কবিকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত)—কী মহৎ ক্ষুধা! এই তো কবি!

কবি। নিমেষভরে ইচ্ছা করে বিকট-উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন-উচ্ছ্বাসে—
শূন্য-ব্যোম অপরিমাণ মদ্য-সম করিতে পান
মুক্ত করি' রুদ্ধ প্রাণ ঊর্ধ্ব-নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবন-ছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত-গৃহাবাসে। (থামিয়া চিন্তন)

বিশ্ববান্ধব। অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ; অগ্নি-সম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি' চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

কবি। বিপ্লব? তোমরা বিপ্লব চাচ্ছ? অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দাঁড়াতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় অন্যকে নয়, ভয় আমাদের স্বজাতিকে—যাদের হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাবে, সেই হবে আমাদের বিপদের কারণ; আমরা যার সহায়তা করতে যাব, তার নিকট হতে সহায়তা পাব না, কাপুরুষেরা সত্য অস্বীকার করবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করবে এবং জেলখানা আমাদিকে গ্রাস করতে আসবে।

আনন্দমোহন। কিন্তু তথাপি আমাদের মধ্যে দু'চার-জন লোকও যখন শেষ-পর্যন্ত অটল থাকতে পারব, তখন আমাদের জাতীয়-বন্ধনের সূত্রপাত হতে থাকবে।

(মিছিলে সমবেত-কণ্ঠে নেপথ্যে ধ্বনিত)

গান

নেপথ্যে। জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না ওরে ভাই, মগন মিথ্যা কাজে ।।
(সকলের উৎকর্ণ হইয়া শোনা)

কমা অরুণ। (কবিকে) ঐ, ঐ-যে উঠেছে মাতৃভূমির আহ্বান। —

কবি। (অরুণকে সস্নেহে) তোমাদের হেরি' চিত চঞ্চল উদ্দাম ধায় মন,
রক্ত-অনল শত শিখা মেলি' সর্প-সমান করি উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন কোষ-মাঝে ঝন্‌-ঝন্‌।
(ভাবান্তর) থাক্‌ ভাই থাক্‌ কেন এ স্বপন—এখনো সময় নয়।
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী জাগিতে হইবে পল গনি' গনি'
অনিমেষ-চোখে পূর্ব-গগনে দেখিতে অরুণোদয় ॥
ফিরে যাও সখাগণ,
এসো দেখি সবে যাবার সময় বলো দেখি সবে
—"গুরুজীর জয়",
দুই হাত তুলি' বলো—"জয় জয়—অলখ-নিরঞ্জন"।
(আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইয়া আসা)

(জামা-কাপড়ভরা দুইটি থলে দুই হাতে ঝুলাইয়া লইয়া পিছনে চাহিতে-চাহিতে ছুটিয়া উত্তেজিত ক্ষুদিরামের প্রবেশ)

ক্ষুদিরাম। ব্যবচ্ছেদ - বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ। বাংলাদেশ বিভক্ত হবে। ওদিকে

বেত, জেল—অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন! (উদ্বেগভরা অস্থির-দৃষ্টিতে লুকাইবার জন্ত অশ্রয়-স্থল খোঁজা। চাপা-ইতঃস্ততের কণ্ঠে) পুলিস!—খানাতল্লাসি করতে পুলিস আসছে। (দ্বিধায় স্বগত) তাই তো, কী করি—আত্মসমর্পণ? আত্মসমর্পণই করব। (দৃঢ়-সংকল্প লইয়া স্বগত) ভয় কিসের? না—না, মরতে আমি প্রস্তুত। (বাহিরের দিকে পুলিসের আসন্ন-আবির্ভাব ইঙ্গিত করিল)

আনন্দমোহন। (নিরুপায়-বিপন্নভাবে এদিক-ওদিক চাহিতে-চাহিতে) এখন কী করা যায়। (বলিতেই দলের জনৈক অভিনেতার প্রবেশ ও উক্তি)

জনৈক অভিনেতা। পুলিস!—এল ব'লে!

কবি। (বিভ্রান্তভাবে) তাই তো। কী করা যায়! (চিন্তান্বিত)

ক্ষুদিরাম। (চাপাস্বরে) এখন আর কী করা যাবে! তবে, এক করা যায় —অভিনয়!

কবি। (বিস্ময়ে) অভিনয়? কিসের অভিনয়?

ক্ষুদিরাম। মানে, বলছিলাম—আমাদের সেই রিহার্সালটা! এখন, এই ফাঁকে সেটাই না-হয় হয়ে যাক।

কবি। (বিশ্ববান্ধবকে) বাল্মীকি-প্রতিভা। নাটিকা-অভিনয়। (অদূরে উপবিষ্ট-অভিনয়-শিল্পীদের দিকে চাহিয়া) দস্যুদল! এসো, এসো চলে এসো তোমরা,—ধরো তোমাদের গান। (বিশ্ববান্ধবকে একটু হাসিয়া) রিহার্সেল হচ্ছে। (অঙ্গুলি-নির্দেশে ক্ষুদিরামের-হাতের থলে-দুইটি দেখাইয়া) আজ এ দুটাই হচ্ছে—'লুটের ভার'।—কী বলো! (বলিতেই ক্ষুদিরাম ও অরুণের উক্তি)

ক্ষুদিরাম ও অরুণ। ঠিক, ঠিক আছে। (বলিয়া পরস্পর গূঢ়-উদ্দেশ্য-বোঝার দৃষ্টি-বিনিময়। এদিকে কবি গিয়া পিয়ানোতে বসিলেন ও সকলের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া 'গেয়ে যাও' বলিয়া অভিনয়-শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন। অভিনেতারা সম্মুখে চলিয়া আসিল। বাজনা শুরু হইতেই রিহার্সেল চলিতে লাগিল)

কবি। (অভিনেতাদের প্রতি নির্দেশে) এবারে লুটের দ্রব্য নিয়ে দস্যুগণের প্রবেশ। দস্যুদল! (অরুণ ক্ষুদিরামের হাত হইতে একটি থলে নিজের হাতে নিল। ক্ষুদিরামসহ দুইজনে 'লুটের-ভার'-স্বরূপ থলে-দুইটি লইয়া দস্যুদলে ভিড়িয়া পড়িল ও গানের কথা-অনুযায়ী অন্যদের সঙ্গে মহোৎসাহে গাহিতে-গাহিতে 'লুটের ভার' দেখাইয়া দস্যুর অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিল। পুলিসদল দুয়ারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল ও সব দেখিতে লাগিল।

গান

দস্যুদল। এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি-রাশি লুটের ভার,—
করেছি ছারখার—সব করেছি ছারখার—
কত গ্রাম-পল্লী লুটে-পুটে করেছি একাকার ॥

(বিশেষভাবে থলেতে-ভরা জামা-কাপড়ের 'লুটের ভার'-সহ সক্রিয়-দস্যু-দুইটির গান ও অভিনয় দেখিয়া পুলিসদলের মধ্যে ভয়-সংশয় ও চমৎকৃতির উত্তেজনা ইত্যাদি নানা প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশমান হইতে লাগিল)

কবি। (অভিনেতাদের দিকে চাহিয়া বুকে অঙ্গুলি রাখিয়া নিজেকে দেখাইয়া সহাস্যে) বাল্মীকি,—আমি হচ্ছি বাল্মীকি—(কবির অভিনয় দেখিতে সকলের উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা। এবারে কবি বিশ্ববান্ধবকে লক্ষ্য করিয়া একটু হাসিয়া নির্দেশ দিলেন) এবারে হচ্ছে বাল্মীকির প্রবেশ।—(বলিয়া নিজে আগাইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিশ্ববান্ধব গিয়া পিয়ানোতে বসিলেন ও যথাসময়ে বাজাইতে লাগিলেন। কবি দস্যুদলকে নির্দেশ দিলেন)—গাও।

দস্যুদল। (সমস্বরে) গান
এক-ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে
না মানি বারণ, না মানি শাসন না মানি কাহারে।
কেবা রাজা কার বা রাজ্য মোরা কী জানি।
প্রতিজনেই রাজা মোরা বনই রাজধানী।
রাজা-প্রজা-উঁচু-নীচু,-কিছু না গনি।

কবি প্রথমে ও পরে সকলে।
ত্রিভুবন-মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়—
মাথার উপরে রয়েছেন কালী সমুখে রয়েছে জয় ॥

(সন্দেহস্থল-আসামীকে সনাক্ত করিবার জন্য বারবার পুলিসেরা অভিনেতাদলের দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া তাকাইয়া চলিল। উহাদের মধ্যে 'পাঁড়েজী'-নামক দলের-অগ্রবর্তী পুলিসটি (ভিতরে-ভিতরে স্বদেশানুরাগী) দ্বিধায় স্বগত বলিয়া উঠিল—)

পাঁড়েজী। সত্যি কি এটা অভিনয়!—না, আর কিছু! (পরক্ষণেই প্রকৃত-ঘটনা আঁচ করিয়া স্বগত তখনই বলিয়া উঠিল—"ওঃ, তাইতো!" বলিয়া মুখ একটু ফিরাইয়া কাহাকেও কিছু বুঝিতে না দিয়া নিজের মুচ্‌কি-হাসি আড়াল করিল। তখন স্বদেশীদলকে বাঁচাইবার জন্য নিজেও যেন অভিনয়ে ক্রমশ মশ্‌গুল হওয়ার

ভান করিয়া শির-সঞ্চালন ও মুখাভিব্যক্তি করিতে লাগিল। অভিনেতাদের সঙ্গে ক্ষুদিরাম ও অরুণ ওদিকে পুরোদমে মহড়া চালাইয়া যাইতে লাগিল।)

কবি। (নিজেকে দেখাইয়া দিয়া দস্যুদলের প্রতি নির্দেশের উক্তিতে) এবারে, বাল্মীকির প্রতি—

১ম দস্যু। (বাল্মীকি-রূপী কবির প্রতি গানে)

এখন করব কী বল্,

অন্যদস্যুরা। এখন করব কী বল্।

১ম দস্যু। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল।

অন্য সকলে। বল্ রাজা, করব কী বল্, এখন করব কী বল্।

১ম দস্যু। পেলে মুখেরই কথা, আনি যমেরই মাথা,

(দস্যুরা পুলিসের দিকে ফিরিয়া গানের কথাগুলি সজোরে ও সবিক্রমে বলিতেই পুলিসেরা সন্ত্রস্ত ও সচকিত হইয়া উঠিল)

—করে দিই রসাতল।

সকলে। করে দিই রসাতল—হো রাজা, হাজির রয়েছে দল।

বল্ রাজা, করব কী বল্, এখন করব কী বল্॥

কবি। (যেন সকলকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটিকাটির বিষয় বুঝাইয়া দিতে উক্তি) বাল্মীকি-প্রতিভা, এ হচ্ছে একটি গীতিনাট্য। এর অনেকগুলি গান বৈঠকী-গান-ভাঙা,—বিলাতী-সুর-দুটি ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো। এ হচ্ছে সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা। অভিনয়ের সঙ্গে কানে শুনলে তবেই এর স্বাদগ্রহণ করা যায়। গীত-বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে আমার এই নাট্য লেখা।

বিশ্ববান্ধব। (এইবার বিশ্ববান্ধব নিজেদের মধ্যে আকারে-ইঙ্গিতে রহস্যভরে মৃদু হাসিয়া কবিকে বলিলেন)—সংগীতে বিপ্লব!—দেশে বিপ্লব তবে এল?

ওগো ভাগ্যবান,

এ মহাসংগীত-ধন কাহারে করিবে তুমি দান?

কোন্ দেবতার যশঃ-কথা

স্বর্গের অমরে কবি, মর্ত্যলোকে দিবে অমরতা?

কবি। (মৃদু হাসিয়া)

দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি' আনে—

তুলিব দেবতা করি' মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।

(চিন্তিতভাবে)—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে,
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই এই ভয় জাগে মোর মনে ॥

বিশ্ববান্ধব। (সগৌরবে সমুচ্ছ্বাসে) সেই সত্য যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনম-স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো ॥

পুলিস। (একজন পুলিস 'ঐ যে'—বলিয়া ক্ষুদিরামকে দেখাইয়া দিয়া তাহাকে উৎসাহে ধরিতে আগাইবার উপক্রম করিতেই পূর্বের কৃত্রিম-অভিনয়-অভিভূত পুলিসটি (পাঁড়েজী) তাহাকে বলিয়া উঠিল—)

কৃত্রিম-অভিভূত পুলিস পাঁড়েজী। (চাপাকণ্ঠে) দূর মূর্খ। এটা যে অভিনয়, মানে রিহার্সেল। দেখছিস-না,—বাল্মীকি-নাটক হচ্ছে! এতে যে রয়েছে রাম, অযোধ্যা। (বলিয়া উৎসাহী-পুলিসটিকে তাহার নির্বুদ্ধিতার জন্য ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে) সরে যাও সরে যাও (বলিয়া পিছনদিকে টানিয়া নিল ও বাল্মীকির দিকে চাহিয়া ভক্তিভরে নমস্কার করিল। এবার—)

অন্য-পুলিস। তাইতো তাইতো, বাল্মীকি, রাম, অযোধ্যা—তাইতো তবে রামলীলা হচ্ছে! (বলিয়া গ্রেপ্তারকামী পুলিসটিও সংশয়ে ফিরিয়া-ফিরিয়া চাহিতে-চাহিতে কবিকে সেও শেষপর্যন্ত রামলীলার রাম অনুমানে নীরবে নমস্কার করিল। অগত্যা মহড়ার-আসর অনুমান করিয়াই হতভম্ভভাবে পুলিসদের প্রস্থান ঘটিল। তখন ব্রতীন্দ্র "জয় গুরুজীর জয়" ধ্বনি দিলে তরুণদলের অন্য-সকলে সমস্বরে সেই ধ্বনি তুলিয়া কবিকে নমস্কারান্তে প্রস্থানোদ্যত হইল। প্রস্থানের-মুখে হঠাৎ-পিছন-ফিরিয়া, উপস্থিত-বুদ্ধিতে-সংকট-বিজয়ী ক্ষুদিরাম তাহার হাতের থলিটি হইতে উঠাইয়া লইয়া এদিক-ওদিক চাহিতে-চাহিতে কবিকে স্মিতহাস্যে মাথা-হেলাইয়া সনমস্কারে তড়িৎ একটি ছোট থলে দেখাইয়া বলিল,—"বারুদ"!

কবি। (চকিত হইয়া) সে কী! বারুদ!—অগ্নিকাণ্ড? (ক্ষুদিরাম সরিয়া পড়িতেছিল) রাজনৈতিক আন্দোলন? হবে না, হবে না—কেবল রাজনৈতিক-আন্দোলনের দ্বারা আমাদের লজ্জা দূর হবে না। (ওদিকে ক্ষুদিরামের প্রস্থান। বাহিরে রাস্তায় জনতার কোলাহল। উদ্বিগ্নমুখে কবিও প্রস্থানোদ্যত)

বিশ্ববান্ধব। (ব্যস্তভাবে) আজ উৎসব। আজ আমাদের মাতার বন্দনা। চলো চলো।

(বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে-দিতে সকলের প্রস্থান)

কবি। (কিছুক্ষণ সকলের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বিক্ষুব্ধ-ভাবে স্বগতোক্তি—)

তবে এসো হেঁ মোর দুঃসহ ছিন্ন ক'রে জীবন লহ
বাজিয়ে তোলো ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঝঞ্ঝনা,
আমার বুকের পাঁজর টুটে উঠুক পূজার পদ্ম ফুটে,
ওরে, আয়রে ব্যথা সকল বাধা-ভঞ্জনা ॥

(প্রস্থান)

দৃশ্য ৪

(কলিকাতা। দুপুর। রাজপথে মিছিল। দুই দিক হইতে দলের প্রথম দুইজনের হাতে ধরা রহিয়াছে পতাকা। তাহাতে লেখা—"বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন ১৩১২ সাল"। সকলে গাহিতেছে—)

গান

জনতা। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ-রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা, তোমায় দেখে-দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

(গান চলিতে-থাকাকালে পথিকদের মধ্যে ঘোষণা-পত্র বিলি করিতে-করিতে দলের প্রস্থান। ঘোষণা-পত্র-হাতে ক্ষুদিরাম ও বিশ্ববান্ধবের প্রবেশ)

ক্ষুদিরাম। (ঘোষণাপত্র পাঠ) "দেশে স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দেশকে দুইঅংশে ভাগ করিবার প্রস্তাব হইতেছে। এতে আমাদের মধ্যে প্রভেদ স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইবে। ইংরেজ-রাজা আমাদের ঐক্যের সহায়ক নহেন, ক্ষমতা-লাভের অনুকূল নহেন। আপনারা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া বিধাতার হুকুম পালন করুন। বন্দেমাতরম।"

বিশ্ববান্ধব। (উদ্দীপ্ত-মুখভাবে) আজ ছাত্রেরা উন্মত্ত, জনসাধারণ উত্তেজিত, বৃদ্ধেরাও উত্তপ্ত। সকলে দেশকে এক মহাসঙ্কট হতে রক্ষা করবার জন্য উদ্যত।

ক্ষুদিরাম। ধন্য ১৩১২ সাল। এমন শুভক্ষণে আমরা জীবন-ধারণ করছি।—আমরাও ধন্য।

(মাথা-ফাটা-অবস্থায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়া অরুণের প্রবেশ)

ক্ষুদিরাম। এ কী?

অরুণ। (ক্ষীণ হাসিয়া) রাজপুরুষ কালপুরুষের মূর্তি ধরছে। রাস্তায় আমাদের মাথা ভাঙছে।

বিশ্ববান্ধব। দম্ভ!—এসব হচ্ছে কার্জনের দম্ভ-প্রচার।

অরুণ। (উত্তেজিত-কণ্ঠে) নাহি আর ভয় নাহি সংশয়
নাহি আর আগু পিছু
পেয়েছি সত্য লভিয়াছি পথ
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন মরণ
নাই নাই আর কিছু॥

ক্ষুদিরাম। আর বিলম্ব নয়। চলো—(বিশ্ববান্ধব ও ক্ষুদিরাম অরুণের অনুসরণোদ্যত, এই সময় নেতা আনন্দমোহনের পরিচালনায় "একতাই শ্রেষ্ঠ বল"-লেখা পতাকাবাহী-দলের গাহিতে-গাহিতে প্রবেশ। বিশ্ববান্ধব ও ক্ষুদিরাম গানে কণ্ঠ মিলাইয়া দলকে আগাইয়া নিয়া আসিল। দলের মধ্যে দুই জনের মাথা বাহিয়া রক্ত ঝরিতেছে কিন্তু তাহারাও গানে উন্মত্ত)

গান

ডান-হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ-হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট-নেত্র আগুন-বরন।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

(দলের প্রস্থান)

(আলাপরত পথিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম পথিক। আজ আসন্ন-বঙ্গবিভাগের উদ্যোগ বাঙালীর পক্ষে পরম-এক শোকের কারণ হয়েছে।

২য় পথিক। শোকের কারণ হলেও এই শোক আমাদিকে অবসাদে অভিভূত করে নাই। (পথিকদ্বয়ের প্রস্থান)

(গাহিতে-গাহিতে আরেকদলের প্রবেশ)

(সমবেত-কণ্ঠে) গান

আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী
তোমার অভয় বাজে হৃদয়-মাঝে হৃদয়-হরণী।
ওগো মা তোমায় দেখে-দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

বিশ্ববান্ধব। (উদ্দীপনায়) বাংলাদেশের বর্তমান-স্বদেশী-আন্দোলনে রাজদণ্ড যাদি'কে পীড়িত করছে, রাজরোষ-রক্তঅগ্নিশিখা তাদের জীবনের ইতিহাসে বারবার সুবর্ণ-অক্ষরে লিখছে—'বন্দেমাতরম'।

(এই সময়ে 'বন্দেমাতরম'-লেখা পতাকা-হাতে সেবিকাদল-নায়িকা নিবেদিতার পরিচালনায় 'ভারতী'-পটের প্রতিলিপি, মঙ্গল-কলস ও অর্ঘ বহিয়া লইয়া বালিকাদলের গাহিতে-গাহিতে প্রবেশ। গানের মধ্যে শঙ্খধ্বনি করিয়া বিনি (স্বেচ্ছাসেবিকা) আগাইয়া গেল ও আহতদের ললাটে চন্দনের টিপ্ দিয়া গলায় মালা পরাইয়া দিয়া বিনম্র-নমস্কারে সম্বর্ধনা জানাইল)

বালিকাদল। গান

জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না ওরে ভাই মগন মিথ্যা কাজে॥
অর্ঘ ভরিয়া আনি ধরো গো পূজার থালি
রতন-প্রদীপখানি যতনে আনো গো জ্বালি,
ভরি লয়ে দুই পাণি বহি আনো ফুলডালি,
মার আহ্বান-বাণী রটাও ভুবন-মাঝে॥

বিশ্ববান্ধব। আমরা মুখে বলি—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, কিন্তু জন্মভূমির গরিমা যে কতখানি, ঐ দেখো—(মেয়েদের দিকে অঙ্গুলি দিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সগর্বে) ঐ দেখো, তা আজ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ।

আনন্দমোহন। সত্যি ভারতবর্ষে এমনটি আর হয় নাই।

(বিশ্ববান্ধব ও আনন্দমোহনের প্রতি মেয়েদের অভিবাদন; হাত উঠাইয়া বিশ্ববান্ধব ও আনন্দমোহনের আশীর্বাদ-জ্ঞাপন)

ক্ষুদিরাম। আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় আজ সচেতন। বাঁধ যে ভাঙে-ভাঙে!

নিবেদিতা। (সম্মুখে চাহিয়া চমকিয়া) এ যে দেখি বিদ্রোহ!—একি রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা?

(একদলের গাহিতে-গাহিতে প্রবেশ)

গান

আগে চল্ ভাই, আগে চল্।
পড়ে-থাকা-পিছে মরে-থাকা মিছে
বেঁচে-ম'রে কিবা ফল ভাই॥ (প্রস্থান)

সার্জেণ্ট। (আনন্দমোহন, বিশ্ববান্ধব ও অরুণের প্রতি ক্রুরদৃষ্টি-নিক্ষেপকারী সার্জেণ্টের 'লেফট্-রাইট্'-নির্দেশানুসারে পিছনদিক হইতে একদল লাঠিধারী-সিপাইর মার্চ করিতে করিতে প্রবেশ। তাহারা চলিয়া যাইবার মুখে,—হাতের পূর্ব-বিজ্ঞপ্তির বাকি-অংশ-পাঠরত ক্ষুদিরামের বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"ঐ যে বন্দীশালায় লৌহশৃংখলের কঠোর ঝংকার শুনা যাইতেছে, দণ্ডধারী-পুরুষদের পদশব্দে-কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে, ইহাকেই অত্যন্ত বড়ো করিয়া দেখিয়ো না"—

স্বদেশীদল। (এই পর্যন্ত পড়া হইতেই স্বদেশীদলের 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনি উঠিল। অমনি ক্রুদ্ধমুখে সার্জেণ্ট সবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল ও দৃপ্ত-পদক্ষেপে ক্ষুদিরামের দিকে আগাইয়া বলিয়া উঠিল—)

সার্জেণ্ট। (ক্ষুদিরামকে) এসব কী হচ্ছে? পোলিটিক্যাল অ্যাজিটেশন?—অ্যাজিটেশন করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি।

অরুণ। (সরোষে আগাইয়া) ভিক্ষাবৃত্তি?

সার্জেণ্ট। (ব্যঙ্গভরে হাসিয়া) হাঁ, ভিক্ষাবৃত্তি নয়তো কী? ভিক্ষুক-মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক-জাতিরও মঙ্গল নাই।

অরুণ। (সরোষে) কে বললে ভিক্ষুক? আমাদের জাতি ভিক্ষুক?

বিশ্ববান্ধব। বলদর্পে অন্ধ, এ যে ধর্মবুদ্ধিহীন স্পর্ধা!—এই স্পর্ধাই ইংরেজ-শাসনকে ভ্রষ্ট করছে।

সার্জেণ্ট। (অঙ্গুলি-নির্দেশে বিশ্ববান্ধবকে দেখাইয়া দিয়া সক্রোধে পুলিসদলকে) এই ব্যাটা! এই ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া। দেখো-না, কী ধর্মের ভেক্। এবারে ওর কণ্ঠসুদ্ধ....(দুই হাতে টুঁটি চাপিয়া ধরার ইঙ্গিত করিয়া সহকারীকে) বুঝলে?—লোকজন সব ঠিক রাখো।

অরুণ। (সার্জেণ্টকে সগর্জনে) সাবধান। ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঙ্গিতের দ্বারা চালনা করেন, তার অগ্নিময় তর্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ।

ক্ষুদিরাম। সাবধান! বারবার বলছি সাবধান।

(পুলিসদল লাঠি বাগাইয়া ধরিল। সার্জেণ্ট আগাইয়া গিয়া নিবেদিতার হাতের 'ভারতী-পট' টানিয়া-ছিঁড়িয়া মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিল; মঙ্গল-কলস ভাঙিয়া সব তছ্-নছ্ করিয়া দিতেছে দেখিয়া কর্মী-বীরেন 'থামো থামো', বলিয়া তাড়াতাড়ি সার্জেণ্টকে বাধা দিতে আগাইল। সার্জেণ্ট "বাঁধো বাঁধো" বলিয়া সজোরে নির্দেশ দিতেই পুলিসেরা বীরেনকে দৃঢ়রূপে বাঁধিতে লাগিল। "দাঁড়াও, এখনি খুলে দিচ্ছি" বলিয়া বীরেনের বাঁধন খুলিয়া দিতে ক্ষুদিরাম আগাইল; হঠাৎ পিস্তল উঠাইয়া সার্জেণ্ট রুখিয়া উঠিয়া ক্ষুদিরামকে বলিল—)

সার্জেণ্ট। খবরদার।

ক্ষুদিরাম। (ফুঁসিয়া আগাইয়া) বটে ?

বীরেন। থাক্ থাক্। এখন নয়, পরে,-পরে! বাইরে যে তোমাদের কত কাজ আছে! (ক্ষুদিরামকে বাঁধন খুলিতে নিষেধের ইঙ্গিতে হাত নাড়িয়া গাহিয়া উঠিল)

গান

বীরেন। ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে।
(ক্ষুদিরামের সঙ্গে সকলে) মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে।
(সকলে) ততই, মোদের আঁখি ফুটবে॥

(গীতরত-বন্দী বীরেনকে লইয়া সার্জেণ্ট ও পুলিসদলের প্রস্থান ও ঐ সময়েই গানের বাকি-অংশ-গীতরত প্রবীণ গায়ক-কর্মী মুকুন্দের প্রবেশ)

গান

মুকুন্দ। (সকলকে) আজকে যে তোর কাজ করা চাই
স্বপ্ন-দেখার সময় যে নাই.
এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই তন্দ্রা ততই ছুটবে।
(সকলে) মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে॥
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই দ্বিগুণ ক'রে
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে।

বিশ্ববান্ধব। (সকলকে) তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু
জেগে আছেন জগৎ-প্রভু,
ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে।
(সকলে) ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে॥

সকলে। (পুরুষ ও মেয়েরা সকলে মিলিয়া ছেঁড়া-'ভারতী-পট' ও ভাঙা মঙ্গল-কলসাদি পথ হইতে কুড়াইয়া লইয়া মাথায় ছোঁয়াইয়া গাহিতে-গাহিতে ও ক্ষুব্ধ ক্ষুদিরামের সহিত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে-দিতে পুনরায় যথারীতি মিছিলে চলিল)

দৃশ্য ৫

(কলিকাতা। কবির বৈঠকখানা। অপরাহ্ণ। উদ্‌ভ্রান্তভাবে স্বগত-উক্তিরত কবির প্রবেশ ও আবৃত্তিরত-অবস্থায় কক্ষমধ্যে পায়চারি)

কবি। সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক-বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে, তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি'
জাগাতে জগৎজনে? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে—
শূন্যতল? কোন্ অন্ধকারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে—

(বারীন, ব্রতীন্দ্র, অরুণ ও উক্তিরতা নিবেদিতার প্রবেশ)

নিবেদিতা। (আকুলভাবে) জর্জর বন্ধনে—অনাথিনী মাগিছে সহায়।

কবি। (বিস্ময়ে) এ কী! শেষে এখানে এলে? এখানে কেন?

নিবেদিতা। আর কোথা যাব? দেখতে-দেখতে কী-যে-সব হয়ে গেল।

ব্রতীন্দ্র। এখন কী করা যায়?

অরুণ। (মেঝেতে লুটানো দুইখানি ইংরাজি-পত্রিকা চোখে পড়িতেই হঠাৎ উত্তেজিতভাবে) এটা বিলাতের টাইমস্ নয়? (অন্য কাগজখানি তুলিয়া ধরিয়া) এটা আবার কী? এটা যে দেখছি এ-দেশের টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া?—যারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ উদ্গার করে? (কাগজটা ছুঁড়িয়া মেঝেতে ফেলিয়া দেওয়া)

কবি। (গম্ভীরমুখে) জানি, অন্যায় এবং অপমান আমাদের উত্তেজিত করছে?

নেপথ্যে হুকার। (হাঁক) এলাহাবাদে সোমেশ্বর দাসের কারাবরোধ।—শুনুন আপনারা—দাসের কারাবরোধ।

বাহিরে জনতা। অবিচার, অবিচার! এযে ভয়ঙ্কর অবিচার।

বাহিরে ক্ষুদিরামের কণ্ঠে। বারুদে আগুন দেওয়া হচ্ছে, বারুদে আগুন দেওয়া হচ্ছে।

বাহিরে জনতা। আগুন দেওয়া? আগুন?—ঠিক্ ঠিক্, তাহলে আগুন দেওয়াই ঠিক্। চল্ চল্, আগুন-দিতে চল্।—বন্দেমাতরম্।

(দৈনিক-কাগজ পড়িতে-পড়িতে নরমপন্থী চৌধুরীর প্রবেশ)

চৌধুরী। (রহস্যের হাসিতে) এদিকে এত—হৈ-চৈ! আসলে কিন্তু, ব্যাপারটা অত্যন্ত তুচ্ছ।

অরুণ। (আগাইয়া আসিয়া) অত্যন্ত তুচ্ছ? কিন্তু, ব্যাপাবটা তাহলে কী?

চৌধুরী। (কাগজ হইতে পাঠ) তবে সবটা শোনো,—"এলাহাবাদের কোনো দেশীয় ধনী-ব্যাংকার স্বত্বরক্ষা-উপলক্ষ্যে তাঁহার কোনো ইংরেজ-ভাড়াটিয়াকে ফুল-গাছের টব লইতে ভৃত্যদের দ্বারা বাধা দেন।" (অরুণকে বলা) সেই স্পর্ধায় তার কারাদণ্ড হয়েছে!—বুঝেছ?

বারীন। (চৌধুরীকে) স্বত্বরক্ষা বা আত্মরক্ষা বা মানরক্ষার খাতিরে কোনো ইংরেজের গায়ে হাত তুললে—

চৌধুরী। হাত তুললে হয়—কারাদণ্ড! এটা সোমেশ্বরের Audacity-দুঃসাহস! ইংরেজ-রাজ্যে—

অরুণ। (ব্যঙ্গ) ঠিক ঠিক! ইংরেজরাজ্যে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশাই করব না।

চৌধুরী। তোমাদের কাছে ন্যায্য-অন্যায্য কর্তব্য-অকর্তব্য-সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিবার কোনো আবশ্যক দেখি না। তোমরা ভালোই বলো আর মন্দই বলো তাতে গবর্মেণ্টের কোনো মাথা-ব্যথা নাই। জানো?—আমাদের এই গবর্মেণ্ট কত স্ট্রং! সত্যি, ভারি স্ট্রং গবর্মেণ্ট।

কবি। ন্যায়পথ লঙ্ঘন করলে সেটাকে আমরা বাহাদুরি জ্ঞান করি না; অন্যায় যতই বলিষ্ঠ দেখতে হোক, তা ঘৃণ্য তা নিন্দনীয়।

নেপথ্যে জনতা। (ক্ষুব্ধ-চিৎকারে) সোমেশ্বর দাসের কথা আমরা ভুলতে পারি না। কিছুতেই না।

(বারীন ও অরুণ দ্রুত আগাইয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিল)

বারীন। (দেখিতে দেখিতে) বাইরে বিস্তর লোক।

অরুণ। লোকে-লোকে চারিদিক আচ্ছন্ন। (নেপথ্যে জনতার 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি)

(ছুটিয়া উত্তেজিত ক্ষুদিরামের প্রবেশ)

ক্ষুদিরাম। (অধীরভাবে কবিকে) ওই শোনো শোনো কল্লোলধ্বনি, ছুটে হৃদয়ের ধারা, তুমি ঘুমাইলে ফিরিয়া যাইবে তারা।

অরুণ। ওই চেয়ে দেখো দিগন্তপানে—

(দ্রুত মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ। (কবিকে) ঘন ঘোর ঘটা অতি—

নিবেদিতা। (ব্যাকুলতার সহিত কবিকে)

আসিতেছে ঝড় মরণেরে ল'য়ে—

কবি। (সস্নেহে নিবেদিতাকে স্মিতহাসিতে)

তাই বসে-বসে হৃদয়-আলয়ে
জ্বালিতেছি আলো নিভিবে না ঝড়ে
দিবে সবে চিরজ্যোতি॥

(বারীন প্রস্থানোন্মুখ)

বারীন। ওদিকে আবার কী হচ্ছে, দেখে আসি।

চৌধুরী। (হাসিয়া) দিবে জ্যোতি ? ব্রিটিশ-গবর্মেণ্ট কিন্তু ভারি স্ট্রং-গবর্মেণ্ট। যাই বলো, ব্রিটিশই আমাদিকে মানুষ করতে পারবে।

বারীন। (শুনিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বারীন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—) কী বললে, ব্রিটিশ-গবর্মেণ্ট আমাদের মানুষ করবে ?

ক্ষুদিরাম। ব্রিটিশ-বিজয় করিয়া ঘোষণা,
যে গায় গাক আমরা গাব না,
আমরা গাব না হরষ-গান।

বারীন। এসো গো আমরা যে-ক'জন আছি
আমরা ধরিব আর-এক-তান।

ক্ষুদিরাম ও অরুণ। (সমস্বরে) আমরা ধরিব আর-এক তান। বন্দেমাতরম্।

(বারীনের সহিত অরুণ ও ক্ষুদিরামের দ্রুত প্রস্থান)

(উক্তিরত আনন্দমোহন ও বিশ্ববান্ধবের প্রবেশ)

আনন্দমোহন। (রহস্যের হাসিতে চৌধুরীকে) ব্রিটিশ-গবর্মেণ্ট কোনোমতেই আমাদিকে মানুষ করতে পারবে না, কোনোমতেই না।

ব্রতীন্দ্র। (বিকৃত সুরে ঠাট্টার সহিত) গবর্মেণ্ট অনুগ্রহ-ভিক্ষুদিকে যখন পদে-পদে—

নেপথ্যে। তাই তো হচ্ছে—পদে-পদে—পাদুকাঘাত! (বলিতে বলিতে জনৈক ম্রিয়মাণ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া উক্তিরত-কর্মী অশোকের প্রবেশ। সঙ্গী-ব্রাহ্মণটিকে দেখাইয়া দিয়া উত্তেজিত-কণ্ঠে সকলকে)

অশোক। দেখুন, চারিদিকে কী ঘটছে, ব্রাহ্মণকে পাদুকাঘাত!

নিবেদিতা। (বিস্ময়ে) কী বললে?—ব্রাহ্মণকে পাদুকাঘাত?

বিশ্ববান্ধব। (গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন) পাদুকাঘাত? এ তো দস্তুরমতো অপমান? এরূপ অপমান শেষে ব্রাহ্মণেরও উপর?

আনন্দমোহন। এ শুধু ব্রাহ্মণের নয়,—এ অপমান যে ভারতবাসীর! এ যে অত্যন্ত গুরুতর! এযে জাতীয়-অপমান!

অশোক। (বিরক্তিতে) ঘটনাটা আরো লজ্জাকর। (ব্রাহ্মণকে অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া দিয়া) ব্রাহ্মণ সাহেবের চাকুরি করে।—গোলাম যে!

ব্রতীন্দ্র। (ব্যঙ্গস্বরে) তেমন ব্রাহ্মণ আজকাল আর কটা মেলে। আগে ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি ছিল, এখন সমস্ত অগ্নি জঠরে!—

ব্রাহ্মণ। (অত্যন্ত বেদনায় কুণ্ঠায়) বাবা, তোমরাই বলো,—চাকরি না করলে খাব কী। আমরা দরিদ্র—নিতান্ত ক্লেশে আধ-পেটা-আহারে আমাদের সংসার-যাত্রা চালাতে হয়। এখন তোমরা আশ্রয় না দিলে (চক্ষু-কোন মুছিয়া) আমাকে যে—

কবি। না খেয়ে মরতে হবে,—এই তো? (ব্রাহ্মণ করজোড়ে কবির দিকে আসিতে উদ্যত হইলে "আহা থাক্ থাক্" বলিয়া কবি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন)

বিশ্ববান্ধব। ঠাকুরের কী করা হয়?

অশোক। ব্রাহ্মণ সাহেবের কর্মচারী। পুলিস-সাহেব তাকে নিজের ঘরে নিয়ে লাঞ্ছনার একশেষ করছিলেন।

আনন্দমোহন। বিধাতার আশীর্বাদে ব্রাহ্মণের এই পাদুকাঘাত-লাভ হয়তো ব্যর্থ হবে না। নিদ্রা অত্যন্ত গভীর হলে এরূপ নিষ্ঠুর আঘাতেই তা ভাঙাতে হয়।

ব্রাহ্মণ। (সকাতরে কবিকে) উপায়?

কবি। উপায় আছে—আজ যাও, কাল এসো।

(বাহিরে হুইসিল বাজিয়া উঠিল। পুলিসের-গাড়ি-আসার শব্দ হইল। সার্জেণ্টের হুকুম শোনা গেল—)

বাহিরে সার্জেণ্ট। (মারো, মারো। (জনতার কণ্ঠে উপর্যুপরি ধ্বনি উঠিল—'বন্দেমাতরম্'। (নিবেদিতা জানলার কাছে মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল—)

নিবেদিতা। এ কী—লাঠালাঠি যে। (হঠাৎ বন্দুকের শব্দ হইল। চারিদিকে দৌড়াদৌড়ির শব্দও শোনা যাইতে লাগিল। ব্রতীন্দ্র ও অশোককে লইয়া আনন্দমোহন তখন—"এসো, দেখে আসি বাহিরে কী হচ্ছে"—বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। কবি বিশ্ববান্ধবকে বলিলেন)

কবি। এখন পুরাতন দলই হোন আর নূতন দলই হোন,—আপনারা কাজের আয়োজন করুন। মত কী—সে তো বারবার শুনি,—কাজ কী,—কেবল সেইটেই দেখা হল না। যদি স্বচেষ্টায় দেশের অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা করা সকল দেশের পক্ষেই অসম্ভব হয় তবে আজকার এই আস্ফালন কাল নিস্ফল অবসাদে পরিণত হবে।

(উদ্বিগ্নকণ্ঠে উক্তিরত অশোকের ত্রস্ত পুন-প্রবেশ)

অশোক। বেআইনি, বে-আইনি,—ভুতুড়ে-কাণ্ড। সর্বত্র একটা ভুতুড়ে-কাণ্ড চলছে। লাঠালাঠি, মারামারি। চলো চলো।

নেপথ্যে—"খুন খুন" চীৎকার, গুলি-চালনার শব্দ, শঙ্খনাদ ও তৎসহ জনতার কোলাহল)

বিশ্ববান্ধব। আজ মাতার বন্দনা।—ঐ শোনো মায়ের ডাক—চলো মাতৃমন্দিরে চলো। (সকলের প্রস্থান। কবির অস্থির-পায়চারি)

দৃশ্য ৬

(কলিকাতা। পান্তির মাঠ। মধ্যাহ্ন। মাতৃপূজা-প্রাঙ্গণ। বেদীতে ছেঁড়া-'ভারতী-পট' স্থাপিত, সম্মুখে মঙ্গল-কলস। নেতা আনন্দমোহন, বারীন, বিশ্ববান্ধব স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকাদল। পথ-হইতে-কুড়ানো-পটের ছেঁড়া-মালাখানি নিবেদিতা আঁচলের খুঁট খুলিয়া কপালে ছোঁয়াইয়া বেদিতে রাখিয়া, পটের সম্মুখে প্রণতি জানাইল।

অতঃপর নিবেদিতার পরিচালনায় সম্মিলিত সংগীত ও তৎসহ বালিকাদের আবৃত্তি ও নৃত্য চলিল)

নিবেদিতা ও বালিকাদল। গান

মাতৃমন্দির-পুণ্য অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে
বরপুত্র-সংঘ বিরাজো হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজো হে।। (শঙ্খধ্বনি)
ঘন তিমির-রাত্রির চির প্রতীক্ষা পূর্ণ করো লহ জ্যোতির্দীক্ষা
যাত্রীদল সব সাজো হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজো হে। (শঙ্খধ্বনি)

বিনি ও সকলে। (মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করিল, বিনি 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিলে সকলে সমস্বরে সেই ধ্বনি তুলিল ও একসঙ্গে পটের প্রতি নতি জানাইল)

(উক্তিরত অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। এদিকে "যাত্রীদল সব সাজো হে" চলছে। ওদিকে যে চলছে— জবরদস্ত-শাসন।—শুনছি জবরদস্ত-শাসনের ঘনঘন বজ্রপাত। গবর্মেণ্ট—

(উক্তিরত ক্ষুদিরামের প্রবেশ)

ক্ষুদিরাম। নিপাত যাক্ গবর্মেণ্ট। এ-গবর্মেণ্ট আমাদের মোটেই আপন নয়— এ যে পর।

অরুণ। পর তো বটেই, কিন্তু কত পর, তা দেশের সর্বসাধারণ ইতিপূর্বে—

ক্ষুদিরাম। তা ঠিক, এমন ক'রে কোনোদিন জানতে পারে নাই।

নিবেদিতা। কী বলছ?—গবর্মেণ্ট? না না, কিছুতেই না, গবর্মেণ্টকে ভয় করব না।

মেয়েরা। গবর্মেণ্টকে ভয় করব না—না না, কিছুতেই না।

বিশ্ববান্ধব। ভয় করব না,—ক্ষুব্ধ হব না, ভারতবর্ষের যে একটি পরম মহিমা আছে, আমরা তার অখণ্ড মূর্তি উপলব্ধি করব।

(সকলের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি)

(গীতরত কবির প্রবেশ)

কবি। গান

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী মা।
অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননী-জননী॥

নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল, অনিলবিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল, শুভ্রতুষারকিরীটিনী ॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন—
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী ॥

(চারিদিকে চাহিয়া সমস্ত অবস্থা দেখিয়া লইয়া কিছুক্ষণ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধচিত্তে স্তব্ধ থাকিয়া প্রার্থনার স্বরে)

কবি। আঘাত-সংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
দাও হস্তে তুলি'
নিজ-হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি
তোমার অক্ষয় তূণ।
করো মোরে সম্মানিত নব-বীর-বেশে।
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর বেদনায়
পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত-ক্রোড়ে না রাখি' নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

(বিনি আগাইয়া আসিয়া বেদী হইতে মালা তুলিয়া লইয়া গাহিতে গাহিতে গিয়া কবিকে সেই মালা পরাইয়া দিয়া প্রণাম করিল। উৎসাহে বিনির সঙ্গে সকলে গাহিতে লাগিল)

গান

বালিকাদল। আজি উজ্জ্বল-ভালে তোলো উন্নত-মাথা
নব সংগীত-তালে গাও গম্ভীর-গাথা।
পরো মাল্য কপালে নব-পল্লব-গাঁথা
শুভ-সুন্দর কালে সাজো সাজো নব সাজে॥

জননীর দ্বারে আজি ওই শুনো গো শঙ্খ বাজে,
থেকো না থেকো না ওরে ভাই, মগন মিথ্যা কাজে॥

(ছুটিয়া ছাত্রনেতা কুমারের প্রবেশ)

কুমার। (অরুণকে) গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তার,—মেলা-উপলক্ষে মফঃস্বলে গ্রেপ্তার চলছে। ঘোষপুরের ক'জন ছাত্রকে পুলিসে গ্রেপ্তার ক'রে (বলিতে-বলিতে ট্যাঁক হইতে একখণ্ড-কাগজের চিঠি লইয়া "এই পত্র" বলিয়া সম্মুখবর্তী অরুণের হাতে দিতে গেলে, অরুণের নমস্কার-পূর্বক কবিকে পত্র দেওয়া এবং অস্থির ও উদ্বিগ্ন-দৃষ্টিতে কবির মুখের দিকে চাহিয়া থাকা)

কবি। (অরুণকে চিঠি ফিরাইয়া দিয়া নির্দেশ)—পড়ো।

অরুণ। (সরবে পত্র-পাঠ) "এখানকার মেলা-উপলক্ষ্যেই কলকাতার একদল ছাত্রের সহিত এখানকার স্থানীয়-ছাত্রদলের ক্রিকেট-যুদ্ধ স্থির হইয়াছে। হাত পাকাইবার জন্য কলিকাতার ছেলেরা আপন-দলের মধ্যেই খেলিতেছিল। ক্রিকেটের গোলা লাগিয়া একটি ছেলের পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। মাঠের ধারে একটা বড়ো পুষ্করিণী ছিল। আহত ছেলেটিকে দুইটি ছাত্র ধরিয়া সেই পুষ্করিণীর ধারে রাখিয়া চাদর ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া তাহার পা বাঁধিয়া দিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একটা পাহারাওয়ালা আসিয়াই একেবারে একজন ছাত্রের ঘাড়ে হাত দিয়া—

অরুণ। (ক্রোধের উত্তেজনায়) তা-বলে একেবারে ঘাড়ে হাত দিয়া ?

কুমার। (বিক্ষোভে) হ্যাঁ, এসেই ঘাড়ে হাত দিয়া—

অরুণ। (পাঠ) "ধাক্কা মারিয়া তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিল। পুষ্করিণীটি সাহেবদের পানীয়-জলের জন্য সুরক্ষিত ছিল। জলে-নামা যে নিষেধ, কলিকাতার ছাত্রটি তাহা জানিত না—

ক্ষুদিরাম। (স্বগত) জানলেও অকস্মাৎ পাহারাওয়ালার কাছে এরূপ অপমান ? এ কি সহ্য হয় ? (কুমারকে) নিশ্চয়ই এরূপ অপমান সহ্য করা তাদের অভ্যাস ছিল না ? (স্মিতহাস্যে রহস্যের সহিত পিঠ-চাপড়াইয়া) তারপর গায়েও নিশ্চয় তাদের জোর ছিল !—কী বলো ?

কুমার। (চাপা-বীরত্বের সহিত) হ্যাঁ ! গায়েও জোর ছিল বৈ কি !

অরুণ। (পাঠ) "কলকাতার ছাত্র অপমানের যথোচিত প্রতিকার আরম্ভ করিয়া দিল। এই দৃশ্য দেখিয়া চার-পাঁচজন কনেস্টবল ছুটিয়া আসিল। এদিকে দেখিতে দেখিতে ছাত্রের দল ছুটিয়া গেল। তাহারা পুলিসকে আক্রমণ করিতেই—

কুমার। (উৎসাহে বলিয়া-ওঠা) আক্রমণ করতেই পাহারাওয়ালার দল—

অরুণ। (হাসিয়া) নিশ্চয় রণে ভঙ্গ দিল।—তাই না?

কুমার। (এখানে একটু গর্বিত ও সলজ্জভাবে স্মিতহাস্যে, কুমারের সজোরে উক্তি) হ্যাঁ, তারা রণে তখনই ভঙ্গ দিল (বলিয়া সম্মতি-সূচক মাথা-নাড়া। ইহার পরে চিঠির বাকি-অংশ পড়িতে গিয়া হঠাৎ অরুণের স্তব্ধতা। 'সে কী'! বলিয়া কিছুটা বিস্মিত ও চিন্তিতভাবে উচ্চৈস্বরে-পড়া)—"কয়জন ছাত্রকে পুলিসে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়া হাজতে রাখিয়াছে।"

কবি। (কুমারকে সবিস্ময়ে ও উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন) গ্রেপ্তার? হাজত?—বল কী?

কুমার। বিচার হবে।

কবি। আবার বিচার! বিচারও হবে?—এতদূর?

অরুণ। (কবিকে) চললুম। (কুমারকে সঙ্গে আসিতে ইশারা করিয়া) এসো—

কবি। (অরুণকে) কী বলছ?—চললুম! কোথায়?

বিশ্ববান্ধব। ওরা যাচ্ছে ঘোষপুরের মেলায়।

অরুণ। চললুম,—ঘোষপুর। (ক্ষুদিরাম ও অরুণের কুমারসহ প্রস্থান)

কবি। (সকলকে) হে তরুণ-তেজে-উদ্দীপ্ত, ভারত-বিধাতার প্রেমের দূতগুলি, স্বদেশের অসহায়-অনাথগণ বঞ্চিত পীড়িত ভীত,—তোমরা যে পার যেখানে পার—এক-একটি গ্রামের ভার লও গে'।

আনন্দমোহন। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। অন্ন, স্বাস্থ্য আর শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিকে নিভৃত-পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হবে।

নিবেদিতা। ('ভারতী'-পটের প্রতি চাহিয়া দেশমাতৃকার উদ্দেশে করজোড়ে হাঁটু গাড়িয়া—)

গান

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে।
নগরে-প্রান্তরে বনে-বনে। অশ্রু ঝরে দুনয়নে,
পাষাণ-হৃদয় কাঁদে সে-কাহিনী শুনিয়ে।
ভাই বন্ধু তোমা-বিনা আর মোর কেহ নাই,
তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি মোর সকলই।
তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা তোমারি দুঃখে কাঁদাব।

তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ তোমারি তরে ত্যজিব,
সকল দুঃখ সহিব সুখে তোমারি মুখ চাহিয়ে ॥

(উক্তিরত প্রবীণ গায়ক-কর্মী মুকুন্দের দ্রুত-প্রবেশ)

মুকুন্দ। (কবিকে) গ্রামে বিষম অশান্তি।

কবি। (উদ্বিগ্নকণ্ঠে) অশান্তি? আবার অশান্তি?

মেয়েরা। অশান্তি তবে এবার গ্রামে-গ্রামেও?

মুকুন্দ। (পিছন ফিরিয়া দেখিতে-দেখিতে) ওরা সব আসছে—এই যে এসেই গেছে। (কবিকে) দূর থেকে আজ এরা শহরে এসে তোমাকেই খুঁজছিল, আমি এখানে ওদের আসতে বললাম।

(আহত চারজন জেলে আর চাষী-মোড়ল রঘুনাথ ও রহিম নামক পল্লীবাসীদের প্রবেশ ও কবিকে দূর হইতে সমবেত-নমস্কার জ্ঞাপন)

মুকুন্দ। মাত্র দুদিন আগের ঘটনা,—দুই নদীর মোহনার মুখে বাঁশ বেঁধে (জেলেদের দেখাইয়া) এই জেলেরা প্রকাণ্ড জাল পাতে। কেবল একপাশে নৌকা-চলাচলের রাস্তা রাখে। হঠাৎ সেখানে পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বোট এসে উপস্থিত।

রঘুনাথ। বোট আসতে দেখে জেলেরা আগে থেকেই পাশের পথটা দেখিয়ে দেয়।

জেলেরা। (একত্রে) জোরে ডেকে কর্তা সাবধান করে দিই—আগে থেকেই।

রহিম। কিন্তু সাহেবের মাঝি, ব্যাটা সেই জালের উপর দিয়েই কিনা শেষে—

জেলেরা। (সখেদে) বোট চালিয়ে দিলে গো!

মুকুন্দ। জালটা নুয়ে প'ড়ে বোটকে পথ ছেড়ে দিল।

রঘুনাথ। কিন্তু কর্তা, বোটের হাল গেল জালে বেধে।

মুকুন্দ। কিঞ্চিৎ বিলম্বে আর মাঝিদের চেষ্টায় হাল ছাড়িয়ে নিতে হল।

জেলেরা। (করজোড়ে) কর্তা, এই হল আমাদের যা অপরাধ!

রঘুনাথ। ওদিকে তখন সাহেব তো রেগে লাল!

রহিম। রেগে লাল হয়ে সেখানেই বোটটা বাঁধলেন।

মুকুন্দ। আর, তাঁর মূর্তি দেখেই নাকি জেলেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল।

রহিম। সাহেব তাঁর মাল্লাদিকে—

রঘুনাথ। তখুনি জাল কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন।

রহিম। তারা অতবড়ো জালটাকে—

জেলেরা। (শুষ্কস্বরে একত্রে) জালটাকে কর্তা টুকরো-টুকরো ক'রে কিনা কেটে ফেললে!

রহিম। (সখেদে) এত ক'রে কাকুতি-মিনতি করলাম—

রঘুনাথ। একা নয়—গাঁয়ের আমরা সবাই মিলে—কর্তা, কত বললাম—

মেয়েরা। (উগ্র-আগ্রহে) সাহেব বুঝি শুনলেই না? জালটা তবে কেটেই ফেললে?

জেলেরা। (সখেদে) কেটে তো ফেললে মা! এখন আমরা বাঁচি কী ক'রে?

কবি। (বিস্ময়ে ও বেদনায়) সে কী! কারো কথা শুনলে না? (সকলে স্তব্ধ।—একটু চিন্তামগ্ন থাকিয়া) দেখলাম সর্বত্রই দুর্বলেরা হারে। (সকলের দিকে চাহিয়া) আর কিছু নয়,—চাই শক্তি। শক্তি-দানই একমাত্র দান।

গান

এখন আর দেরি নয় ধর্ গো তোরা হাতে-হাতে ধর্ গো।
আপন-পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-স্বর্গ।

(সোৎসাহে মেয়েদের শঙ্খবাদন)

কবি। আর দেরি নয়—চলো, গাঁয়ে আমরা সবাই যাব।

(কবিকে আগে লইয়া 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে-দিতে সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ৭

(ঘোষপাড়া-পল্লীমেলার একাংশ। সকাল। নেপথ্যে তালপাতার বাঁশি ও ডুগ্‌ডুগির বাজনা এবং হৈ-হৈ-রৈ-রৈ। পথের পাশে খেলনার দোকান। জনতার যাতায়াত। জীর্ণ-জামাকাপড়-পরা ছেলে-মেয়ের হাত ধরিয়া লইয়া এক দরিদ্র-ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ছেলে। বাবা, স্বদেশী-মেলা, স্বদেশী-মেলা!

মেয়ে। মেলা, মেলা, কী সুন্দর মেলা বসেছে, দেখো বাবা—(হাতের তালপাতার বাঁশি বাজাইয়া নাচিতে-নাচিতে আগাইয়া-চলা)

ভদ্রলোক। (ছড়া-কাটা) বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি আনন্দ-স্বরে—

ছেলে। (ছড়া-কাটা) হাজার লোকের হর্ষধ্বনি সবার উপরে। (খেলনার দোকান দেখাইয়া) বাবা, বাবা,—দেখো, কী সুন্দর রাঙালাঠি! (পিতার না-দেখিবার ভান করা) গ্যাখো-না বাবা!—ঐ যে ঐ দোকানটায়,—দেখছ না?

ভদ্রলোক। কী বলছিলে? রাঙালাঠি? (পকেটে হাত দিয়া—শূন্যহাত নাড়িয়া সরহস্যে করুণ-হাস্যে) পয়সা?—কিনতে পয়সা লাগবে না? (হাত উল্টাইয়া) নাই, নাই, পয়সাই যে নাই—কিনব কী দিয়ে বাবা?

নেপথ্যে ধ্বনি। রাজা আসছেন! (গ্রাম্য-মোড়ল রমজানের হাঁকিতে-হাঁকিতে প্রবেশ)

রমজান। সার বেঁধে সব দাঁড়িয়ে থাকো—রাজা এলেন ব'লে।

(ভদ্রলোকের সহিত ছেলেমেয়ে-দুটিরও চকিত-দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাওয়া ও সরিয়া যাওয়া)

ছেলে-মেয়ে। (পিতাকে) রাজা কোথায় বাবা,—রাজা? (দাপটের সহিত লাঠি ঠুকিয়া রমজান—)

রমজান। (হাঁক) সার বেঁধে, তোমরা সরে দাঁড়াও—পথ ছাড়ো—দেখছ-না রাজা আসছেন যে! (বলিতে-বলিতে ছেলেমেয়ে-দুটির দিকে তাকাইয়া দৃঢ় রুক্ষকণ্ঠে হাঁক) এ-ই, সরে যাও!

ছেলেমেয়ে। (কাঁদিয়া) বাবা, বাবা! (বাবাকে জড়াইয়া ধরা)

রমজান। (ধমক) চুপ। (চোখ ছানাবড়া করিয়া শিশুদের রমজানকে আড়ে-আড়ে দেখা)

(ফলসব্‌জি-মাখনরুটি-ইত্যাদি-ভরা একটি ঝাঁকা মাথায় লইয়া বুড়ো একজন মুসলমানের প্রবেশ)

ভদ্রলোক। (ছেলেমেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া আঙুল দিয়া দূরে দেখাইয়া) আসছে, আসছে, বাছা, এখুনি এসে পড়বে,—একটু চুপ করে থাকো তো মা! (শিশু-দুটিকে টানিয়া সরাইয়া নেওয়া)

(দুইধারে দুইজন লাঠিয়াল পাইক লইয়া মোটা-ঘড়ির-চেন-পরা জমিদারের প্রবেশ। কানে-কালা ও বার্ধক্যে-শ্লথগতি বৃদ্ধ মুসলমানটিকে সামনে পাইয়াই পাইক-দুইজনে—)

পাইকদ্বয়। (ধমকের সঙ্গে ধাক্কা দিতে-দিতে বৃদ্ধ মুসলমানটিকে) সরে যা, সরে যা ব্যাটা বেয়াদব!

মুসলমান। বাবা-গো! (বলিয়াই হুমড়ি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। চোখ তুলিয়া ফিরিয়া-তাকাইবার উপক্রম করিতেই—)

জমিদার। (ঘড়িতে সময় দেখিতে-দেখিতে) ড্যাম, শুয়ার! আঃ, কতটা দেরি করে দিলি হারামজাদা! (মুসলমানটিকে চাবুক ও লাথি মারিয়া কোঁচা ঝাড়িয়া লইয়া প্রস্থান। চাবুকের আঘাতে মুসলমানটির কপাল কাটিয়া গাল বাহিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল)

মুসলমান। (গামছায় রক্ত মুছিয়া লইয়া) হা আল্লা! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ছড়ানো-জিনিসপত্র ঝাঁকায় তুলিতে লাগিল। ভয় পাইয়া ছেলেমেয়েদুটি বৃদ্ধকে দেখাইয়া দিয়া বাবাকে)

ছেলেমেয়ে। রক্ত! কী রক্ত! (দিশাহারার মতো ছুটাছুটি ও চীৎকার) মা, মা গো! বাবা, শিগ্‌গির বাড়ি চলো!

ভদ্রলোক। (ছেলেমেয়েকে) চলে আয়, চলে আয়! (দৌড়াইয়া যাইয়া মেয়েটিকে কাঁধে ফেলিয়া ছেলেটিকে হাতে ধরিয়া দ্রুত প্রস্থান। হন্তদন্ত হইয়া অরুণ ও কুমারের প্রবেশ)

অরুণ ও কুমার। কী হয়েছে? হয়েছে কী? (জিনিসপত্র-কুড়ানো-রত মুসলমান ও দূরে প্রস্থানপর-ভদ্রলোককে দেখিতে-দেখিতে) রক্ত! এত রক্ত! কে? এমন ক'রে কে মেরেছে?

মুসলমান। (দূরে চাহিয়া জমিদারের প্রস্থান-পথ দেখাইয়া দিয়া) ঐ বাবু! (অরুণ ও কুমার কিছুটা আগাইয়া দেখিয়া)

অরুণ ও কুমার। কে সেই বাবু, কোথায় গেল? (উভয়ে ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধের মালগুলি কুড়াইয়া দিতে গেলে মুসলমানটি তাহাদের হাত ধরিয়া সখেদে বলিয়া উঠিল)

মুসলমান। (অরুণকে) আপনি কেন কষ্ট করছেন বাবু,—এ আর কোনো কাজে লাগবে না। (পথ হইতে কুড়ানো-জিনিসে ঝাঁকা ভর্তি হইলে অরুণ মুসলমানটিকে বলিল)

অরুণ। (মুসলমানকে) যা লোকসান গেছে সে তো তোমার সইবে না। চলো, আমি সমস্ত পুরো-দাম দিয়ে কিনে নেব। কিন্তু বাবা, একটা কথা তোমাকে

বলি, তুমি কথাটি না ব'লে যে অপমান সহ্য করলে আল্লা তোমাকে এজন্ত মাপ করবেন না।

মুসলমান। যে দোষী, আল্লা তাকেই শাস্তি দেবেন, আমাকে কেন দেবেন?

অরুণ। জানো? যে অন্যায় সহ্য করে সেও দোষী, কেননা, সে জগতে অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দিয়ে অন্যায় সৃষ্টি করে। ভালোমানুষি ধর্ম নয়, তাতে দুষ্ট-মানুষকে বাড়িয়ে তোলে।

মুসলমান। (জমিদারবাবুর প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে সেদিকে সেলাম জানাইয়া) বাবু যে, বাবা, মস্ত-বড়ো এক ধনী!

অরুণ। (ব্যঙ্গহাস্যে) ধনী? আমাদের দেশে ধনী শুধু ধনী নন, সে তো জেলের দারোগা। (বৃদ্ধের হাত ধরিয়া প্রস্থান-মুখে) আঘাতের উপর আঘাত। (কুমারকে) কুমার, দেশব্যাপী সর্বত্রই কেবল আঘাতের তাড়না। (হঠাৎ হৈ-চৈ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সমুখের দিকে চাহিয়া ম্লান-হাসিতে) ঐ দেখো কুমার! ঐ যে মুণ্ডমালিনী! (বলিয়া তিনজনে পথের একধারে সরিয়া দাঁড়াইল। "মা যাহা হইয়াছেন"-লেখা পতাকা-হাতে করিয়া অভ্যস্ত-রীতিতে "কালী-কাচে"র (কালী-নৃত্যের) সঙ্গে গাহিতে-গাহিতে গাজনের সং সাজা একদল দরিদ্র বিক্ষুব্ধ-গ্রামবাসীর প্রবেশ)

গান

বিক্ষুব্ধ-গ্রামবাসীদল।

এত রঙ্গ শিখেছ কোথায় মুণ্ডমালিনী।
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী॥

গ্রাম্য-মোড়ল রঘুনাথ। (কালীর সামনে গলবস্ত্র হইয়া উক্তি—)

—দেশের যা অবস্থা! মা, মা, ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ মা। মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিস্‌নে।

(অমনি সকলে সমস্বরে গাহিয়া উঠিল)

সকলে। গান

ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ মা, সন্তানের মিনতি
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি, ওমা ত্রিনয়নী॥

ধ্বনি। (সকলের বারবার "বন্দেমাতরম্‌" ধ্বনি দিতে দিতে প্রস্থান)

(উক্তিরত পথিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১। এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

২। ঠিক, ঠিক—একটা সভা-উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তারা—

১। তারা আসবে, তবে তাদের মন খুলতে অনেক দেরি হবে। কিন্তু মেলা-উপলক্ষ্যে যারা একত্র হয় তারা সহজেই আসে। এই মেলাগুলি দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হবার উপলক্ষ্য।

২। দেশের শিক্ষিতেরা যদি এ-সকল মেলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন, বিদ্যালয়, পথঘাট,—(বিস্ময়ে) ও কী! (দূরে অঙ্গুলি-নির্দেশে) দেখো, দেখো,—একেবারে যুদ্ধং দেহি যে!—

১। (সভয়ে) তাই তো! চলো, চলো,—এবার লড়াই শুরু হল ব'লে।

(ভীতভাবে উভয়ের পশ্চাৎ-প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

(ঘোষপুরের মেলা। অন্য-এক-অংশ) রমজান-কে ধরিয়া টানিতে-টানিতে ক্ষুদিরামের প্রবেশ। রমজানের হাতে লবণের ঠোঙা)

ক্ষুদিরাম। করকচ-লবণ বিলাতী-লবণের চেয়ে সস্তা। তবু বিলাতী-লবণ কেনা? (টান মারিয়া রমজানের হাতের লবণের ঠোঙা ছিনাইয়া লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল)

(উক্তিরত কবির প্রবেশ)

কবি। (ক্ষুদিরামকে) এ কী করছ? বিলাতী-দ্রব্য ব্যবহারই কি দেশের চরম অহিত? না, না, গৃহ-বিচ্ছেদের মতো এত-বড়ো অহিত আর কিছুই নাই।

রমজান। (ক্ষুদিরামের দিকে ক্রূরদৃষ্টিতে একটুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সক্রোধে "আচ্ছা, দেখা যাবে!" বলিয়া চলিতে উদ্যত হইলে কবি আগাইয়া রমজানকে বলিলেন—)

কবি। (রমজানের হাতে একটি নোট দিতে গিয়া) এই নাও ভাই, তোমার ইচ্ছামতো যা-হয় কিছু কিনে নিয়ো।

রমজান। (সক্রোধে) না, ও-নোট নেব না, (ক্ষুদিরামের দিকে তাকাইয়া) ওকে আমি দেখে নেব। (প্রস্থান)

কবি। (ক্ষুদিরামকে) বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরাজের প্রতি যতই রাগ

করি না কেন, আর সেই ক্ষোভ প্রকাশ করবার জন্ম বিলাতী-বর্জন আমাদের পক্ষে যতই আবশ্যক হোক না কেন, তার চেয়ে বড়ো আবশ্যক আমাদের কী ছিল ?

(উক্তিরত উপাধ্যায় বিশ্ববান্ধবের প্রবেশ)

বিশ্ববান্ধব। আবশ্যক ছিল—জাতীয় ঐক্য-সাধন।

কবি। ঠিক, জাতীয় ঐক্য-সাধনই আমাদের পক্ষে আজ একান্ত আবশ্যক।

রমজান। (হঠাৎ লাঠিধারী-রহিমকে সঙ্গে লইয়া রমজানের প্রবেশ। "ঐ যে"—বলিয়া ক্ষুদিরামকে দেখাইয়া দিয়া রহিমকে সেদিকে ঠেলিয়া দিয়া রমজান রহিমেরই পিছনে রহিল। ক্ষুদিরাম সক্রোধে আগাইয়া আসিলে, বিবাদের উপক্রম দেখিয়া কবি তাড়াতাড়ি রহিমের কাছে গিয়া)

কবি। তাই ব'লে ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া ? (এই বলিয়া কবি ও বিশ্ববান্ধব উভয় পক্ষকে "বন্দেমাতরম" বলিতে বলিতে নিরস্ত করিয়া হাত দিয়া ঠেলিয়া দুইদিকে সরাইয়া দিলেন)

রহিম। (হতভম্ব রহিম রমজানের দিকে চাহিয়া) তুমি যে এদিকে মেলায় আমাকে টেনে নিয়ে এলে, এখন কী করব বলো ! মেলায় এসেছিলেম, এখন চলে যাই ?

ক্ষুদিরাম। (সোৎসাহে রহিমকে) বলো বন্দেমাতরম্, বলো ভাই !

রমজান। (ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ব্যঙ্গস্বরে রহিমকে) বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্ !—শুনছ-না, ঐ কী বলছে ওরা !

রহিম। (বিস্ময় ও বিরক্তিতে) যা বলছে শুনছি তো ! ওসব বলছে,—তাতে কী হয়েছে ?

রমজান। (রহিমকে) চারদিকেই যে কেবল বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্ ! (রুক্ষকণ্ঠে) মন্ত্র ! এ যে, মন্ত্রে-বন্দনা ! তাহলে, ব্যাপারটা একবার বুঝে দেখো ! —কী হচ্ছে !

(স্মিতহাস্যে উক্তিরত আনন্দমোহনের প্রবেশ)

আনন্দমোহন। (রমজানকে) ভাই, মন্ত্রই তো বটে ! বন্দেমাতরম্-মন্ত্রে আমরা সেই মা-কে বন্দনা করছি—দেশের ছোট-বড় সবাই যার সন্তান।

রমজান। (ক্রোধ-বিকৃত-কণ্ঠে) কী ! কেবলই শুনছি—ছোটোবড়ো, ছোটো-বড়ো ! ধেৎ ! (রুখিয়া উঠিয়া) আমরা ছোটো নাকি ? বলি, আমাদের জন্ম বাবুদের এত মাথাব্যথা কেন ? যারা কখনো বিপদে-আপদে সুখেদুঃখে আমাদিকে স্নেহ করে নাই, আমাদিকে যারা সামাজিক-ব্যবহারে ঘৃণা করে, তারা আজ

(মাটিতে-পড়া লবণের ঠোঙা দেখাইয়া) এই রকম ক'রে আমাদের প্রতি জবরদস্তি করবে ?—আর, আমরাও কি কেবল এসব জবরদস্তি সয়েই যাব ?

রহিম। (যেন যন্ত্রবৎ) ঠিকই তো ! (আনন্দমোহনকে) হ্যাগো ? তা'বলে তোমরা আমাদের উপর জবরদস্তি করবে ?

রমজান। না, না, আমরা এসব সহ্য করব না।

রহিম। (রমজানের দিকে এক-পলক চাহিয়া লইয়া যন্ত্রবৎ) তা তো সত্যই ! না, না, এসব আবার কেউ সহ্য করে নাকি ?

কবি। (বিশ্ববান্ধব ও ক্ষুদিরামের প্রতি) এই আসন্ন-আত্ম-বিভাগকে নিরস্ত করবার জন্য আমাদিকে আরো-বেশি চেষ্টা করতে হবে। পরস্পর অবিবেচনার দ্বারা যে সংঘাত ঘটছে তার সংশোধন করতে, তাকে ভুলতে কিছুমাত্র বিলম্ব করলে চলবে না। দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সকল মতের লোক মিলে আজ একই পথে যাত্রা করতে হবে।

(কবি, আনন্দমোহন ও বিশ্ববান্ধবের প্রস্থান)

ক্ষুদিরাম। (সোৎসাহে উচ্চস্বরে রমজানকে) ঠিক, ঠিক, সকলকে আজ একই পথে যাত্রা করতে হবে।—একই পথে। শুনলে তো ?

রমজান। (ব্যঙ্গ) যাত্রা করতে হবে ! একি স্বদেশী-প্রচার ?—জুলুম ? স্বদেশী মেলা, স্বদেশী-ভাষা, স্বদেশী-ভাণ্ডার—কেবল স্বদেশী, স্বদেশী !—স্বদেশী।

রহিম। তা স্বদেশী হোক-না, তাতে কী হচ্ছে ?

রমজান। (গম্ভীরস্বরে) কী জানো তুমি ? বিদেশীর এই রাজত্ব,—এ যে বিধাতার এক মঙ্গল-বিধান !

রহিম। (অবাক দৃষ্টিতে) তাই নাকি ?—তা, হ্যাঁ, মঙ্গল-বিধানই-বা হবে !

ক্ষুদিরাম। (রমজানকে) যত-সব রাজভক্তির ভড়ং। বহুকালের পরাধীনতায় আমাদের জাতীয়-মনুষ্যত্ব বা সাহস কিছু-আর আছে না কি ?—সব চূর্ণ হয়ে গেছে। অধীনতার পরবশতার অহিফেনের মাত্রা আর বাড়তে দিয়ো না। (ক্ষোভে)—

যে তোমারে দূরে রাখি' নিত্য ঘৃণা করে হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে, পরি তারি বেশ—
—ধিক্, ধিক্ !

(মৌলবী লিয়াকতের পরিচালনায় স্বদেশী-প্রচারকদলের প্রবেশ। "দেশীর

শিল্পের উন্নতি-সাধনে স্বদেশী-ভাণ্ডার”-লেখা পতাকা-হাতে ফেরির মোটা-কাপড়-কাঁধে লইয়া তাহারা গাহিতেছিল—)

গান

ফেরি-দল। মা কি তুই পরের ঘরে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?
তারা যে করে হেলা মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে।
করেছি মাথা নীচু চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এমন ক'রে ফিরব ওরে
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ?

লিয়াকৎ। (রমজানকে) শোনো ভাই-সব, দেশী বস্ত্র পরলে তোমাদের মঙ্গল হবে। নিজের চেষ্টার দ্বারা যতটুকু ফল পাই তাতে ফলও পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরশ-পাথরও যে মেলে। তাই বলছি ভাই, কিছু কেনো-না ! (ফেরির কাপড় লইয়া রমজানের সামনে ধরিয়া কিনিবার জন্য অনুরোধ করিতেই রমজান রাগে মুখ ফিরাইয়া লইল)

রহিম। (আড়চোখে রমজানের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া মৌলবীকে অপ্রস্তুতের সহিত) কিছু কিনব ? কাজ নেই,—থাক্।

লিয়াকৎ। থাকবে কেন ভাই, আমি দিচ্ছি, তুমি নাও। দেশের কাপড়,—এ তো আমাদেরই-দেশের তাঁতির বোনা।

রহিম। তাহলে নিচ্ছি, দাও, কিন্তু মুশকিলে ফেললে—পয়সা ? এখন তো—(অপ্রস্তুতভাব)

লিয়াকৎ। (স্মিতহাস্যে) পয়সা হাতে নেই ? তা দেবে একসময়। তাতে কী আছে ? তাড়া কিসের ? তুমিও তো ভাই দেশেরই একজন—(রহিমের পিঠ-চাপড়ানো)

রহিম। তা বটে। (কিছুক্ষণ মৌলবীর দিকে চাহিয়া 'সেলাম' বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইয়া হাতের কাপড়খানি মাথায় ছোঁয়াইল)

রমজান। (সক্রোধে মৌলবীর প্রতি চাহিয়া লইয়া স্বগত) বেটা শয়তান ! (প্রকাশ্যে) তোমাদের এসব স্বদেশী-ফদেশীতে কোনোদিন কিছু হবে না,—বলে রাখছি—কিচ্ছু হবে না। (সঙ্গী রহিমকে ক্রূর কটাক্ষে) থাক্, পড়ে থাক্ বেটা। (বলিয়া রহিমকে ফেলিয়া রাখিয়া দ্রুত প্রস্থান)

গান

লিয়াকৎ। নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস্ সে-পণ তোমার র'বেই র'বে ॥
ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে সবাই তখন আসবে সেজে
একসাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে ॥
(উক্তিরত নরমপন্থী-চৌধুরীর প্রবেশ)

চৌধুরী। (মিছিল দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে স্বগত) এরা-সব ভদ্রঘরের ছেলে, মাথায় সবার কাপড়ের মোট আর দ্বারে-দ্বারে এরা তা বিক্রয় করে ফিরছে। আজ কত ব্রাহ্মণের ছেলে—তারা নিজের হাতে লাঙল বইছে!—আমাদের সমাজে এসব যে হতে পারে, স্বপ্নেও ভাবিনি! এসব কী দেখছি!

(লিয়াকতের পরিচালনায় ফেরি-দলের গান)

গান

ফেরি-দল। ভয় হতে তব অভয়-ধামে নূতন জীবন দাও হে।
দীনতা হতে অক্ষয়-ধনে সংশয় হতে সত্য-সদনে
জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে ॥

(গাহিতে-গাহিতে লিয়াকতের সহিত সকলের প্রস্থান)

ঘোষপুরের-মেলা—দৃশ্যান্তর

("বঙ্গ-বিভাগ ও শিক্ষা-আন্দোলন"-লেখা পতাকা উড়াইয়া অরুণের সহিত একদল ছাত্রের প্রবেশ। দলের পাশে-পাশে রুল-হাতে সার্জেণ্ট ও লাঠী-কাঁধে দুজন পুলিসও চলিয়াছে। দলের আগে-আগে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা-প্রচার করিয়া চলিয়াছে উত্তেজিত-কুমার)

কুমার। (ঘোষণা) বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের মধ্যে নবজীবনের একটা উত্তেজনা অনুভব করছি। আজ গবর্নমেণ্টের পরোয়ানায় কর্তৃপক্ষের তাড়নায় ছাত্রগণ বেদনা বোধ করছেন।

সার্জেণ্ট। (ঢোলশহরৎ-সহ সরকারী-পরোয়ানা পড়া) সকলে শোনো— গবর্নমেণ্টের পরোয়ানা—

ছাত্রগণ। (সচীৎকারে) এটা অপমানজনক পরোয়ানা।

সার্জেণ্ট। ছাত্রগণ আন্দোলনে যোগ—

ছাত্রগণ। (চীৎকারে সার্জেণ্টের কণ্ঠ চাপা দিয়া) ছাত্রগণ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন—ছাত্রগণ যোগ দিয়াছেন—। বন্দেমাতরম্!

(ধ্বনির উপর ধ্বনি)

অরুণ। (ঘোষণা) সকলে শুনে রাখো,—দেশের বিদ্যালয়কে সরকারের শাসন থেকে মুক্তি দেওয়া দরকার। যে-যে স্থানে আমাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র আছে সে-সকল স্থানেও আমরা যদি স্বাধীন শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত না করি তবে কোনোদিন কেউ আমাদিকে রক্ষা করতে পারবে না।

(সার্জেণ্টের অধৈর্য-পায়চারি)

কুমার ও স্বদেশী-সকলে। (কুমার 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিলে সেই ধ্বনি দিতে-দিতে স্বদেশী-সকলের প্রস্থানোদ্যোগ। মিছিল-দর্শনে-উৎসুক শাক্-সব্‌জি ও মেলার বেসাতি-ভরা ঝুড়ি-মাথায় সদলে গ্রাম্যচাষী মোড়ল রঘুনাথের সঙ্গে গাহিতে গাহিতে রহিমেরও প্রবেশ)

গান

রঘুনাথ ও রহিম। আমরা চাষ করি আনন্দে—

মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।

রঘুনাথ। (বিস্ময়ে ও আনন্দে রহিমকে) স্বদেশী-আন্দোলন!—দেখছ? দেখে নাও! দেখো ভাই, দিনে-দিনে সব কী-হচ্ছে!

রহিম। (বিস্ময়ে) তা তো দেখছি। কিন্তু ছাত্রেরা?—আন্দোলনে তবে ছাত্রেরাও নেমেছে?

সার্জেণ্ট। (আগাইয়া আসিয়া চাষীদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্লেষের সহিত ধমকাইয়া) আর তোমরা? আন্দোলনে তোমরা কেন? জানো?—এই স্বদেশী-আন্দোলন কৃত্রিম?

কুমার। (দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ) কৃত্রিম? আর যা বলো,—সে-কথা কেউ বলতে পারবে না। আমাদের দেশের (চাষীদ্বয়কে দেখাইয়া) চাষাদিগেও যদি আজ জিজ্ঞাসা করা যায়—

সার্জেণ্ট। (চাষীদ্বয়কে শাসাইয়া রহিমের হাতের স্বদেশী-কাপড় দেখাইয়া) তোমরা আবার এ-সব স্বদেশী-জিনিস ব্যবহার করছ কেন?

চাষীদ্বয়। (সমস্বরে) হুকুম।—হুকুম-যে!

কুমার। (সার্জেণ্টকে) জানো? হুকুম বটে, কিন্তু এ হুকুম সাহেব,—সোজা হুকুম নয়!

সার্জেণ্ট। (ধমক দিয়া কুমারকে) থামো! (চাষীদ্বয়কে) এ কি কোনো নেতার হুকুম? বলো-না!—কে সেই নেতা?

রঘুনাথ। কোনো নেতার হুকুম নয়, সাহেব।

সার্জেণ্ট। তবে?

অরুণ। (হাসিয়া সার্জেণ্টকে) নেতার হুকুম নয়।—কোন্ স্বর্গ হতে এ-হুকুম আসছে কে বলতে পারে। যে-শক্তি আজ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত, কই, পূর্বে তো কখনও তা উপলব্ধি করতে পারি নাই।—এ হুকুম অমান্য করতে পারে কে?—এ হুকুম অমান্য করতে পারে,—এমন শক্তি কারো নাই।

ছাত্রদল। নাই, নাই,—এমন শক্তি কারো নাই।

গান

ভয় হতে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে—

ধ্বনি। [সমবেত-কণ্ঠে] 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে-দিতে মিছিলের লোকদের প্রস্থান। সার্জেণ্ট ও পুলিসেরাও অগত্যা ক্ষুব্ধভাবে মিছিলের সঙ্গে চলিয়া যাইতে উদ্যত। এই সময়ে "জাতীয়-ধন-ভাণ্ডার"-লেখা - পতাকা-হাতে স্বেচ্ছাসেবিকা কিশোরী-বিনি ও একটি ভিক্ষাপাত্র-হাতে পরিচালিকা নিবেদিতা পাশাপাশি আগে-আগে থাকিয়া একদল লোকসহ মেলা-পরিক্রমার পথে ঐ-স্থলে উপস্থিত হইল। নিবেদিতাকে ঘেরিয়া দলের লোকেরা উধ্বর্বাহু হইয়া নৃত্যরত-অবস্থায় গাহিতেছিল—

গান

জনতা। থাকতে আর তো পারলি নে মা পারলি কই?
কোলের সন্তানেরে ছাড়লি কই।
দোষী আছি অনেক দোষে ছিলি বসে ক্ষণেক রোষে
মুখ তো ফেরালি শেষে অভয়-চরণ কাড়লি কই॥

নিবেদিতা। (সকলকে ভিক্ষাপাত্রটি দেখাইয়া) আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা-সবাকার ঘরে-ঘরে,
তোমরা চাহিলে সবে এ-পাত্র অক্ষয় হবে—

দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্নের অভাব। প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে এক-পয়সা বা

এক মুষ্টি বা অর্ধমুষ্টি তণ্ডুল স্বদেশ-বলি-স্বরূপ কি তোমরা উৎসর্গ করতে পারবে না? জননী-জন্মভূমির ভার আমরা কি বহন করতে পারব না? বিদেশী কি চিরদিনই আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দেবে? আর, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হলেই কি আমরা চীৎকার করতে থাকব?

জনতা। না, মা।—সে কী কথা? পারব-না—কী বলছ? পারব, পারব, জন্মভূমির ভার আমরা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই বহন করতে পারব।

(সকলের দানে ভিক্ষাপাত্র ভর্তি হইয়া ছাপিয়া উঠিল। রঘুনাথ ও রহিম দুইজনে মিলিয়া আগাইয়া আসিয়া খুট্ খুলিয়া একটি-একটি পয়সা দিল। পাত্রটি ছুঁইয়া লইয়া তাহারা কপালে হাত বুলাইল)

জনতার একজন। করব, মা,—করব; আমাদের নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করব। (ধ্বনি 'বন্দেমাতরম্')

জনতার একজন। যাতে আমরা নিজেদের শিক্ষাকে স্বাধীন করতে পারি, তার ব্যবস্থা করতেই হবে।

জনতার একজন। কিন্তু, উপায় নাই, উপায় নাই,—ইংরেজের প্রবল শক্তি এবং সমাজের প্রবল জড়তার বিরুদ্ধে আমাদের কোথাও-কিছু-করবার আর কোনো উপায় নাই।

নিবেদিতা। কে বলে উপায় নাই?

গান

(নিবেদিতার পরিচালনায় সকলে গাহিতে লাগিল)

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্ জগতজনের শ্রবণ জুড়াক।
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গলে যাক্—মুখ তুলে আজি চাহ-রে॥
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি' হৃদয়ে-হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি—
প্রভাত-গগনে কোটি-শির তুলি' নির্ভয়ে আজি গাহো রে॥
বিশ-কোটিকণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ-কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে দশ-দিক সুখে হাসিবে॥
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন—আসিবে সেদিন আসিবে॥

সার্জেণ্ট। (ব্যঙ্গহাস্যে) হাঃ হাঃ,—আসবে! সে-দিন কি আর আসবে? স্বপ্ন, স্বপ্ন! ও হচ্ছে সব স্বপ্ন দেখা!

বিনি। (ধমক) চুপ্।

সার্জেন্ট। (ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে) কী বললে—চুপ?

বিনি। কোটি-কণ্ঠে মা ব'লে ডাকলে,—স্বপ্ন না সত্য—সেটা তখনই বুঝবে?

সার্জেন্ট। (ব্যঙ্গ-হাস্তে) কেবল বাক্যের বড়াই! বলা হচ্ছে কী-না—জাতীয় ধন-ভাণ্ডার।—জাতীয় ধন-ভাণ্ডার!—জানি, এ সবই কেবল বাক্যের বড়াই।

বিনি। শুনলে তো ধন-ভাণ্ডার।—ও যে বারুদের ভাণ্ডার। বারুদের ভাণ্ডারে দেশলাই জ্বালাতে দিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে! তা,—জানো তো?

সার্জেন্ট। (উপহাসিতে) একে বারুদের ভাণ্ডার—তার উপর আবার কিনা,—অগ্নিকাণ্ড! (পুলিসদলের অজানা-আশঙ্কায় হকচকিত হইয়া এদিক্-ওদিক-চাওয়া) দুর—দুর! বক্তৃতা—বক্তৃতা—ওসব হল বক্তিতার ভেজা-বারুদ! ভেজা-বারুদের বক্তৃতায় ঘটাবে অগ্নিকাণ্ড? তবেই হয়েছে! ('হাঃ হাঃ হাঃ'-শব্দে উচ্চহাসি)

বিনি। (সনমস্কারে আবৃত্তি)

যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার কিছুই তোমার হবে না,
তবু ওগো মাতা, পারি তা ঢালিতে এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
নিভাতে তোমার যাতনা॥

নিবেদিতা। যদিও জননি, যদিও আমার এ বীণায় কিছু নাহিকো বল
কী জানি যদি মা, একটি সন্তান জাগি উঠে শুনি—

ধ্বনি। (মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি)

সার্জেন্ট। (ধ্বনি থামিতেই ঠাট্টার সুরে একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিয়া উঠিল) ওদিকে তো ধ্বনি উঠছে "বন্দেমাতরম্" কিন্তু, হুশিয়ার! দেখছ তো? এদিকে যে (হাতের রিভলবার দেখাইয়া) বন্দুক-গরম! (রহিম হঠাৎ সার্জেন্টের মাথা লক্ষ্য করিয়া—)

রহিম। (স-ক্রোধে) তবে রে বেটা, ঠাট্টা হচ্ছে! ঠাট্টা? (এই বলিয়াই হাতের লাঠি ছুঁড়িবার উপক্রম করিতেই) "থাক্ থাক্ ভাই,—ওসবে কাজ কী?" (বলিয়া রঘুনাথ লাঠি ধরিয়া ফেলিল)

নিবেদিতা। (উচ্চকণ্ঠে জনতাকে) উত্তেজিত হবেন না, বিভ্রান্ত হবেন না, আপনারা নিজের আদর্শের কাছে, স্বদেশের কাছে, ঈশ্বরের কাছে সত্য থাকবেন।

বিনি। (ধ্বনি) বন্দেমাতরম্।

সকলে। (ধ্বনি) বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্। (বাহিরেও উপর্যুপরি ধ্বনি)

নেপথ্যে। (বারীনের কণ্ঠে) দাঁড়াও বিদেশী! আর দেরি নাই। অগ্নিকাণ্ড শুরু হ'ল ব'লে!

সার্জেণ্ট। (হুইসিল্ বাজাইয়া) ধরো, ওদের ধরো—(বলিয়া সার্জেণ্ট পুলিস-দল-সহ বাহিরের শব্দানুসরণে চলিয়া গেল)

নিবেদিতা। (সবিস্ময়-বিক্ষোভে) মেলাতে এ কী-সব-কাণ্ড! (ইতস্তত-দৃষ্টি। তখনই উক্তিরত বারীনের সন্তর্পণে প্রবেশ)

বারীন। তবে, দিদি, আজ এও-যে এক মেলারই-কাণ্ড, কি-না! এ হল,—যা বল্‌ছিলেন—সেই অগ্নিকাণ্ডেরই একটা মহড়া-মাত্র। (সোল্লাসে)

গান

এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে॥
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্ জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্॥

(সকলের প্রস্থান)

(পিতার কাঁধে-চড়া বাঁশি-বাজনা-রতা পায়ে-ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা উৎফুল্ল ছোট্ট মেয়েটি ও হাতে-ধরা ছেলেটিসহ পূর্বোক্ত দৃশ্যের দরিদ্র-ভদ্রলোকের প্রবেশ)

মেয়েটি। আবার-একবার বলো না বাবা, সেই ছড়াটা—বলো না!

পিতা। আবার বলব?—বাজে বাঁশি পাতার বাঁশি আনন্দ-স্বরে
হাজার-লোকের হর্ষধ্বনি সবার উপরে!
—হয়েছে তো?

মেয়েটি। এবার বলো সেই "বন্দে—মা!"

বাবা ও ছেলে-মেয়ে। (একত্রে ধ্বনি) বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

(প্রস্থান)

দৃশ্য ৮

কলিকাতা। স্বদেশ-সেবাসমিতির প্রাঙ্গণ। সাধারণ-সভা

(নিবেদিতা ও বিনির সঙ্গে কাতর-দেহে অসুস্থ-কবির সভাকক্ষে প্রবেশ। বারীন ও ব্রতীন্দ্র আগাইয়া গিয়া কবিকে সাবধানে ধরিয়া আনিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল; নিবেদিতা ও বিনি কবির পাশে দাঁড়াইয়া রহিল)

আনন্দমোহন। সভা-অধিবেশনের সময় হয়েছে। (কবিকে দেখাইয়া) উনি অসুস্থ। তথাপি উৎসাহ সংবরণ করতে পারেন-নি। আজ আবার সাধারণ-সভার অধিবেশন কি-না!

কবি। এতদিন আমি দেশের রাষ্ট্রসভায় স্থান পাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি নাই। আমার ক্ষমতার অভাব এবং স্বভাবেরও এটা ত্রুটি। বন্ধুগণ, সমস্যা যে কী, সে সবের আলোচনা-উপলক্ষ্যে আমরা যদি এখন একটা খুব মস্ত-বড়ো নীতি-কথা বলি, তবে সে-কথার কোনো মূল্য নাই। আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। সম্প্রতি আমি গ্রামে গিয়েছিলাম, দেখে এলাম—পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নেই। সেখানে জলাভাব,—পানীয়-জল রোগের নিকেতন। দুধ দুর্লভ, মৎস্য দুর্লভ, ঘি দূষিত, তৈলবিষাক্ত। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই। মহাজনেরা চাষীদের সর্বনাশ করছে, কারখানায় শ্রমিকদিগের মনুষ্যত্ব নষ্ট হচ্ছে। আজ লোকে ধর্ম-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতেও বাধ্য হচ্ছে।

(এই সময়ে একটা হাঁচির শব্দ হইল। ব্রতীন্দ্র শব্দানুসারে সেইদিকে চাহিল, দেখা গেল অদূরে লোকের মধ্যে একটা মাথা কেমন-যেন অস্বাভাবিকভাবে নুইয়া আত্মগোপনের চেষ্টায় ইতস্তত একটু আন্দোলিত হইতেছে)

ব্রতীন্দ্র। (স্বগত) গোয়েন্দা! ব্যাটা ঠিক গুপ্তচর! দেখি তো একটু এগিয়ে—

ব্রতীন্দ্র তড়িৎ-গতিতে উঠিয়া গিয়া একটা লোককে সভার মধ্য হইতে ধরিয়া টানিতে-টানিতে কবির কাছে নিয়া আসিল। ভয়ে তখন লোকটা কণ্ঠাগত-প্রাণ। সে তার হাতের কাগজ-পেনসিল পকেটে পুরিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া "হুজুর, হুজুর" বলিয়া কবির পায়ে পড়িল। লোকটির হাত হইতে কাগজ-পেনসিল ছিনাইয়া লইয়া কবিকে তাহা দেখাইয়া ব্রতীন্দ্র বলিল 'এই দেখুন!' লোকটা হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কবি "ছেড়ে দাও" বলিয়া হাত নাড়িয়া লোকটিকে ছাড়িয়া দিতে নির্দেশ দিলেন)

ব্রতীন্দ্র। (লোকটিকে) পালা, পালা, বেটা গোয়েন্দা, হতভাগা! (বলিতেই লোকটা অতি নীরিহভাবে গুটি-গুটি-পায়ে কিছুদূর গিয়াই দৌড়াইয়া সভাকক্ষ ত্যাগ করিল)।

কবি। (পলায়মান গোয়েন্দার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশে সহানুভূতির স্বরে) এরা আজ গোয়েন্দা, গুপ্তচর! এরা আজ সত্যকে মিথ্যা করে! কিন্তু সে-কি এমনিতেই?

লোকে যে ধর্ম-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেকেরই ঘরে টানাটানি, অনেকেরই ঘাড়ে ঋণ, অনেকেরই আছে মহাজনের দায়! দেনায় যে সবাই ডুবে আছে!—এতেই তো সব নষ্ট হচ্ছে।

আনন্দমোহন। এই দেশব্যাপী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে ভয়াবহ।

বিশ্ববান্ধব। ভারত-সাম্রাজ্যের দ্বারা ইংরেজ বলী, কিন্তু ভারতকে যদি ইংরেজ বলহীন করতে চেষ্টা করে তবে—

(উক্তিরত ক্ষুদিরামের প্রবেশ)

ক্ষুদিরাম। তবে তা আপনার বিপর্যয় আপনি ঘটাবে।

ব্রতীন্দ্র। নিরস্ত্র নিঃস্বত্ব নিরন্ন ভারতের দুর্বলতাই ইংরাজ-সাম্রাজ্যকে—

কর্মীদল। (উত্তেজনার সঙ্গে) নিশ্চয়—নিশ্চয় তা ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে বিনাশ করবে।

বিশ্ববান্ধব। (গম্ভীরভাবে কর্মীদের প্রতি) যতই যা হোক, তোমাদিকে কিন্তু এক থাকতে হবে,—আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে।

কবি। দেশের কর্মে দুর্গম-পথে যাত্রা আরম্ভ করতে তোমরা কে কে প্রস্তুত আছ? আমি সেই বীর-যুবকদিকে অদ্য আহ্বান করছি। আহ্বান করছি—রাজদ্বারের অভিমুখে নয়,—আহ্বান করছি, ভারতের স্বকীয়-শক্তি যে-খনির মধ্যে নিহিত—সেই খনির সন্ধানে—দেশের মর্মস্থানে; আহ্বান করছি যে-জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি তাদেরই নির্বাক-হৃদয়ের গোপন-স্তরের মধ্যে। সেই গুহার গভীরতম ঐশ্বর্য-লাভের সাধনায়,—কে তোমরা প্রবৃত্ত হবে?

ব্রতীন্দ্র। বন্দেমাতরম্। (ধ্বনি দিয়া একদল যুবককে সঙ্গে লইয়া কবির নিকটে গেল। এই সময়েই একজন পুলিসসহ সদর্প-উক্তিরত সার্জেণ্টের প্রবেশ)

সার্জেণ্ট। (শ্লেষে যুবকদের প্রতি) বন্দেমাতরমের বুলি দিয়ে কী হবে?—বুলি নয়, চাই গুলি।—বুঝলে বন্দুকের গুলি! গুলি-তরবারি দিয়ে আমরা জয় করি!

ক্ষুদিরাম। —জয় করি? বটে?

নিবেদিতা। দেখো—আমরা জয় করব ঐ 'বন্দেমাতরম' দিয়েই।

অরুণ। আমরা জয়ী হবই।

যুবকগণ। (সমস্বরে) জয়ী হবই, নিশ্চয়ই জয়ী হব।

সার্জেণ্ট। এসব কেবল বাক্যের বড়াই! (উপহাসি)

ক্ষুদিরাম। ভাবছ—তরবারির দ্বারা তোমরা আমাদের জাতীয়-বন্ধন ছিন্ন করবে? —এত সাহস?

(ক্রুদ্ধস্বরে সার্জেণ্টকে লক্ষ্য করিয়া)

গান

ক্ষুদিরাম ও নিবেদিতা। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান,—

সকলে। তুমি কি এমনি শক্তিমান?

আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান

সকলে। তোমাদের এমনি অভিমান॥

চিরদিন টানবে পিছে চিরদিন রাখবে নিচে—

এত বল নাইরে তোমার সবে না সেই টান॥

শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও

হও না যতই বড়ো আছেন ভগবান।

আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে—

(এইস্থলে সার্জেণ্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উত্তেজিত সভাস্থ সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল)

সভাস্থ সকলে। (কথায়, ক্রুদ্ধকণ্ঠে) তোরাও বাঁচবি নে রে,—

সকলে। (গানে) বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান॥

(সার্জেণ্ট দাঁড়াইয়া চারিদিকের সমস্ত লক্ষ্য করিতে লাগিল। গোয়েন্দা বিশু গুঁড়ি-মারিয়া সার্জেণ্টের পিছনে-পিছনে ঢুকিয়া পড়িয়া পুলিসের কাছ-ঘেঁসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল)

সার্জেণ্ট। তোমরাও তবে জেনে রাখো—তরবারির দ্বারা আমরা-জয় করি—আমরা রক্ষাও করি তরবারির দ্বারা।

ব্রতীন্দ্র। (সার্জেণ্টকে) তোমাদের এই-সমস্ত তর্জন-গর্জন, আয়োজন-আড়ম্বর তুচ্ছ ছেলেখেলা-মাত্র।

সার্জেণ্ট। আর, এ-সবও তোমাদের পরাধীন-জাতির স্পর্ধা-মাত্র। আমরা গুটি-কতক প্রবাসী পঁচিশ-কোটি বিদেশীকে শাসন করছি কিসের জোরে, জানো? আমরা তোমাদের অপেক্ষা পঁচিশকোটি গুণে শ্রেষ্ঠ।—পঁচিশকোটি গুণে!

ব্রতীন্দ্র। এমন কথা যে বলে সে অত্যন্ত দুষ্ট।

আনন্দমোহন। (যুবকদিগকে) ও-সব এখন থাক্—জেনো, বঙ্গব্যবচ্ছেদ

আসন্ন! সেই বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যে সংকল্প করছি, সেই সংকল্পটিকে স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে স্থায়ী মঙ্গলের উপর স্থাপিত করতে হবে।

সার্জেণ্ট। (বাঁকাহাস্যে) ইংরেজ-আমল কী সুখের বলো তো?

ব্রতীন্দ্র। ইংরেজ আমল সুখের?—হতে পারে না। (সার্জেণ্ট ও পুলিসদলকে দেখাইয়া শ্লেষের সহিত) এ কেবল তোমাদের মতো গোটাকতক সাক্ষীর কথা।

সার্জেণ্ট। ব্রিটিশ-ব্যবস্থা?—

ব্রতীন্দ্র। ব্রিটিশ-ব্যবস্থা যত বড়ই হোক, তা—

ক্ষুদিরাম। (ব্যঙ্গহাস্যে) তা আমাদের নয়। ওসব হল তোমাদের ইম্পিরিয়ালিজমের নেশা।

অরুণ। এই খেয়ালের ঢেউ লর্ড-কার্জনের মনের মধ্যেও যে তোলপাড় করছে।

কবি। (ব্রতীন্দ্রকে) দেশে স্বদেশী-উদ্‌যোগ আজ ব্যাপ্ত। একটা তুচ্ছ কলহের ভাব কখনোই দেশের অন্তঃকরণকে এভাবে টানতে পারত না। কার্জনের সঙ্গে আড়ি তার কারণ হতেই পারে না। মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের কোনো উদ্‌যোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করতে চায় তবে তা ধর্মকে অবলম্বন না করলে কোনোমতেই কৃতকার্য হবে না। ব্যঙ্গব্যবচ্ছেদের আঘাতে স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা একটা ধর্মসাধনার আকার ধারণ করছে।

বিশ্ববান্ধব। এখন হতে আমাদের ঐক্যকে নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারে স্বীকার ও সম্মান করতে হবে।

কবি। ভারতবর্ষের ভাগ্যকে এক রাষ্ট্র-সম্মিলনের মধ্যে বাঁধবার জন্য যে-ত্যাগ, যে-সহিষ্ণুতা, যে-সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তা আমাদিকে অবলম্বন করতে হবে।

(নেতা আনন্দমোহন কবির হাতে কাগজপত্র আগাইয়া দিলেন। কবি কাগজ লইয়া প্রস্তাব লিখিলেন ও কাগজখানি "দেখুন" বলিয়া বিশ্ববান্ধবের হাতে দেখিতে দিলেন। বিশ্ববান্ধব কাগজখানি একটু দেখিয়াই বলিলেন—"সভার প্রস্তাব?—ঠিক আছে"। বলিয়াই তাহা কবিকে ফেরৎ দিলেন। কবি তাহা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলেন)

কবি। (প্রস্তাব-পাঠ) "আগামী ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষ-রূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেইদিনকে আমরা বাঙালীর রাখীবন্ধনের দিন করিয়া

পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখীবন্ধনের মন্ত্রটি এই—"ভাই ভাই এক ঠাঁই"।

সকলে। (সানন্দে উত্তেজিত হইয়া সমস্বরে) "ভাই ভাই এক ঠাঁই।"

কবি। (পাঠ) উক্ত দিনে সংযম-স্বরূপ আমাদের অরন্ধন হইবে—চুল্লি না জ্বালাইয়া আমরা ফল-দুগ্ধ আহার করিব। রাজার খড়্গ যে বিধাতার বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারে না,—ইহাই উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের এই রাখীবন্ধন-উৎসব।

(সকলে দাঁড়াইয়া 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়া পরে কবিকে বলিল)

সকলে। একটা গান—একটা গান।

কবি। (একটু হাসিয়া গাহিতে লাগিলেন)

গান

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা।
তব আশ্রমে তোমার চরণে হে ভারত, লব শিক্ষা॥
পরের ভূষণ, পরের বসন, তেয়াগিব আজ পরের আসন,
যদি হই দীন না হইব হীন ছাড়িব পরের ভিক্ষা॥
পরের বাক্যে তব পর হয়ে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা,
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ পরেছি পরের সজ্জা।
তোমার ধর্ম তোমার কর্ম তব মন্ত্রের গভীর মর্ম,
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব লইব তোমার দীক্ষা॥

(গানের মধ্যে সার্জেণ্টের সঙ্গী-পুলিসটি বিশুকে কানে-কানে কী বলিল ও গান শেষ হইলে বিশু চীৎকার করিয়া উঠিল—)

বিশু। পালাও—পালাও, সৈন্য আসছে– সৈন্য। বাবারে, এবার পালাই (বলিয়া ভীতির ভান করিয়া নিজে দ্রুত সভা হইতে ছুটিয়া সরিয়া পড়িল। দুই-একজন মাত্র সেদিকে ঘাড় ফিরাইল)

সকলে। বিশু! বিশু! আরে ওটা যে সেই গুপ্তচরটা—(বলিয়া সকলে তাচ্ছিল্য দেখাইল। কিন্তু সেদিকে সভার কেহ ভ্রূক্ষেপ করিল না, নড়িল না, ব্রতীন্দ্রের সঙ্গে উৎসাহের সহিত সকলে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি দিতে লাগিল)

সার্জেণ্ট। (ব্রতীন্দ্রকে) তোমরা যেন কী সব বললে?—নব বৎসরে করিলাম

পণ,—পণ কি—উদ্দেশ্য-সাধন? জেনো—অসাধ্য। যতই বলো, ওসব অসাধ্য! একেবারেই অসাধ্য!

কবি। (সার্জেণ্টকে) অসাধ্য বটে, কিন্তু এ-দেশের যিনি উন্নতি করবেন, অসাধ্য-সাধনই যে তাঁর ব্রত।

অরুণ। (সার্জেণ্টকে বিদ্রূপে) স্বদেশী-আন্দোলনে এটাই প্রমাণ যে, অসাধ্যও সাধ্য হয়।—বুঝেছেন মশায়?

(সকলের 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি)

সার্জেণ্ট। (অরুণের প্রতি রক্তদৃষ্টিতে) কিন্তু সাবধান।—আচ্ছা, কেমন সাধ্য হয় দেখা যাবে। (সার্জেণ্টের প্রস্থান)

কবি। (সকলকে) দেশব্যাপী আঘাতের তাড়না উপস্থিত। এই সময়কে যদি উপেক্ষা করি তবে বিধাতার প্রেরণাকে অবজ্ঞা করা হবে। যে দুর্বল নিশ্চেষ্ট—দুঃখ তাকে দুঃখই দেয় শিক্ষা দেয় না। কোথায় আমরা আছি, কোথায় আমাদের শক্তি, কোন্‌দিকে আমাদের অসম্মান, কোন্‌দিকে যে প্রতিকূলতা—এ সম্বন্ধে শুধু ক্ষীণ ধারণা চলবে না—ধারণা মনে গাঁথতে হবে—তা কাজে খাটাতে হবে। এ-সব কথা ভুললে আমরা মরব!—আমাদের যাত্রাপথের দিক-পরিবর্তন করতে হবে একটা ডাক পড়ল।—আগামী ৩০শে আশ্বিন রাখীবন্ধনের দিন। জাগো জাগো,—মুক্তির অধিকারে জাগো। (কবি, বিশ্ববান্ধব ও আনন্দমোহনের প্রস্থান)

(মুকুন্দের প্রবেশ)

(মুকুন্দের পরিচালনায় সমবেত গান)

গান

জাগো নির্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তর-ক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে ॥
জাগো উজ্জ্বল পুণ্যে, জাগো নিশ্চল আশে,
জাগো নিঃসীম শূন্যে পূর্ণের বাহুপাশে।
জাগো নির্ভয়-ধামে, জাগো সংগ্রাম-সাজে,—

(গাহিতে-গাহিতে সকলে পতাকা-হাতে মিছিলে প্রস্থানোন্মুখ। লাঠি-কাঁধে লাল-পাগড়ীধারী-পুলিসদল-সহ উক্তিরত ক্রুদ্ধমূর্তি সার্জেণ্ট সবেগে পুনঃ-প্রবেশ করিয়া ও পথ আটকাইয়া স্বদেশীদলকে ধমকাইয়া—)

সার্জেণ্ট। আবার গান? গানে এ-সব কী বলা হচ্ছে। "জাগো সংগ্রাম-সাজে।—জাগো!—"

ক্ষুদিরাম। (ব্যঙ্গ) সংগ্রাম—মানে—যুদ্ধ!

সার্জেণ্ট। (চোখ বড়ো করিয়া) এঁ্যা, তোমরা যুদ্ধ করবে?

(সার্জেণ্টের হুইসিল বাজানো। গট্‌গট্ করিয়া বন্দুকধারী তিনজন পুলিসের প্রবেশ)

নিবেদিতা ও বিনি। (সার্জেণ্টকে সগর্জনে) আবার বাধা?—পথ জুড়ে কি পদে-পদে কেবল বাধার সৃষ্টি করতেই তোমরা আছ?

(পরে স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকা-দল সকলে মিলিয়া সার্জেণ্টের প্রতি সরোষে—)

স্বদেশীদল। গান

বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই সরতে হবে॥
লুঠ-করা ধন ক'রে জড়ো কে হতে চাস সবার বড়ো,
এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে॥

(ধ্বনি—'বন্দেমাতরম্')

সার্জেণ্ট। (ধ্বনির মধ্য দিয়া সগর্জনে) আবার?—আবার গান?

প্রথমে ব্রতীন্দ্র পরে স্বদেশীদল। (ধ্বনি) বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

(সার্জেণ্ট ও স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকাদল পরস্পর কিছুক্ষণ দৃঢ়দৃষ্টিতে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া-থাকা)

সার্জেণ্ট। আবার—বন্দেমাতরম্?

ব্রতীন্দ্র। (আগাইয়া গিয়া সরহস্যে হাসিয়া সার্জেণ্টকে) দাদা,—তুমি তো দেখলে তোমাদের মন্ত্রতন্ত্র কিছুই অভ্যাস করতে পারলুম না। (স্বদেশীদলে ধ্বনি—বন্দেমাতরম্) শুনছ?—একমাত্র ঐটেই যে পারি! (ধ্বনি—বন্দেমাতরম্)

সার্জেণ্ট। (বিক্ষোভে ব্যঙ্গস্বরে)—'ঐটেই যে পারি!'—ভারি অহংকার!

ব্রতীন্দ্র। (সকৌতুকে সার্জেণ্টকে) গোড়ায় তোমরা যেটা শেখাতে চেয়েছিলে—কী যেন? মানে, "ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করো"—তাই না?,—আর, আজ যেটা আমরা আওড়াচ্ছি—ঐ যে এখনি শুনলে—

সকলে। বন্দেমাতরম্—

ক্ষুদিরাম (হাসি মস্‌করায়) বুঝলে কিনা, দুটোর মধ্যে অনেকটা তফাৎ হয়ে গেছে।

সার্জেণ্ট। (ক্ষুদিরামকে ধমক দিয়া) সেই তফাৎটা ঘোচাতে হবে নির্বোধ।

ব্রতীন্দ্র। (সার্জেণ্টকে সকৌতুকে) তফাৎটা সহজেই ঘোচে, যদি তোমাদের-টাকে আমাদেরই মতো করে নাও।

ক্ষুদিরাম। (সার্জেণ্টকে) বলো না, সাহেব, বলো, বলো—বন্দেমাতরম।

ব্রতীন্দ্র। বলো সাহেব! তা নইলে তা তোমাদেরটা আমরা আর বলতে পারব না।

সার্জেণ্ট। (ধমক দিয়া) চুপ!—'নইলে তো আর বলতে পারব না,' ও—কী বলছ? বলতে পারতেই হবে। তুমি কি মনে করেছ, তোমার কাছে হার মানব?

ক্ষুদিরাম। না, না,—এখনই না। কিন্তু দিনে-দিনে হার মানতে হবে। হার মানতে হবে পদে-পদে।

সার্জেণ্ট। (অবজ্ঞায় মুখ ফিরাইয়া ব্রতীন্দ্রের প্রতি) ভাবছ, আমি তোমাকে আঘাত করতে পারিনে?

ব্রতীন্দ্র। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না।

সার্জেণ্ট। (স্বেচ্ছাসেবকদলকে দেখাইয়া দিয়া ব্রতীন্দ্রকে) এরাই তোমার অনুবর্তী?—এই কর্মকাণ্ডহীন দল?

ব্রতীন্দ্র। (মৃদু হাসিয়া) এদের কর্মকাণ্ড কী-রকম, ক্রমে সেটা দেখতে পাবে।

সার্জেণ্ট। (সদম্ভে পুলিসদলকে আদেশ) দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো,—আমরা এদের এখান থেকে বার করে দিয়ে সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ করি।

ক্ষুদিরাম ও অরুণ। তবে রে! (পুলিসদল আগাইবার উপক্রম করিতেই জামার হাতা গুটাইতে-উদ্যত ক্ষুদিরাম ও অরুণের আক্রমণভাব-প্রদর্শন)

মুকুন্দ। (আগাইয়া ক্ষুদিরাম ও অরুণকে) থামো, তোমরা থামো।

পুলিস-পাঁড়েজী। (সার্জেণ্টকে) হুজুর, এদের বার করে দেব কী, এরাই আমাদের বার করে দেবে—সে-সম্ভাবনাটাই যে এখন প্রবল বলে মনে হচ্ছে!

(ছুটিয়া বিশুর প্রবেশ)

বিশু। (উদ্‌ব্যস্ত হইয়া সার্জেণ্টকে) লড়াই!—লড়াই হচ্ছে। একেবারে লাঠালাঠি! খবর পেয়েছি।

সার্জেণ্ট। (হকচকিয়া বিশুকে) লড়াই! লাঠালাঠি!—(তাড়াতাড়ি হাতের ইঙ্গিতে 'পাঁড়েজী'-কে বলি শুনছ?)—এখানে বসে থেকে সব দেখো। (বলিয়া ঐ

স্থানে পাহারাতে তাহাকে মোতায়েন রাখিয়া পুলিসদলকে লইয়া দ্রুত-প্রস্থান। দ্বিধা-গ্রস্ত পাঁড়েজী স্বদেশীদল হইতে সলজ্জে সসংকোচে বাহিরের দিকে মুখ-ফিরাইয়া "হায় ভগবান, কপালে এই ছিল" বলিয়া একটু দুরে গিয়া নতদৃষ্টিতে নিচে বসিয়া রহিল।

মুকুন্দ।- (মাঝে-মাঝে পুলিসটিকে দেখিতে দেখিতে গানে)

গান

নিচে বসে আছিস কে রে কাঁদিস কেন,
লজ্জাডোরে আপনাকে তুই বাঁধিস কেন?

(আগাইয়া গিয়া-ম্রিয়মান-পুলিসটিকে সস্নেহে হাতে ধরিয়া উঠাইল। ইতিমধ্যে অন্যদিক দিয়া চুপে-চুপে আড়াল হইতে বিশু সন্তর্পণে মুখ-বাড়াইয়াই)

বিশু। (স্বগত) বটে? তলে-তলে পাঁড়ের এই কাণ্ড চলছে? তবে তো এখুনি সাহেবকে সব জানাতে হয় গিয়ে। (বলিয়া চম্পট দিল)

মুকুন্দ। (পাঁড়েজীকে) গান

ধনী যে তুই দুঃখ-ধনে সেই কথাটি রাখিস মনে
ধুলার 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে,
বিনা-অস্ত্র বিনা-সহায় লড়তে হবে॥

সকলে। বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে—

(পঙক্তিটি গাহিতে গাহিতে ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে-দিতে স্বদেশীদল প্রস্থানোদ্যত হইল।)

(পাঁড়েজী এবার শংকার সহিত এদিক-ওদিক চাহিয়া লইয়া আস্তে একবার 'বন্দেমারম্' বলিয়া উঠিল ও জোড়হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রস্থানপর স্বদেশীদলের উদ্দেশে নমস্কার জানাইল। তখনই বিশুর সহিত হন্তদন্ত হইয়া সার্জেণ্ট প্রবেশ করিল)

বিশু। ঐ যে (বলিয়া অঙ্গুলির ইঙ্গিতে নমস্কার-রত 'পাঁড়েজী'-পুলিসটিকে দেখাইয়া দিলে সার্জেণ্ট সক্রোধে তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল)

সার্জেণ্ট। নির্বোধ, রাস্কেল! (বলিয়া ভৎসনা করিয়া গলাধাক্কা দিয়া) দূর হয়ে যাও (বলিয়া তাড়াইয়া দিবার ইঙ্গিত-সূচক আঙুল দিয়া বাহিরের দিকে পথ দেখাইল)

পাঁড়েজি। (সক্রোধে) দেখো সাহেব,—গাল দিয়ো না বলছি (বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পোশাক, ব্যাজ, লাঠি ইত্যাদি সার্জেণ্টের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া) চললুম। (বলিয়া সজোরে চলিয়া গেল)

বিশু। (বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া বলিয়া উঠিল) অ্যাঃ, লোকটা বলে কি-না "চললুম",—এত বড়ো স্পর্ধা! (সার্জেণ্ট ও বিশু সবিস্ময়ে পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে করিতে বিরক্তমুখে অপমানিত বিশুই আগাইয়া গিয়া পাঁড়েজীর পরিত্যক্ত পোশাক-আদি মাটি হইতে তুলিয়া লইল। চিন্তিতমুখে প্রস্থান করিবার সময় বিশুকে স্মরণ করাইয়া দিতে সার্জেণ্ট গুরুত্বপূর্ণ গম্ভীরস্বরে বিশুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল—)

সার্জেণ্ট। মনে রেখো—আগামী ৩০শে আশ্বিন—রাখীবন্ধন।

বিশু। (তাচ্ছিল্যপূর্ণ-স্বরে) রাখীবন্ধন?—উচ্ছব? (কব্জির উপর কব্জি রাখিয়া হাতকড়া-পরিবার ভঙ্গি দেখাইয়া 'হাঃ-হাঃ' করিয়া হাসিমস্করার সুরে বলিল) আগামী ৩০ শে আশ্বিন (ঠাট্টায়) রাখী-বন্ধন উচ্ছব?—না, হাতকড়া-পরার উচ্ছব? (স্বগত, এখন? বলি, কেমন ব্যাটা পাঁড়ে? এবার হাতে-হাতে ধরা পড়ে গিয়ে জব্দ হলি তো? এখন কর্ প্রাণ-ভ'রে তোর স্বদেশীয়ানা!

স্বদেশীদল। (মুকুন্দের পরিচালনায় সমবেতভাবে দৃঢ়কণ্ঠে বিশু ও সার্জেণ্টের প্রতি—)

গান

বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে।

(গাহিতে-গাহিতে দৃঢ়পদক্ষেপে মিছিলে প্রস্থান। কতকটা ভড়কানোর-ভাবে পুলিসদলও পরস্পরের দিকে চাহিতে-চাহিতে মিছিলের অনুসরণ করিল)

দৃশ্য ৯

(কলিকাতা। রাখীবন্ধন-উৎসব। রাজপথে জনতার মিছিল। হাতে-হাতে পতাকা। পতাকা ও বিজ্ঞপ্তি-পটে লেখা—'৩০শে আশ্বিন', 'রাখীবন্ধন' 'অবিভক্ত বাংলা'-ইত্যাদি; মাঝে-মাঝে সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি; একে-অন্যকে মালা পরাইয়া হাতে রাখী বাঁধিয়া দিয়া পরস্পর আলিঙ্গন ও নমস্কার বিনিময় করিতে-করিতে চলিতেছে। নৃত্যপর বালক-বালিকাদল। মিছিলের অগ্রভাগে পতাকা-হাতে কুমার ও বিনি।

স্বদেশীদল। (সমবেত-কণ্ঠে গান)

গান

বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট, বাংলার বন বাংলার মাঠ,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান॥
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান॥

(প্রস্থান)

(মিছিলের অনুসরণ-কারী 'স্বদেশী'-বিরোধী রমজান, কয়েকজন মুসলমান ও 'স্বদেশী'-প্রচারক মৌলবী লিয়াকতের মধ্যে কথাবার্তা)

জনৈক মুসলমান। (লিয়াকৎকে) পার্টিশনে আমাদের প্রধান-আশঙ্কার কারণ কী?

লিয়াকৎ। মুসলমান-অংশ ভাষা—সাহিত্য—শিক্ষার একত্বে হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ। যদি বাংলাকে হিন্দু-প্রধান ওমুসলমান-প্রধান—এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায়, তবে ক্রমে-ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল হয়।

রমজান। (বিজ্ঞের চালে খুব গম্ভীরভাবে ঠাট্টায়) আমাদের দেশে হবে মিলন? আর, সে-মিলন হবে হিন্দু-মুসলমানে?

লিয়াকৎ। মিলন ঘটা কঠিন। তবু আমাদের পক্ষে বড়ো আবশ্যক হচ্ছে আমাদের মধ্যে যাতে বিভাগ না ঘটে তারই ব্যবস্থা করা।

রমজান। (ঠাট্টার সহিত) কী বলছ? হিন্দু-মুসলমানে আবার কখনো এক হওয়া? এ কি সম্ভব?

লিয়াকৎ। তুমিই বা কী বলছ?—জেনো—যদি বিধাতার কৃপায় কোনোদিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হতে পারে, তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের এক হওয়াও বিচিত্র হবে না।

রমজান। (অবজ্ঞা ও বিক্ষোভে তুচ্ছার্থে ঠাট্টায়)! হুঃ মিলবে! কী-যে সব বলছ!

লিয়াকৎ। মিলবে, মিলবে। দেখো—হিন্দু-মুসলমানে ধর্মে নাও মিলতে পারে কিন্তু জনবন্ধনে মিলবে। (কণ্ঠে জোর দিয়া)—মিলবেই দেখো—মিলবে জন-বন্ধনে।

(বলিতে বলিতে রাখীর-গোছা-হাতে গীতরত কবির প্রবেশ)

কবি। আজ সবাই ছুটে আসুক জুটে যে যেখানে থাকে—
এবার যার খুশি সে বাঁধন কাটুক আমরা বাঁধব মাকে।
আমরা পরান দিয়ে আপন ক'রে বাঁধব তারে সত্য ডোরে,
সন্তানেরই বাহুপাশে বাঁধব লক্ষ পাকে॥
আজ ধনী গরীব সবাই সমান, আয়রে হিন্দু আয় মুসলমান,
আজকে সকল কাজ পড়ে থাক্ আয়রে সাথে-সাথে।
আজ দাওগো সবার দুয়ার খুলে, যাওগো সকল ভাবনা ভুলে
সকল ডাকের উপরে আজ মা আমাদের ডাকে॥

(কয়েকজন মুসলমান পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল—"আজ ধনী গরীব সবাই সমান, আয়রে হিন্দু আয় মুসলমান"-পংক্তিটি গাহিতে-গাহিতে কবি আগাইয়া গিয়া তাহাদের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিলেন ; মুসলমানেরা একটু হাসিয়া পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিল,—কবি গাহিতে লাগিলেন—মুসলমানদের মধ্য হইতে লিয়াকৎ কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে লাগিলেন—"আয়রে হিন্দু আয় মুসলমান" ; অন্য মুসমানরাও তখন সঙ্গে-সঙ্গে গাহিতে লাগিল। বিশ্ববান্ধবের প্রবেশ, লিয়াকৎকে মাল্যদান ও আলিঙ্গন)

লিয়াকৎ। (গলার মালা খুলিয়া লইয়া পুনরায় বিশ্ববান্ধবকে তাহা পরাইয়া দিয়া অভিভূত-ভাবে) আজ দুঃখ-বেদনার একান্ত পীড়নের মধ্যে আমাদের যাত্রা। —উদার-আনন্দে সমস্ত বিদ্রোহ-ভাব দূর হোক।

বিশ্ববান্ধব। বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য মন্দির নানা ধর্ম, নানা শাস্ত্র, নানাজাতির সম্মিলন চেষ্টা করছে সেই সাধনাতে—

লিয়াকৎ। সেই সাধনাতেই যোগদান করব, নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র এই রচনার কার্যেই প্রবৃত্ত করব।

(লিয়াকতের নেতৃত্বে সকলের গান)

গান

আমরা পথে-পথে যাব সারে-সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে-দ্বারে॥

বলব, জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ,
তোদের মা ডেকেছে ক'ব বারে-বারে॥

কবি। প্রত্যেক ক্ষুদ্র-মানুষটি বৃহৎ-মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা-আকারে উপলব্ধি করতে থাকবে।

লিয়াকৎ। এই উপলব্ধি তার প্রাণ, তার মনুষ্যত্ব, তার ধর্ম।

কবি। গান

হে ভারত, আজি তোমার সভায় শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হর্ষে এনেছি পূজার দান॥
এনেছি মোদের দেহের শকতি, এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ তোমারে করিতে দান॥

(আবৃত্তিরত ব্রতীন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রতীন্দ্র। দাও আমাদের অভয়-মন্ত্র দাওগো জীবন নব।
যে-জীবন ছিল তব তপোবনে, যে-জীবন ছিল তব রাজাসনে,

(উক্তিরত ক্ষুদিরামের প্রবেশ)

ক্ষুদিরাম। মুক্ত দীপ্ত সে-মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।

(উক্তিরত অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব॥

কবি। আমাদের রাখীবন্ধনের বীজ বিরোধের মধ্য থেকে তাকে ভেদ করেই ছায়াময় বনস্পতি হয়ে উঠবে। পূর্ব-পশ্চিম রাজা-প্রজা সকলকেই ভারতবর্ষ সকল-প্রকার বিরুদ্ধতার ভিতরেও একক্ষেত্রে আকর্ষণ করবার জন্য চিরদিন চেষ্টা করেছে—রাখীবন্ধনের গণ্ডীর দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল আমাদের মনের মতো জাতিকেই গড়ব এবং অন্যকে বর্জন করব—তা চলবে না।

(এইস্থলে দলের-সঙ্গে-চলমান চৌধুরী সহসা উৎসাহোজ্জ্বল-মুখে সাগ্রহে কবিকে বলিয়া উঠিল)

চৌধুরী। অন্যকে বর্জন চলবে না?

কবি। না, চলবে না। যারা আমাদের আঘাত করতেও এসেছে তাদের আমরা আত্মসাৎ করব, আমাদের উপর এই আদেশ আছে।

ক্ষুদিরাম। (বিস্ময়ে) আত্মসাৎ করব?—যারা অমাদের আঘাত করতে এসেছে,—তাদেরও?

ব্রতীন্দ্র। করব বই কি। আত্মসাৎ করব তাদেরও—যারা আমাদের আঘাত করতে এসেছে—এই যে আদেশ!

অরুণ। এখনকার কালে একথা বললে কারো কাছে উপাদেয় ব'লে মনে হবে না।

ক্ষুদিরাম। অনেকে মনে করবেন,—এ একটা কাপুরুষতার লক্ষণ।

কবি। কিন্তু তবু এই সত্য কথাটি বলা চাই। আমরা কষ্ট পেয়ে, দুঃখ পেয়ে আঘাত পেয়ে সর্বস্ব হারিয়ে সকলকে বাঁধব, সকলকে নিয়ে এক হব—আর একের মধ্যে সকলকেই উপলব্ধি করব।

বিশ্ববান্ধব। বঙ্গ-বিভাগের বিরোধ-ক্ষেত্রে এই যে রাখীবন্ধনের দিনের অভ্যুদয় হয়েছে—

(উক্তিরত আনন্দমোহনের প্রবেশ)

আনন্দমোহন।—এর অখণ্ড আলোক এখন এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম ক'রে—সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাত-রূপে পরিণত হোক।

বিশ্ববান্ধব। তা-হলেই এই দিনটি ভারতের বড়ো দিন হবে।

লিয়াকৎ। তা-হলেই এই দিনে বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদেরও মিলন হবে।

কবি। এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে।

(সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ১০

(কলিকাতা। স্বদেশ-সেবাসমিতির প্রাঙ্গণ। কর্মী-সমাবেশ)

ক্ষুদিরাম। মারাত্মক ব্যাপার!

বিশ্ববান্ধব। (বিস্ময়ে) মারাত্মক ব্যাপার? সে কী?—কী বলছ?

ক্ষুদিরাম। বলছি ঠিকই। শীঘ্রই একটা দুর্দৈব ঘটবে।

(উক্তিরত কবির প্রবেশ)

কবি। তাঁরা বাংলার প্রাথমিক-শিক্ষাকে চারখানা করবার সংকল্প করেছেন। পাঠ্যপুস্তকে বাংলার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বিভাগ অনুসারে চার-রকমের গ্রাম্য-উপভাষা চালাবার প্রস্তাব হচ্ছে,—দেশটাকে বিচ্ছিন্ন করাটাই তাঁদের লক্ষ্য।

ব্রতীন্দ্র। তা-ছাড়া, য়ুনিভার্সিটি-বিল ?

ক্ষুদিরাম। য়ুনিভার্সিটি-বিল ?—সে-যে য়ুনিভার্সিটির মৃত্যুবাণ।

(উক্তিরত মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ। য়ুনিভার্সিটি-বিলে এদেশের উচ্চশিক্ষার মূলোচ্ছেদ করা হবে। আমাদের য়ুনিভার্সিটি গোড়াতেই বিদেশের নকল। আমাদের দেশে বিদ্যাকে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য করা কি সংগত ? দেশে বিচার দুর্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্মূল্য হয়, তবে—

কবি। তবে, ধনী দরিদ্রের মধ্যে ঘটবে নিদারুণ বিচ্ছেদ !

ক্ষুদিরাম। ফলে হবে—

কবি। দেশ বিচ্ছিন্ন।

ক্ষুদিরাম। তারপর, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের প্রতি কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি—

(অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। সম্প্রতি এক অপমানকর সার্কুলার জারি করলেন।

ক্ষুদিরাম। —ফলে, ছাত্রমণ্ডলী হল উত্তেজিত !

কবি। অপেক্ষা করলে চলবে না। নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার এখন নিজেদেরই গ্রহণ করতে হবে। অবিলম্বে দেশবাসী সকলে প্রস্তুত হও।

বিশ্ববান্ধব। সে তো বটেই। এখন বিশেষ প্রয়োজন—শিক্ষা এবং ঐক্য। —এই দুটাই জাতি-মাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চরম সম্বল।

(আনন্দমোহনের প্রবেশ)

আনন্দমোহন। এই দুটোর উপরেই যে আজ ঘা পড়েছে।

ক্ষুদিরাম। কিন্তু আমরা ? আমরা কী করলাম ?

অরুণ। (বিক্ষোভে ব্যঙ্গস্বরে) জানতে চাও ?—আমরা কী করলাম ?

ক্ষুদিরাম। (ব্যঙ্গহাস্যে) জানি,—করলাম আন্দোলন ! করলাম,—সভা-সমিতি !

অরুণ। আর কীই-বা করতে পারি !

("য়ুনিভার্সিটি-বিল আন্দোলন"-উক্তিরত ছাত্রদলের
"বঙ্গ-বিভাগ ও শিক্ষাবিধি"-লেখা পতাকা-হাতে প্রবেশ)

ছাত্রদল। আমরা বর্তমান-য়ুনিভার্সিটিকে বয়কট করব ! আমাদের জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। (ধ্বনি)—চাই এখন জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়।

কবি। আমি আরো আগে থেকেই এতদিন যাবৎ বলে এসেছি—চাই এখন আমাদের জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়।

সকলে। চাই আমরা জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়।

অরুণ। আন্দোলন, সভা, বিশ্ববিদ্যালয়—সবই তো হল বুঝলাম, কিন্তু—আচার্য? বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য কোথায়?

কবি। ওহে, তাও ঠিক আছে—ঐ যে আসছেন! (শিক্ষাচার্য-অরবিন্দের প্রবেশ)

সকলে। (আচার্য-অরবিন্দকে দেখিয়া বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পরস্পর-বলাবলি) অরবিন্দ!—তাইতো! ঐ যে—সত্যই তো-আচার্য-অরবিন্দ!

আনন্দমোহন। (শিক্ষাচার্যকে দেখাইয়া সোৎসাহে) এই যে আমাদের শ্রদ্ধেয় আচার্য এসেছেন।

কবি। (শিক্ষাচার্যকে সানন্দে সহাস্যে স্বাগত জানাইয়া) জয় তব জয়। আচার্য, তোমার আসন পাতবার জন্য প্রস্তুত হও।

ছাত্রদল। (ধ্বনি) জয় গুরুজীর জয়। জয় আচার্য অরবিন্দ,—জয় আচার্য অরবিন্দ।

কবি। (শিক্ষাচার্যকে) হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি তুমি। ভারতের বীণাপাণি, হে কবি, তোমার মুখে রাখি' দৃষ্টি তাঁর, তারে-তারে দিয়েছেন বিপুল ঝংকার। নাহি তাহে দুঃখ-তান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ, নাহি দৈন্য নাহি ত্রাস। আজ তোমাকেই আমরা আমাদের জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য-পদে বরণ করছি।

শিক্ষাচার্য। (কবি, বিশ্ববান্ধব ও আনন্দমোহন-প্রভৃতিকে নমস্কারান্তে) ভ্রাতৃগণ, শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করতে হবে। হে কবি, জাতীয়-বিদ্যালয় এতদিন কেবল তোমার লেখায় তোমার ধ্যানের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। জাতীয়-শিক্ষার দিকে দেশকে প্রথমথেকে তুমিই ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করে এসেছ। তোমার চেষ্টাতেই তাই সেই দুর্লভ ধ্যানের-সামগ্রী আজ আমাদের সম্মুখে বাস্তবে প্রকাশমান। তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো। আজ যে-সকল ছাত্র গবর্ণমেণ্ট-কৃত অপমানে জাতীয়-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে উদ্যত, তাদিকে আদর্শ হয়ে ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের জন্য পথ প্রস্তুত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমরা কোনো শ্রেয়-পদার্থকেই পরের কৃপার দ্বারা পাই না, নিজের শক্তির দ্বারাই তা অর্জন করে থাকি।

ধ্বনি। ('বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়া নিবেদিতা ও বিনির পরিচালনায় একদল মেয়ের প্রবেশ)

নিবেদিতা। আহ্বান,—আহ্বান উঠেছে—সমস্ত দেশের মধ্যে নিজের শক্তিকে অবলম্বন করবার জন্য একটা মর্মভেদী আহ্বান উঠেছে।

বিনি। দেশের অপমান—সে যে আমাদেরই অপমান।

মেয়েরা। আজ আমরা ক্লেশকে উপহাসকে অগ্রাহ্য করব।

শিক্ষাচার্য। (নিবেদিতাকে) জননী, এইবার বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ। প্রস্তুত থাকো। এক-জায়গায় এক-হবার চেষ্টা আরম্ভ করতে হবে। আমরা হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক-পুরুষ, শহরবাসী পল্লীবাসী, পূর্ব পশ্চিম—সকলে পরস্পরের দৃঢ়বন্ধন প্রতিক্ষণে অনুভব করতে থাকব।

(ছেলে-মেয়েদের সমবেত-সংগীত ও ছোরা-তরোয়াল ও লাঠিসহ নৃত্য)

গান

ছাত্রছাত্রীদল। এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি-মন।
এক-কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন॥ বন্দেমাতরম্। (সকলে)
আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়। বন্দেমাতরম্।

চৌধুরী। (শঙ্কিত-চাপাকণ্ঠে "পুলিস, পুলিস" বলিয়া হঠাৎ উচ্চকিত হইয়া প্রবেশ এবং এই সময়েই সার্জেণ্টের হুইসিলের ইঙ্গিত-মাত্র একদল পুলিস প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া "বাঁধো বাঁধো" বলিতে-বলিতে সোজা গিয়া নৃত্যরতদের ধরিয়া একে-একে বাঁধিতে লাগিল। তখন নিবেদিতার সঙ্গে বন্দীরা আরো-জোরে গাহিতে লাগিল)

স্বদেশীদল। (নিবেদিতার নেত্রীত্বে সোৎসাহে সকলের গান)

গান

আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।

(গাহিতে-গাহিতে বাধা দিবার জন্য মুষ্টিবদ্ধ-হাত বাড়াইয়া অরুণ সার্জেণ্টের দিকে আগাইয়া যাইতেই সার্জেণ্টের পদাঘাতে সে ধুলায় লুটাইয়া পড়িল। ধুলা হইতে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াই গাহিতে লাগিল—)

গান

অরুণ। টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন॥ বন্দেমাতরম্।

স্বদেশীদল। (এইবার শিক্ষাচার্য আগাইলে, নিবেদিতার নেত্রীত্বে, বাঁধিবার জন্ম সার্জেণ্টের দিকে সকলে হাত বাড়াইয়া দিয়া, উত্তেজিত-কণ্ঠে গাহিতে লাগিল। কাহাকে বাঁধিবে-না-বাঁধিবে ভাবিয়া পুলিস-দলের মধ্যে ব্যতিব্যস্ততা। সরোষে সার্জেণ্ট পার্শ্ববর্তী নরমপন্থী-চৌধুরীর দিকে আগাইয়া যাইতেছিল, চৌধুরী বলিয়া উঠিল—)

চৌধুরী। (হাত নাড়িয়া বিরক্তিতে) দল!—দল!—এ কেবল দলের কীর্তি। আমি তো বলি—এ-সব হাঙ্গামা করা ভালো না। কে শোনে।—আমি তো জানতাম,—এমনি-কিছু-একটা ঘটবে। শেষপর্যন্ত তাই হল দেখছি।—

(শিক্ষাচার্য-অরবিন্দ বন্দী হইয়া যাইতে-যাইতে)

শিক্ষাচার্য। সকল মহৎকর্মে দুঃখ কিছু নয়
ক্ষত মিথ্যা ক্ষতি মিথ্যা মিথ্যা সর্বভয়।
কোথা মিথ্যা রাজা কোথা রাজদণ্ড তার
কোথা মৃত্যু অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু ওরে মূঢ়
তোলো তোলো শির,
আমি আছি তুমি আছ—
সত্য আছে স্থির।

জনতা। (আবৃত্তিরত-অবস্থাতেই শিক্ষাচার্য-সহ বন্দীদের লইয়া পুলিসেরা চলিয়া গেল। পিছনে-পিছনে উত্তেজিত জনতা চলিল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে-দিতে। এদিকে ব্যথিত-উদ্বিগ্ন-মুখে আনন্দমোহন, ব্রতীন্দ্র, অরুণ, ছাত্র-ছাত্রীদল—ইহারাও সঙ্গে গেলেন। চৌধুরী বিমর্ষ-ভাবে দাঁড়াইয়া সব দেখিতে লাগিলেন। একটু পরে তিনিও চলিয়া গেলেন)

নিবেদিতা। (ভাবনায়) কী জানি কী হবে!

কবি। যা হবার তাই হবে। ভাবতে হবে না, ভাবনার লোক উপরে আছেন। চলো, বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। (উভয়ের প্রস্থান)

(ক্ষুদিরাম এতক্ষণ দৃঢ়মুষ্টিতে দণ্ডায়মান থাকিয়া একান্তে সব দেখিতেছিল, এবারে স্বগত বলিয়া উঠিল—)

ক্ষুদিরাম। ঠিক, ঠিক, রুদ্রমূর্তি বিধাতা! কিন্তু তাও ঠিক জেনো, বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ! (প্রস্থান)

দৃশ্য ১১

(কলিকাতা। মধ্যাহ্ন। রাজপথ। হকারের প্রবেশ)

হকার-১। (হকার হাঁকিতেছে—"অরবিন্দ ঘোষের বন্দেমাতরম-মামলা"। হাতে তাহার এক বাণ্ডিল 'বন্দেমাতরম'-কাগজ। সকলে সে-কাগজ কিনিয়া একাগ্র মনে পড়িতেছে, আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতেছে—)

১ম ব্যক্তি। খুব ভালো কাগজ হয়েছে। কিন্তু, অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও-কাগজের কী-দশা হবে জানি না।

(হকারের কাছ হইতে কাগজ কেনা ও পাঠ)

২য় ব্যক্তি। বোধ হয় সে জেল থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

৩য় ব্যক্তি। কিন্তু আমাদের দেশে জেল-খাটাই যেন আজ মনুষ্যত্বের পরিচয় হয়ে উঠেছে।—কী বলো!

৪র্থ ব্যক্তি। জেলখানার ভয় না ঘোচাতে পারলে আমাদের কাপুরুষতা দূর হবে না।

৫ম ব্যক্তি। দু'চার জন-ক'রে জেলে যেতে-যেতে ওটা অভ্যাস হয়ে যাবে।

হকার-২। (অন্যদিক দিয়া আরেকজন হকার কতকগুলি দৈনিক ও মাসিক-পত্রিকা বগলে করিয়া 'বঙ্গদর্শন' 'বঙ্গদর্শন' হাঁকিতে-হাঁকিতে প্রবেশ করিল। সেই হকারকে ছাঁকিয়া ধরিয়া সকলে একে-একে পত্রিকা কিনিতে লাগিল। পত্রিকা ফুরাইয়া যাওয়াতে হকার চলিয়া গেল। এক-একজন ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্যের-হাতের পত্রিকা দেখিতে ব্যগ্র। কবি, বিশ্ববান্ধব, আনন্দমোহন ও ক্ষুদিরাম প্রভৃতি স্বদেশীদলের লোকদের পত্রিকা-হাতে প্রবেশ। পত্রিকা মেলিয়া ধরিয়া জোরে-জোরে কবি পড়িয়া যাইতে লাগিলেন—)

কবি। (পাঠ) নমস্কার,

অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্তি তুমি। তোমা লাগি' নহে মান
নহে ধন, নহে সুখ, কোনো ক্ষুদ্র দান,—
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা, ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি।

বিধাতার শ্রেষ্ঠদান আপনার পূর্ণ-অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ-আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত-ভাষায়
অখণ্ড-বিশ্বাসে।

সকলে। (সমস্বরে) জয় তব জয়!

ক্ষুদিরাম। (পাঠ) কে আজ ফেলিবে অশ্রু কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা? কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল?
মোছ্ রে দুর্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল।

বিশ্ববান্ধব। (পাঠ) বন্ধন-পীড়ন-দুঃখ-অসম্মান-মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,—
মহাতীর্থ-যাত্রার সংগীত।

কবি। (পত্রিকা পড়িতে-পড়িতে)
এ উদাত্ত সংগীতের তরঙ্গ-মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার॥

(কবির সহিত সকলের নেপথ্যের দিকে অভিবাদন)

(রহস্যভরা-হাসিমুখে উক্তিরত চৌধুরীর প্রবেশ)

চৌধুরী। (বক্রদৃষ্টিতে) কী-সব কথা!—মহাতীর্থযাত্রা! সোজা-কথায় তো জেলে-যাওয়া!—আজ তা হল কিনা মহাতীর্থযাত্রা! কিন্তু, একদিন—

ক্ষুদিরাম। সেদিন কী ছিল?

চৌধুরী। সেদিন ইংরেজি-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ একটি-মাত্র বন্দরকেই আপনার গম্যস্থান স্থির করেছিলেন।

ক্ষুদিরাম। (ব্যঙ্গস্বরে) বন্দরটির নাম?

চৌধুরী। সে-বন্দরের নাম? নাম ছিল রাজ-প্রসাদ! ওহে, প্রাসাদ নয়—প্রসাদ, অর্থাৎ কিনা—রাজার অনুগ্রহ! সেদিন বিদেশী-রাজার অনুগ্রহটুকুই ছিল সেই মহাতীর্থ! —তাদের জীবনের সম্বল।—এখন বুঝলে তো?

আনন্দমোহন। (কবিকে) এবার আর বাঁধা-বন্দরে বন্দনা-গীত গাওয়া নয়।

এবার পাহাড়, ঝড়,—এসব ডিঙিয়ে নিয়ে আমাদিকে পার করতে হবে—তোমার উপরেই সকলের ভরসা !

চৌধুরী। কেন, বিদেশী-ও তো আমাদের জন্য অনেক-কিছু করছে।

ক্ষুদিরাম। এবার স্বদেশীরা কী করতে পারে সেটাই চোখ মেলে দেখো।

আনন্দমোহন। দেখাবার সময় সামনেই আসছে !

ক্ষুদিরাম। (নিদারুণ অস্থিরতায় আবৃত্তি –)

কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড-খণ্ড করি'
দণ্ডে-দণ্ডে ক্ষয়।
শ্যেন-সম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি ক'রে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে॥

চৌধুরী। (উদ্বেগে ক্ষুদিরামের নিকট গিয়া সস্নেহে পিঠে হাত রাখিয়া) কী বলছ—"মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি" ? বলি,—ভয় নাই ?

কবি। (হাত উঠাইয়া ক্ষুদিরামকে আশীর্বাদে) সম্মুখে বৃহৎ সংগ্রাম, সম্মুখে মহান মৃত্যু ! এই সংকটে—মাভৈঃ, মাভৈঃ।

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—
'ভয় নাই ওরে ভয় নাই',
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই॥ (প্রস্থান)

ক্ষুদিরাম। (প্রার্থনার ভঙ্গীতে ঊর্ধ্বে চাহিয়া)

হে রুদ্র, তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী—
মরণ-নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে হৃদয়-ডমরু বাজাব
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে তোমার অর্ঘ্য সাজাব।

(সকলে প্রস্থানোন্মুখ)

সার্জেণ্ট। (এই-সময়ে একদল পুলিস লইয়া সার্জেণ্ট "লেফট্-রাইট্ লেফট্-রাইট্" বলিতে বলিতে গট্‌গট্ করিয়া প্রবেশ করিল ও কেহ কিছু না বুঝিয়া-

উঠিতেই প্রত্যেকের হাত হইতে 'বঙ্গদর্শন' ও 'বন্দেমাতরম্'-পত্রিকা কাড়িয়া লইতে লাগিল)

ক্ষুদিরাম। (হাতের পত্রিকা কাড়িতে আসিলে ক্ষুদিরাম ক্রূরহাস্তে হাল্কাসুরে হাতের পত্রিকা দেখাইয়া সার্জেণ্টকে) যা চেয়েছ তার কিছু-বেশী দিব,—(সামনে মাথা পাতিয়া দিয়া)—বেণীর সঙ্গে মাথা।

সার্জেণ্ট। (ক্ষুদিরামকে ধমকাইয়া) পরিহাস ? (বলিয়াই থাবা দিয়া চকিতে অসতর্কে ক্ষুদিরামের হাতের পত্রিকাখানা ছিনাইয়া লইয়া সগর্বে 'হাঃ-হাঃ' করিয়া সশব্দে পাল্টা-পরিহাসের ক্রূর-হাসি হাসিতে লাগিল। ক্ষুব্ধ ক্ষুদিরাম অপ্রস্তুত হইয়া চাহিয়া রহিল। এই-সময়েই একদল ছাত্রসহ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়া কুমারের প্রবেশ। হাতে-হাতে তাহাদের-ও 'বন্দেমাতরম্' ও 'বঙ্গদর্শন'-পত্রিকা, আর তাহারা তাহা পড়িতে ব্যস্ত। ক্ষুদিরামের চোখ-মুখের অবস্থা দেখিয়া কুমার নিজের পত্রিকাখানি ক্ষুদিরামকে দিতে তাহার কাছে আগাইয়া যাইতেই "সাবধান।" বলিয়া সার্জেণ্টের হুম্‌কি। তাহার অঙ্গুলির নির্দেশমতো পুলিসেরা ছাত্রদের হাতের পত্রিকা-গুলিও ছিনাইয়া নিতে গেল। পাল্টা 'সাবধান !' বলিয়া শাসাইয়া ঘুঁষি বাগাইয়া ছাত্রেরা রুখিয়া দাঁড়াইলে অগোণে হিংস্র-দৃশ্য-সৃষ্টির-শঙ্কা-উদ্বিগ্ন আনন্দমোহন ও বিশ্ববান্ধব উদ্বেগের সুরে দ্রুত দুই হাত তুলিয়া "সাবধান ! মনে রেখো—যে সয় তারি জয়।"—বলিয়া আগাইয়া ছাত্রদের নিরস্ত করিল। মর্মাহত-ছাত্রদল 'আঃ' বলিয়া খুবই বিক্ষুব্ধ হইল, তৎসত্ত্বেও নেতাদের কথা নিতান্ত অনিচ্ছায় বিকৃত-মুখভাবে তাহারা মান্য করিয়া "আচ্ছা !" বলিয়া পত্রিকাগুলি পুলিসদের ছাড়িয়া দিল। সার্জেণ্ট সংগৃহীত পত্রিকাগুলি বগলে পুরিয়া "চলা যাও" বলিয়া পুলিসদলকে এইবার চলিয়া-যাইবার ইশারা করিল। তাহাদের চলিয়া-যাইবার মুখে কুমার সার্জেণ্টকে তাহার বগলস্থিত পত্রিকাগুলি অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—)

কুমার। পত্রিকা নিন্, তবে জানবেন এর সঙ্গে চিরস্থায়ী শত্রুতাও আপনি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন—শান্তি থাকবে না—ব'লে দিচ্ছি কোথাও আর শান্তি থাকবে না !

ছাত্রদল। (সমস্বরে সরোষে) থাকবে না, থাকবে না, শান্তি থাকবে না।

সার্জেণ্ট। (সশব্দ ব্যঙ্গ-হাসিতে ক্রূরদৃষ্টিতে সকলের প্রতি একবার চোখ ফিরাইয়া) এই কথা !—আমরাও শান্তি চাইনে ! (পুলিসদলের প্রস্থান)

(কুমার, ছাত্রদল, ক্ষুদিরাম—সকলে নিরুদ্ধ-আক্রোশে পুলিসদলের দিকে চাহিয়া ফুঁসিতে লাগিল)

ক্ষুদিরাম। ভ্রাতৃগণ, মনে রেখো—কবি যা বলেছেন—সম্মুখে বৃহৎ সংগ্রাম, সম্মুখে মহান মৃত্যু—

ছাত্রদল। বন্দেমাতরম্‌, বন্দেমাতরম্‌।

(সকলের প্রস্থান)

(ইতস্তত খুঁজিতে-খুঁজিতে অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। তাই-তো, কুমারটা আবার কোথায় গেল! গাঁয়ের থেকে সদ্য শহরে এসেছে। ছেলেটাকে একটু সাবধান করে দিতে হত!—কারো পাল্লায় আবার না পড়ে!

(অরুণের চিন্তিতভাবে চলা। পশ্চাৎ-দিক হইতে হন্তদন্ত হইয়া গুপ্তচর-বিশুর প্রবেশ ও অরুণকে দেখিয়া শ্রুতিগোচরভাবে স্বগতোক্তি)

বিশু। এঁর কাছে কামনা সিদ্ধি হবে না তো আর কার কাছে হবে? মশায়, শুনছেন? (অরুণের কাছে-আসা)

অরুণ। (প্রথমে স্বগত) যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। দেখাই যাক্‌-না, কী বলে! (সন্দেহে বিশুকে) মহাশয়ের কী-অভিপ্রায়ে আগমন?

বিশু। কী বিনয়!—চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হল।

অরুণ। (স্বগত) এখন আসল কথাটা যে পাড়লে হয়। (বিশুকে) তা, মহাশয়ের কী আবশ্যক?

বিশু। মহাশয় অতি মহানুভব। মহাশয়ের মতো মহানুভব ব্যক্তি, যারা ভারত-ভূমির—(দৃষ্টিকোণে এদিক-ওদিক দেখিয়া-নেওয়া)

অরুণ। মানছি মশায়,—তারপরে—

বিশু। বিনয়ী লোকের স্বভাবই এই যে, নিজের গুণানুবাদ—

অরুণ। গু-ণা-নু-বা-দ। রক্ষে করুন মশায়, রক্ষে করুন। অনুবাদ ছেড়ে আসল কথাটা বলুন তো!

বিশু। আসল কথা কী জানেন?—দিনে-দিনে আমাদের দেশ অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে। (প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা)

অরুণ। অ-ধো-গ-তি! সে কেবলমাত্র কথা সংক্ষেপ করতে না-জানার দরুন।

বিশু। আমাদের স্বর্ণশস্যশালিনী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দারিদ্র্যের অন্ধকূপে—

অরুণ। বলুন, বলুন—ব'লে যান।—

বিশু। দারিদ্র্যের অন্ধকূপে দিনে-দিনে নিমজ্জমানা—

অরুণ। (কৃত্রিম-কাতরস্বরে স্বগত) নি-ম-জ্জ-মা-না !—বাপরে !—(প্রকাশ্যে) —মশায়, বুঝতে পারছি-নে।

বিশু। তবে আপনাকে প্রকৃত ব্যাপারটা বলি—

অরুণ। (কৃত্রিম-আগ্রহে) সেই ভালো। সেই ভালো।

বিশু। (চাপা-কণ্ঠে স্বগত) ইংরেজরা লুঠ করছে।

অরুণ। এ তো বেশ কথা। প্রমাণ সংগ্রহ করুন, ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নালিশ রুজু করি।

বিশু। ম্যাজিষ্ট্রেটও লুঠছে।

অরুণ। তবে ডিষ্ট্রিক্ট-জজের আদালতে -

বিশু। ডিষ্ট্রিক্ট-জজ তো ডাকাত—

অরুণ। (চোখ ছোট করিয়া) কী বললেন ?—কিছু বুঝতে পারছি-নে।

বিশু। আমি বলছি, দেশের টাকা বিদেশে চালান যাচ্ছে।

অরুণ। দুঃখের বিষয়।

বিশু। তাই একটা সভা।—স্বদেশের সদনুষ্ঠানে আপনার সদনুরাগ—

অরুণ। (বিরক্তিতে স্বগত) লোকটা কোথা থেকে এসে জুটল !

বিশু। (কণ্ঠস্বর একটু বাড়াইয়া দিয়া) দেশের টাকা বিদেশে চালান যাচ্ছে। বিলাতী লবণ, বিলাতী কাপড়,—বিলাতী-দ্রব্য ব্যবহার—দেশের চরম অহিত। আগে এসব বুঝতুম না।—এখন থেকে আমরা ম্যানচেষ্টারের রুটি বন্ধ করব, দেশকে বিলাতী কাপড় ছাড়াব। লিভারপুলের দুইচক্ষু জলে—

অরুণ। জলে ভরিয়ে দেব !—ভালো ! ভালো !

বিশু। আমাদের পাড়ার ছেলেরা মিলে একটা সভা করেছি। (সতেজে) আজ যে নিতেও হবে দিতেও হবে ! (সন্তর্পণে এদিক-ওদিক চাহিয়া লইয়া বলিল, —"নিতেও হবে"। বলিয়া হাতে-মাথা-কাটার ভঙ্গি-প্রদর্শন করিয়া) বুঝছেন তো, ইংরেজকে জব্দ করতে চাই।—দেশী-কাপড়-চালানো ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা লড়াই। বিলাতী-ব্যবহার ?—ছিঃ ছিঃ ! ওসব-যে মাতৃবিদ্রোহ—মাতৃবিদ্রোহ ! ব্যবহার নয়, চাই আজ বর্জন ! চাই বিলাতী-বর্জন,—বয়কট !—বয়কট ! বিলাতী-বয়কট চাই।

অরুণ। (কৃত্রিম আগ্রহে, যেন খুব সন্তর্পণে, বিশুকে গম্ভীরভাবে) কিন্তু আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে তো বয়কট সম্পূর্ণ হবে না ! অতএব দেশী-কাপড় পরতে হবে।

বিশু। ঠিক্ ঠিক্! (কৃত্রিম-উৎসাহে দৃঢ়কণ্ঠে) দিশি-কাপড়? জানি জানি— বলছেন, দিশি কাপড় পরতে হবে। —এই তো?

অরুণ। (হঠাৎ বিশুর ধুতির কোঁচা তুলিয়া ধরিয়া বিশুকে দেখাইয়া রসিকতার সুরে) বলি মশায়, এটা কি দিশী-কাপড়? কোন্ স্বদেশী-মিলের? (কঠিন-স্বরে) এই ক'রে স্বদেশী? (ক্রুরহাস্যে) মুখে বিলাতী-বয়কটের বুলি! —আর, এদিকে খাস্-বিলাতী কাপড়-পরা?

বিশু। (অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়া ভয়ে-বিহ্বলতায় কথা ঘুলাইয়া ফেলিয়া) মশায়, পাড়ার ছেলেরা, ঐ যত ছেলে-ছোকরারা মিলে একটা (স্বগত) "দুর ছাই—এখন পালাই কোথা দিয়ে!" বলিয়া পলায়নের পথ-খোঁজা আর সেই-মুহূর্তেই হঠাৎ বুদ্ধি-খেলিয়া-যাওয়ার-ভাবে পকেট হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া চাপাকণ্ঠে অরুণকে বলা—) ওসব কাপড়-টাপড় কী বলছেন!—পিস্তল, গুপ্তহত্যা, লড়াই,—যে-ভাবে হোক, ইংরেজকে আজ জব্দ করতেই হবে! এ-সবকি আগে বুঝতুম? এবার থেকে—

অরুণ। (সাগ্রহে গুরুত্বব্যঞ্জক চাপাকণ্ঠে) ইংরেজকে জব্দ করতে হবে—কথাটা তবে এতদিনে বুঝেছেন? ওসব সভাসমিতিতে কী হবে, লড়াই, চাই লড়াই! বোমা! পিস্তল! (পিঠ চাপড়াইয়া খুব উৎসাহ দেখাইয়া) ঠিক ঠিক, আপনি ঠিক বুঝেছিলেন! তাই তো,—দেখি-দেখি! জিনিসটা দেখি,—খাঁটি না মেকী। (বলিয়া সন্তর্পণে এদিক-ওদিক দেখিয়া লইয়া হাত বাড়াইয়া দিল। বিশু-ও তখন এদিক-ওদিক চাহিয়া পিস্তলটি অরুণের হাতে দিয়াই "পুলিস, পুলিস" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পূর্ব-আশঙ্কিত সংকট এড়াইবার জন্য অরুণ বিশুর দিকে একটু চোখ তুলিয়া ব্যঙ্গস্বরে "ইংরেজকে জব্দ করবে! বলি দাদা, তার আগেই যে নিজে কেমন জব্দ হলে?" বলিয়া সহাস্যে নিজের পকেটে টুক্ করিয়া পিস্তলটি পুরিয়া ফেলিয়াই সরিয়া পড়িল। বিশু হতভম্ব হইয়া "কী হল! লোকটা সট্‌কে পড়ল?" বলিয়া অরুণের প্রস্থান-পথের দিকে তাকাইয়া রহিল। মন্থর-গতিতে হেলিতে-দুলিতে খৈনি-টেপা-অবস্থায় পুলিসের প্রবেশ ও উক্তি—)

পুলিস। কী হে? চোর-বেটা পালালো নাকি? গেল কোথায়? আসলে,—ভয় হয়েছে, বেটা বিষম ভয় খেয়েছে। যাক্, এসময় এক ছিলিম তামাকু যদি হোত—

বিশু। (পুলিসকে) পালিয়েছে, বেটা পালিয়েছে! কিন্তু ধরা চাই!—ওদের সন্ধান যে দেবে, সরকার তাকে মোটা পুরস্কার—বুঝেছ? চলো, চলো—(কানে-কানে সলাপরামর্শ করিতে-করিতে প্রস্থান)

দৃশ্য ১২

গুপ্তগৃহ

(বনের মধ্যে পোড়োবাড়ি। দ্বার বন্ধ, ঘর অন্ধকার, মড়ার-মাথার খুলির উপর জ্বলন্ত শলিতা, মেঝেতে লাল-শালু-মোড়া বেদগ্রন্থ, খোলা তলোয়ার। ব্রতীন্দ্র ও কুমারের মধ্যে চুপি-চুপি আলাপ চলিতেছে)

কুমার। (অধীরভাবে) কী অস্ত্র?—কেবল বক্তৃতা, আর আবেদন? কী ধর্ম? কেবল ছদ্মবেশ? এমনি ক'রে কতদিন কাজ চলবে? কতটুকুই বা ফল হবে?

ব্রতীন্দ্র। ফল? ফলের কথা এখনই বলছ?

(উক্তিরত ক্ষুদিরামের প্রবেশ)

ক্ষুদিরাম। (ব্রতীন্দ্র ও কুমারকে চাপাকণ্ঠে) চুপ। (বাহিরের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া) বাইরে থেকে যে শুনতে পাবে! (কুমারের পাশে আসিয়া উপবেশন)

(উক্তিরত মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ। (স্মিতহাস্যে) গুপ্ত-বিপ্লবের অদ্ভুত আয়োজন! (কুমারকে দেখাইয়া ব্রতীন্দ্রকে প্রশ্ন) এ কে? (সোজাসুজি কুমারকেই জিজ্ঞাসা) তুমি কে? বাড়ি কোথায়?

কুমার। বলব না।

মুকুন্দ। কী চাও।

কুমার। দেশের কাজ।

ক্ষুদিরাম। (জনান্তিকে মুকুন্দকে) ছেলেটিকে যদি কোনোমতে ক'দিন কাছে রাখতে পারি!—কোনোমতে—! (কুমারকে) এই আসনে বসো। (আসন প্রদান)

কুমার। কেন?

ক্ষুদিরাম। পূজা হবে।

কুমার। কেন?

ক্ষুদিরাম। (দৃঢ়কণ্ঠে) এইরূপই নিয়ম।

(কুমার আসনে বসিল। ক্ষুদিরাম তাহার কপালে চন্দন দিল। সিন্দুরের টিপ দিয়া দিল, গলায় মালা দিল, সম্মুখে বসিয়া চাপাকণ্ঠে বলিল—"বন্দেমাতরম্"। সকলে চাপাকণ্ঠে সমধ্বনি করিল। তারপরে ব্রতীন্দ্রের প্রদর্শিত-মতে তলোয়ার লইয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা নিজের বুকের রক্ত নিতে যাইতেই—)

কুমার। (চম্‌কাইয়া দ্বিধায়) রক্ত! বুকের রক্ত! কেন?

ক্ষুদিরাম। (দৃঢ়কণ্ঠে) নিয়ম। মুখের কথায় নয়, চাই বুকের রক্তে লেখা প্রতিজ্ঞা—"ভারত-উদ্ধার"।

কুমার। (কুমারও সেইরূপেই তখন বুক একটু চিরিয়া উচ্চারণের সহিত প্রতিজ্ঞাপত্রে লিখিল—'ভারত-উদ্ধার')—ভারত-উদ্ধার।

সকলে। (চাপাকণ্ঠে ধ্বনি) বন্দেমাতরম্।

কুমার। (ক্ষুদিরামকে) আমরা কী করব, কী করতে চাই?

ক্ষুদিরাম। সে-কথা স্পষ্ট ভাবি নাই,—এই জানি, মনে আগুন জ্বলছিল। (কর্মী অরুণ ছুটিয়া আসিয়া মুকুন্দকে—)

অরুণ। আজ বারাকপুরে একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালী-ভদ্রলোক তিনজন গোরা-সৈন্যের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে হত হয়েছেন।

(সকলের স্তম্ভিতভাবে সংবাদ শ্রবণ)

মুকুন্দ। (বিক্ষোভে) দেখতে-দেখতে কতগুলি দেশীয়-লোকের বীভৎস-হত্যা পরে-পরে সংঘটিত হল!

ব্রতীন্দ্র। জানো না আজ রুদ্রমূর্তি রাজা?

ক্ষুদিরাম। বটে? রুদ্রমূর্তি রাজা? (হঠাৎ পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাহা নাড়িতে-নাড়িতে ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে) কিন্তু প্রজা?—প্রজাপতির বিচার কিন্তু সুনিশ্চিত। (স্বগত)—শোধ তুলব,—এর শোধ তুলব! (উক্তি করিতে করিতে ক্রোধে পায়চারি)

মুকুন্দ। (ব্রতীন্দ্রকে) খবর কী? ছেলেদের জুটিয়ে এনেছ?

ব্রতীন্দ্র। হাঁ। এদিকে কিন্তু গতিক ভালো না।

মুকুন্দ। (ব্রতীন্দ্রকে) ভাই, তোমার বোধ হয় ওই উত্তর-দিকে যাওয়াই কর্তব্য। (নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এই দাদাকে বাঁচাবার জন্য সতর্ক হয়ে কাছে-কাছে ফিরছ? কিন্তু ভাই, বোধ হয় সাবধানে কাজ করতে পারব। দেরি কোরো না, আমার জন্যে তোমার কোনো ভয় নাই।

ব্রতীন্দ্র। তবে চলি। (সকলে প্রস্থানোন্মুখ। চিন্তিত-মুখে মুকুন্দের পায়চারি)

(সংবাদপত্র পড়িতে-পড়িতে আনন্দমোহনের প্রবেশ)

আনন্দমোহন। (কাগজপড়া) "একটা গোরা রাজপথে বায়ু-বন্দুক ছুঁড়িয়া

আমোদ করিতেছিল। তিনজনের গায়ে গুলি লাগে। অপরাধী স্বীকার করিয়াছে যে, "He fired at a coffeeshop-sweeper for a Lark"—অর্থাৎ সে কেবলমাত্র মজা করিয়া একজন কফি-দোকানের ঝাড়ুদারকে গুলি করিয়াছিল।

ক্ষুদিরাম। (সক্রোধে বিস্ময়ে) তা ব'লে "মজা করিয়া ঝাড়ুদারকে—গুলি?"

আনন্দমোহন। আরো শোনো—(হাসিয়া ব্যঙ্গের সহিত কাগজ হইতে পড়া) এই গুলি "ঝাড়ুদারের গায়ে অধিক দূর প্রবেশ করে নাই"।

ক্ষুদিরাম। "গুলি গায়ে অধিক দূর প্রবেশ করে নাই"।—কিন্তু, এরূপ মজা ভারতবর্ষের মর্মের মধ্যে গভীর-রূপে নিহিত থাকে। এর কি একটা প্রতিঘাত নাই? —প্রতিঘাত?

আনন্দমোহন। প্রতিঘাত?—সে-প্রতিঘাত কি নিতান্ত নির্জীবভাবে হতে পারে?

ক্ষুদিরাম। (আনন্দমোহনের কথার পুনরুক্তি করিতে-করিতে পায়চারি করিয়া দৃঢ়-সংকল্প-করার কঠিনভাবে) তা ঠিক—প্রতিঘাত কি নিতান্ত নির্জীবভাবে হতে পারে?—"নির্জীবভাবে"? (দৃঢ়পদ-বিক্ষেপে নীরবে ক্রুদ্ধ ও চিন্তিতভাবে পায়চারি)

ব্রতীন্দ্র। (কাগজ দেখিতে-দেখিতে জোরে-জোরে নূতন সংবাদের হেডিং পাঠ) শোনো,—"আসন্ন বঙ্গ-বিভাগ।"

সকলে। বাংলার বিভাগ-ব্যাপারে বাঙালীকেই বাদ!

ক্ষুদিরাম। এ যে রাজ্যশাসনের চরম-পন্থা।

ব্রতীন্দ্র। কিন্তু—এ যে একেবারে "Settled fact"!

আনন্দমোহন। এদিকে যখন লর্ড কার্জন, মর্লি,—গুর্খা, প্যুনিটিভ-পুলিস, পুলিস-রাজকতা,—

কুমার। তার উপর—নির্বাসন, জেল, বেত্রদণ্ড—

ব্রতীন্দ্র। দলন, দমন, আইনের আত্মবিস্মৃতি,—

ক্ষুদিরাম। অপরপক্ষে তখন প্রজাদের মধ্যে—

ব্রতীন্দ্র। আর কী হবে?—প্রজাদের মধ্যে হচ্ছে উত্তেজনা-বৃদ্ধি। তারা আজ বিভীষিকার সামনে হচ্ছে অসহিষ্ণু। বাংলাদেশের মনের জ্বালা সমস্ত দেশের আকাশে অগ্নিমূর্তি হয়ে দেখা দিচ্ছে!—চারিদিকে একটা রুদ্ররোষ স্তব্ধ।

কুমার। (উত্তেজনা-চঞ্চল) এর একটা প্রতিঘাত? বলি—একটা প্রতিঘাত নাই? —চরম-প্রতিঘাত?

(উৎসাহ-উদ্দীপ্তমুখে উক্তিরত-কর্মী নির্মলের প্রবেশ)

নির্মল। আছে, আছে! প্রতিঘাত নিশ্চয়ই আছে!—শুনুন, ওদিকে কী হচ্ছে—(চাপাকণ্ঠে) চন্দননগরের মেয়রকে হত্যার আয়োজন, পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি, ট্রামগাড়ির প্রতি আক্রমণের উদ্‌যোগ, রেলগাড়িতে বোমা।—

অশোক। (গভীর আর্তস্বরে) রেলগাড়িতে বোমা নয়—রেলগাড়িতে হয়েছে—বলি,—মানুষ-বলি—বন্দেমাতরম্ (বলিতে-বলিতে একটি বালকের রক্তাক্ত-মৃতদেহ কাঁধে লইয়া অশোকের প্রবেশ ও মৃতদেহ মেঝেতে রাখিয়া তাহার উপর সযত্নে কাপড় ঢাকা দেওয়া)

অরুণ। (চমকিয়া) এ কী,—মৃত ? এ-কি স্বদেশ-সেবক ?

ক্ষুদিরাম। (আগাইয়া উদ্দীপ্তমুখে) ভক্তদেহের রক্তলহরী মুক্ত হইল কি রে ?

অশোক। (গম্ভীরস্বরে) বীরগণ জননীরে—

রক্ততিলক ললাটে পরালো—পঞ্চনদীর তীরে।

—কারখানার ইংরেজ-কর্মচারীদের প্রতি রেলগাড়িতে বোমা ছুঁড়তে গিয়ে—

ক্ষুদিরাম। (সাগ্রহে সগৌরবে) বোমা ? কী বললে, বোমা ছুঁড়তে গিয়ে ? এ তবে বোমার-বলি ?

নির্মল। এ বোমারই বলি !

ক্ষুদিরাম। বন্দেমাতরম্ ! (চাপাকণ্ঠে সকলের অনুবৃত্তি)

অরুণ। এতদিনে কি পড়িল ধরা (মৃতদেহ দেখাইয়া)—অশনি-ভরা বিদ্যুৎ ?

অশোক। (প্রতিবাদে নিদারুণ-ক্ষোভে)—কী বলছ ?—পড়িল ধরা ? না, না, ধরা পড়েনি— বিপদ দেখে দলকে বাঁচাতে এই কর্মী হয়েছে আত্মঘাতী ! (বলিয়া নিজের বুকে ছুরি-বিদ্ধ-করার প্রক্রিয়া-প্রদর্শন)

বক্ষে সে যে—
ছুরি বসাইল বলে—
"গুরুজীর জয়" বলিয়া বালক
লুটাল ধরণীতলে।

ক্ষুদিরাম। (দুই হাত তুলিয়া জয়োল্লাসে) এই তো ! —এই-তো দেখছি—এতদিনে আজ—

—এসেছে প্রভাত এসেছে !
তিমিরান্তক শিবশংকর কী অট্টহাস হেসেছে।

যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে
ভীম-আনন্দে ভেসেছে॥

আনন্দমোহন। (মৃতদেহ দেখাইয়া) এখান থেকে এখনি সকলে সরে যাও।

(অঙ্গুলি-নির্দেশে সরিয়া-পড়ার ইঙ্গিত—মৃতদেহের তিনদিক ঘিরিয়া সকলের হাঁটু গাড়িয়া বসা ও 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া প্রণামান্তে মৃতদেহ কাঁধে তুলিয়া লইয়া মৌনভাবে সরিয়া-পড়া)

দৃশ্য ১৩

কলিকাতা। রাজপথ। মধ্যাহ্ন

(আনন্দমোহন ও অরুণের সহিত চিন্তিত ও বিরক্তমুখে দ্রুত উক্তিরত বিশ্ববান্ধবের প্রবেশ)

বিশ্ববান্ধব। বিভীষিকা, চারিদিকে বিভীষিকা—

অরুণ। তা হবেই তো! আজ যে—চিরসঞ্চিত নীরব-নালিশ অন্তর্জ্বালার সহিত উদ্গীর্ণ!

আনন্দমোহন। যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজশক্তিকে আবিষ্কার না করতে পারব ততদিন পর্যন্ত বিদেশী পর-শক্তির সহিত আমাদের এরূপ সংঘর্ষ চলতে থাকবেই।

অরুণ। আমরাও তো তাই চাই। (ক্রুদ্ধমূর্তিতে পায়চারি)

বিশ্ববান্ধব। (পায়চারি-রত অরুণের দিকে চাহিয়া) কিন্তু, অধ্যবসায়ই যে শক্তি, অধৈর্যই যে দুর্বলতা। প্রশস্ত ধর্মের-পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান।—সে কথা যেন মনে থাকে।

অরুণ। (তীব্র প্রতিবাদে) কাকে বলছেন দুর্বলতা? এক্ষেত্রে অধৈর্য কি দুর্বলতা?

আনন্দমোহন। (আড়চোখে অরুণের দিকে চাহিয়া লইয়া) একদল অধীর অসহিষ্ণু যে গুপ্ত-পন্থাকেই রাষ্ট্রহিত-সাধনের একমাত্র পন্থা স্থির করছে?

বিশ্ববান্ধব। (সবিস্ময়ে) গুপ্ত-পন্থা?—উৎপাত? উৎপাতের সংকীর্ণ-পথ সন্ধান করাই যে কাপুরুষতা।

অরুণ। (দারুণ ক্রোধে) কী বলছেন?—গুপ্ত পন্থা,—উৎপাত? গুপ্তপন্থা,—কাপুরুষতা?

(বলিতে বলিতে বিক্ষোভের সহিত অরুণের প্রস্থান)

(গীতরত মুকুন্দের প্রবেশ)

গান

মুকুন্দ। (বিশ্ববান্ধবের প্রতি) তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তাব'লে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে হয়তো রে ফল ফলবে না॥
আসবে পথে আঁধার নেমে তাই বলেই কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি হয়তো বাতি জ্বলবে না॥

(রহস্যের-হাসিযুক্ত পথপ্রদর্শক-ক্ষুদিরামের সঙ্গে একজন ভীতিবিহ্বল-শেঠের "কোথায় কোথায়" বলিয়া ত্রস্ত-প্রবেশ। "ঐ যে" বলিয়া ক্ষুদিরাম হাত দিয়া আনন্দমোহনকে দেখাইয়া দিল ও চুপ করিয়া একধারে দাঁড়াইয়া সব দেখিতে-শুনিতে লাগিল। শেঠ আসিয়া আনন্দমোহনের হাতে একখানি বিজ্ঞাপনের কাগজ দিল, এবং হাতজোড় করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—)

শেঠ। হুজুর,—হুকুমপত্র। হুজুর,—বাজারে আগুন! আগুন, আবার তার উপর মারধোরও চলছে! হুজুর—

সকলে। (উদ্বেগে আগাইয়া) আগুন? মারধোর?

(আনন্দমোহন পত্র পড়িতে-পড়িতে সকলকে তাহার মর্মার্থ বলা—)

আনন্দমোহন। বাজারে নোটিশ পড়েছে যে, যদি মহাজনেরা দেশী-জিনিসের আমদানি না করে তবে বাজারে আগুন লাগবে। সে-সঙ্গে জমিদারের আমলা-দিকেও প্রাণহানির ভয় দেখানো হচ্ছে। (বিজ্ঞাপনের কাগজখানি সকলকে পড়িতে দেওয়া—ক্রমান্বয়ে সকলের পড়া; সবশেষে বিশ্ববান্ধব তাহা পড়িয়া কেমন স্তব্ধ থাকিয়া)

বিশ্ববান্ধব। (বিরাগে ও বিস্ময়ে) ঘরে আগুন-লাগানো? মানুষ-মারা? দলে টানবার জন্য টানাটানি?—মারামারি?—খুনোখুনি?

মুকুন্দ। (হাতের দৈনিক-পত্রিকা পড়িতে-পড়িতে) দেখো দেখো—এবারে প্রাদেশিক-সমিতিতে—

আনন্দমোহন। কী হয়েছে?—সমিতিতে পুলিস?

(পশ্চাৎ-পটের ছায়াছবিতে দৃশ্যমানঃ—স্বদেশী-সভা। পুলিসদলের আবির্ভাব। চড়-চাপড়, কীল-ঘুঁষি, ধাক্কা, লাথি, লাঠি ও বেয়নেটের গুঁতা-দেওয়া। আহত শিশু-বৃদ্ধ কয়েক-জনের অজ্ঞান হইয়া পড়া,—বাকী-সকলের অটল ধৈর্যে শান্তভাবে অবস্থান করা)

মুকুন্দ। সমিতিতে ছাত্রদলের, যুবকগণের ও নায়কবর্গের অবিচলিত স্থৈর্য। পুলিস যখন নিরস্ত্রদের উপর আঘাত বর্ষণ করতে আরম্ভ করল তখনো তারা দৃঢ়তার সহিত সব সহ্য করছিল।

বিশ্ববান্ধব। (উৎসাহের সহিত উদ্দীপ্তমুখে) সমস্ত সহ্য করছিল?—সহ্য? —বল কী? মারামারি না ক'রে? (পত্রিকাখানি পড়িতে-পড়িতে কিছুক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক থাকা) যদি সহ্য করার এই বৃহৎ লক্ষ্যটাকে ধরি, তবে ক্ষণিক উত্তেজনা ক্ষুদ্র অন্তর্দাহ আমাদিকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না।

(উক্তিরত কুমারের প্রবেশ)

কুমার। (ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে বিরাগের তিক্ত-সুরে) অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—(উর্ধ্বদিকে চাহিয়া) তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।

(গাহিতে গাহিতে নিবেদিতার প্রবেশ ও কুমারের প্রতি)

গান

নিবেদিতা। ওরে তোরা নেই-বা কথা বললি,
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী।
মরিস মিথ্যে বকে-ঝকে দেখে কেবল হাসে লোকে
না-হয় নিয়ে আপন মনের আগুন মনে-মনেই জ্বললি॥
অন্তরে তোর আছে কী যে নেই রটালি নিজে-নিজে
না-হয় বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে চুপে-চাপেই চললি॥
কাজ থাকে তো কর্‌গে-না কাজ লাজ থাকে তো ঘুচা-গে লাজ,
ওরে কে যে তোরে কী বলেছে নেই-বা তাতে টললি॥

(খবরের-কাগজ হাঁকিয়া হকারের প্রবেশ)

হকার। "বন্দেমাতরম,"—"বন্দেমাতরম"-মামলা। (সকলের কাগজ কিনিয়া পড়িতে থাকা। হাঁকিতে-হাঁকিতে হকারের প্রস্থান)

(হঠাৎ লাঠিধারী-পুলিস ও পিস্তলধারী-সার্জেন্টকে সঙ্গে লইয়া ইতস্তত চাহিতে-চাহিতে ইংরেজ-পুলিস-সুপার প্রবেশ করিল। এবং কট্‌মট্ করিয়া সকলের দিকে চাহিতে-চাহিতে চলিয়া যাইবার-মুখে লোকজনদের দেখাইয়া সঙ্গী-সার্জেন্টকে চোখের ইশারায়)

পুলিসসাহেব। ব্যাপার কী—(বলিয়া ঘটনা জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। সার্জেন্টকে বলিয়া উঠিল) এরা কি সব সেই এক্‌ষ্ট্রিমিস্ট্—এরা তবে একেবারে

সার্জেন্ট্। —যাকে বলে চরমপন্থী!

পুলিসসাহেব। (নাক-সিঁটকাইয়া)—নেটিভ,—নিগার,—শুয়ার! Kick! kick them first and then speak to them—এদের প্রতি আগে লাথি—পরে কথা!

(শুনিয়া সকলে নিদারুণ অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল,—পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিল। পুলিসদল চলিয়া গেল। ক্ষুদিরাম এক-পাশে গম্ভীর-মুখে এতক্ষণ একমনে দাড়াইয়া সব দেখিতে-শুনিতে ছিল! এইবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—)

ক্ষুদিরাম। কী বলছে?—Kick them? হাটের মধ্যে এরূপ জুতা-মারার কথা বলতে সাহস করে!—আজ!—দাঁড়াও,—আজই এর শোধ তুলব। (বলার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজনায় বারংবার পকেটে পিস্তল-নাড়ার-ইঙ্গিত-সূচক হাত দিয়া-দিয়া—"এই পিস্তল দিয়েই" বলিয়া চকিতে সে পুলিসদলের অনুসরণে বাহির হইয়া গেল।—কিছুক্ষণ বাদেই 'দুম্‌দাম্‌' করিয়া দুইটি গুলির শব্দ হইল। অমনি নেপথ্যে সার্জেণ্টের গলার "ধরো, ধরো" চীৎকার শোনা গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই—"হত্যাকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড, পালাও পালাও"—চীৎকার করিতে-করিতে লোকজন গুলির-দিক হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া বিপরীত দিকে পালাইয়া গেল। বিশ্ববান্ধব, আনন্দমোহন প্রভৃতি কৌতূহলে—"গুলি! এ-যেগুলির শব্দ" বলিয়া গুলির শব্দের অনুসরণে উদ্যত। তখনই শোনা গেল,—নেপথ্যে আবার চীৎকার উঠিতেছে,—"পালাও, পালাও"। গ্রেপ্তার-সচেষ্ট পুলিসদ্বয়ের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিরত সদ্য-ধূমায়মান-পিস্তল-হাতে ছুটিয়া ক্ষুদিরামের প্রবেশ ও "অরবিন্দ লহ নমস্কার" বলিয়া অরবিন্দের উদ্দেশ্যে নেপথ্যের দিকে কিঞ্চিৎ মাথা নোয়াইয়া যেই-মাত্র নমস্কার নিবেদন করিতে যাওয়া—অমনি এই ফাঁকে পুলিসেরা ক্ষুদিরামের হাতের পিস্তল কাড়িয়া লইল। আনন্দমোহন পিছন-দিকে হাত নাড়িয়া-নাড়িয়া সকলকে পালাইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিলে কুমার-ছাড়া অন্যরা তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল)

ক্ষুদিরাম। (পুলিস-দ্বারা জাপটানো-অবস্থায়) প্রতিশোধ! হাতে-হাতে অপমানের প্রতিশোধ! (নেপথ্যে দূরের হকারের-কণ্ঠের হাঁক শুনা যাইতেছে—"অরবিন্দ-ঘোষের বন্দেমাতরম্‌-মামলা"! এ-মামলায় যারা সরকারী সাক্ষী ছিল, তারা সকলেই"—(বলিতেই সিপাহীরা ধমক দিল)—"চোপ্‌রাও"। (ক্ষুদিরাম বলিয়া চলিল "—জানি,—জানি, সকলেই তারা গবর্মেণ্ট-কর্তৃক পুরস্কৃত এবং উৎসাহিত হয়েছে!" (পুলিসেরা ক্ষুদিরামের মুখ চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করিতেই ক্ষুদিরাম আরো জোরে-জোরে বলিয়া উঠিল)—প্রজার মর্মবেদনার উপর জুতার গোড়ালি? হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ! হাতে-হাতে তেমনি প্রতিশোধ লাভ হল!—বন্দেমাতরম্‌।

(পশ্চাৎ হইতে ধাবমান আরো-পুলিস আসিয়া ক্ষুদিরামকে হাতকড়া পরাইয়া কোমরে দড়ি বাঁধিয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

কুমার। (আগাইয়া গিয়া পুলিসদের প্রতি রোষে) যে-সত্য ত্রিশ-কোটি প্রজার মর্মের মধ্যে হাহাকার করছে তাকে বলের দ্বারা উচ্ছেদ করতে পারে এমন শাসনের উপায় কোনো মানবের হাতে নাই,—(আরো আগাইয়া গিয়া পুলিসদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া)—কোনো দানবের হাতেও নাই। (স্ট্রেচারে-শায়িত মুমূর্ষু পুলিস-সুপারের আহত-দেহ লইয়া সার্জেণ্ট ও পুলিসদের প্রবেশ। মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরাইয়া-কাতরাইয়া ক্ষীণ তীব্র-কণ্ঠে পুলিস-সুপার হুকুম দিল)—"ধরো দুটোকে। ভারতবর্ষে ইংরেজের গায়ে যারা হাত তোলে তারা যাতে কোনোমতেই নিষ্কৃতি না পায় সেজন্য সতর্ক হতে হবে। ধরো শীঘ্র দুটোকেই।" (পুলিসেরা সম্মুখবর্তী কুমারকেও হাতকড়া পরাইয়া কোমরে দড়ি বাঁধিতে লাগিল। বন্দী ক্ষুদিরামের চলিতে-চলিতে গান)

ক্ষুদিরাম। গান

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

(বন্দীদ্বয়-সহ পুলিসদলের প্রস্থান। সঙ্গে-সঙ্গে উদ্‌ভ্রান্ত ও উত্তেজিত-ভাবে বন্দীদের প্রস্থান-পথের দিকে তাকাইয়া গাহিতে-গাহিতে বিনির প্রবেশ)

গান

বিনি। দুঃখ-তাপে ব্যথিত-চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥
সহায় মোর না-যদি জুটে নিজের বল না-যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না-যেন মানি ক্ষয়॥

পাঁড়েজী। (বন্দিদ্বয়ের-রক্ষী পুলিসদলের-একজন 'পাঁড়েজি' লাঠি উঁচাইয়া ফিরিয়া আসিল ও বিনিকে তাড়া করিবার ভানে বলিতে লাগিল) চলা যাও, চলা যাও।

বিনি। (পুলিসটিকে সতেজে) আমরা মাতৃভূমির কন্যা—(বলিতে-বলিতেই উক্তিরত অন্য-আরো মেয়েদের প্রবেশ)

মেয়েরা। আজ আমাদের দেশ রাজ-শক্তির নির্দয় আঘাতে বিক্ষত।

(সম্মুখে চলিতে-চলিতে বিনির উক্তি)

বিনি। হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরি
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরান।—বন্দেমাতরম্।

(বলিতে বলিতে সকলে আগাইয়া চলিল। পুলিসটি পিছনদিকে চাহিয়া লইয়া মাথা একটু নোয়াইয়াই আনন্দোজ্জ্বল-মুখে চাপাকণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুলিল—"বন্দেমাতরম্" ও সঙ্গে চলিতে চলিতে লোকচক্ষে মেয়েদের ভয়-দেখাইবার ভানে লাঠি ঘুরাইতে-ঘুরাইতে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া চলিল) চলা যাও, চলা যাও।

দৃশ্য ১৪

গুপ্তগৃহ

(মগ্নচিত্তে আবৃত্তিরত-অবস্থায় মুকুন্দের পদচারণা)

মুকুন্দ। দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন-শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি' করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।

(ভাবাবেগ সামলাইতে থামিয়া একটু পরেই—আবৃত্তির উপক্রম। ইতিমধ্যে নিবেদিতার প্রবেশ ও ইতস্তত-দৃষ্টিপাত; আবৃত্তিরত-মুকুন্দকে দেখিতে পাইয়া স্তব্ধ হইয়া একপাশে অপেক্ষায় থাকা।)

মুকুন্দ। (পুনরায় আবৃত্তি) শাস্তি? শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তি-ভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের-গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
কপট বেষ্টন।

নিবেদিতা। (চিন্তিতমুখে মুকুন্দকে পায়চারি করিতে দেখিয়া আগাইয়া গিয়া) আপনাকেই খুঁজছিলাম।

মুকুন্দ। (কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ভাবাবেগ সামলাইয়া লইয়া) তোমাকে যে-বইটি দিয়েছিলাম, সেটা পড়েছ? সেই লেখাটা নিয়ে বুঝি ভাবছ?

নিবেদিতা। (একটু কাছে আসিয়া) ঠিক ভাবছিলুম না, এতক্ষণ সেই লেখায় হাত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ক'দিন থেকে কিছুতেই যেন কোনো কাজে মন বসাতে পারছি না—ভারি অন্যায় হচ্ছে। আজ আমি যেমন করে হোক—

মুকুন্দ। না, না, জোর করে চেষ্টা ক'রো না। বোধ হয় কেউ সঙ্গিনী নেই, নিতান্ত একলা কাজ করতে তোমার শ্রান্তি বোধ হয়। কাছে দুই-একজনের সঙ্গ এবং সহায়তা হলে—

নিবেদিতা। আমাকে সাহায্য করবেন? রোগী-শুশ্রূষা-সম্বন্ধে সেই ইংরেজি বইটা? আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

মুকুন্দ। (নিবেদিতাকে) ইচ্ছে করে-নিজের কাছে রেখে সকল-প্রকার লেখা-পড়ায় এবং কাজে সহায়তা করি।

নিবেদিতা। তাহলে আমারও ভারি উপকার হয়, অনেক কাজ করতে পারি। দেখতে-দেখতে কী যে হয়ে গেল।—কী করা যায়?

মুকুন্দ। (স্মিতহাস্যে) এমন সোনার প্রতিমা! তোমার এ হাল কে করল?

নিবেদিতা। (সহাস্যে) কে সমস্ত করায় তা আমি কী জানি।

মুকুন্দ। তা বটে, অদৃষ্টের কথা কে জানে। আমরা তো কীট-মাত্র।

নিবেদিতা। আমার পিতৃকুলে কুলগর্ব রক্ষা করতে আমার পাত্রের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। সম্বন্ধের প্রস্তাব আসছিল; পিতা ইতস্তত করছিলেন, এমন সময় সরকার-বাহাদুরের সঙ্গে দেশের লোকের লড়াই বাঁধল। ভিতরে ভিতরে—আনন্দে আমার বুক কেঁপে উঠল। সেই আনন্দেই আমার সমস্ত ফেলে দিয়ে স্বদেশ-উদ্ধারে আসতে পারলুম। স্বাধীনতার জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিলুম।

মুকুন্দ। একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপরে ঝুলছে। দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনা ক্রমশই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে। আজ বিপ্লবের দিন। বিপ্লবের অভিসারে আমাদের যাত্রা! বড়ো দুঃসময়! ধরা পড়লে, জেল, বেত্রাঘাত ফাঁসি! (সহসা হাসিয়া) ভয়ানক ধুম! আমরা এতই ভয়ংকর!—জেল, ফাঁসি। সে সবই-তো জানো!

নিবেদিতা। ফাঁসি? প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত না। ভয় কিসের? বিস্ময় লাগে! এ তো আনন্দের কথা!—বলুন,—দেশের হিতসাধনে কী করব?

মুকুন্দ। আত্মহিত, দেশহিত যে-কোনো হিতসাধনই লক্ষ্য হোক না কেন, কেবলমাত্র বীর, ত্যাগী ও তপস্বী তার যথার্থ সাধক।

নিবেদিতা। (ক্ষোভে) স্বদেশীর নামে আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায়-পীড়ন চলছে! চলছে গুপ্তহত্যা!—এ কি এক মুহূর্তের জন্য—বীর, ত্যাগী, তপস্বী—যাঁদের কথা বলছেন,—তাঁরা সহ্য করতে পারতেন?

মুকুন্দ। যদি মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যও পাপকে আশ্রয় করি তবে তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। তোমার কী ইচ্ছা? তুমি কী করতে চাও?

নিবেদিতা। সেবা। সেবা করতে চাই। আমি সেবিকা। সেবাব্রতে আমি জীবন উৎসর্গ করব। কী করতে হবে?

মুকুন্দ। করতে হবে—অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা। দেশে-দেশে গ্রামে-গ্রামে ব্রত নিয়ে বেড়াতে হবে।

নিবেদিতা। এখন, করতে হবে কী, কোথায়?

মুকুন্দ। করতে হবে—স্বদেশী-সমাজ স্থাপন। কাজের কি অন্ত আছে? প্রতি পল্লীতে অনাথ ও অসহায়গণের নিমিত্ত ঔষধ-পথ্য-সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করো। আমি গাড়োয়ান-পল্লীতে একটি পঞ্চায়েৎ স্থাপন করবার চেষ্টায় আছি। চললেম। (প্রস্থানোদ্যত)

নিবেদিতা। সেবার একটা সুযোগ—সে তো আমার সৌভাগ্য। দীক্ষা দাও। (জনান্তিকে স্বগত) হে ব্রাহ্মণ, তুমি কিছুই গ্রহণ কর না, নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর, তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, কেউ কি তোমাকে কিছুতেই একটুও কাছে পাবে না?—কোনোদিনই না?

মুকুন্দ। (স্বগত) মহাপ্রলয়! মহাপ্রলয়ের তীরে (উজ্জ্বল-মুখে নিবেদিতার দিকে একটু দেখিয়া লইয়া) কী আনন্দ! এ যে অনন্ত-আনন্দের আস্বাদ! (সাময়িক ভাবাবেগ সামলাইয়া প্রকাশ্যে নিবেদিতাকে) সাধারণ-সভার অধিবেশন হবে। সভা আগামী রবিবার। (একটু হাসিয়া) সভায় সেদিন এসো। চলো, এখন তবে একটু দেশের কাজে যাত্রা করি।

(উদ্বিগ্নভাবে ব্রতীন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রতীন্দ্র। যাত্রাভঙ্গ! (চাপাস্বরে) সরে যাও, সরে যাও—(বলিয়া মুকুন্দকে ও নিবেদিতাকে তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইবার ইঙ্গিত করা)

মুকুন্দ। (ব্রতীন্দ্রকে) কেন, কী হয়েছে?

ব্রতীন্দ্র। পুলিসের লোক। গুপ্তচরের কাজ। সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল—এখুনি এ-বন ছাড়তে হবে। বেটারা সন্ধান পেয়েছে দেখছি।

নিবেদিতা। (জিনিসপত্র গুটাইতে-গুটাইতে হাল্কাসুরে) উন্মাদনায় যোগ দিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়।—এ তো জানা কথা!

ব্রতীন্দ্র। গুপ্ত-চক্রান্তের দ্বারা নরনারী-হত্যা!—এ যে গুণ্ডাগিরি! গুণ্ডাগিরিকে যদি একবার প্রশ্রয় দেওয়া হয়—

মুকুন্দ। দেশের কাজে ধর্মকে লঙ্ঘন করলে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না! মিলনের পথ, সৃজনের পথ, ধর্মের পথ। কিন্তু, ধর্মের পথ দুর্গম!

ব্রতীন্দ্র। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন।

মুকুন্দ। পাথেয় সংগ্রহ করতেই যে আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে।

ব্রতীন্দ্র। (কণ্ঠে জোর দিয়া) তা করতেই হবে!—তোমার পক্ষে আমি। আমিও তোমার সঙ্গী! চলো—চলো—

মুকুন্দ। (ব্রতীন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিতে) সভা—মনে রেখো—সভা আগামী রবিবার। (তাড়াতাড়ি কক্ষের জিনিসপত্র সব গুটাইয়া লইয়া পিছনের দরজা দিয়া সকলের প্রস্থান)

[পশ্চাৎপটে ছায়াছবিতে দৃশ্যমান :—বহির্দ্বার-মুখে দ্বাররক্ষী-কর্মীদের সহিত পুলিসদলের পিস্তল ও বন্দুকের গুলি-বিনিময়। ধোঁয়ায় চারিদিক ছাইয়া-যাওয়া—ও ধোঁয়া-ভরা আলো-আঁধারির মধ্যে সংঘর্ষের মুখে দুইদলের ছায়া-ছায়া ছুটাছুটি ও সংঘাত-চলা। একটু ফরসা হইতেই দেখা গেল—ঘাঁটিতে কয়েক-জন স্বদেশ-কর্মী ও পুলিসের গুলিবিদ্ধ ও রক্তাক্ত মৃতদেহ শয়ান। মঞ্চে পুলিসদলের-অগ্রবর্তী হইয়া গুপ্তচর-বিশুর দ্রুত-প্রবেশ ও চতুর্দিকে শঙ্কিত অথচ শ্যেনদৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিতে-করিতে পুলিসদলের প্রতি—]

বিশু। এরই মধ্যে নিরুদ্দেশ! (হতাশায় হাত উল্টাইয়া) কোথায় অন্তর্ধান করল? ছাড়া হবে না, সন্ধান মিলবেই।—সন্ধান চাই, সন্ধান!

(সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ১৫

(মাঝামাঝি পার্টিশন দিয়া দ্বিধাবিভক্ত কারাকক্ষ। অভিনয়কালে এক-একভাগ যথাক্রমে আলোকিত ও অন্ধকার থাকিবে, যেন, সম্পূর্ণ দুটি পৃথক কক্ষ বোঝায়। বৃহত্তর-অংশে রাজবন্দীদল যে-যাহার ভাবে অবস্থিত। ক্ষুদ্রতর অপর-অংশে শিকলে-হাত-বাঁধা একাকী ক্ষুদিরাম আপন-মনে পায়চারি করিতে-করিতে গাহিতেছে—)

গান

ক্ষুদিরাম। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে॥
যদি কেউ কথা না কয়—ওরে ওরে, ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে —
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।
যদি সবাই ফিরে যায়,—ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন-পথে যাবার কালে, কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা—

(গানের এখান হইতে তাল দিয়া-দিয়া কক্ষান্তরে সকলে মিলিয়া সোৎসাহে গান করা)

রাজবন্দীদল। ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে॥
ক্ষুদিরাম। যদি আলো না ধরে—ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার-রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে—
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে॥

(গানের সঙ্গে থাওয়ার-থালি ও জানালা-দরজা পিটাইয়া উত্তেজিতভাবে সকলের মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনি তোলা ও ঐ-সঙ্গে কুমারের নৃত্যোদ্যম। এমন সময় বেত-হাতে ওয়ার্ডারেরা প্রবেশ করিয়া ও "বেয়াদব" বলিয়া কুমারকে বেত্রাঘাত করিতেই কুমার প্রথমবার মাত্র "উঃ" করিয়া উঠিয়া নীরব হইয়া গেল। তার উপরে ওয়ার্ডার উপর্যুপরি বেত্রাঘাত করিয়া ক্রুদ্ধভাবে অন্যদের দিকে আগাইয়া যাইতেই বন্দীরা এবার দলবদ্ধভাবে "ত বে রে" বলিয়া তাড়া করিল ও তাহারা বেত ছিনাইয়া নিতেই ভীত হইয়া ওয়ার্ডার তড়িৎ চলিয়া গেল। বেদনায় কুমারের সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া-

কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি ঠোঁট কামড়াইয়া ধৈর্যের সহিত সে নির্বাক। অন্যান্য বন্দীদের তখন নিরুপায়ভাবে হাত-পা নাড়িয়া বিক্ষোভ-প্রকাশ)

অরুণ। এখন করা যায় কী ?

বীরেন। (অরুণকে) করা যায় কী ?—করা যায় ?—(ব্যঙ্গস্বরে) ভারতে ইংরেজ-গবর্মেণ্ট যেন একেবারেই নাই, এমনভাবে শান্তশিষ্ট নরম হয়ে থাকা !

ক্ষুদিরাম। (ব্যঙ্গস্বরে স্বগত) এমনভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা শয়নাগারেই চলে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সেরূপভাবে চললে নিশ্চয় ঠকতে হয়।

বীরেন। ইংরেজ যতদূর-সম্ভব এমনভাবে চলছে যেন আমরা কোথাও নাই।

অরুণ। (উত্তেজিতভাবে) নাই ?—আমরা নাই ? কোথাও কি নাই ?

ক্ষুদিরাম। (ব্যঙ্গ ও কঠিনস্বরে) সত্যই তো আমরা নাই,—আমরা যেন আজ কোথাও নাই ! আর, সেজন্যই পনেরো-বৎসরের একটি স্কুলের-ছেলের একটু তেজ দেখলে তারা জেলের মধ্যে বেত মারতে পারে ! (যন্ত্রণায় কুমারের "আঃ- আঃ" শব্দ করিয়া ছট্‌ফট্ করা)

অরুণ। (জনান্তরে ওয়ার্ডারের উদ্দেশ্যে—বাহিরে চাহিয়া) ওদের এক-একটাকে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলব।

বীরেন। লোহার দরজা বন্ধ। কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা ? এখান থেকে পালাবার পথ যে জানিই-নে।

কুমার। (চারিদিক চাহিয়া লইয়া অকস্মাৎ হতাশ ও ক্লান্তভাবে 'মা ! মাগো' বলিয়া কুমার বসিয়া পড়িল)

ক্ষুদিরাম। (স্বগত গানে)

গান

আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে।
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া ভেঙে পড়িস্ না রে॥
নেই যে-রে ভয় ত্রিভুবনে, ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয় চরণ স্মরণ ক'রে বাহির হয়ে যা-রে॥

—দেবতা হোক আর মানব হোক যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, যেখানে কেবল বেত চাবুক জেল জরিমানা পিউনিটিভ-পুলিস ও গোরা-গুর্খার প্রাদুর্ভাব, সেখানে ভীত-হওয়া নত-হওয়ার মতো আত্মাবমাননা,—আর নাই ! তুমি দেশকে ভালবাসো ? আর চরম-পরীক্ষা হবে,—তুমি দেশের জন্য প্রাণ দিতে পার কি না।

কুমার। (শুনিতে-শুনিতে উদ্দীপ্তভাবে নেপথ্যে তাকাইয়া—)

গান

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা।
আমি তোমার চরণ মা গো—
আমি তোমার চরণ করব শরণ
আর কারো ধার ধারব না মা॥
ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়
ওমা ভয় যে জাগে শিয়রবাগে, কারো কাছেই হারব না মা॥

নেপথ্যে। (এই সময়ে নেপথ্যে 'ঢং-ঢং-ঢং-ঢং' শব্দে পাগলা-ঘন্টি বাজিয়া উঠিল। কয়েকজন বন্দুকধারী-পুলিস সঙ্গে লইয়া ওয়ার্ডার দৌড়িয়া আসিল ও বাহির হইতে বন্দীদের গুনতি করিয়া লইয়া "ঠিক, সব ঠিক আছে" বলিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই আরো দাপট দেখাইয়া রাজবন্দীদলের 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনি-তোলা, ডাণ্ডা-বেড়ি-পরা দুইজন বন্দীকে রুলের গুঁতা মারিতে-মারিতে টানিয়া আনিয়া বন্দীদের ঘরে ভরিয়া রাখিয়া পুলিসগুলি চলিয়া যাইতেছিল; বন্দীরাও সমস্বরে তখন 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনি দিয়া উঠিল। ঘরে ঢুকিতে ডাণ্ডা-বেড়ি-পরা-আগন্তুক-বন্দীদ্বয় খোঁড়াইতে গিয়া পড়িয়া-পড়িয়া যাইতেছিল আর তখনই দুইজন পুলিস ফিরিয়া আসিয়া আবার তাহাদিগকে রুলের গুঁতা মারিতে লাগিল। গুঁতার চোটে বন্দীদ্বয় যন্ত্রণায় 'মা-মাগো' বলিয়া বারবার চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। ওয়ার্ডার অমনি ধমকাইয়া বলিল— "চোপরাও, রাস্কেল"। অন্যান্য বন্দীরা দলবদ্ধভাবে ঘুষি বাগাইয়া "ব্যাটা শয়তান" বলিয়া রুখিয়া যাইতেই পুলিসেরা "হুঁশিয়ার" বলিয়া বন্দুক বাগাইয়া ধরিল। বন্দীরাও উদ্যত-দৃঢ়মুষ্টিতে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিল। এই সংকট-মুহূর্তে হঠাৎ একদল-পুলিস আসিয়া "সাহেব যে! ওরে, আমাদের সাহেব আসছেন!" —বলিয়া অদূরে ইঙ্গিত করিতেই পুলিসেরা দ্রুত চলিয়া গেল)

অরুণ। (কুমারকে) ভয় হচ্ছে? সাহেবকে ভয় হচ্ছে না কি? দৈন্যই বলো, অজ্ঞতাই বলো, মূঢ়তাই বলো,—মনুষ্য-চরিত্রের ভয়ের মতো এত ছোটো আর কিছুই নাই।—

গান

যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না।
তবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর-ভয় থাকে তো করি মানা॥

যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে
ভুলবি যে পথ পায়ে-পায়ে
যদি তোর হাত কাঁপে তো নিবিয়ে আলো
সবারে করবি কানা ॥

কুমার। (একান্ত-ভক্তিভাবে উর্ধ্বদিকে হাত জোড় করিয়া হাঁটু গাড়িয়া)

গান

তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান ॥
যদিও এ-বাহু অক্ষম দুর্বল তোমারি কার্য সাধিবে
যদিও এ-অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে ॥

ওয়ার্ডার। (ফিরিয়া আসিয়া ব্যঙ্গ-স্বরে) 'এ-অসি?' কী বললে,—"অসি?" (বলিয়া আরো জোরে-জোরে হাসিয়া) "অসি নয়,—ফাঁসি, দু'দিন বাদে যে গলায় পড়বে ফাঁসি—ফাঁসি।—পাগল—পাগল, একেবারে বদ্ধ পাগল!" বলিয়া আরেকবার চারিদিকে ভয়ে-ভয়ে চাহিয়া লইয়া ব্যঙ্গস্বরে "হাঃ-হাঃ" করিয়া হাসিয়া টহলে প্রস্থান)

ক্ষুদিরাম। গান

যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিসনে কিছু।
আজকে তোরে কেমন ভেবে, অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে,
কাল সে প্রাতে মালা-হাতে আসবে রে তোর পিছু-পিছু ॥
আজকে আপন মানের ভরে থাক্ সে বসে গদীর 'পরে—
কালকে প্রেমে আসবে নেমে করবে সে তার মাথা নিচু ॥

কুমার। (গানে)

গান

আর নহে আর নয়, আমি করিনে আর ভয়।
আমার ঘুচল কাঁদন ফলল সাধন হ'ল বাঁধন ক্ষয় ॥

ক্ষুদিরাম। শোনো তোমরা শোনো,—আমাদের কবি কী বলেছেন—যখন কোনো বৃহৎ আকর্ষণে আমরা আপনাদের আরাম, আপনাদের স্বার্থের গহ্বর ছাড়ি, আপনাকে আপনার-বাহিরে প্রবলভাবে সমর্পণ করি, তখন আমাদের ভয় থাকে না,

দ্বিধা থাকে না, তখনই আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত অদ্ভুত শক্তিকে উপলব্ধি করি, নিজেকে আর দীনহীন দুর্বল মনে হয় না—মাভৈঃ।

ক্ষুদিরাম। গান

(ক্ষুদিরামের সঙ্গে সকলে সমবেত-কণ্ঠে)

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধা-বাঁধন নেই গো নেই ॥
দেখি খুঁজি-বুঝি কেবল ভাঙি গড়ি যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই ॥
পারি নাই-বা পারি না-হয় জিতি কিংবা হারি
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে আমরা তুলি সৃজন ক'রে
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই ॥

ওয়ার্ডার। (সদম্ভে ফিরিয়া আসিয়া ওয়ার্ডার বন্দীদের রুল দেখাইয়া) —"বাধা-বাঁধন নেই ?" আসছে—আসছে, সাহেব নিজেই এবার চলে আসছে।

(দুইজন সশস্ত্র-সিপাইসহ ক্ষুদিরামের কক্ষে জেলরের প্রবেশ)

জেলর। (গম্ভীরভাবে ক্ষুদিরামকে) কাটল কেমন ?

ক্ষুদিরাম। (হাল্কা সুরে) সুখেই কেটেছে।

জেলর। এবার তবে বিচারশালায় চলো—(জেলর, সিপাই-দুইজনকে "নিয়ে যাও" বলিয়া ইঙ্গিত করিল। তাহারা চট্‌পট্ ক্ষুদিরামের দুই-ধারে আসিয়া দাঁড়াইল ও ক্ষুদিরামকে কক্ষের বাহিরে নিয়া যাইতে লাগিল। যাইতে-যাইতে ক্ষুদিরাম 'বন্দেমাতরম' গান ধরিল। সঙ্গে-সঙ্গে বন্দীরা নিজেদের কক্ষে সবাই মিলিয়া গাহিতে লাগিল—)

গান

ক্ষুদিরাম। বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম ॥

ক্ষুদিরাম। ("বন্দেমাতরম্" ধ্বনি দিয়া) বিদায় দেহ ভাই! (বলিয়া সঙ্গীদের নিকট বিদায় মাগিয়া পুলিসদলের সঙ্গে চলিয়া গেল, বন্দী-সঙ্গীগণ স্তব্ধ হইয়া ক্ষুদিরামের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া রহিল –)

দৃশ্য ১৬

(কলিকাতা। আদালত। বিচার-কক্ষ। বিচার-মঞ্চে ইংরেজ-জজসাহেব আসীন। জজ-সাহেবের মাথার উপরে দেওয়ালে সম্রাট পঞ্চম-জর্জের এবং সপ্তম-এডওয়ার্ডের প্রতিকৃতি টাঙানো। কাঠগড়ার ভিতরে, ইংরেজ-অফিসারকে-হত্যার-দায়ে-অভিযুক্ত ক্ষুদিরাম ও অন্য-রাজবন্দীরা দণ্ডায়মান। একদিকে সরকারী-উকিল ও তাহার সহকারীগণ ও অন্যদিকে আসামী-পক্ষের উকিল ও তাহার সহকারীগণ উপবিষ্ট। আদালতের অন্যান্য আমলা, যথা,—পেশকার ও ইন্টারপ্রিটার প্রভৃতি যথাস্থানে সমাসীন। কাঠগড়ার পাশে ইন্স্পেক্টার, সার্জেণ্ট ও পুলিসগণ। জজসাহেবের দুই-পাশে আর্দালীগণ হুকুমের অপেক্ষারত। আদালত-কক্ষের দরজায়-দরজায় পুলিস মোতায়েন। আদালত-গৃহ উৎসুক-জনসাধারণের ভীড়ে সমাকীর্ণ। বসিবার আসনে স্থান-সংকুলান না-হওয়াতে বহুলোক দেওয়াল ঘেঁষিয়া দণ্ডায়মান ও নিস্তব্ধ। সওয়াল-জবাব ইত্যাদি যথারীতি শেষ হওয়ার পর জজসাহেব গম্ভীরকণ্ঠে রায়দান-রত। দীর্ঘ-রায়পাঠের পর শুধু দণ্ডাদেশ উচ্চারণ-করা বাকী।—এই অবস্থায় এই দৃশ্যের পটভূমিকা উত্থিত)

জজ। (ক্ষুদিরামের প্রতি) দু'পক্ষের সওয়ালই শুনলাম। (আসামীর পক্ষের উকিলের দিকে চাহিয়া) এখন, আমার যা বক্তব্য তা বলছি।—য়ুরোপীয়-হত্যা—এ-অপরাধের প্রাণদণ্ডই বিধান! আসামীকে আমি প্রাণদণ্ড দিলাম। (অঙ্গুলি-নির্দেশে অন্য-রাজবন্দীদের প্রতি চাহিয়া)—আর-সব আসামী বেকসুর খালাস।

ক্ষুদিরাম, দর্শকবৃন্দ ও স্বদেশীদল। (জজসাহেব রায়দানের অন্তে আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থানোদ্যত। বিপ্লবীরা এবং সেই সঙ্গে দর্শকবৃন্দ "বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিয়া উঠিল। তখনই ক্ষুদিরাম উদাত্ত-কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলে সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল)

গান

ক্ষুদিরাম। সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে॥

জানিনে তোর ধনরতন আছে কিনা রানীর মতন,
তবু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়াল,
এই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥

(ক্ষুদিরাম গান ধরিবার সঙ্গে-সঙ্গে সার্জেণ্ট তাহাকে বাধা দিতে রুল-হাতে তড়িৎ আগাইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া গমনোদ্যত জজসাহেব ফিরিয়া হাত উঠাইয়া ইশারায় সার্জেণ্টকে বাধা দিতে নিষেধ করিয়া চলিয়া গেলেন। উদ্যত রুল নামাইয়া সার্জেণ্ট এবং ওদিকে দর্শকগণও কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে গান শেষ হইলে সার্জেণ্ট কাঠগড়া হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত-বন্দীদের সরাইয়া বাহিরে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়া ক্ষুদিরামকে জেলে লইয়া যাইতে লাগিল,—অভিভূত-দর্শক-গণ বন্দীদের সঙ্গে মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি দিতে লাগিল। ক্ষুদিরাম সকলকে নমস্কার করিয়া পুলিসদলের সঙ্গে চলিতে লাগিল)

ক্ষুদিরাম। (যাইতে-যাইতে)

জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর, পেতে হবে তব পরিচয়,
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে সকল শঙ্কা করি' জয়।
ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে,
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহ-বাহনে—
মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে বজ্রশিখার দাহনে।
তিমির-রাত্রি পোহায়ে—
মহাসম্পদ তোমারে লভিব সব সম্পদ খোয়ায়ে—।
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে ॥

(সকলের প্রস্থান-শেষে উক্তিরত চৌধুরী, কবি ও স্বদেশীদলের প্রবেশ)

চৌধুরী। (বিস্ময়ে ও বেদনায়) আর, কী দেখতে-বা এলাম! তবে তো সেদিন সত্যই তার প্রাণের কথাই সে বলেছিল,—"মহান মৃত্যুর সাথে, মুখোমুখী করে দাও মোরে বজ্রের আলোতে"! হায়, মৃত্যুপথ-যাত্রী! (ক্ষুদিরামের-প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া সজল-চোখে নমস্কার)

কবি। মৃত্যু যে আজ অমৃত হল। মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে। সে মনে করে

আমি বুঝি স্বতন্ত্র, আর মৃত্যুতেই আমার লোপ। কিন্তু নিজেকে সকলের সঙ্গে মিলিত ক'রে উপলব্ধি করলেই মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুভয় দূর হয়ে যায়।

চৌধুরী। (বিস্ময়ে) দূর হয়ে যায়!—মৃত্যুভয়?

কবি। হয়, মৃত্যুভয়ও দূর হয়। কারণ, তখন যে আমি জানি—সকলের সঙ্গে আমি এক, সকলের জীবনের মধ্যেই আমি জীবিত।

চৌধুরী। তাও কি হয়? কী করে তা হবে? কোথাও কি তা হয়েছে?

কবি। মৃত্যুর উপরে এই জীবনের সত্য উপলব্ধি ক'রেই তো জাপানের শত-সহস্র বীর দেশের জন্য অনায়াসে আপন প্রাণ উৎসর্গ করেছে। যদি আজ আমি সমস্ত দেশকেই 'আমি' ব'লে জানতে পারি তবে—আমার ভয়কে, আমার লোভকে দেশের মধ্যে মুক্তিদান ক'রে—

নিবেদিতা। মুক্তিদান ক'রে আমরাও কি তবে দেবত্ব লাভ করতে পারি?

বিনি। আমরাও কি অসাধ্য-সাধন করতে পারি?

কবি। নিশ্চয়ই পারি। চোখের উপরে ঐ দেখছ-না? (সম্মুখের পথে ইঙ্গিত)

বিশ্ববান্ধব। আজ কতকাল পরে আমরা বাংলাদেশে এই সত্যের আভাস পেলাম!

(নেপথ্যে মিছিলের ধ্বনি। সকলের উৎকর্ণ হইয়া তাহা শোনা)

নেপথ্যে। (ধ্বনি) ধন্য ১৩১২ সাল। ধন্য স্বদেশী-আন্দোলন। ধন্য জাতির রাখীবন্ধন। ধন্য আমরা এমন দিনে জীবন ধারণ করছি। ("বাংলার মাটি বাংলার জল"—গাহিতে-গাহিতে ও 'বন্দেমাতরম'-ধ্বনি দিতে-দিতে দূরে মিছিলের প্রস্থান)

চৌধুরী। (দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত) শেষে, দেশের জন্যে রাখীবন্ধনের দিন-গুলিতে আজ দেখছি মৃত্যুর সঙ্গেও হচ্ছে মানুষের রাখীবন্ধন! সাবাস! সাবাস মৃত্যুঞ্জয়ী! না-জানি দেশে কালে-কালে আরো কত-কী ঘটবে, এমন আরো কত-কী-না দেখতেও হবে—তাইতো!—মানুষের এ হল কী!

স্বদেশীদল। (ঊর্ধ্বে সনমস্কারে)

তিমির-রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে॥

(কক্ষের মোটা-তালা-চাবি-হাতে প্রস্তর-মূর্তির মতো গম্ভীর-নিস্তব্ধ নিরুৎসুক পুলিসটির প্রবেশ। নীরবে সকলের প্রস্থান)

মাল্য-চন্দন

আজি উজ্জ্বল ভালে তোলো উন্নত মাথা
নবসংগীত-তালে গাও গম্ভীর গাথা,
পরো মাল্য কপালে নব পল্লব-গাঁথা,
শুভ-সুন্দর কালে সাজো সাজো নব-সাজে ॥

আমি বুঝি স্বতন্ত্র, আর মৃত্যুতেই আমার লোপ। কিন্তু নিজেকে সকলের সঙ্গে মিলিত ক'রে উপলব্ধি করলেই মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুভয় দূর হয়ে যায়।

চৌধুরী। (বিস্ময়ে) দূর হয়ে যায়!—মৃত্যুভয়?

কবি। হয়, মৃত্যুভয়ও দূর হয়। কারণ, তখন যে আমি জানি—সকলের সঙ্গে আমি এক, সকলের জীবনের মধ্যেই আমি জীবিত।

চৌধুরী। তাও কি হয়? কী করে তা হবে? কোথাও কি তা হয়েছে?

কবি। মৃত্যুর উপরে এই জীবনের সত্য উপলব্ধি ক'রেই তো জাপানের শত-সহস্র বীর দেশের জন্য অনায়াসে আপন প্রাণ উৎসর্গ করেছে। যদি আজ আমি সমস্ত দেশকেই 'আমি' ব'লে জানতে পারি তবে—আমার ভয়কে, আমার লোভকে দেশের মধ্যে মুক্তিদান ক'রে—

নিবেদিতা। মুক্তিদান ক'রে আমরাও কি তবে দেবত্ব লাভ করতে পারি?

বিনি। আমরাও কি অসাধ্য-সাধন করতে পারি?

কবি। নিশ্চয়ই পারি। চোখের উপরে ঐ দেখছ-না? (সম্মুখের পথে ইঙ্গিত)

বিশ্ববান্ধব। আজ কতকাল পরে আমরা বাংলাদেশে এই সত্যের আভাস পেলাম!

(নেপথ্যে মিছিলের ধ্বনি। সকলের উৎকর্ণ হইয়া তাহা শোনা)

নেপথ্যে। (ধ্বনি) ধন্য ১৩:২ সাল। ধন্য স্বদেশী-আন্দোলন। ধন্য জাতির রাখীবন্ধন। ধন্য আমরা এমন দিনে জীবন ধারণ করছি। ("বাংলার মাটি বাংলার জল"—গাহিতে-গাহিতে ও 'বন্দেমাতরম'-ধ্বনি দিতে-দিতে দূরে মিছিলের প্রস্থান)

চৌধুরী। (দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত) শেষে, দেশের জন্যে রাখীবন্ধনের দিন-গুলিতে আজ দেখছি মৃত্যুর সঙ্গেও হচ্ছে মানুষের রাখীবন্ধন! সাবাস! সাবাস মৃত্যুঞ্জয়ী! না-জানি দেশে কালে-কালে আরো কত-কী ঘটবে, এমন আরো কত-কী-না দেখতেও হবে—তাইতো!—মানুষের এ হল কী!

স্বদেশীদল। (ঊর্ধ্বে সনমস্কারে)

তিমির-রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে॥

(কক্ষের মোটা-তালা-চাবি-হাতে প্রস্তর-মূর্তির মতো গম্ভীর-নিস্তব্ধ নিরুৎসুক পুলিসটির প্রবেশ। নীরবে সকলের প্রস্থান)

মাল্য-চন্দন

আজি উজ্জ্বল ভালে তোলো উন্নত মাথা
নবসংগীত-তালে গাও গম্ভীর গাথা,
পরো মাল্য কপালে নব পল্লব-গাঁথা,
শুভ-সুন্দর কালে সাজো সাজো নব-সাজে

মাল্য-চন্দন

দৃশ্য ১

(কলিকাতা পথ। নেপথ্যে চলিয়া-যাওয়া একটি মিছিলের 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি শুনা যাইতেছে। তাহারই অক্ষম-শব্দানুকরণে অনভ্যস্ত-ভাঙা-উচ্চারণে, "বন্দে-মা বন্দে-মা"-ধ্বনি দিতে-দিতে শহরে-আগত একদল দরিদ্র-পল্লীবাসীর প্রবেশ)

পল্লীবাসীদল। মা, মা, কোথায় মা! (অনুসন্ধানে এদিক-ওদিক চাওয়া। নিবেদিতার প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া)

রঘুনাথ। (করজোড়ে দল হইতে আগাইয়া গিয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে) জয় মা-লক্ষ্মী, রক্ষা করো।

নিবেদিতা। কী হয়েছে, এত ব্যস্ত কেন? (আনন্দমোহন, বিশ্ববান্ধব, লিয়াকৎ ও মুকুন্দসহ কবির প্রবেশ)

কবি। (রঘুনাথকে) ভালো আছিস তো? খবর কী?

রঘুনাথ। (আগাইয়া কবিকে প্রণামান্তে) জয় হোক মহারাজ। খবর পরে বলব। এখন শীঘ্র একবার আপনাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। বিলম্ব করবেন না।

কবি। (সবিস্ময়ে) কেন? কোথায় যেতে হবে?

রঘুনাথ। কুঠির অত্যাচার! ধান লুট! কারো ঘরে কিছু রাখলে না। পুলিস গ্রামকে শাসন করছে!

কবি। সত্যি নাকি? (সকলকে রঘুনাথের পরিচয়-দেওয়া) রঘুনাথ আমাদের প্রজা, গ্রামের লোক। আমরা ইংরেজি-শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক জানি। (পল্লীবাসীদের দেখাইয়া) আর, এই পল্লীবাসী আপামর-সাধারণ? আপামর-সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে-অন্তরে এক করতে না পারলে আমরা কে?

লিয়াকৎ। আমরা যে কে,—এ কথা কিছুতেই একবারও আমাদের মনে হয় না।—তা সত্যি!

বিশ্ববান্ধব। সত্যি, দেশের হৃদয়-লাভই চরম লাভ।

আনন্দমোহন। দেশের যথার্থ কাছে-যাবার কোন্-কোন্ পথ খোলা আছে সেগুলি দৃষ্টির সম্মুখে আনতে হবে।

কবি। দেশের আপামর-সাধারণের উন্নতি-বিধান করাই এখন আমাদের যথার্থ কাজ। (হতবাক্-পল্লীবাসীদলকে দেখাইয়া বিশ্ববান্ধব, লিয়াকৎ ও আনন্দমোহনকে)

—ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান-মুখে লেখা শুধু শত-শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী,—এই সব মূঢ়-ম্লান মূক-মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।—ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে।

মুকুন্দ ও নিবেদিতা। (পল্লীবাসীদের প্রতি) 'মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে'—শুনলে তো ?

ধ্বনি। (পল্লীবাসীদল উৎসাহে নিবেদিতাকে ঘিরিয়া "বন্দে-মা,—বন্দে-মা" ধ্বনি দিতে লাগিল)

বিশ্ববান্ধব। দেশের কাজ বলতে আর ভুল বুঝলে চলবে না। আর দ্বিধা না, চাষীকে আমরা রক্ষা করব। এ সম্বন্ধে রাজার—

কবি। (সজোরে—বিস্ময় ও বিরক্তিতে) এ সম্বন্ধে রাজার !—রাজার সাহায্য ? এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্যের কল্পনা যেন আমাদের মাথায় না আসে ; কারণ, এ-স্থলে সাহায্য অর্থই,—দুর্বলের স্বাধীন-অধিকারের মধ্যে প্রবলকে এনে বসানো।

লিয়াকৎ। (মাথা নাড়িয়া সম্মতির স্বরে) ঠিক, ঠিক, এ তো সাহায্য নয়, এতে উল্‌টে আরো দুর্বলেরা হবে প্রবলদের আহার্য।

রঘুনাথ। (উৎকণ্ঠায় কবিকে) মহারাজ, কথা ক'বার সময় নাই। শীঘ্র আসুন। দেরী করবেন না, মহারাজ, তাহলে বিপদ হবে।

কবি। (রঘুনাথকে) চলো, চলো।—

(এই সময়ে ক্রন্দন-রত-পুত্র-তমিজ-সহ আলুথালু-বেশা ফরিদা আসিয়া কবির পা জড়াইয়া ধরিল)

রঘুনাথ। (শঙ্কিত ব্যথিত ও রুদ্ধ-কণ্ঠে) ঘরের মেয়েদের ইজ্জত থাকছে না ! (ফরিদাকে দেখাইয়া দিয়া) এ আমাদের গাঁয়ের-চাষী-ফক্কর পরিবার। ফক্কর নিরুদ্দেশ,—পলাতক। গ্রামের আরো বহুলোক পলাতক। দেশের লোক

বশে টিকতে পারছে না, এমনি হয়েছে। পুলিসের উৎপাত চলছে পাড়ায়-পাড়ায়।

লিয়াকৎ। (আগাইয়া আসিয়া ফরিদাকে) ভয় নাই মা। (ফরিদার মাথায় হাত রাখিলেন। নিবেদিতাও তাড়াতাড়ি ফরিদার কাছে আসিয়া ফরিদাকে মাটি হইতে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া আশ্বাস-দেওয়ার সুরে সস্নেহে বলিল)—"ভয় নাই, বোন—ভয় নাই,—ভয় নাই (বলিয়া তমিজের মাথায়ও হাত বুলাইতে লাগিল)

রঘুনাথ। (কবিকে) দেরি করবেন না মহারাজ, তাহলে বিপদ হবে।

কবি। (সকলকে) চলো, চলো।

নিবেদিতা। (উৎকণ্ঠায়) আপনাকে একলা যেতে—

কবি। যেতেই হবে!

নিবেদিতা। (মুকুন্দকে) তবে সঙ্গে যাও! (বলিয়া কবির সঙ্গে যাইতে ইশারা করিল)

মুকুন্দ। (উজ্জ্বল-মুখে স্বগত) আনন্দের আস্বাদ, অনন্ত-আনন্দের আস্বাদ! (দীর্ঘনিঃশ্বাসে নিবেদিতার দিকে এক-পলক চাহিয়া লইয়া) বেশ, যাচ্ছি। বলিয়া নিবেদিতাকে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া কবির অনুসরণে উদ্যত হইল। নিবেদিতা ফরিদার হাত ধরিয়া রওনা হইতে গিয়া 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিল ও উজ্জ্বল-দৃষ্টিতে গমনোন্মুখ মুকুন্দের দিকে আগ্রহ-ভরে চাহিয়া থাকিতে গিয়া স্বগত)—হে ব্রাহ্মণ, তুমি সুদূর, তুমি স্বতন্ত্র! সত্যই, দূরে-দূরেই তুমি থাকলে!" কথা-কয়টি বলিতে-বলিতে হঠাৎ সচেতন হইয়া নিজের বিব্রতাবস্থা সামলাইতে মুখ ফিরাইয়া নিল। নেপথ্যে সকরুণ আবহ-সংগীত। এই সময়ে পতাকাধারী-জনতার একটি মিছিল—"বাংলার মাটি বাংলার জল" গাহিতে-গাহিতে সোৎসাহে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল ও গাহিতে-গাহিতেই কবি, বিশ্ববান্ধব, লিয়াকৎ ও আনন্দমোহনকে সকলে মাল্যভূষিত করিয়া নমস্কার জানাইল। অতঃপর সকলে মিলিয়াই সমস্বরে গাহিতে লাগিল —)

সকলে। গান

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

('বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়া সকলে প্রস্থানোদ্যত। এই সময়ে লাঠিধারী-

সিপাহীদল এবং কাঁধের-সহিত-ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ভাঙা-ডান-হাতওয়ালা কুঠির ম্যানেজার-সাহেব-সহ রুলধারী-ক্রুদ্ধমূর্তি সার্জেণ্টের প্রবেশ)

সার্জেণ্ট। (মিছিলের সম্মুখপথে দাঁড়াইয়া স্বদেশীদলকে ধমকাইয়া) তফাৎ যাও – তফাৎ যাও।

কবি। (একটু মিষ্টি হাসিয়া সার্জেণ্টের বরাবর আগাইয়া) আমি যাবই। আমাকে যে যেতেই হবে।

কুঠির ম্যানেজার। (ক্রূর-হাস্যে বাঁ-হাত বাড়াইয়া ফরিদাকে দেখাইয়া দিয়া সার্জেণ্টর প্রতি) ঐ যে,—ফরুর পরিবার।

ফরিদা। (এই কথা শুনিবামাত্র) ও কে? ও কে? (বলিয়া ভূত-দেখার মতো ফরিদা আঁৎকাইয়া উঠিয়া নিবেদিতার আরো কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। তমিজ—"মা মা,—ঐ যে,—সাহেব, সেই সাহেবটা"! বলিয়া দুইহাত বাড়াইয়া দ্রুত মাকে গিয়া জড়াইয়া ধরিল। নিবেদিতা তমিজের চোখ-মুখ আঁচলে-মুছাইয়া সস্নেহে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। বলিল—"ভয় নাই,—বাবা, ভয় নাই")

রঘুনাথ। (কবিকে) কুঠির উৎপাত! ঐ যে, (সাহেবকে দেখাইয়া দিয়া) কুঠির ম্যানেজার স্বয়ং এসেছে।—স্বয়ং সে প্রজার ধানলুট করে। সেই উৎপাতের সময় ফরু-সর্দার সাহেবের ডানহাতে এমন এক লাঠি বসায় যে—

ম্যানেজার। (আগাইয়া রঘুনাথকে ধমকাইয়া) চোপ্ রাও বেয়াদব!

(কর্মী অরুণ ও বীরেনের প্রবেশ)

অরুণ ও বীরেন। বটে? (বদ্ধমুষ্টি তুলিয়া সাহেবের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে আগাইতেই—)

আনন্দমোহন। থাক্, থাক্ (বলিয়া উভয়কে নিরস্ত করিলেন)।

সার্জেণ্ট। (জনতাকে শাসাইয়া) এখনও তফাৎ যাও, তফাৎ যাও,—বারবার বলছি।

স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকাদল। (গাহিতে-গাহিতে স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকা-দলের প্রবেশ)

গান

আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে যে যেখানে থাকে,
সকল ডাকের উপরে আজ মা আমাদের ডাকে॥
(চারিদিকে চাহিয়া আরো-উচ্চকণ্ঠে গাওয়া)

গান

আজ ধনী-গরিব সবাই সমান আয়রে হিন্দু আর মুসলমান
আজকে সকল কাজ পড়ে থাক্,-আয়রে লাখে-লাখে।

(জনতার দিকে ভীরু-দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে এক ফাঁকে স্বগত "এবার পালাই" বলিয়া ম্যানেজার-সাহেবের পলায়ন। আক্রোশে ফুলিতে-ফুলিতে ইতস্তত চাহিতে-চাহিতে অস্থির-সার্জেণ্টের দৃঢ়-পায়চারি করা। কবি নির্ভীক-পদক্ষেপে যতই আগাইয়া আসিতে লাগিলেন, সার্জেণ্ট ততই অধৈর্যের সহিত সকলকে "সরে যাও, সরে যাও" বলিয়া শাসাইতে লাগিল। জনতাকে দেখাইয়া বল-প্রয়োগে তাহাদিগকে সরাইয়া দিবার নির্দেশ দিয়া সার্জেণ্ট সিপাইদের বলিল—"দূর করো, ওদের শীঘ্র এখান থেকে দূর করে দাও"। কবি হাতের-ইশারায় জনতাকে পিছনে-পিছনে আসিতে নির্দেশ দিয়া ভগবান-উদ্দেশে জয়-দেওয়ার-ভঙ্গীতে উর্ধ্বে দুই হাত তুলিয়া গাহিতে-গাহিতে আগাইতে লাগিলেন)

গান

কবি। কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই—

(এই পর্যন্ত গাহিতেই, কবি সার্জেণ্টের সামনে আসিয়া পড়িলেন। কবির পিছনে জনতার প্রতি পুলিসেরা লাঠির আঘাত হানিতে উদ্যত। বীরেন, অরুণ, আনন্দমোহন ও ব্রতীন্দ্র আকুল হইয়া আগাইয়া যাইতেই কবি সহজ-ভাবে সার্জেণ্টের দিকে পা বাড়াইয়া দিয়া গাহিয়া চলিলেন—)

কবি। গান

দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই ॥

কবি। (সার্জেণ্টকে) "ভাই, ওদের যে বড়ো বিপদ, না গিয়ে কি পারি?" হঠাৎ এই সময়েই বিশ্ববান্ধব সম্মুখে আগাইয়া নিজের গলার মালাটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া জনতার-প্রতি আঘাতে-উদ্যত ক্রুদ্ধমূর্তি সার্জেণ্টের গলায় তাহা পরাইয়া দিতে-দিতে সার্জেণ্টকে সহাস্যে বলিলেন,—"চলো-না, সাহেব, তুমিও চলো—সবটা দেখে আসবে।" কবি প্রসন্ন-দৃষ্টিতে বিশ্ববান্ধবের দিকে এক পলক চাহিয়া লইয়া স্মিতহাস্যে সার্জেণ্টের প্রতিও প্রীতিজ্ঞাপক সুরে—"চলো চলো,—না-হয়, তুমিও আজ পরকে করবে ভাই"—বলিয়া আগাইয়া গেলে, বিশ্ববান্ধব "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিল। ধ্বনি দিতেই জনতা-সুদ্ধ গাহিয়া উঠিল—"দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে

করিলে ভাই”। গাহিতে-গাহিতে সকলে মিলিয়া মিছিলে চলিয়া গেল। অভাবিত আকস্মিক এই-ঘটনায়-অভিভূত-সার্জেণ্ট “তাইতো,—My eyes, O God—বলিয়া চাপাকণ্ঠে “তাইতো,—এ কী দেখছি!”বলিয়া চোখ-রগ্‌ড়াইয়া লইয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। পরক্ষণেই সে একটু দূরে-দূরে থাকিয়া জনতার মিছিল অনুসরণের জন্য পুলিসদের প্রতি নির্দেশ দিল—“যাও, ওদের সঙ্গে যাও,—তফাৎ-তফাৎ যাও”। সকলের প্রস্থান। ক্রমে দূরে-দূরে নেপথ্যে তখন ধ্বনিত হইতে লাগিল—“বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল” ইত্যাদি)

দৃশ্য ২

(পল্লীগ্রাম। প্রাক্-সন্ধ্যা। ফরুর গৃহ-প্রাঙ্গণ। একদিক দিয়া ফরু-সর্দারের প্রবেশ ও ইতি-উতি চাওয়া এবং অন্যদিক দিয়া নাপিত-রামচরণের প্রবেশ)

রামচরণ। (ভয়ে-বিস্ময়ে) ফরু তুমি? এসময়ে তুমি এখানে? কুঠির উৎপাত-উপলক্ষ্যে যে বিস্তর লোককে হাজতে রাখছে।

ফরু। কে?—রামচরণ?—ভাই, মোকদ্দমা চালাতে হবে না?

রামচরণ। মিথ্যা চেষ্টা। জামিন হবে কে? সাক্ষী পাবে কোথায়? যারা সাক্ষী হতে পারত, তারা সবাই আজ আসামী। তারপরে, এই সাহেব-মারা মামলার তদন্তের চোটে এ-অঞ্চলের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তুমি—

ফরু। আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

রামচরণ। একটা ছোটো-ইংরেজকে মারলেও যে সেটা একটা ছোটোরকম রাজ-বিদ্রোহ। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব সহজে ক্ষমা করবেন না।

ফরু। কোনো চেষ্টা না ক'রে যে গতি হতে পারে, আমার সেই গতিই হোক—সকলের সঙ্গে আমি জেলে থাকব।—এদিকে, খবর কী?

রামচরণ। জানো-না? এদিকে যে নদীর মধ্যে এক কাণ্ড!

ফরু। কাণ্ড? সে আবার কী-রকম?

রামচরণ। স্টীমার সশব্দে উজানে আসছিল। জাহাজের ম্যানেজার ছিল সাহেব। পালের উপর পাল-তোলা একটা মহাজনের নৌকো, বাতাসের বেগে মাঝে-মাঝে জাহাজটাকে ধরি-ধরি করছিল।—আবার মাঝে-মাঝে পিছনেও পড়ছিল।

ফক্রু। ধরি-ধরি করছিল? সে কী হে?

রামচরণ। পাল্লা! পাল্লা-পাল্লি চলছিল-যে!

ফক্রু। জাহাজে—নৌকোতে,—পাল্লা? (অবিশ্বাসের হাস্য)

রামচরণ। মাঝির রোখ!—পাল্লায় জেতবার চেষ্টা করছিল—জাহাজ থেকে সাহেবও সব দেখছিল। হঠাৎ একটা আওয়াজ—

ফক্রু। গুলির আওয়াজ?

রামচরণ। হ্যাঁ, গুলিরই। এক মুহূর্তে পাল গেল, নৌকো গেল,—

ফক্রু। স্টীমার?

রামচরণ। স্টীমার তখন নদীর বাঁকে অদৃশ্য।

ফক্রু। ম্যানেজার?—ম্যানেজার কেন এমন করল?

রামচরণ। বলা কঠিন। ইংরাজ-নন্দনের মনের ভাব,—আমরা বাঙালীরা কি বুঝতে পারি? একটা বন্দুকের গুলি, তার থেকে নৌকো হল ফুটো,—নিমেষের মধ্যে হল নৌকোলীলা সমাপ্ত।

ফক্রু। আর মাঝিমাল্লা?

রামচরণ। আল্লা বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নইলে তাদের বাঁচবার কোনো কথা ছিল না।

ফক্রু। (ব্যঙ্গে) কী বললে—আল্লা বাঁচিয়ে দিয়েছেন? তোমার আল্লাকে আমি বহুত-বহুত সেলাম দিয়ে জানিয়ে রাখছি,—তাঁকে আমি এক-কানাকড়িরও কেয়ার করিনে। আমি আমার পাল তুলে চল্লুম।—তিনি যতদূর যা করতে পারেন তা পৃথিবী-সুদ্ধ সকলেরই জানা আছে, তার বেশি কী-আর করবেন,—বলো। যেমনি হোক, হাউমাউ করব না।—তা তো হল, এখন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে—

রামচরণ। (বিস্ময়ে) কী বলছ? ম্যানেজারের বিরুদ্ধে?

ফক্রু। কেন? ম্যানেজারের বিরুদ্ধে পুলিসে একটা দরখাস্ত?

রামচরণ। পুলিসে দরখাস্ত!—কিছুতেই না, কিছুতেই না! প্রথমত পুলিসকে দর্শনী দিতে হবে। তারপর কাজ-কর্ম আহার-নিদ্রা ত্যাগ। আদালতে-আদালতে ঘুরতে হবে। তারপরে, সাহেবের নামে নালিশ! আরো যে কী-বিপাকে পড়তে হবে, কী-ফল লাভ হবে তা ভগবানই জানেন।—সাহেবেরা যে এমনিতেই প্রকাশ্যভাবে আমাদের সহস্রবার ক'রে লাথি-ঝাঁটা মারে। কী ঘেন্না!

ফক্রু। ঠিক ঠিক, ব্যাটারা যেন এক-একজন নবাব-পুত্তুর!

রামচরণ। অবিশ্যি,—আমাদেরই দেশের লোকের দোষ—তারা পেটের দায়ে মানের দায়ে উমেদারি করতে সেলাম করতে যায়।

ফরু। ওদের কাছে সোহাগ ক'রে লৌকিকতা করতে যাওয়া ঝকমারির এক-শেষ। কাজ কী বাপু, আমাদের এমন-কী দায় পড়েছে?

রামচরণ। (হঠাৎ চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে) একটু আগে তোমার বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, কেমন-যেন গা-ছম্‌ছম্ করতে লাগল। (ইশারায়) জরু ঘরে নাই?

ফরু। (ঘরের দিকে উঁকি মারিয়া সোৎসাহে রসিকতা ও আবেগের সুরে) —ও গো, কোথায় গেলে,—বলি শুনছ? মন-মেজাজ ভারী নাকি গো। কী হল?

গান

যোবতী, ক্যান-বা করো মন ভারী।
পাবনা থাক্যে আন্যে দেব ট্যাকা-দামের মোটরি॥

রামচরণ। (উদ্বেগে) অন্ধকার দাওয়া। ছেলেটা?—তোমার ছেলেটাই বা কোথায়?

ফরু। (আহ্বান) খোকা? এইখানে এসে মোড়ায় বোস্। (রামচরণকে) এক-একসময় খোকা যে চুপচাপ ক'রে ব'সে-বসে কী ভাবে! আপন মনে হাসে, মুখভঙ্গি করে। খোকাটা ভালো ক'রে কথা কইতে পারে না ব'লে ওর মনের যা-কিছু মনেই থেকে যায়।—খোকা—! (আহ্বান) চারিদিক যে নিঃশব্দ। (এইবার শঙ্কিতভাবে) ওদিকে গ্রামে আবার ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের তাঁবু পড়ল।

রামচরণ। তাইতো! সে-সঙ্গে বয় বরকন্দাজ, কনেস্টবল, খানসামা—কত-কী রয়েছে।

ফরু। শুধু কি তাই? আবার, কুকুর, ঘোড়া, মহিষ, মেথর,—(বাহির হইতে হাঁক আসিল)

নেপথ্যে। আছিস নাকি? (মেথরের প্রবেশ)

মেথর। (ফরুকে দেখিয়াই ব্যঙ্গ ও রাগত-স্বরে) এই যে—বাছাধন!

ফরু। (স্বগত, বিস্ময়ে) ব্যাটা সাহেবের-মেথর! (মেথরকে) এই যে!—তা কী মনে ক'রে?

মেথর। (কড়া-মেজাজে) সাহেবের জন্য মুর্গী, আণ্ডা, কুকুরের জন্য মাংস—চার সের ঘি।

ফরু। (মেথরকে সক্রোধে) ব্যাটা নচ্ছার কোথাকার?—বেরো, বেরো, দূর হ বলছি! (তাড়া করিতেই মেথরের পলায়ন)

রামচরণ। খুবই অত্যাচার হচ্ছে জানি, কিন্তু কিছুই যে করবার জো নেই।

ফরু। কেন জো নেই?

রামচরণ। (হাসিয়া) তুমি ভাই যেমনটি ছিলে ঠিক তেমনিটি আছ দেখছি। বলি, ঘরে তো স্ত্রী-পুত্র আছে, না কী?

ফরু। থাকলেই-বা,—তাবলে, কিছুই করবে না? বসে-বসে কেবল এরূপ অপমান সহ্য করবে? (হঠাৎ রামচরণ উচ্চকিত হইয়া ফরুকে সতর্ক হইতে ইশারা করিল,—একটু পরেই মেথরের সঙ্গে সার্জেণ্ট ও চাদর-কাঁধে মাধব চাটুজ্যের প্রবেশ)

সার্জেণ্ট। (ফরুকে সরোষে) সাহেবের মেথরকে তোমরা তাড়িয়ে দিয়েছ?

মাধব। (ছাতার ডাঁট উঁচাইয়া ফরুকে দাবড়াইয়া সার্জেণ্টকে) সাহেবের মেথরকে দূর করতে পারে এদের এমন স্পর্ধা হয়েছে? বটে? (সসম্ভ্রমে) মেথর হলেও সে যে সাহেবের মেথর! (ফরুকে সরোষে) ঘি বিনা-বাক্য-ব্যয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না? (ছাতা মাটিতে রাখিয়া চাদর ঝাড়িয়া লইয়া টিকি বাঁধিতে-বাঁধিতে ক্রোধে আগাইয়া) তাতে কি তোমার বাপের কড়ি লাগত? কী ভেবেছ? এরা কি এমনি মেথর? যে-সে লোক? হ্যাঁ, সাহেবের মেথর যে! (বারবার 'মেথর, মেথর'-শব্দ শুনিতে শুনিতে মেথর ক্রুদ্ধ ও বেদনাহত হইয়া অস্বস্তিতে পায়চারি করিতে করিতে স্বগত বলিতে লাগিল—"কোথাকার এক বিট্‌লে বামুন! কী বলছে দ্যাখো—আঃ!")

রামচরণ। (চাপা-রহস্যে গম্ভীরভাবে) তাইতো, সাহেবের মেথর যে! সে কি সামান্য-লোক হতে পারে? গ্রহ মন্দ! তাই-না ফরুটার এমন দুর্বুদ্ধি!

মাধব। (সাহেবকে) সাহেব!—ঘৃত-সংগ্রহের জন্য কেউ কোথাও যায় নাই।

সার্জেণ্ট। (ফরুকে) তাহলে তো মেথরটা ঠিকই বলেছে। (মেথরকে ডাকিয়া ফরুকে দেখাইয়া দিয়া) ধরো, শালার কান ধরো।

মাধব। (মেথরকে ধমকাইয়া) ধর্‌-না! দেরি হচ্ছে কেন? (মেথর আরো-নির্দেশের অপেক্ষায় সার্জেণ্টের দিকে চাহিয়া রহিল)

সার্জেণ্ট। (ফরুকে কানে ধরিয়া সরাইয়া নিয়া যাইবার জন্য অঙ্গুলি নির্দেশে) কানে ধরে নিয়ে ওকে তাম্বুর চারধারে ঘৌড়দৌড় করাও।

মাধব। (মেথরকে চোখ-রাঙাইয়া) শুনিসনে ! সাহেব কী বলছে ?—ঘোড়দৌড় করা !—ভাবছিস কী ? (মেথর ফরুর কান ধরিতে আগাইয়া গেল। ফরু তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল—মেথর ডিগ্‌বাজি খাইয়া 'বাপরে' বলিয়া হুমড়ি খাইতে-খাইতে গড়াইল ও তখনি "পুলিস, পুলিস" বলিয়া চেঁচাইয়া ছুট দিল। এবারে রুল বাগাইয়া সার্জেণ্ট নিজেই "অল্‌রাইট্‌" বলিয়া আগাইয়া-যাইতেই "তবে রে !"—বলিয়া ফরু সার্জেণ্টের হাত হইতে রুল টানিয়া লইল ও "বেরো,—বেরো শয়তান !" বলিয়া বারবার গলাধাক্কা দিতে-দিতে প্রাঙ্গণের সীমানায় নিয়া ঠেলিয়া সার্জেণ্টকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিল)

মাধব। (ভয়ে কাঁপিতে-কাঁপিতে কাছা-কোঁচা সামলাইতে-সামলাইতে ফরুর গতিবিধির দিকে দৃষ্টি রাখিতে-রাখিতে এক-পা-দু-পা করিয়া সরিয়া গিয়া স্বগত বলিয়া উঠিল—) বেটা তো জোয়ান কম নয় ! বাবা ! বেটার কী বুকের ছাতি ! (এমন সময় "বাবা—বাবা"—বলিয়া বাহির হইতে ভয়ে কাঁদিতে-কাঁদিতে তমিজ ছুটিয়া আসিল, সে-সঙ্গে ফরিদাও "কী হল গো' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ফরুর দিকে আগাইল। এদিকে মেথর, সার্জেণ্ট ও পুলিস-সহ প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া পিছন হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ধাবমানা ফরিদার চুলের-গোছা টানিয়া ধরিল। ফরু অম্‌নি লাফ দিয়া মেথরকে ধরিয়া টান মারিতেই—পুলিসেরা তাড়াতাড়ি তাহাকে ঘিরিয়া লইয়া হাতকড়া পরাইয়া টানিয়া বাহিরে নিয়া যাইতে লাগিল। ক্রোধে-উত্তেজিত বাঘের মতো ভীষণ-দর্শন বন্দী-ফরু ফিরিয়া-ফিরিয়া ফরিদা ও তমিজকে দেখিতে লাগিল)

রামচরণ। (ফরুকে উদ্বেগে) তারপরে ?—শেষটায় তবে জেলের আশ্রয়ই নেবে ?

ফরু। (রামচরণকে) উকিল রাখব না। হাজত-হাতকড়া থেকে খালাস আমি চাইনে। হাজত, জেল,—অদৃষ্টে যা থাকে—চললুম।

ফরিদা। (সচীৎকারে ব্যাকুলকণ্ঠে) ওগো, কোথায় যাচ্ছ ?

ফরু। (ফরিদাকে) যাচ্ছি জেলে। তুই খোকাকে নিয়ে ঘরে যা—(বিস্ময়) ও কী ? চোখে জল কেন ? কী হয়েছে ? ভাবনা কী, দুঃখ কিসের ? (ইঙ্গিতে ফরিদাদের দেখাইয়া দিয়া রামচরণকে) চললাম দাদা, দেখো—তুমি এদের উপর একটু দৃষ্টি রেখো। (পুলিস দুয়ারের পাট ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া ধানের বস্তা বাহির করিয়া বস্তার মুখ মেলিয়া "ধান" ?—বলিয়া স্বগত প্রশ্ন করিয়া বস্তা ও ফরুকে টানিতে-টানিতে বাহিরে লইয়া যাইতে লাগিল)

রামচরণ। (প্রস্থানমুখী সার্জেণ্টকে) ধান লুট ?—প্রজার ধান লুট ?—লোককে উৎপীড়ন করবার তোমার কোনো অধিকার নাই।

সার্জেণ্ট। (প্রস্থানের মুখে রুল দেখাইয়া শাসাইয়া) অধিকার আছে কি না—পরে দেখা যাবে।

(ফরুকে লইয়া পুলিসদল ও মাধবের প্রস্থান)

রামচরণ। (ক্ষোভে বিরক্তিতে) কবে যে দেশ থেকে এ-কুগ্রহ যাবে !

ফরিদা। (ঊর্ধ্ব দিকে চাহিয়া সকাতরে) হাঁ আল্লা ! (মুখ ফিরাইয়া অশ্রু-গোপন)

তমিজ। (ফরিদার আঁচল টানিয়া) ঘরে চলো-না !

ফরিদা। (তমিজকে দেখাইয়া দিয়া রামচরণকে) তোমার হাতে আমার এই অনাথকে—(কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সামলাইয়া লইয়া সকাতরে) অনাথকে তুমি রক্ষা করো।

রামচরণ। (ফরিদাকে) তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এ সম্বন্ধে যা কর্তব্য আমি তা করব। (সস্নেহে ফরিদাকে) আর তুমি ?—তুমি এখন কোথায় যাবে ?

ফরিদা। (নিজের ঘর দেখাইয়া দৃঢ়কণ্ঠে) যাব আবার কোথায় ? থাকব আমার স্বামীর ঘরেই। আমার কোনো ভাবনা নাই। (ছেলে-তমিজকে লইয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল)

(মাধবের প্রবেশ। দূর হইতে আক্রোশের সহিত লক্ষ্য করিতে-করিতে আগাইয়া আসিয়া)

মাধব। (হাত পাতিয়া সতর্জনে ফরিদাকে) বাকী খাজনা ?

ফরিদা। (সকাতরে) আমার নাবালক ছাওয়াল। এখনই কোথা থেকে খাজনা দিই !

মাধব। (ব্যঙ্গ) নাবালক ছাওয়াল !—ওদিকে নূতন-নূতন আইন হচ্ছে যে। ন্যায্য খাজনা আদায় করা ছাড়া অন্য পাঁচ-রকম পাওনা একেবারে বন্ধ। এখন আমাদের দান-খয়রাত করতে গেলে ফতুর হতে হবে যে। বিষয়-রক্ষা, সম্ভ্রম-রক্ষা করা যে দুরূহ। অনেক প্রজাই বশ্যতা স্বীকার করল, কেবল কিছুতেই বাগ মানল না—(নেপথ্যে ফরুর উদ্দেশে চাহিয়া) ঐ উদ্ধত-প্রকৃতির যুবক।—তোর স্বামীটার কথা বলছি।

ফরিদা। (ঊর্ধ্বে চাহিয়া সকাতরে অসহায়ের স্বরে) আল্লা !

রামচরণ। (সহানুভূতির স্বরে) তুমি মেয়ে-মানুষ, এ সমস্ত-কথা বুঝবে না। (পুলিসের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) ঐ-ডাঙার বাঘের মুখ হতে যেটুকু বাঁচল—(মাধবের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) এই জলের কুমির তার প্রতি আক্রমণ করল।

শুনলে কি ? মহাজন তার কী-হুকুম জারি করল ? দেখছ কী, যথাসর্বস্ব নীলাম হল ব'লে !

মাধব। (ভ্যাংচাইয়া ভ্রুকুটির সহিত রাগে গরগর করিতে করিতে) মেয়েমানুষ ! ওসব ঢের দেখা আছে !—মেয়েমানুষ ! (ভুলে ছাতা ফেলিয়া প্রস্থান। ফরিদা তমিজকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহাকে দুইহাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল)

ফরিদা। (মুখ ফিরাইয়া ধীরে-ধীরে দৃঢ়কণ্ঠে রামচরণকে) মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি ব'লেই যে সমস্ত চুপ ক'রে সহ্য করতে হবে, সে আমি বুঝিনে। আমাদের পক্ষেও ন্যায়-অন্যায় সম্ভব-অসম্ভব আছে।

রামচরণ। চুপ-চুপ ! এখন ওসব বললে বিস্তর পীড়া ভোগ করতে হবে।

ফরিদা। (স্থির ও দৃঢ়-কণ্ঠে) তা, করতে হয় তো করব !

রামচরণ। (ফরিদার দিকে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চাহিয়া থকিয়া) তোমার এই পরিচয় পেয়ে, জীবন সার্থক মনে করি !

(ফরিদা দীর্ঘনিশ্বাসে তমিজকে লইয়া ধীরে-ধীরে ঘরের দিকে যাইতেছে। এমন সময় প্রতিবেশী রমজানের প্রবেশ। "এতদুর ?" বলিয়া রামচরণ ও ফরিদার দিকে সন্দিগ্ধ-বাঁকাদৃষ্টিতে চাহিতে-চাহিতে আগাইয়া)

রমজান। আজকের দিনে কাকেও বিশ্বাস করবার জো নাই।

রামচরণ। (হাসিয়া রমজানকে) বিশ্বাস করা কিন্তু কর্তব্য।

ফরিদা। (কঠিন ব্যঙ্গের স্বরে রমজানের প্রতি রুক্ষ-কটাক্ষপাত করিয়া রামচরণকে) বলছ বটে,—কিন্তু, কিছুতেই যে ওকে বিশ্বাস করতে পারি না।

রমজান। (কণ্ঠে কৃত্রিম-দরদ ঢালিয়া সক্রোধে) ঐ ফরু—সে যে আমার আপন পিস্‌তুতো ভাই ! (বিস্ময়ের ভানে) খাজনা বাকী ? এ তো আমি জানতেও পারি নাই। (রামচরণ ও ফরিদার দিকে সন্দেহজনক অবৈধ-সম্বন্ধের অনুমানে রক্ত-চক্ষু করিয়া)—সংসারটা বীভৎস। ছিঃ ! ছিঃ ! দিন দিন এ-সব কী হচ্ছে।

রামচরণ। (রমজানকে দেখাইয়া ফরিদাকে সান্ত্বনা ও ভরসা দেওয়ার স্বরে) শুনলে তো ! এখন, ও-যে তোমার পরম-আত্মীয় ওই-ই যে তোমাদের আশ্রয় ?

ফরিদা। (রাগে ও ঘৃণায়) এ কি আশ্রয় ?—না, স্বার্থের ফাঁদ ? সব ষড়যন্ত্র, সবই ওর ছলনা !

রমজান। (ফরিদাকে) তুমি একা, তাতে স্ত্রীলোক—(তমিজকে দেখাইয়া দিয়া)

তোমার ঐ সোনামণিকে তুমি একা রক্ষা করবে ? (রামচরণকে একপাশে ডাকিয়া নিয়া চুপি-চুপি কিছু বলিল)

রামচরণ। (রমজানকে দেখাইয়া তাহার সহিত ফরিদাকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল) এ তোমার স্বজাতি-যে !

ফরিদা। (ক্রোধের উত্তেজনায় রামচরণকে) ওর সঙ্গে যাব ? যেতে বলছ ? না, না,— আমাকে যদি কাটো—তবু না। তমিজ, ঐ মণি—আমার চোখের-মণি, আমি ছাড়া এই সংসারে ওর আর কেউ নাই। (তমিজকে আরো কাছে টানিয়া আনিয়া চাপিয়া ধরিল)

রমজান। তবে থাকো ! (কৃত্রিম-ক্রোধে মুখ-ফিরানো)

(এই সময়ে রামচরণের স্ত্রী, চাষী-রঘুনাথের মেয়ে রানী ও কয়েকজন প্রতিবেশী আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচরণ স্ত্রীকে ইশারা করিলে সে আগাইয়া আসিল, তমিজ "মাসি মাসি" বলিয়া ছুটিয়া তাহার কাছে গেল। "এসো বাবা।"—বলিয়া রামচরণের-স্ত্রী তমিজকে কোলে তুলিয়া লইল। রানী গিয়া নিজের কোঁচড় হইতে মোয়া তুলিয়া লইয়া তমিজের হাতে দিল। পরে কোঁচড়ের চাল আনাজপাতি ঘরের দাওয়ায় ঢালিয়া রাখিল)

রমজান। (রানীর দিকে চাহিয়া সক্রোধে) এ সমস্তই কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে !

রানী। না না, কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি নয়।

রমজান। (রানীকে ধম্‌কাইয়া) তুমি কী বোঝ ?—

রানী। (আনাজগুলি দেখাইয়া) বাবা এসব পাঠিয়ে দিয়েছেন।

(রানী ফরিদার পাশে আসিল, রামচরণের-স্ত্রী ও রানীর সঙ্গে তমিজসহ ফরিদা ঘরের দিকে পা বাড়াইল)

রমজান। (ফরিদাকে শাসাইয়া) আচ্ছা ! তবে, তাই ভালো। (প্রস্থানোদ্যত। ছাতা খুঁজিতে মাধবের পুনঃ-প্রবেশ, হঠাৎ রানীকে দেখিতে পাইয়া উঁকি-ঝুঁকি মারা)

মাধব। (ফরিদাকে উদ্দেশ করিয়া) অনেক,—অনেক টাকা যে খাজনা বাকি। আজ কিয়দংশ শোধ করবে ব'লে ফকুটা প্রতিশ্রুত ছিল। (মাধবকে ইতিউতি চাহিতে দেখিয়া ভয়ে তমিজ "মা মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

মাধব। (তমিজকে দেখাইয়া ফরিদাকে) ছেলেটা কাঁদে কেন রে ?

রমজান। (আগাইয়া আসিয়া কাতরতার ভানে মাধবের পা-জড়াইয়া ধরিয়া) দাদাঠাকুরগো উপস্থিত বিপদ ; কী করি।—সাহেব-মারা মামলা।

মাধব। রাম-রাম! সন্ধ্যাবেলায় এ কী-বিপদেই-না পড়লাম। আদালতে সাক্ষ্য দিতে-দিতেই যে প্রাণ—

রমজান। (কৃত্রিম-দরদে হাউমাউ করিয়া) দাদাঠাকুর,—এখন বাঁচবার কী উপায়? (ফরিদার দিকে আড়চোখে চাহিয়া লইয়া) বউটার কী হবে?

একজন প্রতিবেশী। (মাধবকে) যদি বলি, সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ভাত ছিল না; খেটেখুটে ফরু এসে ভাত পায়নি, তাই, সাহেব যেমন তেড়ে এসেছে অমনি রাগের মাথায় তেড়ে গিয়ে তখনি সাহেবকে—

মাধব। (চোখ-পাকাইয়া প্রতিবেশীকে) খবরদার! হারামজাদা, আদালতে একবর্ণও মিথ্যা বলিস না—এত বড়ো মহাপাপ আর নাই। ওরে বাপরে। শেষ-কালে কি মিথ্যা-সাক্ষ্যের দায়ে পড়ব? কোর্টে বিস্তর লোক। (ছাতা কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত। প্রতিবেশীরা মাধবের শাসানিতে ভয়ে সচকিত)

(তখনই প্রতিবেশীদের প্রতি উক্তিরত রঘুনাথের প্রবেশ)

রঘুনাথ। (দৃঢ়কণ্ঠে সকলের প্রতি) ভয় নেই—ভয় নেই। দেশে স্বদেশী-আন্দোলন শুরু হয়েছে!—কিছু ভেবো না,—কলকাতা থেকে লোক আসছে। —কড়াগণ্ডা-হিসাবের চুলচেরা-মীমাংসা করবার জন্য। ভয় নাই,—তোমরা চলে এসো।

(প্রতিবেশীদের ডাকিয়া লইয়া প্রস্থান, রানীও তাহাদের সঙ্গে গেল)

মাধব। (সভয়ে বিস্ময়ে ফ্যাকাশে-মুখে মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে স্বগতোক্তি) সমস্তই স্বপ্নের মতো! স্বদেশী-আন্দোলন!—কলকাতা থেকে আসছে লোক! —(রঘুনাথের দিকে ক্রূর-কটাক্ষ হানিয়া স্বগত) আচ্ছা!—সবুর!—শোধ তুলব। দেখব কে বাঁচায়! (বলিতে-বলিতে অঙ্গুলির ইঙ্গিতে রঘুনাথের প্রতি প্রতিশোধের স্পৃহা জানাইয়া রমজানকে) এসো, চলে এসো (বলিয়া ডাকিয়া লইয়া কানে-কানে পরস্পর পরামর্শ করিতে করিতে প্রস্থান। ফরিদা, তমিজ, রামচরণ ও তাহার স্ত্রী সেদিকে চাহিয়া রহিল)

দৃশ্য ৩

(পল্লিপথ। মধ্যাহ্ন। রঘুনাথ ও অন্যান্য-লোকদের সঙ্গে আলাপরত ব্রতীন্দ্র ও মুকুন্দ। জনতার মধ্য হইতে তমিজ-সহ রামচরণ আগাইয়া মুকুন্দকে)

রামচরণ। (মুকুন্দকে) ঠাকুর, আপনার খাওয়া-দাওয়া ?

মুকুন্দ। আপনি কে ?

রামচরণ। নাপিত।

মুকুন্দ। (রামচরণের হাত-ধরা ছেলেটিকে দেখাইয়া) এটি কে ? ফরুর ছেলে ?

রামচরণ। ফরুরই ছেলে। (সস্নেহে তমিজের পিঠে হাত বুলাইয়া) মায়া পড়ে গেছে। আমরা বলি হরি, (তমিজকে দেখাইয়া)—ওরা বলে আল্লা, কোনো তফাৎ নেই। কুঠির ম্যানেজার-সাহেব স্বয়ং লাঠিয়াল-সহ প্রজার ধান লুট করে। ফরু-সর্দার কাকেও কোনোদিন ভয় করে না।—উৎপাতের সময় সে সাহেবের হাতে এক লাঠি বসায়। দু'বার পুলিসকে ঠেঙায়। সর্দার এখন হাজতে। তার একমাত্র পুত্র এই তমিজ,—আমার স্ত্রী-কে ও গ্রাম-সম্পর্কে 'মাসি' বলে।—আমার জোত-জমা বিশেষ-কিছু নেই ব'লে কুঠির-লোক আমার গায়ে হাত দেয় না।

রঘুনাথ। ক্রোশ-দেড়েক দূরে কুঠির কাছারি। তার তহশীলদার ব্রাহ্মণ। নাম মাধব চাটুজ্যে। যদি—

মুকুন্দ। তার স্বভাবটা ?

রঘুনাথ। তা,—যমদূত বললেই হয়।

রামচরণ। (এদিক-ওদিক চাহিয়া) এত বড়ো ধূর্ত নির্দয় কৌশলী-লোক আর দেখা যায় না।

রঘুনাথ। এই-যে ক'দিন দারোগাকে ঘরে পুষছে তার সমস্ত খরচা—

রামচরণ। খরচটা আমাদেরই কাছ থেকেই সে আদায় করবে !

রঘুনাথ। (ব্যঙ্গস্বরে) তাতে কিছু তার মুনাফাও থাকবে !

ব্রতীন্দ্র। (মুকুন্দকে) তুমি কলকাতায় চলে যেয়ো। আমাকে কিছুদিন এখানে থেকে-যেতে হবে। (মুকুন্দ প্রস্থানোন্মুখ)

রঘুনাথ। (মুকুন্দকে) আপনি খাবেন না ? চাটুজ্যের ওখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে তারপরে না-হয় যাবেন।

মুকুন্দ। (ক্ষীণ-হাসিতে) তা'বলে মাধব চাটুজ্যের অন্ন ?—জাত বাঁচাতে ?—না ! (ফিরিয়া ব্রতীন্দ্রের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া চাহিয়া মুকুন্দ অভুক্ত চলিয়া গেল)

(একদল গ্রামের লোককে সঙ্গে নিয়া অরুণের প্রবেশ। লোকগুলির কারো-বা মাথা-বাঁধা, কারো-বা পা-ভাঙা, কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে শাবল, যুবকেরা উত্তেজিত, বৃদ্ধেরা বিমর্ষ ও চিন্তিত)

অরুণ। (ব্রতীন্দ্রকে) আবার অশান্তি! পুলিসের একজন উচ্চ-কর্মচারী এসে এদের গুরুতর ক্ষতি করছে। এমনি দেশের অধিকাংশ-লোককে যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, কানন-গো, আদালতের আমলা—যে-কেউ এসে যখন-তখন অনায়াসেই মারতে পারে, তবে (ব্রতীন্দ্র-আগাইয়া আসিয়া গানে)

গান

ব্রতীন্দ্র। (অরুণকে) ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না।

হবার নয় যা কোনোমতেই হবে না সে,—হতে দেব না॥
পড়ব না রে ধুলায় লুটে যাবে নারে বাঁধন টুটে,
যেতে দেব না।
মাথা যাতে নত হবে এমন বোঝা মাথায় নেব না॥

ব্রতীন্দ্র। (গ্রামবাসীদের প্রতি) তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানী, ফৌজদারী যেমন-ইচ্ছা নালিশ কর্, আমি মোকদ্দমা চালাব।

সর্দার। (হাত জোড় করিয়া) কর্তা, মামলা করে লাভ কী? পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আমরা ভিটায় যে টিকতেই পারব না।

রঘুনাথ। (ব্রতীন্দ্রের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া) আপনি থাবেন না? মাধব চাটুজ্যে—সে যে আপনার স্বজাতি!—

ব্রতীন্দ্র। কার কথা বলছ?—চাটুজ্যের?—কী বলছ? মুসলমানকে যে-লোক পীড়ন করছে—তারই ঘরে আমার জাত থাকবে? আর, এই যে রামচরণ,—বিপন্ন মুসলমানের-ছেলেকে যে রক্ষা করছে, এর উপর আবার সমাজের নিন্দাও যে বহন করতে প্রস্তুত, এমন-যে রামচরণ—তারই ঘরে কিনা আমার জাত নষ্ট হবে? আচার-বিচারের ভালো-মন্দের কথা পরে ভাবব। এখন তো তা পারলাম না। হ্যাঁ, কী বললে? চাটুজ্যে আমার স্বজাতি? (রামচরণকে) ভাই রামচরণ, আমি তোমার ওখানে দুচার-দিন থাকব।

রামচরণ। আপনি এই অধমের এখানে থাকবেন, তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কিছুই নাই। কিন্তু দেখুন—কী থেকে আবার কী হয়। (মাধবের উদ্দেশে নেপথ্যে চাহিয়া ভীতি-প্রকাশ) ব্যাটা আবার এদিকে আসছে না তো?

ব্রতীন্দ্র। আমি এখানে উপস্থিত থাকলে পুলিস কোনো উৎপাত করতে সাহস করবে না। যদি করে, আমি তোমাদের রক্ষা করব।

(অতি-কুণ্ঠিতভাবে হাত-কচলাইতে-কচলাইতে মাধব চাটুজ্জ্যের প্রবেশ। ব্রতীন্দ্র-বাদে সকলের "ঐ রে!" বলিয়া ভীতি-প্রকাশ)

মাধব। (ঝাঁকিয়া-পড়িয়া অতি-বিনিতভাবে নমস্কার-পূর্বক) অধম মাধব চাটুজ্জে,—আমার পুণ্যবল,—তাই আপনার দেখা পেলাম। দয়া করে একবার যদি,—(কুণ্ঠায়) মানে, অধমের বাড়িতে আপনাকে যেতে বলছি। এতে হয়তো আমার অপরাধই হচ্ছে। তবে আপনার দয়া। —এই আর কী!

ব্রতীন্দ্র। (সরোষে) আমি তোমার ঘরে জল গ্রহণও করব না। অন্যায়কারী অত্যাচারী!

মাধব। (ক্রোধে খাড়া হইয়া উঠিয়া টিকি নাড়িয়া) কে হে তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়? তাইতো, লোকটা কম নয় তো দেখছি! ভেবেছিলাম ভিক্ষে নিতে এসেছে; এ যে চোখ রাঙায়। ওরে তেওয়ারি।—

(লম্বা-লাঠিহাতে তেওয়ারির প্রবেশ)

তেওয়ারি। হুজুর!

মাধব। এই বেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটা লোক –

তেওয়ারি। লোক কেন? কী করতে হবে?

মাধব। আর কিছু নয়—একবার কেবল সাহেবকে জানিয়ে আসুক—(ব্রতীন্দ্রকে দেখাইয়া) একজন ভদ্রলোক কোথা থেকে এসে সাক্ষী ভাঙাবার চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে। (ব্রতীন্দ্রের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া প্রস্থান। সঙ্গে তেওয়ারির ও মাধবের অনুগমন)

ব্রতীন্দ্র। (গ্রামবাসীগণের প্রতি)

গান

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি বারে বারে হেলিস-নে ভাই।
শুধু তুই ভেবে-ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস-নে ভাই।।
একটা-কিছু করে-নে ঠিক, ভেসে-ফেরা মরার অধিক।
বারেক এদিক বারেক ওদিক এ খেলা আর খেলিস-নে ভাই।।
মেলে কিনা মেলে রতন করতে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন চোখের জলটা ফেলিস নে ভাই।।

ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিস-নে আর হেলা-ফেলা,
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা তখন আঁখি মেলিস-নে ভাই ॥
(সদলে পুলিসসাহেবের প্রবেশ। দলের সঙ্গে
মাধব চাটুজ্জেকেও দেখা যাইতেছে)

ব্রতীন্দ্র। (আগাইয়া গিয়া পুলিসসাহেবকে) গুড্ ইভ্নিং স্যার।

পুলিসসাহেব। তুমি কোন্ জাত? (ব্রতীন্দ্রের আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করা)

ব্রতীন্দ্র। বাঙালী।

পুলিসসাহেব। ওঃ! খবরের-কাগজের সঙ্গে তোমার য়োগ আছে বুঝি?

ব্রতীন্দ্র। না।

পুলিসসাহেব। তবে তুমি কী করতে এসেছ?—

ব্রতীন্দ্র। পুলিসের অত্যাচারে গ্রামের দুর্গতির চিহ্ন দেখে এবং আরো-উপদ্রবের সম্ভাবনা আছে জেনে, প্রতিকারের জন্য এসেছি।

পুলিসসাহেব। লোকগুলো অত্যন্ত বদমায়েস। সে-কথা তুমি জান?

ব্রতীন্দ্র। তারা বদমায়েস নয়, তারা নির্ভিক, স্বাধীনচেতা। তারা অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে পারে না।

পুলিসসাহেব। (ধমকের সহিত) এখানকার অবস্থা তুমি কিছুই জান না।

ব্রতীন্দ্র। আপনি এখানকার অবস্থা আমার চেয়ে অনেক কম জানেন।

পুলিসসাহেব। (মাধব চাটুজ্জ্যেকে) বাবু, শুনছি প্রজারা নাকি পুলিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা-সাক্ষী দিতে প্রস্তুত?

মাধব। (কৃত্রিম-বিস্ময়ে) এও কি কখনো সম্ভব? এত তোদের ক্ষমতা?

পুলিসসাহেব। (ব্রতীন্দ্রকে) আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি —তুমি যদি কোনো-প্রকার হস্তক্ষেপ করো তাহলে খুব সস্তায় নিষ্কৃতি পাবে না।

ব্রতীন্দ্র। আপনি যখন প্রতিবিধান করবেন না তখন আমার আর কোনো উপায় নাই।—আমি গ্রামের লোকদের নিজের চেষ্টায় পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে উৎসাহিত করব।

(পুলিসসাহেব চলিতে-চলিতে হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যুৎ-গতিতে ব্রতীন্দ্রের দিকে ফিরিয়া গর্জিয়া উঠিলেন)

পুলিসসাহেব। কী! এত বড়ো স্পর্ধা!

মাধব। (ব্রতীন্দ্রকে বক্রস্বরে) গেল, গেল,—স্বদেশীটা জেল খাটতে গেল। এতদিন যায় নি, এটা-ই আশ্চর্য।

(গ্রামবাসীগণ-সহ উক্তিরত কবির প্রবেশ)

কবি। (মাধবের প্রতি) জেল ভালো। লোহার বেড়ি মানুষের মতো মিথ্যা কথা বলে না।

ব্রতীন্দ্র। (মাধবকে ব্যঙ্গ-হাস্যে) জেলের মধ্যে তোমাদের মতো মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন-কাপুরুষের সংখ্যা অল্প,—বাইরে কিন্তু অনেক বেশি।

(কবি দ্বিতীয়-কথা না বলিয়া ধীরগমনে চলিয়া গেলেন, দলের সকলে তাঁহার অনুগমন করিল। পুলিসসাহেব রোষদৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়া রহিলেন, পরে ফিরিয়া মাধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—)

পুলিসসাহেব। দেশের লোকদের মধ্যে এ-সকল কিসের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে!

মাধব। (কুণ্ঠিতভাবে) একে তো লেখা-পড়া নাই, তাতে এদের ধর্ম-বোধও নিতান্তই অপরিণত।

নেপথ্যে। (নেপথ্যে মেমের কণ্ঠে) হ্যারি,—শুনছ?

মাধব। (পুলিসসাহেবকে) হুজুর, মেমসাব্ আয়া।

পুলিসসাহেব। (চম্‌কিয়া হাতঘড়ি দেখিয়া) বাই জোভ্! তাইতো, দেখছি দেরি হয়ে গেল! (কাজের কথা স্মরণ হওয়াতে তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেলেন, সকলে তাঁহার অনুগমন করিল)

(গাহিতে গাহিতে বিশ্ববান্ধবের প্রবেশ)

বিশ্ববান্ধব। গান

কে এসে যায় ফিরে-ফিরে আকুল নয়ন-নীরে।
কে বৃথা আশা-ভরে চাহিছে মুখ-'পরে
সে-যে আমার জননী রে॥
কাহার সুধাময়ী বাণী, মিলায় অনাদর মানি,
কাহার ভাষা হায়, ভুলিতে সবে চায়।
সে-যে আমার জননী রে॥
ক্ষণেক স্নেহ-কোল ছাড়ি, চিনিতে আর নাহি পারি,
আপন সন্তান করিছে অপমান—
সে-যে আমার জননীরে॥

পুণ্য-কুটিরে বিষণ্ণ কে বসি সাজাইয়া অন্ন,
সে-স্নেহ-উপহার রুচে না মুখে আর।
সে-যে আমার জননী রে॥
(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

(পল্লীগ্রাম। চাষী-রঘুনাথের গৃহ-প্রাঙ্গণ। রঘুনাথের কিশোরী-মেয়ে রানী পড়ন্ত-বেলায় প্রাঙ্গণে বসিয়া চুল বাঁধিতেছিল)

পাড়ার মেয়েরা। (নেপথ্য হইতে) সই, বেলা যে প'ড়ে এল, জল্‌কে চল্‌।

(রানী চকিতে সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল—)

রানী। ডাক্ লো ডাক্ তোরা বল্‌লো বল্—
বেলা যে প'ড়ে এল জল্‌কে চল্‌।

(রানী গৃহে গিয়া কলসী লইয়া আসিল ও বেণী দুলাইয়া সঙ্গিনীদের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল)

[নৃত্যনাট্যে বা মূকাভিনয়ে]

(কলসী-কাঁখে মেয়েদের সুদূর-নদীতে জল-আনিতে যাওয়া। তাহারা নদীচরে স্থানে-স্থানে বালু খুঁড়িয়া বহু-আয়াসে জল-সংগ্রহ করিল; শ্রান্তি-ক্লান্তিতে ফিরিয়া আসিতে প্রতি পদক্ষেপে হাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের খুব কষ্ট হইতেছিল। এভাবে তাহারা গ্রামের নিকট আসিয়াছে। এমন সময় নেপথ্যে **'আগুন আগুন'** চীৎকার উঠিল। কালিঝুলি-মাখা পোড়া-জামা-কাপড়ে জনকয়েক গ্রামবাসী দৌড়াইয়া আসিল। পুরুষেরা এদিকে-ওদিকে জল খুঁজিতে লাগিল)

রানী। (হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়িয়া যাওয়াতে ভীতভাবে) এখন কী করি! আগুন? ও মা, তাইতো! —আমি যে উনুনে আঁচ দিয়ে এসেছিলাম! (বলিতে বলিতে রানী উন্মত্তের মতো ছুটিয়া যাইতেছিল, তখনই রানীর-দাদা কিশোর আসিয়া চীৎকার করিয়া রানীকে বলিল—)

কিশোর। সর্বনাশ! হেঁসেলে আগুন লেগে গেছে।

রানী। রক্ষা করো, রক্ষা করো, কে কোথায় আছ— (ছুটিয়া প্রস্থান)

(পুরুষেরা মেয়েদের কলসীগুলির দিকে একাগ্র-দৃষ্টি-দিয়া চাহিতে লাগিল। তাহারা "শিগ্‌গির জল দাও" বলিতেই "এ যে আমাদের সারাদিনের পিপাসার সম্বল" বলিয়া মেয়েরা কলসীর জলটুকু ছাড়িয়া দিতে ভীত-উদ্বিগ্ন হইল। পুরুষেরা "ওগো, দাও" বলিতেই মেয়েরা হতবিহ্বল হইয়া, কলসীগুলি আগাইয়া দিলে পুরুষেরা কলসীগুলি লইয়া "ওরে, চল্ চল্" বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। "হায়, হায় কী হয়ে গেল গো" বলিয়া মেয়েরা কপালে করাঘাত করিতে করিতে পিছনে ছুটিল)

দৃশ্যান্তর

(কবির জমিদারি—পল্লীগ্রাম। সদর-রাস্তার পার্শ্বে চাষী-রঘুনাথের গৃহ-প্রাঙ্গণ। আশেপাশে অগ্নিদাহের চিহ্ন। গ্রামবাসীদের কয়েকজন চাটাইয়ে উপবিষ্ট)

একজন গ্রামবাসী। বুকের মধ্যে এখনো কাঁপছে।

আর-একজন। আগুনের আঁচে চোখ বুজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না।

৩য় ব্যক্তি। ছ্যাথ্, যখন চূড়ান্ত হয় তখনই শান্তি হয়। এত ভয় করছিস্ কেন? তাঁর নাম কর্। কেবল বাঁচতেই চাস্? যিনি মারেন, তাঁর গুণগান করবিনে বুঝি? ওরে সেই গানটা ধর্—

সকলে। গান

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি বলো ভাই ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে ধন্য হরি রাজ্য-পাটে,
ধন্য হরি শ্মশান-ঘাটে ধন্য হরি ধন্য হরি॥

সুধা দিয়ে মাতান যখন, ধন্য হরি ধন্য হরি।
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন, ধন্য হরি ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে-বুকে, ধন্য হরি হাসি-মুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে ধন্য হরি ধন্য হরি॥
আপনি কাছে আসেন হেসে ধন্য হরি ধন্য হরি।
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে-দেশে ধন্য হরি ধন্য হরি।
ধন্য হরি স্থলে-জলে ধন্য হরি ফুলে-ফলে,
ধন্য হরি পদ্মদলে চরণ-আলোয় ধন্য করি'॥

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—(বলিয়া একসুরে তারস্বরে একটানা সকলে গাহিয়া চলিয়াছে—এই সময় কবি ও আনন্দমোহনের

প্রবেশ। গৃহকর্তা রঘুনাথ মোড়া আনিয়া বসিতে দিল ও প্রণাম করিয়া কবির ও আনন্দ-মোহনের পায়ের ধুলা বুকে ও মাথায় মাখিয়া করজোড়ে বলিল—)

রঘুনাথ। আমার জনম সার্থক হল। আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল।

কবি। মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।—প্রাণ ডাকছে; দেখলাম—একেবারে মাঝখানে গিয়ে পড়তে না পারলে এ ঘোর কাটবে না।

রঘুনাথ। আর তো পারিনে।

কবি। ভয় নেই।

একজন বৃদ্ধ। কাশি-জ্বর হয়েছিল, তিন দিন লঙ্ঘন দিয়েছি। আজ অন্নপথ্য ক'রে পদধূলি নিতে এসে—(খক্-খক্ কাশি)। জয় হোক মহারাজের।—(কাশি)

রঘুনাথ। (জোড় হাত করিয়া আবেদন জানানো) ছেলেকে একটা চাকরি হুজুর!—

কবি। তোমার তো চাষের কাজ আছে, তবে ছেলেকে অন্য কাজে কেন?

রঘুনাথ। চাষে আমাদের কুলায় না। একদিন ছিল সুখেই ছিলাম, এখন উপায় নাই। আর চলে না। (কপালে করাঘাত করিয়া হতাশা প্রকাশ)

রহিম। সে-বছর ভালো ধান হয়নি ব'লে চুঁচড়োয় বুড়ো-বাপের কাছে এনৃছাপ নিতে গিয়েছিলাম। তা, সে বললে, আমি তোদের কিছু ছেড়ে দিচ্ছি, তোরাও আমাকে কিছু খেতে দিস। তার কাছে দরবার করতে গিয়েছিলুম ব'লে সেই মনোবাদে তোমার এখানকার আমিন আমাকে ফেরেবি-মোকদ্দমা ক'রে তিন মাস জেল খাটিয়েছিল। আমি তখন (অভিমানে) তোমার মাটিকে সেলাম ক'রে ভিন্-এলাকায় চলে গিয়েছিলুম।

রঘুনাথ। আমাদের মরণ সর্বত্রই। পালাব কোথায়?

আনন্দমোহন। তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করো, সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র করো, তাহলে অনায়াসে ট্রাক্টর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্রে কাজ করলে জমির তারতম্যে কিছু যায় আসে না, যা লাভ হবে তা তোমরা সকলে ভাগ ক'রে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে এক-জায়গায় মজুত রাখবে, সেখান থেকে মহাজনেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে।

রহিম। কিন্তু, করবে কে?

রঘুনাথ। আমরা নির্বোধ, এত বড়ো ব্যাপার ক'রে তুলতে পারব কী করে?

কবি। গান

ও জোনাকি, কী সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ।
এই আঁধার-সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ॥
তুমি নও তো সূর্য নও তো চন্দ্র
তাই বলেই কি কম আনন্দ!
তুমি আপন জীবন পূর্ণ ক'রে আপন আলো জ্বেলেছ॥
তোমার যা আছে তা তোমার আছে,
তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে।
তোমার অন্তরে যা শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ॥
তুমি আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠো,
তুমি ছোটো হয়ে নও গো ছোটো।
জগতে যেথায় যত আলো সবায় আপন ক'রে ফেলেছ॥

কেশোরুগী। (তন্দ্রায় ঝিমাইতেছিল, ঘুম-ঘোর ভাঙিল, গানের শেষে চোখের পাতা একটু মেলিয়া পাশের রহিমকে জিজ্ঞাসা করিল) এখন কি সত্যপীরের গান হচ্ছে? (কাশি)

রহিম। কী সব বাজে বকছ? (কেশো-রুগীর প্রতি বিরক্তিতে চাহিয়া লইয়া কবিকে) হুজুর, আমরা কুকুর; ক'ষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি। গ্রামে আগুন লাগল। গ্রামের লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কিছু করতে পারে না। ঘরের চাল ভেঙে আমাদের শেষে আগুন নিবারণ করতে হল।

রঘুনাথ। (কৃতজ্ঞতার সুরে) ভাগ্যিস, ঘর ভাঙলে, তাই বাঁচতে পেরেছি। নদী বহুদূরে, ফি-বৎসর বড়ো জলাভাব—

কবি। তোমরা কুয়ো খোঁড়ো, আমি বাঁধিয়ে দেবার খরচ দেব।

রমজান। মহাশয়, আপনি কি মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজতে চান?

কবি। তোমরা যতক্ষণ কুয়ো না খোঁড়, আমি কিছুই দেব না।

আনন্দমোহন। কয়জন মিলে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তে পারবে না? গোরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙে যায়, বর্ষাকালে দুর্গম হয়, তার জন্যে তোমরাই দায়ী, তোমরা ইচ্ছা করলে সকলে মিলে সহজেই ওখানটা ঠিক করে নিতে পার। কিন্তু—তা তো করবে না!

রমজান। (ব্যঙ্গ) বাঃ, আমরা রাস্তা ক'রে দেব আর যত বাবুদের যাতায়াতের সুবিধে হবে!—বেশ তো!

আনন্দমোহন। (বক্রোক্তি) অপরের কিছু সুবিধা হয়, এ বুঝি সহ্য হয় না। তার চেয়ে কষ্ট ভোগ—সেও ভালো ?—তাই না ? এই তোমাদের বুদ্ধি ?

কবি। এদের ভালো করা কঠিন। চলো! (বিরক্তিতে আসর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিলেন)

সকলে। (কবি চলিয়া গেলেন, অন্যরা পূর্ববৎ "হরিবোল হরিবোল" বলিয়া নামগানের ধুয়া টানিতে লাগিল। কিন্তু তখনই সেই ধ্বনি ছাপাইয়া বাহিরের পথ হইতে অন্য সুরে শব-বাহকদের শব্দ উঠিল—

নেপথ্যে। বলো হরি—হরিবোল, বলো হরি—হরিবোল!

সকলে। দেখে আসি—কে গেল! চলো চলো! (শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া সকলে বাহিরে চলিয়া গেল)

দৃশ্য ৪

(পল্লীগ্রাম। চাষী-রঘুনাথের অন্দরের উঠানের কোনা দিয়া সন্তর্পণে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক উঁকি-ঝুঁকি মারিতে-মারিতে মাধব চাটুজ্জের প্রবেশ।)

মাধব। (চতুর্দিকের অগ্নিদগ্ধ-দৃশ্য দেখিতে-দেখিতে প্রকাশ্যে কৃত্রিম-বিস্ময়ে) এ কী কাণ্ড! আগুন!—(স্বগত আত্মপ্রসাদে)—ঠিক, ঠিক হয়েছে। যেমন পরামর্শ দিয়েছি,—আগুন-লাগিয়ে দেবে, তারপরে অগ্নিদাহের গোলমালের মধ্যে কার্য-সিদ্ধি করতে হবে। তা, ঠিকই করেছে দেখছি (এই বলিয়া ঘরের দিকে বার-বার ক্রূর-দৃষ্টি-নিক্ষেপ) তবে, আমি কেবল এই কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম। সে যে এত শীঘ্র এমন চারদিকে—(অন্দরের দিকে কটাক্ষপাত করিতে-করিতে) ভিতরে-যাওয়ার পথ-করবার চেষ্টা করা যাক্।—ঠাকুর, না, কুকুর! স্বদেশী! কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া মূর্খ,—নির্বোধদের কাছে দাঁত দেখিয়ে ছুটা স্বদেশী বক্তিমা দিয়ে যে রোজগার করে খায়, রঘুনাথটা তাকে আমার সঙ্গে বিদ্রূপ-করবার জন্যে শহর থেকে ধরে নিয়ে এসেছে—এতটা বুদ্ধি যার জোগাতে পারে,—তার ফলটা যে কী হতে পারে, সে আর তার মাথায় জোগাল না ? পিপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে। (রঘুনাথের উদ্দেশে সক্রোধে) চাষা-ভুষোর বাড় বেড়েছে। আমাকে চেনে না সে ? ছোটোলোক! আমি কী-না করতে পারি ? তার এক গালে চুন আর-এক গালে কালি লাগিয়ে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারি, ভিটেয় ঘুঘু-চড়াতে

পারি। তা না হলে সে তো জব্দ হবে না! (হঠাৎ কিশোরকে আসিতে দেখিয়া) কী রে রঘুর ব্যাটা! আমার টাকাগুলোর কী হবে?

(কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। হাতে যে কিছুই নেই।

মাধব। কী শুভ-সংবাদটাই-না দিলে!

কিশোর। পথের ভিক্ষুক।—তোমার কাছে দাসত্ব ক'রে ঋণ-শোধ করব।

মাধব। বটে?—তাই বুঝি? দাসত্ব করবে?—আমার? আমার বহু দুঃখের-অন্নে বুঝি ভাগ-বসাবার মতলব করেছ? তোমাকে চাকরী দেব,—আমি তত-বড়ো গর্দভ নই জেনো।

রানী। (এই সময়—"দাদা, ঘরে খুদ-কুঁড়ো আর বাকি রইল না। খেটে-খেটে আমার শরীরও আর"—বলিয়া কিশোরী রানী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল, উঠানে মাধবকে দাঁড়ানো দেখিয়া কী-যেন শঙ্কায় তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া গেল)

মাধব। (ঘরের দিকে একবার উঁকি মারিয়া—(স্বগত) মেয়েটি কিন্তু দেখতে বেশ! (ফিরিয়া কিশোরকে) আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস বল্ দেখি?

কিশোর। (এতক্ষণ মাধবের হাবভাব দেখিতে-দেখিতে, হঠাৎ রুষ্ট হইয়া উঠিয়া) তোমার অন্ন আমি চাইনে! আমি নিজে উপার্জন করে যা পারি খাব।

মাধব। আমাকে অপমান? কাঁধে ক'টা মাথা আছে, দেখতে হবে। ভিটে মাটি উচ্ছন্ন ক'রে তবে ছাড়ব। নাকের-জলে চোখের-জলে করব। হতভাগা! এক-একজনের ওই রকম মরাই স্বভাব।—টাকা দিতে হবে। নইলে—(আনাচে-কানাচে উঁকি। স্বগত) দূর ছাই!—মেয়েটা আবার কোথায় গেল!

কিশোর। নইলে আবার কী? আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু করবে? আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি!

মাধব। (মোলায়েম সুরে) না, না, ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষ্মী ছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে। টাকাটা ঠিকমতো দিয়ো বাবা। নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে, তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে—সেটাতে তোমাদেরই পাপ হবে, বাবা! (স্বগত) ছোঁড়াটা দেখছি নির্ঘাৎ মরবে আর-কি। (হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া) ওরে, ওরা সব আসে কোথা থেকে! আমার খবর পেলে নাকি? এখন করি কী। (তাড়াতাড়ি লুকানোর পথ-দেখা)

কিশোর। (স্বগত) আরে বুড়োটা করে কী? হঠাৎ খেপে গেল নাকি?

মাধব। (স্বগত) আমি তবে যাই। আমাকে দেখলেই লোকের যত টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েছে,—আমি সব-টাকা পুঁতে রেখেছি।—শুনে অবধি আমাদের জমিদার যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, প্রজাদের জল-দান করছেন। কোন্ দিন আমার ভিটে-মাটির ভিত্ কেটে জল-দানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমুতে পারিনে। (এদিক-ওদিক চাহিতে-চাহিতে প্রস্থান। কিশোর তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।)

রানী। (সরোষে বাহিরে আসিয়া) এখান থেকে যেতেই হবে।

কিশোর। ইচ্ছে করছে, দূরে চলে যাই, এতদূরে যাই যেখানে কেউ ঠেকাবে না।

(উক্তিরত রঘুনাথের প্রবেশ)

রঘুনাথ। এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়তো ডুবব, কিন্তু আর ফিরব না। চলো, কলকাতায় চলো। (সকলে ঘরে ঢুকিল। তখন বাহিরে রাস্তায় কে গাহিতেছিল)

নেপথ্যে। গান

আত্মজনের কোলে বুকে ধন্য হরি হাসিমুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে ধন্য হরি ধন্য হরি ॥

দৃশ্য ৫

কলিকাতা। রাজপথ। মধ্যাহ্ন

(আলাপরত ব্রতীন্দ্র ও আনন্দমোহনের প্রবেশ)

আনন্দমোহন। (উৎকণ্ঠায় ব্রতীন্দ্রকে) কী বললে? কে বললে? (সবিস্ময়ে)—কী বলছ?—একজন দেশী-লোককে খুন?

ব্রতীন্দ্র। ভালো ক'রে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না।

আনন্দমোহন। তবে, তা হবে—আজ ইংরাজের পক্ষে একজন ভারতীয়কে মারা নিতান্তই সহজ,—

ব্রতীন্দ্র। কেন সহজ? একটা মানুষ খুন কি সহজ কথা?

আনন্দমোহন। সহজ এজন্য যে, সে ইংরেজ—সে যে রাজশক্তি।

(উক্তিরত বিশ্ববান্ধবের প্রবেশ)

বিশ্ববান্ধব। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিল, তার পরে

ছিল একটি কোম্পানি, কিন্তু এখন একটি কোম্পানি নয়—ভারতের সিংহাসনে বসে আছে যে গোটা-একটা জাতি !

আনন্দমোহন। এখন ইংরেজ-জাতি জানে ভারতবর্ষ তাদের সকলেরই।

বিশ্ববান্ধব। এখন রাজা বিদেশী। প্রজার বেদনা বোঝেন না।

আনন্দমোহন। বেদনা বুঝবে কী! এখন তো প্রজাদের বেদনায় রাজপুরুষরা উদাসীন।

ব্রতীন্দ্র। কেবল কি উদাসীন? তিনি ক্রুদ্ধ, খড়্গাহস্ত।

আনন্দমোহন। (শ্লেষের সহিত সহাস্যে) তারপরে, ভারত-শাসনের বর্তমান যিনি ভাগ্যবিধাতা? —তার ব্যাপারটা কী?

ব্রতীন্দ্র। বিলাতের সেই মর্লি?

নেতা। হ্যাঁ, সেই লর্ড মর্লি।—তিনি যে তাঁর সুদূর স্বর্গলোক হতে সেদিন সংবাদ পাঠালেন—

(সরোষে উক্তিরত সার্জেণ্টের প্রবেশ)

সার্জেণ্ট। হ্যাঁ, তাতো পাঠিয়েছেনই। তিনি সংবাদ পাঠালেন এই যে (বক্রস্বরে) —"যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা একেবারে চূড়ান্ত; তাহার আর অন্যথা হইতে পারে না!" (ব্যঙ্গহাস্যে) বুঝলে তো?—যত যা-ই করো, এখন আর এই বঙ্গ-বিভাগের অন্যথা হতে পারে না।

ব্রতীন্দ্র। (সক্রোধে দৃঢ়কণ্ঠে) "অন্যথা হইতে পারে না"? —এ কি মগের মুল্লুক?

সার্জেণ্ট। (ব্যঙ্গস্বরে ব্রতীন্দ্রকে) হাঃ, হাঃ, হাঃ,—দেখছি, লড়াইয়ের নেশায় পেয়েছে! তোমরা লড়বে?

বিশ্ববান্ধব। আমরা লড়াই করতে পারি জ্ঞানে, ধর্মে। সেখানে আমাদের পৈতৃক মূলধন আছে। সেখানে পিতৃলোক আর দেবতা আমাদের সহায়।

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

আনন্দমোহন। শুধু আজকের নয়।—স্মরণ রেখো, এই ধর্মবাণী সকল দেশের সকল কালের চিরন্তন সত্য।

বিশ্ববান্ধব। এই বাক্য স্পর্ধামত্ত মানবসমাজের উর্ধ্বে থেকে বজ্রমন্ত্রে আপন অনুশাসন চিরকালই প্রচার করতে থাকবে।

সার্জেন্ট। ব্যাপারটা তবে—কী দাঁড়াচ্ছে?—স্বার্থের বিরোধ?

ব্রতীন্দ্র। বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

সার্জেন্ট। (ব্রতীন্দ্রকে—ঠাট্টার সহিত) বিরোধের পরে? —যুদ্ধ? যুদ্ধ না তিতুমীরের লড়াই? আস্ফালন-করাকেই তো আর যুদ্ধ করা বলে না। (মৃদুমন্দ উপহাস্যে প্রস্থান)

ব্রতীন্দ্র। (বিশ্ববান্ধবকে) যুদ্ধই তো বটে! কিন্তু, আমরা যে এদিক দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বা দলবলের কোনো হিসাবই লই নাই।

বিশ্ববান্ধব। তার প্রধান কারণ, দেশকে ঠিকমতো কেউ কোনোদিন জানিই না।

(উক্তিরত কবির প্রবেশ)

কবি। যুদ্ধ, অস্ত্রশস্ত্র—ও-সব এখন থাক্। —আমাদের হচ্ছে অন্যরকম। আমাদের কথা কী জানো?—বিলাত পরকে বিনাশ করা-ই, পরকে দূর করা-ই, আত্মরক্ষার উপায় ব'লে জানে, ভারতবর্ষ পরকে আপন-করা-ই আত্মসার্থকতা ব'লে জানে। আজ যদি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে, পরকে আপন করতে না পারি,—তবে বুঝব পাপের ফলে আমাদের সমাজের লক্ষ্মী আমাদিকে পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু আজ অবিচার, অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এবং কার কতদূর অধিকার সেটা চাষা-ভুষোদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে সমূহ আমাদের কাজ। তাতে চাষাদের মনের মধ্যে যে-রকম আন্দোলন হবে, বড়ো-বড়ো সংস্কার-কার্যেও তেমন হবে না। কারখানায় গিয়ে—

ব্রতীন্দ্র। কারখানায় গিয়ে?—তাহলে কারখানাতেই আমি যাই?

আনন্দমোহন। এই কথাই রইল, আমাদের এখন জন-শিক্ষা-কার্যে প্রবৃত্ত হতে হবে।

বিশ্ববান্ধব। আমরা যদি পাঁচটি-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক পাই তাহলে আমরা যা কাজ করব তা চিরকালের জন্য ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে দেবে।

কবি। যদি নয়, আর বেশি দিনের জন্যেও অপেক্ষা করা নয়—এখন আমরা যে-কয়জনেই উৎসাহ অনুভব করি, প্রয়োজন স্বীকার করি, সেই পাচ-দশজনেই সুখ-স্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে একটি স্বকীয়-শাসন-জাল বিস্তার করব। প্রত্যেক দলের নিজের পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, ব্যবহার্য-দ্রব্যাদির বিক্রয়-ভাণ্ডার, ঔষধালয়, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক, সালিশ-নিষ্পত্তির সভা ও নির্দোষ-আমোদের মিলনগৃহ থাকবে।

ব্রতীন্দ্র। আমোদ! আমোদের মিলন-গৃহও থাকবে?

কবি। থাকবে না কেন? থাকবে, তবে, সেটা থাকবে নির্দোষ-আমোদের মিলনগৃহ।

(বলিতে বলিতে সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ৬

কলিকাতার বস্তি-অঞ্চল। মজদুর মণ্ডলীর মিলন-গৃহ। সন্ধ্যা। (কথকতার আসর। সমবেত-বস্তীবাসীদের মধ্যে উদ্বাস্তু-চাষী-রঘুনাথও একদিকে উপবিষ্ট। অদূরে বেদীতে বসিয়া ব্রতীন্দ্র সূত্রধারের-ভূমিকায় বই-হাতে কথকতারত। তাঁহার কথকতার-বর্ণিত-বিষয়কে নানা কুশীলব সাজিয়া বস্তিবাসী-মজুরেরা রূপদানে বৃত। প্রথমে সমবেত-কণ্ঠে প্রার্থনা-সংগীতে আসরের উদ্বোধন)

সকলে। (প্রার্থনা-সংগীত)

বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট বাংলার জল বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক হে ভগবান॥
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান॥

ব্রতীন্দ্র। (পাঠ)

"নিবেদিল রাজভৃত্য, মহারাজ বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়া-তলে
করিছেন নাম-সংকীর্তন।"
শুনি' রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে। কহিলেন নমি' তাঁর পায়ে
"হেরো প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতি-নির্মিত নিকেতন

অভ্রভেদী দেবালয়—তারে কেন করিয়া বর্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে।"
"সে মন্দিরে দেব নাই" কহে সাধু।
রাজা কহে রোষে,
"দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ!
রত্ন-সিংহাসন-'পরে দীপিতেছে রতন-বিগ্রহ—
শূন্য তাহা?

"শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ" সাধু কহে,—
"আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতার নহে।"
ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা—"বিংশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে-মন্দির অম্বর ভেদিয়া,
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে-মন্দিরে দেবতার নাই কোনো স্থান!"
শান্তমুখে কহে সাধু—"যে-বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি-সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ-প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে, সে-বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে, সে-দিন কহিলা ভগবন,
"......দীনশক্তি যে-ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ-প্রজাগণে:
সে আমারে গৃহ করে দান!—চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীন্ সাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে—
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ!"
রাজা জ্বলি রোষানলে
কহিলেন, "রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ ক'রে
এ মুহূর্তে চলি যাও।"

সন্ন্যাসী কহিলা শান্তস্বরে—

"ভক্ত-বৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে

সেইখানে মহারাজ, নির্বাসিত করো ভক্তজনে।"

মজদুর-১। (দর্শক-মণ্ডলীর মধ্য হইতে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আমরা চারিদিকে প্রচার ক'রে বেড়াব আমাদের রাজা নেই। আমার পঁচিশ-বছরের ছেলেটা সাতদিনের জ্বরে মারা গেল। দেশে যদি ধর্মের রাজা থাকবে তবে কি এমন অকাল-মৃত্যু ঘটে?

মজদুর-২। তবু তোর এখনো দু'ছেলে আছে, আমার যে একে-একে পাঁচ ছেলেই মারা গেল, একটিও বাকি রইল না।

রঘুনাথ। ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের? তাদের আবার রাজা?

মজদুর-৩। ঠিক বলেছিস ভাই।

ব্রতীন্দ্র। (মজদুরকে) তা সেই অন্ন-রাজাকেই খুঁজে বের কর্। ঘরে ব'সে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।

মজদুর-৪। মরতে হয় মরব, কিন্তু আমাদের আর দুঃখ সহ্য হয় না। আমরাও রাজার কাছে দরবার করব।

ব্রতীন্দ্র। কী চাইবি রে? অর্ধেক রাজত্ব চাইবি-নে?

মজদুর-৪। ঠাট্টা করছ কেন, ঠাকুর।

ব্রতীন্দ্র। ঠাট্টা কেন করব? সব রাজত্বটাই কি রাজার? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী? চাইতে দোষ নেই রে, চেয়ে দেখিস।

মজদুর-১। যখন তাড়া দেবে?

ব্রতীন্দ্র। তখন আবার চাইব। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে? আরও একজন শোনবার লোক রাজদরবারে বসে থাকেন।—শুনতে-শুনতে তিনি একদিন আর্জি মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছু ক্ষতি হয় না।

(প্রথমে ব্রতীন্দ্র—সঙ্গে সকলের গান)

গান

আমরা বসব তোমার সনে,
তোমার শরিক হব রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে॥

ব্রতীন্দ্র। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই—ম্যালেরিয়া, মারী,

দুর্ভিক্ষ—এগুলি কি আকস্মিক? যখন কোনো জাতি নিশ্চেষ্ট হয়ে কেবল আকাশের দিকে তাকায় তখন সে মরতে থাকে।

রঘুনাথ। চিতা যে নিভতে চায় না।—(বলিয়া ললাটে করাঘাত করিতে লাগিল)।

(এই সময়ে কারখানার কাজের শেষে হাতুড়ি গাঁইতি রেঞ্চ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি-হাতে ছেঁড়া মলিন কারখানার-পোশাকে উত্তেজিতভাবে হাতিয়ার নাড়িয়া নৃত্যভঙ্গিসহ গাহিতে-গাহিতে শ্রমিকদলের প্রবেশ)

শ্রমিকদল। (সমবেতকণ্ঠে গান)

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন,
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন,
ওগো তায় জাগাইনু রে॥
পোষ মেনেছে হাতের তলে যা বলাই সে তেমনি বলে—
দীর্ঘ-দিনের মৌন তাহার আজ ভাঙাইনু রে।
অচল ছিল সচল হয়ে ছুটেছে ওই জগৎ-জয়ে—
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে=

ব্রতীন্দ্র। (ঈষৎ হাসিয়া আগন্তুক-শ্রমিকদের প্রতি) তোদের কী চাই, বল্ দেখি।

জনৈক শ্রমিক। আমরা তোমাকে চাই।

ব্রতীন্দ্র। আমাকে নিয়ে তোদের কিছু লাভ হবে না রে। দুঃখই পাবি।

আগন্তুক শ্রমিক। আমাদের দুঃখই ভালো। আমরা রাজাকে মানি-নে।

সকলে। আমরা তোমাকে রাজা করব।

(উক্তিরত মজুরবেশী রমজানের প্রবেশ)

রমজান। কাকে মানিস নে?—তোরা কাকে রাজা করবি?

(কয়েকজন পল্লীচাষীর প্রবেশ)

আগন্তুক চাষী। (ব্রতীন্দ্রকে) পেন্নাম হই। আমরা তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

রমজান। (ক্রুদ্ধব্যঙ্গ-স্বরে আগাইয়া গিয়া চাষীদের) দরবার করতে এসেছি!—বলি, কিসের দরবার?

সকলে। (রমজানকে বিরক্তির সহিত) অন্ন বিনে মরছি যে।

রমজান। (ধমকের সহিত) মরতে তো সকলকেই হবে।

সকলে। (রমজানকে) মরি তো (ব্রতীনকে দেখাইয়া দিয়া) ওঁরই হাতে মরব।

রমজান। (ব্যঙ্গস্বরে) সে বড়ো দেরি নেই। (ব্রতীনকে দেখাইয়া-দিয়া) স্বদেশী?—এখানে তবে স্বদেশী-প্রচার হচ্ছে?

সকলে। (রমজানকে টিট্‌কারি দিয়া) দেশের লোক, আমরা দেশের কথাই বলছি। আর তুমি? তুমি কি হচ্ছ—বিদেশী? তা, তুমি যদি বিদেশের কথা বলতে চাও তো, বলো না! তাইতো, দেশের হয়েও শেষে বিদেশী হয়ে গেলে ভাই?

একজন চাষী। (অন্যজনকে) ওরে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাজাকে পেয়েছিস,—রাজা আমাদের—

রমজান। (চাষীকে ব্যঙ্গস্বরে) কী সব কথা!—রাজা আমাদের! বলি, রাজা আবার ক'টা? রাজা তো ইংরেজ! (হঠাৎ সচীৎকারে) পুলিস! পুলিস!

(একদল পুলিস লইয়া সার্জেণ্ট ঢুকিয়া পড়িতেই ব্রতীন্দ্র আগাইয়া আসিয়া গান ধরিল)

গান

সকলে। 'আমরা বসব তোমার সনে।'

সার্জেণ্ট। (ব্রতীন্দ্রের সামনে গিয়া ব্যঙ্গস্বরে) স্বদেশী করা হচ্ছে! (ব্রতীন্দ্রের হাতের বই-এর দিকে চাহিয়া) এটা আবার কী?—'হুংকার'? সেই স্বদেশী-কবিতার বইটা? (বইখানি টান মারিয়া ছিনাইয়া নিতেই পুলিস ও বস্তিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। তাহার মধ্যেই মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি দিতে-দিতে সকলের প্রস্থান)

(কবি ও চৌধুরীর প্রবেশ)

চৌধুরী। কই? কোথায় সেই বস্তির স্বদেশী-সমিতি? বস্তির 'মিলন-গৃহ'ই বা কোথায়? বা, তোমার মিলন-গৃহের বিশুদ্ধ আমোদের-ও তো দেখা নেই? তবে, কী দেখতে আসা? এ যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার! মিলনগৃহ? এ যে দেখি মহা এক নিগ্রহের-গৃহ হয়ে আছে!

কবি। তাই তো! কাউকে দেখছি না তো! কোথায় গেল সব?

চৌধুরী। দেখবে কী? দেখো গে,—কোন্‌দিকে এতক্ষণে-বা ধুন্ধুমার বেধে গেছে! সেই, তোমারই কবিতায় যে লেখা আছে,—"অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি",—কাছাকাছি হয়তো কোথাও বা সেই ছুরিই চলছে!

হারু। ওই শোনো ভাই বিশু, পথে শুনি 'জয় যীশু';
কেমনে এ নাম করিব সহ্য আমরা আর্য-শিশু।
কোথায় রহিল কর্ম, কোথা সনাতন ধর্ম।
সম্প্রতি তবু কিছু শোনা যায় বেদ-পুরাণের মর্ম,
ওঠো ওঠো ভাই জাগো, মনে-মনে খুব রাগো।
আর্য-শাস্ত্র উদ্ধার করি, কোমর বাঁধিয়া লাগো।
বিশু। তুমি আগে যেয়ো তেড়ে আমি নেব টুপি কেড়ে।
গোলেমালে শেষে পাঁচজনে প'ড়ে মাটিতে ফেলিয়ো পেড়ে।
(গেরুয়া-পরা অনাবৃতপদ মুক্তিফৌজ-প্রচারকের উক্তিরত-অবস্থায় প্রবেশ)
মিশনারী-সাহেব। ধন্য হউক তোমার প্রেম ধন্য তোমার নাম,
ভুবন-মাঝারে হউক উদয় নূতন জেরুজিলাম।
ধরণী হইতে যাক্ ঘৃণা-দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা দূর হোক—
মুছে দাও প্রভু মানবের আঁখি, ঘুচাও মরণ-শোক।
তৃষিত যাহারা জীবনের বারি করো তাহাদের দান।
দয়াময় যীশু, তোমার দয়ায় পাপীজনে করো ত্রাণ।
হারু। (পথের পাশ হইতে বিশুকে)
ওরে ভাই বিশু, এ কে ? জুতো কোথা এল রেখে।
গোরা বটে তবু হতেছে ভরসা গেরুয়া বসন দেখে।
বিশু। হারু, তবে তুই এগো, 'বল্ বাছা তুমি কে গো ?'
মিশনারী। বধির নিদয় কঠিন-হৃদয় তারে প্রভু দাও কোল।
অক্ষম আমি কী করিতে পারি !
হারু ও বিশু। (ব্যঙ্গস্বরে) "হরিবোল—হরিবোল।"
মিশনারী। দাও ব্যথা, যদি কারো মুছে পাপ
আমার নয়ন-নীরে।
প্রাণ দিব, যদি এ জীবন দিলে
পাপীর জীবন ফিরে।
বিশু। আর প্রাণে নাহি সহে, আর্য-রক্ত দহে !
ওহে হারু, ওহে মাধু, লাঠি নিয়ে
ঘা কতক দাও-তো হে।
হারু। যদি চাস্ তুই ইষ্ট, বল্ মুখে বল্—'কৃষ্ট'।

মিশনারী। ধন্য হউক তোমার নাম দয়াময় যীশুখৃষ্ট।

বিশু। তবে রে,— লাগাও লাঠি।

(মিশনারীর মাথায় হারুর লাঠি-প্রহার। মাথা ফাটিয়া রক্তপাত। রক্ত মুছিয়া মিশনারী—)

মিশনারী। প্রভু তোমাদের করুন কুশল, দিন্ তি'নি শুভমতি,
আমি তাঁর দীন অধম ভৃত্য, তিনি জগতের পতি।

(ঊর্ধ্বে প্রণিপাত ও প্রস্থান)

বিশু। (সহসা দূরে চাহিয়া)
ওরে শিবু, ওরে হারু, ওরে ননি, ওরে চারু,
তামাশা দেখার এই কি সময়, প্রাণে ভয় নেই কারু ?

হারু। (বিশুকে) পুলিস আসিছে গুঁতা উঁচাইয়া এই বেলা দাও দৌড়।
ধন্য হইল আর্যধর্ম ধন্য হইল গৌড়।

বিশু। বাবারে! লুকিয়ে থাকি। (ঊর্ধ্বশ্বাসে দুইজনের পলায়ন)

(কবির প্রবেশ)

কবি। (পলাতক বিশু ও হারুর প্রতি ক্ষোভে)
কিসের এত অহংকার, দম্ভ নাহি সাজে,
বরং থাকো মৌন হয়ে সসংকোচে লাজে।
উৎসাহেতে জ্বলিয়া উঠি' দু'হাতে দাও তালি
'আমরা বড়ো'-এ যে না বলে তাহারে দাও গালি।
কাগজ ভ'রে লেখো রে লেখো, এমনি করে যুদ্ধ শেখো
হাতের কাছে রেখো রে রেখো কলম আর কালি।

এ দেখছি, স্বজাতির প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাত? স্থলবিশেষে এসব একপ্রকার কৌশলমাত্র। ভণ্ডামি। যখন বলি, সাহেবের কাছে আর ঘেঁষব না,—তখন রাজ-সমাজের একটু ঘ্রাণমাত্র এত কৃতার্থ হই যে, আপনার দেশের লোকের আত্মীয়তা সে-গৌরবের নিকট তুচ্ছ বোধ হয়।

এবার ফিরাও মোরে লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে-সমীরে
তরঙ্গে-তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদ-ঘন অন্তরের নিকুঞ্জ-ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর—

(সুরে) প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি-রে করবি এখন কী ?
ওরে বরা, করবি এখন কী ?

(কবির পুনঃ-প্রবেশ)

কবি। (বিশু ও হারুকে লক্ষ্য করিয়া)

দাস্য-সুখে হাস্যমুখ বিনীত জোড়-কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোতুল-কলেবর।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি' ঘৃণায়-মাখা অন্ন খুঁটি'
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি ঘর।
ঘরেতে বসে গর্ব কর পূর্ব-পুরুষের,
আর্যতেজ-দর্পভরে পৃথ্বী-থরথর। (প্রতিক্রিয়ায় বিশুর ক্রুদ্ধভাব)

হারু। (কবির প্রতি শ্লেষের সুরে)

বাহবা কবি, বলিছ ভালো শুনিতে লাগে বেশ !
এমনি ভাবে বলিলে হবে উন্নতি বিশেষ !

(না-বুঝিয়া কবির সম্বর্ধনায় সকলের করতালি)

কবি। (জনতাকে)

রক্ষা করো, উৎসাহের যোগ্য আমি কই ?
সভা-কাঁপানো করতালিতে কাতর হয়ে রই।
চাহি না আমি অনুগ্রহ-বচন এত-শত,
'ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা',—থাকুক আপাতত।

(হারু ও বিশুর প্রতি)

স্পষ্ট তবে খুলিয়া বলি তুমিও চলো, আমিও চলি,
পরস্পরে কেন এ ছলি নির্বোধের মতো ?

কিশোর। (হারু ও বিশুকে ভর্ৎসনা করিয়া) ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে লজ্জা বোধ কর না ? হীন, অভদ্র, ভণ্ড !—ছদ্মবেশ, ছদ্মব্যবহার—ধিক।

বিশু। (কিশোরকে শাসাইয়া দূরে অঙ্গুলি-নির্দেশে) সৈন্য ! সৈন্য আসছে ! দাঁড়া—সৈন্য ডেকে আনছি !

(অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। (সক্রোধে) সৈন্য ?—সৈন্যদের যারা মিত্র (বিশু এবং হারুকে দেখাইয়া) তাদের বিনাশ না-করাই অধর্ম। পথ-কুক্কুর ! গুণ্ডা !

(বিশু ও হারু ঘুঁষি উঁচাইয়া অরুণের দিকে আগাইয়া আসিতেই অরুণ

কিশোরের হাতের পতাকা-দণ্ড টানিয়া লইয়া বাগাইয়া ধরিল। অমনি বিশু ও হারু ভয়ে আঁৎকাইয়া দৌড় মারিল। উদ্যত দণ্ড-হাতে অরুণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের মুখে মুখ ফিরাইয়া কবিকে বলিল—)

অরুণ। (কবিকে) সাবধানে থেকো। অন্তরে-বাহিরে শত্রু। (অরুণকে নিবৃত্ত-করিবার ভঙ্গিতে হাত উঠাইয়া কবি অরুণের অনুগমনে উদ্যত হইলে পলাতক-বিশুদের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া অরুণ কবিকে বলিল—)

অরুণ। (বক্র-হাস্যে) এসব যত ভীত, ক্রীতদাস!—মুখে করে আস্ফালন। (গমনোদ্যত)

কবি। (অরুণকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া) সৈন্য আসছে যে!

অরুণ। (কবির উদ্দেশে হাত উঠাইয়া) গুরুজির জয়!—বন্দেমাতরম্।

(প্রস্থান)

কিশোর। (হাসিয়া কবিকে) একটু তামাশা দেখে আসি। (কিশোর ফেরির-কাপড়ের গাঁটরি মাথায় তুলিয়া লইয়া কবির উদ্দেশে হাত উঠাইয়া 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল)

কবি। (হাত তুলিয়া নিষেধের ইঙ্গিত করিয়া) আহা, আর কেন, আর কাজ নাই, থাক্ থাক্। (অরুণ ও কিশোরের প্রস্থানপথের দিকে উদ্বিগ্নমুখে কবিও প্রস্থানোদ্যত;—এই সময়েই কোমরে দড়ি-বাঁধা অরুণ ও কিশোরকে লইয়া সার্জেন্ট, রমজান, পুলিস এবং তাহাদের সঙ্গে কিশোরের-কাপড়ের-মোট-মাথায় লইয়া বিশু ও 'বন্দেমাতরম্'-লেখা পতাকাদণ্ডটি হাতে লইয়া হারুর পুনঃ-প্রবেশ)

সার্জেন্ট। (অরুণকে) কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত?

অরুণ। (ব্যঙ্গ-হাসিতে) মহারাজের যেমন ইচ্ছা!

সার্জেন্ট। (সরোষে অরুণকে) চুপ করো, উল্লুক! (পুলিসকে) খবরদার। ছাড়িস-নে।—এখন হাজত—তারপরে হবে জেল—

কিশোর। (সার্জেন্টকে ব্যঙ্গস্বরে) জেল?—তাই হবে। নিয়ে চলো। চলো-না!

কবি। (সঙ্গে চলিতে-চলিতে উদ্বেগে কিশোর ও অরুণকে) তবে যাচ্ছ?

বিশু। (ব্যঙ্গহাসিতে) কোথায় যাচ্ছ হে?

কিশোর। (হাসিয়া কবিকে) রাস্তার ছেলে!—যাচ্ছি রাস্তারই কোলে!

সার্জেন্ট। (কিশোরকে রক্তচক্ষে) মেরে তোমার পিঠ লাল করব, তবে তুমি সিধে হবে!

কিশোর। (স-রহস্যে) আজ্ঞে, মারের চোটে খুব-সিধে-জিনিসও কিন্তু বেঁকে যায়, হুজুর!

সার্জেণ্ট। (ধম্‌কাইয়া) চুপ করো বেয়াদব। (সার্জেণ্টের ইঙ্গিতে পুলিস বন্দীদের নিয়া চলিল। সার্জেণ্ট কবিকে একখানি নোটিশ দিয়া বলিল— "ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হতে সাক্ষীর শমন, মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবার জন্য।"

(কবি শমন পড়িতে পড়িতে চলিতে লাগিলেন। বিশু মাথার-কাপড়ের মোট ও 'হুংকার'-বইর বাণ্ডিলের দিকে চোখের ইশারা করিয়া হাসির সহিত জনান্তিকে সোল্লাসে হারুকে বলিল—)

বিশু। পুরস্কার!—এগুলো হল আমাদের পুরস্কার! বুঝলি, আজকের দিনের রোজগার! এমনি করে-করেই সব হবে!

হারু। (হাতের পতাকাদণ্ডটি সজোরে মাটিতে ঠুকিয়া সোল্লাসে বিশুকে) সাবাস!

(কবি-সহ জনতা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে-দিতে পুলিস ও বন্দীদলের পিছনে চলিল)

দৃশ্য ৮

(কলিকাতা। কুলি-বস্তি। বাহিরে পথে ঢ্যাঁড়া দেওয়া হইতেছে। ঘোষণা— "কলিকাতায় প্লেগ"। চালার নিচে রঘুনাথ মেঝেতে চাটাইয়ের উপর চাদর-ঢাকা-অবস্থায় শুইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। রঘুনাথের মেয়ে রানী ঘরে ঢুকিল। হাতের জলভরা-ঘটি বিছানার একপাশে রাখিয়া দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। রঘুনাথ মাথা উঁচাইয়া দেখিতে গিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার চোখে-মুখে নিদারুণ ভয় দেখা দিল। চীৎকার করিতে গেল, দুই হাত তুলিতে গেল, গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না। এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করিল কবি, বিশ্ববান্ধব ও জনকয়েক-যুবককর্মী। তাহাদের কারো হাতে চুনের বালতি, কারো-কারো হাতে স্ট্রেচার, কারো-কারো হাতে কোদাল, সাবল, ঝাঁটা, পিচ্‌কারি ইত্যাদি। "কলকাতায় তবে প্লেগ দেখা দিল!" বলিতে বলিতে কবি ঘরে ঢুকিয়া রঘুনাথকে সরাইয়া নিতে কর্মীদের প্রতি "ওকে নিয়ে যাও" বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন। কর্মীরা রঘুনাথকে তুলিয়া ধরিতেই রঘুনাথ কবিকে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে ও বেদনায় বিস্ফারিত সজল-চোখে

জড়িতস্বরে অসহায়ভাবে বলিয়া উঠিল—"বা-বু—হু-জু-র।" কবি রঘুনাথকে হাত-ইশারায় শান্ত হইতে বলিলেন)

রঘুনাথ। (খুব ধীরে কাতরস্বরে) দেশ থেকে নগরে আশ্রয়ের জন্ম এসেছিলাম। নীচ-জাত....মনে ক'রে...মালিক...তাড়িয়ে দিলেন। ক-লে-র.... কা-জে....!

কবি। ছেলে?

রঘুনাথ। ছেলে নিরুদ্দেশ।

(কর্মীরা রঘুকে নিয়া চলিয়া গেল, দু-একজন ঘরে চুন ছড়াইতে লাগিল, একজন মেঝে হইতে একটা মরা-ইঁদুরকে কেরোসিনের বালতির মধ্যে সাবধানে তুলিয়া নিল)

কবি। (বিশ্ববান্ধবকে) দেশে বড়ো-বড়ো কারখানা। ওদিকে চারিদিকের দরিদ্র গৃহস্থ স্বাভাবিক অবস্থা হতে আজ বিচ্যুত। বাসস্থান হতে বিশ্লিষ্ট। স্ত্রী-পুরুষেরা কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত,—তা অনুমান করা কি কঠিন?

বিশ্ববান্ধব। কবি, তবে উঠে এসো,—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার;

কবি। অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত-বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।

বিশ্ববান্ধব। এ-দৈন্য-মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

(কর্মীরা রোগীর বিছানাপত্র গুটাইয়া পোড়াইতে নিয়া গেল, বস্তির দুই-এক-জন লোক কৌতূহলী হইয়া দুয়ারে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াই ত্রস্ত পলাইয়া গেল)

কবি। গান

সকল ভয়ের ভয় যে তারে কোন্ বিপদে কাড়বে,
প্রাণের সঙ্গে যে-প্রাণ গাঁথা কোন্‌কালে সে ছাড়বে॥
না হয় গেল সবই ভেসে রইবে তো সেই সর্বনেশে,
যে-লাভ সকল ক্ষতির শেষে সে-লাভ কেবল বাড়বে॥

(রানীর প্রবেশ)

রানী। দাদাবাবু ডাকছ ?

ব্রতীন্দ্র। বইগুলো রইল!—তোকে আমি একটু-একটু করে পড়তে শেখাব। (বলিয়াই বাণ্ডিল হইতে একখানা বই বাহির করিয়া লইয়া রানীর সামনে ধরিল)

রানী। (অন্যমনস্কভাবে) শেখাও।

ব্রতীন্দ্র। (বই-এর মলাটে আঙুল দিয়া দেখাইয়া প্রত্যেকটি অক্ষর বারবার ধীরে ধীরে বলা)—"হুং-কা-র"—"হুং-কা-র" (বলিয়া বই-এর নাম পড়াইতে শুরু করিবার মুখেই—)

রানী। (ব্যাকুলভাবে) এখানে থাকলে আমি বাঁচব না, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে ?

ব্রতীন্দ্র। সে কী-ক'রে হবে ?

রানী। (অভিমানভরে) সে কী-ক'রে হবে! (ক্ষুব্ধ ও চিন্তান্বিত। স্বগত) তাই তো,-কী করে হবে!

ব্রতীন্দ্র। আমার জায়গায় যে-লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব,—তিনি তোকে আমার মতন যত্ন করবেন, তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

রানী। (অভিমানে কাঁদ-কাঁদ-ভাবে উঠিয়া পড়িয়া) না—না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না। (ফুঁপাইয়া)—কাউকে না!

ব্রতীন্দ্র। তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, (টাকার পুঁটলি দেওয়া) এতে তোর দিন-কয়েক চলবে।—

রানী। দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না। (বলিয়া টাকার পুঁটলি দেখিয়া মুখভার করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল)

ব্রতীন্দ্র। (স্বগত) হায় বুদ্ধিহীন মানব-হৃদয়।

(ম্লানমুখে রানী ফিরিয়া-আসিয়া অদূরে দাঁড়াইল এবং শ্লেট ও বইয়ের বাণ্ডিল সব গুছাইয়া হাতে লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল)

ব্রতীন্দ্র। (সস্নেহে কৃত্রিম-অভিমানে হাসিয়া) তুমি আমাকে ভালোবাস না ?

রানী। (অভিমানে মুখ ভারি করিয়া) না, ভালোবাসব না—কখ্‌খনোই না, না, না।

ব্রতীন্দ্র। কেন ? আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি ?

ব্রতীন্দ্র। আমার জায়গায় লোক আসবেন। তাঁকে বলে দিয়ে যাব।

রানী। "বলে দিয়ে যাব"—না, না, না—(তীব্র-অভিমানে মুখ-ফেরানো ও দ্রুত-প্রস্থান)

ব্রতীন্দ্র। (কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া হঠাৎ স্বগত) এতদিন পরে আমার মনে হল, আমি কিছু, আমি কেহ। এতদিন আমি অগোচর ছিলাম,—তুমি আমাকে আবিষ্কার করলে। (দীর্ঘনিঃশ্বাসে) তোমাকে সুখী করতে পারলাম না, আমা হতে তোমাকে কেবল কষ্ট সহ্য করতে হল—আমাদের এ না-হলেই ভালো ছিল, না-হলেই ভালো ছিল। (প্রস্থানমুখে হঠাৎ স্বগত উচ্চকিত হইয়া) তাইতো,—বইগুলো? হারু—গুপ্তচর! এইদিকেই সে এসেছে!—(অনুমানে) তবে কি থানাতল্লাসি করতে এসেছে? (ভাবিতে-ভাবিতে প্রস্থান)

(উৎসুক-দৃষ্টিতে রানীর পুনঃ-প্রবেশ)

রানী। (চারিদিক দেখিয়া) কই তিনি? তিনি কই? এখানে তিনি নেই? (হতাশায় দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়া একমনে চিন্তায় নিমগ্ন) সে গেল কেন? কী আমি করেছি? (ভাবনা) সত্যি কি চলে গেল? (ভাবনা)

(চুপ্‌ড়ি-কাঁখে রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। (রানীকে) আজ হাট। ভাবলাম, অনেকদিন দিদিকে দেখি নাই, তা একবার—আজ ভাই অনেক কাজ আছে, অধিকক্ষণ থাকতে পারব না। (চুপ্‌ড়ি লইয়া দাওয়ায় বসা) তা দিদি, তুমি তো সব জানোই, (ক্ষোভে-দুঃখে-অভিমানে, থামিয়া-থামিয়া) সেই মিন্‌সে, আমাকে বড়ো ভালোবাসত দিদি। ভালো সে এখনো বাসে। তবে আর-একজন কার 'পরে তার মন গেছে—আমি টের পাই। (হঠাৎ শঙ্কা ও রহস্যের মধ্যে দোলায়মান হইয়া, স্বগত) সে কে? (রানীকে) তুমি? তোমার যে কী চোখ, কী রূপ! (হাসিয়া মনোগত-শঙ্কা চাপা দিতে হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া) না ভাই, ঠাট্টা করছিলাম! (বারবার ত্রাসযুক্ত-দৃষ্টিতে রানীকে দেখা ও বলা) আমি টের পাই! তা, সেই মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হয় না? (রানী চুপ) তবে আমি যাই ভাই, দেরি করলাম।—কত বকুনি হবে। (হঠাৎ মনে পড়িয়া এদিকে ওদিকে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া, স্বগত) তাই-তো, তাই-তো, বইগুলো? সেই যে সে বলেছিল!—সেই বইগুলো? (রানীর অন্যমনস্কতা দেখিয়া প্রস্থান-মুখে) বাছা, তুমি অন্য-কোথাও যাও। তুমি ভালোমানুষের মেয়ে—এখানে থাকলে তোমার সুবিধা হবে না। (প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কা লইয়া প্রস্থান)

রানী। (স্বগত) আমার রূপ নেই, গুণ নেই। আমার বাপ-মা আমাকে ঘরকন্না ছাড়া আর তো কিছুই শেখায়-নি!—বইগুলো তো নিয়েছি—তাতে অনেক-রকম কথাবার্তা আছে—কিন্তু সেগুলো নিয়ে—(বিরক্তিতে ও দুঃখে)! —না, না আমাকে কিছুতেই মানায় না। (ভয়ভাবনায়) তবে আমার উপায়?

(হাত তুলিয়া "জয় হোক"—বলিতে বলিতে গনৎকার-সাধুবেশে হারুর প্রবেশ)

হারু। (আওড়াইতে-আওড়াইতে) শোন্ রে শোন্, অবোধ মন,
শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ॥

(নিকটে আসিয়া রানীকে) তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত। আমি তা বুঝতে পারছি। অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত বলো। আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাব।

রানী। আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো।

হারু। সমস্ত বলো।—বলো—

রানী। (একটু চুপ থাকিয়া পরে) একজনকে দেবতার মতো ভক্তি করতাম।

হারু। ঠিক ঠিক। সে কে, বলতে হবে।

রানী। তা বলতে পারব না।

হারু। সে কে, স্পষ্ট বলো। বলতেই হবে। স্বদেশী? সে-বাবু কোথায়? তিনি স্বদেশী-প্রচারক?—শিক্ষিত-বাবু?

রানী। (চম্‌কাইয়া উঠিয়া দৃঢ়তার সহিত) না, বলতে পারব না।

হারু। (স্বগত) ঠিক ঠিক! নিশ্চয় স্বদেশী! "হুংকার"-বইগুলো?—সন্ধান নিতে হচ্ছে। কী রূপ! মস্ত শিকার যে শিকার করব! (রানীকে) আচ্ছা, স্বামী কোথায়? (রানী চুপ। রানীর কপালের দিকে চাহিয়া লইয়া) কপালে দেখছি সিঁদুর নেই। তাহলে কুমারী? (স্বগত) যাই হোক, শিকার, এ-কে শিকার করব। এ শিকার একা আমার! (রানীকে) আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাব। (গুণ-গুণ স্বরে)
শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি,
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ—
ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে—

(এদিক-ওদিক চাহিতে-চাহিতে সন্তর্পণে গাহিতে-গাহিতে প্রস্থান)

রানী। (অসহায়-দৃষ্টিতে উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া) কই, এখানে তো তিনি নেই! দেরি হয়ে গেছে? তাইতো! সময় গেলে আর ফেরে না। (হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে)

কে বললে—ফেরে না ? আমি ফেরাব। দেরি হয়ে থাকে, আর এক-মুহূর্ত দেরি করব না। কপালে যা থাকে তাই হবে। তাকে আমি ছাড়ব না, আমাকে কেউ ছাড়াতে পারবে না-(অস্থিরভাবে পায়চারি। আসন্ন সন্ধ্যার কথা ভাবিয়া) কী করি! নিতান্ত একা! ভাই নাই, বন্ধু নাই। সারাদিন নিরাশ্রয় ঘুরি! সন্ধ্যায় যে কোথায় যাব! এদিকে যে সন্ধ্যা হয়-হয়। আঁধার রাত। কী হবে! কী হবে! (ভাবিয়া হঠাৎ মনে-পড়ায়) ঠিক. ঠিক—রুক্মিণী! সেই রুক্মিণী। যাই, তবে রুক্মিণীর কাছেই যাই। (দুয়ার বন্ধ করিয়া প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

(কলিকাতা। বস্তিতে রুক্মিণীর ঘর। সন্ধ্যা। ঘরের মেঝেতে আসর পাতা। পাশেই তাকিয়া-ঠেস-দেওয়া-প্রণয়ী,—সাধুবেশী হারু। হারুর সামনে অঙ্গভঙ্গী-সহকারে সুসজ্জিতা রুক্মিণী গাহিতেছে—)

গান

রুক্মিণী। বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ।
সকলি যে স্বপ্নসম হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে সেথায় তো আদর মিলে,
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ ?

রুক্মিণী। কেমন হে, সংসার কেমন চলছে ?

হারু। (দেখানো-হাসিতে) বেশ চলছে। কাল তোমার নিমন্ত্রণ,—(গম্ভীর-ভাবে) অবস্থা বড়ো মন্দ। বলি, অধীনের প্রতি এত অপ্রসন্ন কেন ? মান করেছিস বুঝি ভাই!—মান-রতনে আপাতত তেমন আবশ্যক নাই, আবশ্যক হয় পরে দেখা যাবে, আপাতত কিছু সোনা-রুপা পাই ?—কাজে লাগে।

রুক্মিণী। তা তোমার যদি আবশ্যক থাকে তো—তোমাকে দেব না তো কাকে দেব।

হারু। না, আবশ্যক এমনই-বা কী। তবে কী জানো ভাই, আমার মার কাছে টাকা থাকে, আমি নিজের হাতে টাকা রাখি না। মা জোড়াঘাটায় গেছেন তাঁর জামাইয়ের বাড়ি। তা, আমি তোমার টাকা কালই শোধ দেব।

রুক্মিণী। তোমার অত তাড়াতাড়ি করবার আবশ্যক কী? যখন সুবিধা হয় শোধ দিলেই হবে। —এ তো আর জলে ফেলছি-না! (স্বগত) জলে দিলেও বরঞ্চ পাবার সম্ভাবনা আছে!

হারু। (কাছে ঘেঁষিয়া প্রীতিভরে) তুমি আমার সুভদ্রা, আমি তোমার জগন্নাথ।

রুক্মিণী। মর্ মিন্‌সে। সুভদ্রা যে জগন্নাথের বোন।

হারু। তা—তাহলে সুভদ্রাহরণ? সেটা হল কী ক'রে?

রুক্মিণী। (হাসিতে-হাসিতে কুট্‌পাট) মরণ! মরণ!

হারু। (বুক-ফুলাইয়া) না, তা হবে না, হাসলে হবে না, জবাব দাও। সুভদ্রা যদি বোনই হল তবে সুভদ্রাহরণ?—আর কথা কবার জো নাই। বলি, কেমন জব্দ!

রুক্মিণী। (অতি মিষ্টস্বরে) দুর মূর্খ।

হারু। (গলিয়া গিয়া) মূর্খই তো বটে, তোমার কাছে আমি তো ভাই চিরকালই মূর্খ।—আচ্ছা ভাই, কথাটা যদি তোমার পছন্দ না হল, কী ডাকলে তুমি খুশি হবে, আমাকে বলো।

রুক্মিণী। বলো,—প্রাণ।

হারু। প্রাণ।

রুক্মিণী। বলো—প্রিয়ে।

হারু। প্রিয়ে।

রুক্মিণী। বলো—প্রিয়তমে।

হারু। প্রিয়তমে।

রুক্মিণী। বলো—প্রাণপ্রিয়ে।

হারু। প্রাণপ্রিয়ে। আচ্ছা ভাই প্রাণপ্রিয়ে, তুমি যে টাকাটা দিলে তার সুদ কত?

রুক্মিণী। (রাগের ভানে মুখ-বাঁকানো) যাও, যাও, এই বুঝি তোমার ভালোবাসা? সুদের কথা কোন্ মুখে জিজ্ঞাসা করলে?

হারু। (আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া) না, না, সেকি হয়? আমি কি ভাই, সত্য বলছিলাম? আমি-যে ঠাট্টা করছিলাম, এইটে আর বুঝতে পারলে না? ছি প্রিয়তমে। (উৎসাহে চাপাকণ্ঠে) বইগুলো? সেই স্বদেশী-বইগুলোর কথা বলছি—(বলিয়াই আদর করিতে যেই রুক্মিণীকে টানিয়া কাছে আনিয়াছে অমনি সরল-হৃদয়া রুক্মিণী আদরে গলিয়া গিয়া হারুর বক্ষে লুটিয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিয়া উঠিল—)

রুক্মিণী। বিবাহ কারে বলে, কারে বলে স্বামী—
আজও শিখিনি—

শুধু এইটুকু জানি
শুনব কথা দেখব তারে
ভালোবাসি যারে—

(বলিতে-বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। হারু তখনো বলিল—)

হারু। বইগুলো? সেই বইগুলো কোথায়? (রুক্মিণীর চোখ-মুছানো) ছিঃ প্রিয়তমে, ছিঃ! (রুক্মিণীর মুখখানি দুইহাতে তুলিয়া-ধরা)

(উদ্‌ভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন রানীর প্রবেশ)

রানী। (সম্মুখের দৃশ্য দেখিয়া চমকাইয়া লজ্জা-ঘৃণা ও ক্রোধে) ছি, ছি—এ সব কী হচ্ছে! (মুখ ফিরাইয়া বাহিরে ছুটিয়া যাইবার মুখে হারু লাফাইয়া গিয়া রানীর আঁচল টানিয়া ধরিয়া)

হারু। এ শিকার ছাড়া হবে না। (রানীর মুখ চাপিয়া ধরিতে গেলে—)

রানী। (রুক্মিণীর প্রতি) দিদি, দিদি—(রুক্মিণী ছুটিয়া আসিয়া—)

রুক্মিণী। সাবধান, পিশাচ! (হারুকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া রানীকে) ভয় নাই দিদি, ভয় নাই, (মুখ ফিরাইয়া হারুকে তীব্রশ্লেষে ক্রূরকটাক্ষে) কেন গা, আমাকে কি আর মনে ধরে না? বলি, এখন তো মনে ধরবেই না। কেন গা, এ-মুখটা বুঝি কালো? যদি কালোই হয়ে থাকে সে তো তোমার জন্যেই! —তবে এক-কালে কেন—(কাঁদিয়া ফেলা, পরক্ষণেই আহত ক্রুদ্ধা-বাঘিনীর মতো একদৃষ্টিতে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া থাকা। তখনই নেপথ্যে—)

নেপথ্যে ব্রতীন্দ্র। কোথায় কে রয়েছে—সুধাই কাকে! ভিতরে ঝগড়া হচ্ছে (উচ্চকণ্ঠে) ঘরে কে আছ? (আরো জোর-গলায়) রুক্মিণী, রুক্মিণী ঘরে আছ? (বলিতে-বলিতে ব্রতীন্দ্রের প্রবেশ ও রানীকে দেখিয়া উদ্বেগে) তুমি রানী? রানী তুমি এখানে? (চাপা-গলায়) বইগুলো? —চলো, চলো! তাড়াতাড়ি এসো। (সম্মুখে হারুকে আক্রমণোদ্যত দেখিয়া) তুমি হারু? সেই গুপ্তচর, শয়তান? (রুক্মিণীর দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে) রুক্মিণী! এবার বুঝেছি, তবে এসব তোমাদের দুজনের ষড়যন্ত্র! (হারুকে) পামর! (ধাক্কা মারিয়া হারুকে মেঝেতে ফেলিয়া দিয়া রানীকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া) রানী, চলে এসো,—চলো, চলো।

রানী। (মাটিতে পড়িতে গিয়া হারুর মাথার পাগড়িটা খসিয়া পড়িয়াছিল। রানী প্রস্থানের-মুখে মুখ ফিরাইয়া আরেকবার রুক্মিণীকে দেখিতে গিয়া পাগড়ি-খোলা মাথায় হারুকে দেখিয়া বিস্ময়ে আতঙ্কে) ও কে ? গুপ্তচর ! শেষে, সন্ন্যাসী হল গুপ্তচর ? (উভয়ের প্রস্থান)

(এবার একবার বাহিরের দিকে কটাক্ষ করিয়া লইয়া নিজের বুকে আঙুল ছোঁয়াইয়া রূঢ় ব্যঙ্গ-স্বরে হারু মেঝে হইতে উঠিতে-উঠিতে বিকৃত-মুখে গাহিয়া রুক্মিণীকে লক্ষ্য করিয়া মত্তাবস্থায় টলিতে টলিতে বলিল—)

হারু। সখি,—এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ ? বলি,—কী চলছে ? নূতন প্রণয় ? (কাষ্ঠ-হাসিতে) ও কী বলছিল ?—ডেকে ডেকে ?—কেন বলছিল—"ঘরে কে, ঘরে কে,—রুক্মিণী, রুক্মিণী" ! (ধিক্কারে মোলায়েম-ব্যঙ্গস্বরে) প্রিয়তমে,—ছিঃ। (হঠাৎ সহাস্যে সক্রোধে চীৎকারে) পিশাচী !

রুক্মিণী। (পিছন হইতে রানীকে ডাকিয়া)—"দিদি, দিদি ! আমাকে মনে রাখিস। আমার পাপিষ্ঠ মন, আমি অশুচি, আমি অসতী—পতিতা। আমার তো জগৎ নাই। আমি কেবল—(ফোঁপাইয়া কান্না)।

হারু। পাপিয়সী !—(মেঝে হইতে উঠিয়াই রুক্মিণীকে আথালি-পাথালি পদাঘাত করিতে করিতে) কোথায় আমার শিকার ? আমার শিকার কোথায় গেল ? আর, তোরও তো সে নূতন শিকারই বটে ! আমাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে এবার কিনা স্বদেশীটার সঙ্গে চলছে—গোপনে-গোপনে সাক্ষাৎ ? কিন্তু তুমি যা মনে করেছ তা নয়, আমি তোমাদের ভিতরকার কথা সবই জানি। মায়াবিনী ! স্বদেশীর সঙ্গে চলছে ষড়যন্ত্র ? তোরা আমাকে ধরিয়ে দিবি ? (স্বগত) ওদিকে সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। স্বদেশীদের ধরিয়ে দিলে মোটা পুরস্কার ! হায় হায় ! জুটল না,—পুরস্কারটা কপালে জুটল না। (সক্রোধে রুক্মিণীকে তাড়া করিয়া) খুন !—খুন করব !—দেব,—দেব গলা টিপে। ষড়যন্ত্র—ওঃ—তবে রে সর্বনাশী—(দুই হাতে রুক্মিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রুক্মিণী ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মেঝেতে পড়িয়া গোঁঙাইতে লাগিল ও জ্ঞান হারাইল। এদিক-ওদিকে চাহিয়া লইয়া ভয়ে সন্দেহে)—কী জানি, মরে নাই তো ?–(বলিয়াই রুক্মিণীর অসাড়-দেহটাকে নাড়িয়া গায়ে হাত দিয়া, তাপ-দেখিয়া, হারু ভয়ে দৌড়াইয়া পলাইল। এই সময় কবি ও বিশ্ববান্ধব-সহ স্বদেশী-সেবা-সমিতির কর্মীদের প্রবেশ)

জনৈক কর্মী। কলকাতায় প্লেগ তো খুব জেগে উঠেছে।

কবি। সতর্ক থাকলে প্লেগ অনেকেই এড়াতে পারে।—(বলিতে-বলিতে কবি, "প্লেগ-সেবা-সমিতি"-লেখা পতাকা ও সরঞ্জামবাহী প্লেগ-সেবকদল-সহ রুগী-সন্ধানে, সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রুক্মিণীর দেহ দেখিয়াই কবি কর্মীদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন)—কে ওই প'ড়ে? প্লেগ হয়েছে? ও কি মৃত?

কর্মী। দেখছি—আড়ষ্ট! হঠাৎ কী জানি কী কারণে এমন হল! তা, এখন বাঁচাবার উপায়?—(কবি আগাইয়া গিয়া তখনই কাছে বসিয়া রুক্মিণীর আড়ষ্ট-শির কোলে তুলিয়া)

কবি। "জল আনো, জল"। (ঘরের কোণের ঘড়া হইতে কর্মীরা জল আনিয়া দিল। চোখে-মুখে জলের ছিটা দিতেই ক্রমে রুক্মিণীর একটু জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইতেই রুক্মিণী কবিকে দেখিয়া কাতর-স্বরে থামিয়া-থামিয়া)

রুক্মিণী। —ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। তুমি কে এসেছ—ওগো দয়াময়?—(বলিয়াই হাতড়াইয়া কবির পা ধরিতে গিয়া আবার জ্ঞান হারাইল)

কবি। (কর্মীদের প্রতি)—জ্ঞান হয়েছে। (স্বগত) হায় হতভাগিনী! ওকে তোমরা নিয়ে চলো। (হাতের ইশারায় কর্মীদের প্রতি রুক্মিণীকে সঙ্গে নিতে নির্দেশ)—চলো।—(রুক্মিণীর অচেতন-দেহ স্ট্রেচারে তুলিয়া নিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ১০

(খুলনা। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট। যথারীতি কাজ চলিতেছে। সার্জেণ্ট ও পুলিসদল দর্শকবৃন্দের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষায় ব্যস্ত। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ব্রতীন্দ্র এবং সাক্ষীর কাঠগড়ায় চেয়ারে-উপবিষ্ট কবি। ম্যাজিস্ট্রেট রায় পড়িতেছেন—)

ম্যাজিস্ট্রেট। জাতীয়-বিদ্যালয়ের শিক্ষক—

ব্রতীন্দ্র। বন্দেমাতরম্।

ম্যাজিস্ট্রেট। 'হুংকার'-নামে কবিতার বই লিখিয়া—

ব্রতীন্দ্র। বন্দেমাতরম্।

ম্যাজিস্ট্রেট। বই লিখিয়া বিনানুমতিতে উৎসর্গ করেন—(কবির দিকে চাহিলেন)

কবি। (উদ্দীপ্তভাবে) হ্যাঁ, উৎসর্গ করেন আমার নামে।

ব্রতীন্দ্র। (কবির উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাইয়া) উৎসর্গে লিখেছিলাম—"ছাড়িনু 'হুংকার'—পৌঁছিবে পদে তোমার"।

ম্যাজিস্ট্রেট। কাব্যখানি রাজদ্রোহের। 'হুংকারে'র জন্য (ব্রতীন্দ্রের দিকে চাহিয়া লইয়া) আসামীর রাজদ্রোহের-অপরাধে একমাস সশ্রম-কারাদণ্ড হইল। (রায়ের কাগজ পেস্কারকে দিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের প্রস্থান)

কবি। (কাঠগড়া হইতে নামিয়া আসিতে-আসিতে বিরক্তিতে) এই মকদ্দমার জন্য এতটা টানাটানি?

(ব্রতীন্দ্রকে লইয়া পুলিসদলের প্রস্থানোদ্যোগ। সঙ্গে-সঙ্গে কবি ও ব্রতীন্দ্রের উদ্দেশে ফুলের গুচ্ছ ও মালা ছুড়িয়া দিয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে দিক কাঁপাইয়া জনতা বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। ভিড়ের মধ্যে হাঁকিয়া হাঁকিয়া "হুংকার" বই বিক্রী হইতে লাগিল। কবির নেতৃত্বে গান চলিতে লাগিল—)

গান

বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান। (প্রস্থান)

(জনতার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিতে-চাহিতে ব্যাকুলদৃষ্টিতে জীর্ণবস্ত্রা রানীর প্রবেশ। "সরে যা, সরে যা" বলিয়া রানীকে ধমক দিয়া পাশ কাটাইয়া ব্যস্ত-সমস্ত এক ব্যক্তি ফুলের একটি তোড়া ও একটি পতাকা-হাতে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি দিতে-দিতে একান্ত-আগ্রহে সম্মুখের দিকে দ্রুত চলিয়া গেল। লোকটির দিকে চাহিয়া-লইয়া, একপাশে সরিয়া হতচকিত রানী স্বগত বলিয়া উঠিল—)

রানী। সবাই কত কী দিচ্ছে!—আমি কী দেব? কিছুই যে আমার কাছে নেই। (সম্মুখে চাহিয়া দূরের মিছিল দেখা)

(পিছনে-পিছনে তাক করিয়া নিঃশব্দে হারুর প্রবেশ ও এদিক-ওদিক দেখিয়া লইয়া সতর্কতার সহিত রানীর পিছু-লওয়া। তখনই কক্ষ ঝাঁট দিতে ঝাড়ু-বালতি-হাতে জমাদারনীর প্রবেশ ও হারুকে সন্দেহজনক অবস্থায় আগাইতে দেখিয়া রহস্যের সহিত চাপা-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—)

জমাদারনী। বলি, কার জন্যে এমন ঘোরাফেরা! ঘর ছেড়ে এবার পথের মানুষ খুঁজতে হচ্ছে বুঝি?

(অদূরে রানীকে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে—"ও মা"! বলিয়া গালে হাত দিয়া আরো-কিছু বলিতে উপক্রম করিতেই হারু মুখে আঙুল রাখিয়া জমাদারনীকে চুপ

থাকিবার ইশারা করিয়া হাতের ইঙ্গিতে ডাকিয়া লইয়া দ্রুত রানীর পশ্চাদনুসরণ করিল)

রানী। (একমনে সামনে চাহিয়া থাকিয়া স্বগত বলিয়া-চলিয়াছে) একটি লোকও নেই, সবাই চলে গেছে। (থামিয়া সনিঃশ্বাসে) উনিও চলে গেছেন!—তা হলে? আমি এলাম, কিন্তু উনি?—অপেক্ষা করলেন না? (হঠাৎ চারিদিক দেখিয়া ভয়ে-দুঃখে-আশঙ্কায়) বাইরে চলে এলুম! এখানে যে আমার কেউ নেই!—একলা, শুধু একলা আমি। (থামিয়া সম্মুখে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে) তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ—কিন্তু অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না?—সেটা কি আজ তোমাকে জানিয়ে যেতে পারব না? তবে—(পদশব্দে চমকাইয়া পিছনে দৃষ্টি ফিরাইতেই) কে? কে তুমি?

(চাকরি-ছাড়িয়া দেওয়া স্বদেশানুরাগী প্রাক্তন-পুলিস-পাঁড়েজীর প্রবেশ)

পাঁড়েজী। আমি? আমি এখন (দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ওই প্রাসাদের দ্বারী।

রানী। (অন্যমনে স্বগত) কিসের জন্য সে এল? বীরত্ব দেখাবার জন্য? শুধু এল বীরত্ব দেখাবারই জন্য?—সেই 'বন্দেমাতরম্'? পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। যাবার আগে প্রণাম করে নিই। (সম্মুখের দিকে নেপথ্যের উদ্দেশে যুক্তকরে প্রণাম-নিবেদন)

পাঁড়েজী। মা, তুমি হেঁটে-হেঁটে চলেছ।—এই দীন-বেশ!—একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে—

রানী। না, না, না, আমি তাঁর দাসী—সকলের নিচে আমার স্থান।

পাঁড়েজী। এর উপরে আর কথা নেই। (রানীর সঙ্গে পাঁড়েজীর প্রস্থান)

(সতর্কে তাক করিয়া রানীর অনুসরণরত হারুর পুনঃ-প্রবেশ)

হারু। (স্বগত) শিকার। এ-শিকার ছাড়া হবে না তো! (প্রস্থান)

দৃশ্য ১১

(কলিকাতা। অদূরে মন্দির। সম্মুখস্থ পথ। দুপুর)

১ম পথিক। সকলে সরে যাও। সরে যাও তোমরা। দেখ্ছ না, কলের কুলি সেই—রঘুর মেয়েটা আসছে-যে।

(গাহিতে-গাহিতে রানীর প্রবেশ)

গান

রানী। ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে।
দ্বারে-দ্বারে বেড়াই ঘুরে মুখ তুলে কেউ চাইলি-নে॥
লক্ষ্মী তোদের সদয় হোন, ধনের উপর বাড়ুক ধন,—
আমি একটি মুঠো অন্ন চাই গো
তাও কেন পাই-নে॥
ওই-রে সূর্য উঠল মাথায়, যে-যার ঘরে চলেছে,
পিপাসাতে ফাটছে ছাতি, চলতে আর-যে পারি-নে।
ওরে তোদের অনেক আছে আরো অনেক হবে,—
একটি মুঠো দিবি শুধু আর কিছু চাই-নে॥

১ম পথিক। ছুঁসনে ছুঁসনে—

২য় পথিক। সরে যা অশুচি।

৩য় পথিক। হতভাগী, জানিস-নে? রাজপথ দিয়ে যত নগরের লোক আনাগোনা করে!—এ পথে তুই কেন?

(রানীর পথপার্শ্বে সরিয়া-দাঁড়ানো)

গান

রানী। শোনো শোনো আমাদের ব্যথা দেব-দেব প্রভু দয়াময়—
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয়।

(পূজার-ডালি-হাতে বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। কে তুমি গা? বলি, কার বাছা?—চোখে যে জল দেখছি! ভিখারিনী-বেশ। অমন করে একপাশে এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

রানী। (কাঁদিয়া উঠিয়া) মা, আমি যে অনাথিনী।

বৃদ্ধা। (কাছে আগাইয়া) আহা, মরে যাই।

পথিকগণ। ছুঁয়ো না, ওকে ছুঁয়ো না—

কে গো তুমি! জানো না কি—

—কোথাকার-কে! একটা কলের কুলি! ও যে তারি মেয়ে।

বৃদ্ধা। ছি ছি ছি, তাই নাকি? জাত্‌-কুল নেই! ঘেন্না, কী ঘেন্না—মা-গো!

(প্রস্থান)

রানী। মা জগৎ-জননী, মাগো, তুমিও কি আমাকে নেবে না? তুমিও কি মা, এ-অনাথাকে ঘৃণায় ত্যাগ করবে? সবাই যে মা, দূর করে দিল—ঘর নেই, দুয়ার নেই! ভিখারী হয়ে ফিরছি—তোমার কোলে এখানেও কি একটু আশ্রয় মিলবে না?

রানী। গান

শুনেছে তোমার নাম অনাথ-আতুর-জন—
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন॥
কাঁদে যারা নিরাশায় আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন॥

(গাহিতে-গাহিতে বিশ্ববান্ধবের প্রবেশ)

বিশ্ববান্ধব। গান

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে,
সবার পিছে সবার নিচে সবহারাদের মাঝে॥
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি।
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে।
সবার পিছে সবার নিচে সবহারাদের মাঝে॥

রানী। (বিশ্ববান্ধবকে) প্রভু, কাছে যাব?

বিশ্ববান্ধব। (রানীকে) বৎসে, আমি-যে একরকম সন্ন্যাসী। আমার তো ঘৃণা-অনুরাগ নেই,—আমার কাছে যে সবাই সমান।

রানী। কিন্তু, যখন সবাই এসে তোমাকে বলবে—ওকে ছুঁয়ো না, ও কোথাকার কে—অস্পৃশ্য—

বিশ্ববান্ধব। ভয় নাই, বৎসে। চলো—

(উভয়ে প্রস্থানোন্মুখ, এমন সময়ে হঠাৎ গুপ্তচর-হারুর প্রবেশ ও রুখিয়া আগাইয়া বিশ্ববান্ধবকে ভর্ৎসনার সুরে)

হারু। ভণ্ড-তাপস,—ধর্মের নামে ঘরে-ঘরে বেশ ধর্মলোপ করে বেড়াচ্ছ? লোকের চোখে তুমি সুখে বসে ধুলা দিয়ে চলেছ! (রানীকে দেখাইয়া) আর অবলা-অখলা এই মেয়েটা যে পথে-পথে তোমার জন্য পাগল হয়ে ফিরছে!

(বিব্রতাবস্থায় হারুর দিকে বিশ্ববান্ধবের চাহিয়া-থাকা)

রানী। (ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া পালাইতে-পালাইতে হারুকে দেখাইয়া) ও কে, ও কে, ও কে?—সেই গুপ্তচর? (প্রস্থান)

বিশ্ববান্ধব। (রানীর অনুসরণে চলিতে চলিতে রানীরই উদ্দেশে)

ভয় নাই মাতঃ, লইব না অপরাধ।
এনেছ আমার মাথার ভূষণ অপমান-অপবাদ।
(নেপথ্যের দিকে ভগবদুদ্দেশে প্রণতি-পূর্বক)
ভগবান! যদি কূল পাই তরণী-গরব রাখিতে না-চাহি কিছু,—
তুমি যদি থাকো আমার উপরে, আমি র'ব সব-নিচু।

(প্রস্থান)

(কাচুমাচু-মুখে হারুর তাড়াতাড়ি অন্যদিকে সরিয়া পড়া। ওদিকে (গাহিতে-গাহিতে নিবেদিতা পথ দিয়া চলিয়া গেল—)

গান

নিবেদিতা। এ কী অন্ধকার এ ভারতভূমি,
বুঝি, পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে-পলে ডুবে রসাতলে কে তারে উদ্ধার করিবে॥
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি।
আজি এ আঁধারে বিপদ-পাথারে কাহার চরণ ধরিবে॥

(মাধব ও পতাকা-হাতে স্বদেশী-কাপড়ের-মোট কাঁধে লইয়া ফেরিওয়ালার-বেশে কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। এখানে কেন এলে?

মাধব। দু'বছরের খাজনা বাকি, দেবে কিনা বলো।

কিশোর। না,—দেব না।

মাধব। দেবে না? এত বড়ো আস্পর্ধা?

কিশোর। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

মাধব। আমার নয়?

কিশোর। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

মাধব। (চীৎকারে) আমার নয়? (ব্যঙ্গস্বরে) এখন যত—সুর তোলা-হচ্ছে—কিনা—ক্ষুধার অন্ন! দু'বছরের খাজনা বাকি! —ও-সব অন্ন-টন্ন বুঝিনে! খাজনা চাই বাপু! কেন বিপদে পড়বি!—

(উক্তিরত পুলিসের প্রবেশ)

পুলিস। কী বাবা, চেঁচামেচি করছ কেন, বলো তো?

মাধব। সরকারের কাছে দরবার করব।

পুলিস। পরামর্শ শোনো বাবা—দরবার করতে গিয়ে মরবি। তোরা নেহাৎ ছোটো ব'লেই,—কিন্তু যদি হাঙ্গামা করিস তো একটি প্রাণীও রক্ষা পাবি-নে।

(ভয়ে মাধব চলিয়া গেল; পুলিস হাতের খৈনিটুকু মুখে ফেলিয়া কিশোরের দিকে কিছু ঘুষের ইঙ্গিত করিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"ট্যাঁকে কিছু আছে?" কিশোর ভ্রূকুটি করিয়া পথ ধরিল, পিছনে-পিছনে প্রত্যাশী-মুখে পুলিসের প্রস্থান)

(আলাপরত আনন্দমোহন, বীরেন, ব্রতীন্দ্র ও অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। ঠিক তা ঠিক, সর্বত্রই ঘটছে অসামঞ্জস্য!

বীরেন। যা বলেছ! আজ দেশ-জোড়া-ই এই অসামঞ্জস্য!

আনন্দমোহন। আমাদিকে এই সামাজিক-অসামঞ্জস্যের ভয়ংকর বিপদ হতে দেশের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করতে হবে।

অরুণ।
হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

বীরেন।
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

আনন্দমোহন। একটা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ আসন্ন হয়ে এসেছে। শরতে যে বৃষ্টি নিতান্ত দরকার সেটা একেবারেই হল না। বিপ্লবের সূচনা দেখা যাচ্ছে। তা নিয়ে তোমাদের ভাববার দরকার নেই। কিন্তু অনাহার থেকে দেশের লোককে বাঁচানোই তোমাদের ব্রত হবে। এতে তোমাদের নিজেদের যদি ক্ষতি হয়, তাও স্বীকার করতে হবে।

(সকলের প্রস্থান)

(তখনই ছেলে-তমিজের হাত ধরিয়া ফকুর-পরিবার ফরিদা প্রবেশ করিল ও মৌনমুখে ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে আনন্দমোহন, বীরেন, ব্রতীন্দ্র ও তরুণদের পিছে চলিতে লাগিল)

তমিজ। (ফরিদাকে) মা, কী খাব? (কান্না)

ফরিদা। (ব্রতীন্দ্রকে) বাবু, দুটি খেতে দাও। ওগো, এই ছেলেটিকে দাও, আমি কিছু চাইনে। (প্রস্থান)

(আলাপরত উত্তেজিত একদল লোকের প্রবেশ)

১। সাহসে সব কাজ হয়—ওই যে কথায় বলে,—"আছে যার বুকের পাটা যমরাজকে সে দেখায় ঝাঁটা।"

২। ভিক্ষে করে কিছু হবে না, আমরা লুট করব। (৩-কে) লুটপাটে দোষ আছে কি?

৩। কিছু না, খিদের কাছে দোষ নেই রে বাবা। জানিস তো অগ্নিকে বলে পাবক, অগ্নিতে সকল পাপ নষ্ট করে। জঠরাগ্নির বাড়া তো আর অগ্নি নেই।

অনেকে। আগুন?—তা ঠিক বলেছ। বেঁচে থাকো ঠাকুর! তবে তাই হবে। তা, আমরা আগুনই লাগিয়ে দেব। ওরে, আগুনে পাপ নেই রে। এবার ওদের বড়ো-বড়ো ভিটেতে ঘুঘু চড়াব।

২। দাদা, রাজাকে ভয় করবে না?

১। ভয় আমি কাউকে করিনে।

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব। বেশী ব্যস্ত হবার দরকার করে না, চুলোতেই যাবে শিগ্‌গীর, তার আয়োজন হচ্ছে। বেটা তোরা কী বলছিলি রে?

১। আমরা ঐ ভদ্রলোকের কাছে (৩-কে দেখাইয়া) শাস্ত্র শুনছিলুম।

মাধব। এমনি মন দিয়েই শাস্ত্র শোনে বটে। চীৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তালা ধরিয়ে দিলে!—যেন ধোপা-পাড়ায় আগুন লেগেছে।

২। তোমার কী ঠাকুর? তুমি তো রাজবাড়িতে সিধে খেয়ে-খেয়ে ফুল্‌ছ—আমাদের পেটের নাড়িগুলো যে জ্বলে-জ্বলে ম'ল—আমরা কি বড়ো সুখে চেঁচাচ্ছি?

মাধব। (৩-কে) তোমাকেই এর মধ্যে বুদ্ধিমানের মতো দেখাচ্ছে, আচ্ছা, তুমি বলো দেখি, কথাগুলো কি ভালো হচ্ছিল? আর, তোমাকেও তো (১-কে দেখাইয়া) বেশ ভালোমানুষ দেখছি হে। আমি রাজার কাছে বিশেষ ক'রে তোমাদের দুজনের নাম করব। কথাগুলো কি রাজা শোনে-নি, রাজা সব শুনতে পায়।

(বিমূঢ়ভাবে সকলের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি, বিভিন্ন জনের মধ্যে বিভিন্নভাবে আশা, নিরাশা, ক্ষোভ ও আশঙ্কার প্রকাশ)

(আর-একদল আলাপরত লোকের প্রবেশ)

ক। এবারে মেলায় তেমন লোক হল না।

খ। এবারে আর লোক হবে কী? সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগল। একখানা চালাও বাকি রইল না।

ক। (মাধবকে) খুড়ো, গোলা ভ'রে-ভ'রে গম জমিয়ে রেখেছ!—

খ। সৈন্য এল ব'লে। সমস্ত লুটে নেবে। (সকলকে মাধবকে দেখাইয়া) আমাদের এই মহাজনদের বড়ো-বড়ো গোলা আর মোটা-মোটা পেট বেবাক ফাঁসিয়ে দেবে। গম আর রুটি দুয়েরই জায়গা থাকবে না।

মাধব। আচ্ছা, আমোদ করে-নে। কিন্তু শিগ্‌গীর তোদের ঐ দাঁতের পাটি ঢাকতে হবে। গুঁতো সকলেরই উপর পড়বে।

গ। সেই সুখেই তো হাসছি বাবা! এবারে তোমায়-আমায় একসঙ্গে মরব। তুমি রাখতে গম জমিয়ে, আর, আমি মরতুম পেটের জ্বালায়। সেইটে হবে না। এবার তোমাকেও জ্বালা ধরবে। সেই শুকনো মুখখানি দেখে যেন মরতে পারি।

১। আমাদের ভাবনা কী ভাই? আমাদের আছে কী? প্রাণখানা এমনেও বেশিদিন টিকবে না, অমনেও বেশিদিন টিকবে না। এ'ক'টা দিন কষে মজা ক'রে নে রে ভাই।

২। (আগন্তুক একজনকে) ও-জনার্দন, এতগুলি থলে এনেছ কেন? কিছু কিনবে না কি?

জনার্দন। একবারে বছর-খানেকের মতো গম কিনে রাখব। (মাধবকে ইশারা)

২। কিনলে যেন, রাখবে কোথায়?

জনার্দন। আজ রাত্তিরেই মামার বাড়ি পালাচ্ছি।

ক। মামার বাড়ি-পর্যন্ত পৌঁছলে তো! পথে অনেক মামা ব'সে আছে। আদর করে ডেকে নেবে।

(উত্তেজিত একজনের প্রবেশ। সেইদিকে সকলের দৃষ্টি যাওয়া-মাত্র উল্টা-দিক দিয়া এক-পা দু'-পা করিয়া অলক্ষিতে মাধবের সরিয়া পড়া)

আগন্তুক। ওরে, কে তোরা লড়াই করতে চাস, আয়।

১। রাজি আছি। কার সঙ্গে লড়তে হবে ব'লে দে।

আগন্তুক। রাজা বলেছে,—যে সন্ধান ব'লে দেবে তাকে পুরস্কার দেবে। মহাজন, ঐ মহাজন-খুড়ো ষড় ক'রে আমাদের এই বৈরাগী-ঠাকুরকে ধরিয়ে দিতে চায়, গোপনে বন্দী করতেও চেষ্টা করেছিল।

১। বটে? আয় ভাই, খুড়োকে গুঁড়ো ক'রে (মুখ ফিরাইয়া মাধবের দিকে চাহিতে গিয়া দেখিল, কোথাও সে নাই। সকলে হতভম্ব বনিয়া গেল,—"কোথায় সে গেল!")

২। লড়তে বলছ?—তা লড়ব! এই মাঠ থেকেই লড়াই শুরু করে দেওয়া যাক-না। প্রথমে ঐ মহাজনদের চালের বস্তাগুলো লুটে নেওয়া যাক, তারপর ঘি আছে। কাপড় আছে।

সকলে। লড়ব, লড়ব –চলো, চলো। (প্রস্থান)

(সন্তর্পণে বিশুর প্রবেশ)

বিশু। হে হরি, কী দেখলুম! কী শুনলুম! এরা তবে স্বদেশী ডাকাত? কী বললে—লড়াই! তবে, লড়াই শুরু হচ্ছে? (বিস্ময়ে ও আনন্দে চক্ষু ছানাবড়া-করা) মধুসূদন! রাজাকে দুটো মিষ্টি কথা পাঠিয়ে দেওয়া যাক! বাবা, স্বদেশী! তোমরা বেঁচে থাকো। দয়াময়!—তা বলব, খুব মিষ্টি-মিষ্টি করে-ই বলব, রাজা কী খুশি-ই না হবে! কথাগুলো যত বড়ো-বড়ো ক'রে বলব, রাজার মুখের হা তত বেড়ে যাবে।—আঃ কী দুর্যোগ! আজ সমস্ত দিন (পেটে হাত বুলাইয়া) এই দেব-পুজোটা হয়নি। এবার গিয়ে (আহারের ইঙ্গিতে মুখে-আঙুল-ঠেকাইয়া) একটু পুজো-আর্চায় মন দেওয়া যাক। দীনবন্ধু, ভক্তবৎসল হরি হে!

(প্রস্থান)

(উত্তেজিত একদল বস্তিবাসী-শ্রমিকের প্রবেশ)

১! চাইনে আমরা রাজা। যাক্-রাজা, মরুক্ রাজা।

বৃদ্ধ মজুর। ওরে, তোরা মরতে বসেছিস না-কি? বলিস কী রে! আগে রাজাকে জানা, তারপরে যদি না শোনে তখন না-হয় অন্য পরামর্শ বে।

১। আমি প্রথমেই বলব—

অতিদর্পে হতা লঙ্কা, অতিমানে চ কৌরবঃ।
অতিদানে বলীর্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্॥

২। বেশ বেশ। সাবাস। (তৃতীয়কে) বুঝেছ ভাবখানা?

৩। আমাকে আর বোঝাতে হবে না দাদা। আমি আর বুঝিনি? আজ বাইশ-বৎসর ধ'রে আমি শহরে গুড়ের কারবার করে আসছি, আর, একটা মানে বুঝতে পারব না, এ কোন্ কথা।

২। ঠিক বলেছ, তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু রাজা যদি না বোঝে তুমি কী ক'রে বুঝিয়ে দেবে বলো তো-শুনি।

১। (হাবার মতো চেয়ে-থাকা)

২। অর্থাৎ, বাড়াবাড়িটে কিছু নয়।

৩। ওই, অত-বড়ো কথাটার এইটুকু মানে হল?

২। তা না-হলে আর শাস্তর কিসের?

৩। কিন্তু কথাটা ভালো,—শুনে রাজার চোখ ফুটবে।

২। সব বুঝলুম, কিন্তু যে-রকম কাল পড়েছে, রাজা যদি শাস্তর না শোনে।

১। তখন আমরাও শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব।

৪। সাবাস বলেছ, শাস্তর ছেড়ে অস্তর!

৩। কিন্তু, বড়ো গোলমাল হচ্ছে। কথাটা কী যে স্থির হল, বুঝতে পারছি নে।—শাস্তর না অস্তর?

২। বেটা তাঁতি কি না, এইটে আর বুঝতে পারলি নে? তবে এতক্ষণ ধরে কথাটা হল কী? স্থির হল যে শাস্তরের মহিমা বুঝতে ঢের দেরী হয়, কিন্তু অস্তরের মহিমা খুব চট্‌পট্ বোঝা যায়।

অনেকে। তবে শাস্তর চুলোয় যাক্, (উচ্চস্বরে) অস্তরই ধরো।

৫। (তৃতীয়কে), বেটা তাঁতি-বুঝতে পারলি?

(কথারত মুকুন্দ ও কবির প্রবেশ)

মুকুন্দ। কল তাঁতকে মারছে, আর ব্রিটিশ-শাসন মারছে গ্রামকে। আমরা কি দিনে-দিনে সম্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হতে দেখব?

(বিশুর সঙ্গে উত্তেজিত সার্জেণ্টের প্রবেশ)

বিশু। (সার্জেণ্টকে, জনতাকে দেখাইয়া) ঐ যে ওরাই সব বলছিল—'অস্তর ধরো'।

সার্জেণ্ট। বটে?—অন্তর?

জনতা। হাঁ, অন্তর! এবার অন্তরই ধরব।

সার্জেণ্ট। সাহস তো কম নয়!

জনতা। সাহসেই তো কাজ হয়।

সার্জেণ্ট। গ্রামের মানুষ!—তাদের মুখে আজ এই কথা?

জনতা। কেন বলব না। তোমাদের শাসন গ্রামকেও যে মারছে।

সার্জেণ্ট। তোমাদের মুখে এ-কথা ফোটাল কিসে?

জনতা। তোমাদের শাসনে। শোন-নি, সেই গান?—"শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরো।"

কবি। (জনতাকে) থামো তোমরা। সাহেব, কড়া-শাসনে, উগ্রতায় গবর্ণমেণ্টের বলিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না। কেবল ভয় প্রকাশ হয় মাত্র।

জনতা। শুনেছ সাহেব?—প্রকাশ হয় মাত্র ভয়।

সার্জেণ্ট। ভয়?

মুকুন্দ। হাঁ, ভয়! অগ্নিকাণ্ড-যে! তুলার বস্তার মধ্যে আগুন ফেলে যখন সমস্তটা ধরে উঠবার উপক্রম হল, তখন প্রবল পদাঘাতের দ্বারা সেটা নির্বাণ করার চেষ্টা হচ্ছে! তুলা-বেচারি একে তো পুড়ল, তারপর লাথিটাও অপর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হল। ইংরেজের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত যে! তাইতো এ-সমস্ত ব্যাপার ঘটছে!

সার্জেণ্ট। (জনতাকে) পথে জটলা কিসের? পথ ছাড়ো।

জনতা। তোমরা কড়া শাসন ছাড়ো। (জনতার একজন শাসাইয়া সার্জেণ্টের সামনে যাইতেই)

সার্জেণ্ট। (মাটিতে পদাঘাত করিয়া দাপটে) শাসন ছাড়ব? শাসনের এখনো কী দেখেছ?

কবি। দুর্ভিক্ষ, ভূকম্প, মহামারীর প্রলয় পীড়নে দেশ আসন্ন মৃত্যুর ভীষণ নৈরাশ্যে উদ্দাম। এই সময় পতিতের উপর পদ-প্রহার, ব্যথিতের উপর জবরদস্তি?—এ-যে ভয়ের নিষ্ঠুরতা-মাত্র।

সার্জেণ্ট। (উপহাস্যে) ভয়ের নিষ্ঠুরতা? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

জনতা। আবার হাসি? ছিঃ—ছিঃ (ধিক্‌কার-ধ্বনি)

মুকুন্দ। ওরা হাসবেই তো! ওরা কি সব-কথার অর্থ বোঝে? এদের মধ্যে এমন মূঢ়চেতারও অভাব নাই যারা অসহ্য অবজ্ঞার আঘাতে প্রজা-হৃদয়ে অপমান-ক্ষত

সর্বদা জাগিয়ে-রাখাই রাজনৈতিক-হিসাবে কর্তব্য জ্ঞান করেন! এই করেই এরা নিজেরাই প্রজাবিদ্রোহ সৃষ্টি করছে।

সার্জেণ্ট। এখনো সরলে না? (হুইসিল-বাজানো। জনতা বিশু ও সার্জেণ্টকে ঘেরাও করিতে উদ্যত)

বিশু। (সার্জেণ্ট-কে) আর, বাঁশি নয় সাহেব! এখন চাই হাসি! হাসি লাগিয়ে চলো। দেখছ-না ওরা কেমন মরীয়া হয়ে উঠেছে। মারামারি বাধাবে, মুশ্‌কিলে ফেলবে—তার চেয়ে আমরাও দলেবলে সেজে আসি-গে, চলো!

কবি। (জনতাকে) হাঙ্গামার উপর হাঙ্গামা বাধিয়ে লাভ কী। এখন যে-যার কাজে যাও।

জনতা। বন্দেমাতরম্!

সার্জেণ্ট। (জনতার প্রতি রক্তদৃষ্টিতে) Adult Tigers! Blood-thirsty Savages! (বিশু ও সার্জেণ্টের প্রস্থান)

মুকুন্দ। (সার্জেণ্টের উদ্দেশে) কী বললে সাহেব? যত ধেড়ে-বাঘের দল, যত রক্তপিপাসু-বর্বর?—বলি, তা আমরা? না, তোমরা?

কবি। সকলের চেয়ে ভয়ংকর দুর্লক্ষণ দেশের নিশ্চেষ্টতা। আমরা মরছি—ম্যালেরিয়া, প্লেগ, ওলাউঠা, দুর্ভিক্ষে!—নর-রক্ত-পিপাসার নিবৃত্তি হল না। সমস্ত দেশের উপর মৃত্যুর অবিচ্ছিন্ন-জালনিক্ষেপ!—কালরাত্রি—এ যে কালরাত্রি চলছে!

(বিপরীত দিক হইতে উক্তিরত নিবেদিতার প্রবেশ)

নিবেদিতা। (কবিকে) কিন্তু, কালরাত্রি বুঝি পোহাল।—রোগীর বাতায়ন-পথে প্রভাতের আলো দেখা যাচ্ছে যে। (কবি ও মুকুন্দ দুইজনকে দেখাইয়া) এইতো সামনেই দেখছি—আজ দেশের শিক্ষিত-ভদ্রমণ্ডলী সুখে-দুঃখে সমস্ত-জনসাধারণের সঙ্গী ও সহায়।

কবি। মা জননী, এ রাজ্যের লক্ষ্মী তুমি। চলো মা। তুমি এই হেঁটে-হেঁটে দুঃখ কেন পাও?

নিবেদিতা। (কবিকে) আমি হেঁটেই চলে যাব। ওতে কিছু হবে না।

মুকুন্দ। (কবিকে) আমি না-হয় সঙ্গে যাব।

নিবেদিতা। কিছু ভেবো না। সেবা ক'রে আমার জীবন আনন্দে কাটবে।

সকলে। এবার যে আমাদের লড়াই শুরু হচ্ছে।

কবি। (মুকুন্দকে) স্বদেশকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু, কার হাত হতে?

মুকুন্দ ও সকলে। নিজেদের পাপ হতে। ("ঠিক ঠিক"—বলিয়া কবি অগ্রসর হইয়া গেলেন। পথিকদল তাঁহার পিছনে-পিছনে গেল)

নির্বেদিতা। (মুকুন্দকে) আমার শক্তির অভাব।

মুকুন্দ। ও কী বল্‌ছ ? আমার শক্তি যে তুমি।

নিবেদিতা। তাই যদি হয়, তো, সেও তোমারই শক্তিতে।

মুকুন্দ। আমার কেবলই ভয় হয়, তোমাকে যদি হারাই তা-হলে

নিবেদিতা। তা-হলে তোমার কোনো কষ্ট হবে না। দেখো, একদিন ভগবান প্রমাণ করিয়ে দেবেন যে, তোমার মহত্ত্ব একলা তোমাতেই আছে।

মুকুন্দ। আমার সে-প্রমাণে কাজ নাই।

নিবেদিতা। (পশ্চাতে ইশারা করিয়া) ওদিকে একজন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

মুকুন্দ। (ফিরিয়া-চাহিয়া নির্বেদিতাকে) আচ্ছা চললুম, তুমি তবে এসো। —কিন্তু দেখো !—(প্রস্থান)

(ছেলের হাত ধরিয়া ফরিদার প্রবেশ)

নিবেদিতা। আমি যে টাকা আর কাপড় পাঠিয়েছি তা তোদের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে তো ?

ফরিদা। পৌঁচেছে। কিন্তু, তাতে আর আমার কতদিন-বা চলবে ?

নিবেদিতা। ভয় নাই, আমার যতদিন খাওয়া-পরা জুটবে তোদেরও জুটবে। আজও কিছু নিয়ে যা। কিন্তু বেশিক্ষণ এখানে থাকিস না। (উভয়ের প্রস্থান)

(আলাপরত পথিকদের প্রবেশ)

১। মঙ্গল হবে না। তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

২। তিন-মাস কেন, যে-রকম দেখছি তাতে তিন-দিনের ভর সইবে না।

৩। আগুন লাগল। এ বছর চাষার কপালে কী আছে কে জানে।

(পথিকদের প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

(রাত্রি। গলির পাশে কুঁড়েঘরের দাওয়ার মেঝেতে ঘুমন্ত-তমিজকে আঁচলের বাতাস দিতে-দিতে চিন্তিতা-ফরিদা এদিক-ওদিক চাহিতেছিল। ঘরের দরজায় তালা-লাগানো। রাস্তা হইতে একজন পুলিসের প্রবেশ)

পুলিস। (গম্ভীর-কণ্ঠে) চলে এসো।

ফরিদা। (সভয়ে) ওগো, পায়ে পড়ি—আমাকে—

পুলিস। (ধমক দিয়া) ভালোয়-ভালোয় আসবি তো আয়—(লাফাইয়া গিয়া ফরিদাকে জাপ্‌টাইয়া ধরা)

ফরিদা। (চীৎকার) মা গো! (কালো-কাপড়ে সর্বাঙ্গ-ঢাকা কুমার ও বিনির প্রবেশ)

কুমার। (পুলিসকে ধম্‌কাইয়া) খবর্‌দার!

পুলিস। (পাল্টা ধমকে কুমারকে) কোন্ হ্যায়?–স্বদেশী? (কুমার ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একটানে পুলিসের পাগড়ি কাড়িয়া লইলে দেখা গেল সে ছদ্মবেশী-রমজান)

ফরিদা। (ভয়ে) মা গো! (আঁৎকানো। রমজানের ছুটিয়া পলায়ন। হাতের ইশারায় বিনির ফরিদাকে ডাকিয়া আনিয়া টাকা আর কাপড় দেওয়া)

বিনি। এই নাও টাকা আর কাপড়। দেরি কোরো না, শিগ্‌গির চলে যাও। (ফরিদার প্রস্থান। মুখ ফিরাইতেই কুমার দেখিল অদূরে কয়েকটা ভরা-থলে-হাতে কে যেন সন্দেহজনকভাবে ইতস্তত চাহিতে-চাহিতে এদিকে আসিতেছে। দূরে আঙুলের ইশারা করিয়া মুখে আঙুল রাখিয়া নীরবে সরিয়া আসিতে জানাইয়া কুমার বিনিকে টানিয়া নিয়া গেল। মাথায়-কাপড়-জড়ানো লোকটা কাছে আসিয়া ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া পড়িয়া মেঝেতে থলেগুলি নামাইয়া রাখিল, পরে, তালা খুলিয়া চাবিটা তালাতেই লাগাইয়া রাখিয়া থলেগুলি ঘরের ভিতরে রাখিয়া স্বগত বলিল—)

লোকটা। আর শহরে নয়, আজ রাত্তিরেই বাড়ি পালাতে হবে! (এ সময়ে রাস্তায় বিশুর প্রবেশ)

বিশু। (লোকটাকে) কে ওখানে? কে তুমি? (আগন্তুক-লোকটা চাবি খুঁজিতে-খুঁজিতে বেসামাল)

লোকটা। (স্বগত) দুর ছাই!—চাবি? ঘরের চাবিটা আবার এ সময়ে কোথায় গেল? ওটা যে না-পেলে এবারে আর রক্ষা নাই! (দৌড়াইয়া পালাইতে

গেল, কিন্তু দাওয়া হইতে নামিতে গিয়া আছাড় খাইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। মাথার পাগড়ি খুলিয়া মাটিতে পড়িয়া রহিল, লোকটা ডিগ্‌বাজি খাইয়া ত্রস্তে উঠিয়া পালাইল। দেখা গেল, লোকটা আর কেউ নয়—মাধব চাটুজ্যে)

বিশু। (বিস্ময়ে) মাধব চাটুজ্যে! আশ্চর্য! এসময় লোকটা এখানে কী করতে এল? (দাওয়ায় উঠিয়া) থলে-হাতে!—হাতে এতগুলি থলেই-বা কেন? (দেশলাই জ্বালিয়া দরজাটা ফাঁক করিয়া ভিতরে উঁকি মারিয়া) চালের বস্তায় ঘর-ভরা। গম, ঘি, কাপড়,—কত কী! আশ্চর্য, আশ্চর্য! (মাধবের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া সহাস্যে) বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো! তা, বলব, রাজাকে বলব—রাজা কী-খুশিই না হবেন? বাবা, তুমি রাখতে চাল-গম সব জমিয়ে, আর, আমি মরতুম পেটের জ্বালায়। ঐ পেটের জ্বালাতেই তো হয়েছি শেষে আজ এই পুলিসের গুপ্তচর! ছোটোভাই একটা ছিল, পেটের জ্বালায় সেটাও হয়েছে কবে থেকে নিরুদ্দেশ! সব-সংসারটা এই-একটা ঘাড়ের উপর!—পেটের জ্বালায় মানুষকে কী-না করে ফেলে! সত্যি, খিদে পেলে মানুষের যে কী-রকম হয়! সাহেবদের গোমস্তাগিরি ক'রে খাচ্ছি!—বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো, যে-ক'রে-হোক—খেতে পারলেই তো হয়। তবে, বলব চাটুজ্যে, তোমার কথাও বলব রাজাকে, ভালো ক'রেই বলব! (দরজার কড়ায়-ঝোলানো তালা-চাবি হাতড়াইয়া পাইয়া হঠাৎ—) এই যে! তালাচাবি দেখছি এখানেই রয়েছে! (দরজার তালায় চাবি দিয়া চাবিটা পকেটে পুরিয়া) এবারে সরে পড়তে হয়! (ঘুমন্ত তমিজকে কাঁধে লইয়া ফরিদার পুনঃ-প্রবেশ। ফরিদা ও বিশুর পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইয়া আতঙ্কে-চমকানো।)

বিশু। (ভীত ও চাপাকণ্ঠে স্বগত) ডাকিনী?—তাই হবে।

ফরিদা। (অদূরে অঙ্গুলি-নির্দেশে) ডাকিনী নই গো—ঐ দেখো, ওখানে রয়েছে আমারই রান্নার হাঁড়ি-সরা।

বিশু। তবে, প্রেতিনীই হবে! (ফরিদাকে দাওয়ায় উঠিতে দেখিয়া কিছুটা পিছাইয়া যাওয়া (ফরিদা আগাইয়া গিয়া একধারে-রাখা শূন্য হাঁড়ি-সরা ও কতগুলি শাকপাতা লইয়া আসিলে) মানুষই তো দেখছি,—তবে, নিশ্চয়ই ভিখারিনী!

ফরিদা। (শাকপাতাগুলি তুলিয়া ধরিয়া ধরা-গলায় ফুঁপাইয়া বিশুকে) দেখো না গো, শুধু কতগুলি শাকপাতা! এতে কি পেটের জ্বালা যায়? ওগো, তোমার ঐ ঘর থেকে চারটি চাল দাও-না!

বিশু। এ বলে কী! (ফরিদাকে ধম্‌কিয়া) দুর হ হতভাগী! (ধমকে তমিজ

কাঁদিয়া উঠিলে চাপা-কড়াস্বরে তমিজকে) চু-প্ ! (তমিজ ভয়ে থামিয়া গেল ; কিন্তু তমিজের কান্না শুনিয়া আড়াল হইতে কুমার ও বিনির দৌড়াইয়া-আসা)

কুমার। (বিশুকে ধম্‌কিয়া) দাঁড়াও, কে তুমি ? (সমুখে আসিয়া স্বগত) মুখ গোঁফদাড়িতে ঢাকা—তবে কি ছদ্মবেশ ? (বিশুকে) তুমি চোর ? তোমার এ দুর্মতি হল কেন ? ওখানে কী করছিলে !

বিশু। কিছু করিনি তো ! —আপনারা ভুল বুঝেছেন !

কুমার। (ব্যঙ্গস্বরে-ধমকে) কী বললে ? ভুল ? তুমি একটি ভণ্ড ! ভুল বুঝেছি আমরা ? তুমি তাহলে ঠিক কথাটা বলো। (বিশু দৌড়াইয়া পালাইতে উদ্যত, কুমারও ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে গেলে বিশু ছুরি বাহির করিয়া কুমারের বুকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল, কুমারও তখনই চকিতে পিস্তল বাহির করিয়া বিশুকে তাক্ করিয়া পিস্তল দেখাইয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—)

কুমার। ভণ্ডগিরি খাটবে না—ভালোমানুষের মতো—(বলিয়া বাকিটা মৌনমুখে শুধু বাঁ-হাত দিয়া ইঙ্গিতে পথ-দেখাইয়া দিয়া) দূর হও জানোয়ার !

বিশু ! (ছুরি পকেটে রাখিয়া দিয়া নতমস্তকে রওনা হইয়া একটু গিয়াই স্বগত) হাতে পিস্তল ! তবে স্বদেশী ! স্বদেশী-আন্দোলন ! গুপ্তহত্যা ! রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ? বলব—রাজাকে বলব—রাজা কী খুশিই-না হবে ! (হঠাৎ থামিয়া, আকুলভাবে স্বগত) কিন্তু ও কে ? পরিচিত কণ্ঠস্বর ! সন্ধান চাই—সন্ধান।

(ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান। বিনি ফরিদার কাছে গিয়া দাঁড়াইল)

কুমার। (স্বগত) কে ? ও কে ? দাদা ? তবে তো পালাতে হয় ! বিনি, আমি পালাচ্ছি !

বিনি। তা যাবে তো যাও-না ! আঁচলে বেঁধে রেখেছি নাকি ?

কুমার। ওগো, ঐ জন্যেই তো আরো যেতে পাচ্ছি-নে।

বিনি। মিছে বোকো না, (উদ্বেগে) সত্য করে বলো কুমার—কোথায় যাবে ? বলি, যুদ্ধ করবে না-কি ?

কুমার (স-রহস্যে) তুমি থাকতে আমি যুদ্ধ করব ? তাড়া আছে ! (ফরিদাকে) তবে আসি। (চলিতে চলিতে স্বগত) সেই চোখ, সেই নাক, মুখ-গোঁফদাড়িতে ঢাকা—ছদ্মবেশ ? তবে কি—সত্যই দাদা ? দাদা, তুমি চোর ? তুমি ভণ্ড ! না, পালাতেই হয়—যদি আবার এসে পড়ে !

(সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ১২

কলিকাতা। সকাল। প্রাসাদ-সম্মুখস্থ পথ

(প্রাসাদ হইতে নেপথ্যে সানাই ও টিকারা বাজিয়া উঠিল। শারদীয়া-পূজা ও নানা-কাজে নরনারী প্রাসাদে আসা-যাওয়া করিতেছে। কারো-কারো হাতে অর্ঘ-থালা। ভারে-ভারে নানা ভোজ্য-দ্রব্য ভিতরে যাইতেছে। দুই দিকে মঙ্গল-কলস ও লতা-পাতায় সাজানো-গেটে দুইজন দারোয়ান (তাহাদের একজন পূর্বতন চাকুরি-ত্যাগী-পুলিস—'পাঁড়েজি')—লাঠি-হাতে দাঁড়ানো। অদূরে লজ্জাভয়ে সঙ্কুচিতা ভিক্ষার্থিনী রঘুর-মেয়ে রানী। পথ দিয়া দুই ব্যক্তির আলাপ করিতে-করিতে প্রবেশ)

১। (আনন্দ-উৎসাহে) সুন্দর রোদ উঠেছে। পূজা আরম্ভ হবে। আশ-পাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

২। (ব্যঙ্গ ও বিরক্তিতে) কী যে সব হচ্ছে! ছেলে-বুড়ো সকলেই যেন ছেলে-মানুষ হয়ে উঠে, বড়ো-গোছের পুতুল-খেলায় প্রবৃত্ত!

১। দেখো-সব-জিনিসই পুতুল, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে কল্পনার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা ব'লে চেনা যায়—তাদের সীমা পাওয়া যায় না। সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য ক'রে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল ব'লে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পথে কাশগুচ্ছ-হাতে দুটি বালক-বালিকা (পূর্বোক্ত ১ম-খণ্ড 'রাখী-বন্ধনে'র মেলার দৃশ্যের ছেলেমেয়ে-দুইটি) নৃত্য করিতে করিতে গাহিয়া চলিয়াছে—)

গান

আমার নয়ন ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে॥
শিউলি-তলার পাশে-পাশে ঝরাফুলের রাশে-রাশে
শিশিরভেজা ঘাসে-ঘাসে অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে॥
আলো-ছায়ার আঁচলখানি লুটিয়ে পড়ে বনে-বনে,
ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে কী কথা কয় মনে-মনে।

তোমায় মোরা করব বরণ মুখের ঢাকা করো হরণ,
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ দু'হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে॥
বনদেবীর দ্বারে-দ্বারে শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে-তারে জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে পাষাণগালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে॥

(হঠাৎ রানীর দিকে চোখ পড়িতেই বালকটি থামিয়া গিয়া বালিকাকে বলিল—)

বালক। (বালিকাকে) আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে
হেরো ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।

বালিকা। উৎসবের হাসি-কোলাহল শুনিতে পেয়েছে ভোর-বেলা
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে দেখিবারে আনন্দের খেলা।

বালক। ওর প্রাণ আঁধার যখন করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি,

বালিকা। দুয়ারেতে সজল নয়ন এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি।

বালক। অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি জননীরা আয় তোরা সব,

বালক ও বালিকা। মাতৃহারা মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব।

(রানীর কাছে গিয়া নিজেদের হাতের ফুলগুলি তাহার হাতে দিয়া উভয়ে চলিয়া যাইবে, তখনই রানীর দুইচোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। রানী "বেঁচে থাকো" বলিয়া দুইজনের থুঁত্‌নিতে হাত ছোঁয়াইয়া চুমকুড়ি খাইয়া মেয়েটির চুলে ফুলগুলি গুঁজিয়া দিল। ছেলে-মেয়ে-দুইটি নাচিতে-নাচিতে চলিয়া গেল—রানী সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে আলাপরত মাসি ও বিনি দুইজনে প্রাসাদের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। পথে অদূরে রানীকে দেখিতে পাইয়া নাক সিঁটকাইয়া মাসি—)

মাসি। (স্বগত) যত জঞ্জাল! (বিনিকে)—বিনি!

বিনি। কী মাসি?

মাসি। এক-গাছা চুড়ি তোর হাত থেকে নাকি চুরি গেছে?

বিনি। চুরি তো যায়-নি?

মাসি। কাউকে দান করেছিস? গরীবের মতো ছোটোলোক নেই, বেশী আছে ব'লে যাকে-তাকে অমন দান-খয়রাত্‌ করিস-নে—বুঝলি?

(দাঁড়াইয়া রানীর গান-শোনা)

রানী। গান

ওগো পুরবাসী—

আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

হেরিতেছি সুখ-মেলা ঘরে-ঘরে কত খেলা

শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি॥

মাসি। ভিখ্ নেবে, তাও ছ্যাখো-না, কতই বায়না। দেশে আকাল পড়েছে, চেঁচিয়ে কানের মাথা খাচ্ছে। একবার পিঠে বেতটি পড়লেই সব-ক'টা ঠাণ্ডা হবেন।

(এই সময়ে ভিখারীদল আসিয়া মাসিকে ঘিরিয়া ধরিয়া পয়সা চাহিতে লাগিল। মাসি গলা-চড়াইয়া বিনিকে বলিল—)

মাসি। ব'লে দে-তো বলে দে, পাঁড়েজি-বেটাকে ব'লে দে,—সকল-ক'টাকে এসে ধরে নিয়ে যাক্।

(দুইজন দারোয়ানের একজন—"সরে যা, সরে যা" বলিতে-বলিতে ছুটিয়া আসিতে উদ্যত, অন্যজন-'পাঁড়েজী' "শোনো, শোনো" বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে ব্যস্ত, ভিখারীরা ছুটিয়া দূরে গেল। দারোয়ান-দুইজন রানীর দিকে আগাইয়া আসিল)

১ম দারোয়ান। কে রে তুই ?

রানী। আমি ভিখারিনী।

১ম দারোয়ান। (ব্যঙ্গ) ভি-খা-রি-নী! দূর হ। দূর হ!

(আলাপরত দুই-ব্যক্তির প্রবেশ)

১। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ।

২। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অস্থিচর্মসার। পেটের জ্বালায় শেষে লুটপাট আরম্ভ হল।

১। দুর্ভিক্ষকাতর বুভুক্ষুগণ দলে-দলে শহরে চলে আসছে!

(একবার রানীর দিকে চাহিয়া উভয়ে চলিয়া গেল)

গান

রানী। চাহি-না অধিক ধন র'ব-না অধিক ক্ষণ,

যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি।

তোমরা আনন্দে র'বে নব নব উৎসবে,

কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি॥

১ম দারোয়ান। আবার ?

পাঁড়েজী। (প্রাসাদের দিকে চাহিয়া) হায় দেবী, "অন্ন কই, অন্ন কই" ব'লে তোমার সন্তানেরা যে আজ কেঁদে ফিরছে। দেখি (রানীর দিকে ঝুঁকিয়া) আহা, মুখখানি যে আমার সেই কন্যাটিরই মতো।

১ম দারোয়ান। রাখো ও-সব কথা!—

(ভিখারীদলের পুনঃ-প্রবেশ)

১ম ভিখারী। (মাসির দিকে আগাইয়া হাত বাড়াইয়া) দয়া ক'রে মা-গো—

মাসি। (নথ-ঘুরাইয়া ঝাঁঝের সহিত) কী বলছিস্? দয়া?—বল্-তো, দয়া আমায় কে করে? দুর হ—

১ম দারোয়ান। তাড়িয়ে দিলেম তবু আবার?—(মাসির মনস্তুষ্টি-সাধনে লাঠি উঁচাইয়া ভিখারীদের তাড়া করিল ও হাসি-মস্করার-সুরে বীরত্ব ফলাইয়া বলিল—) পথ ভুলেছিস?—রাস্তা দেখতে চাস্? এবার এমন-জায়গায় পাঠিয়ে দেব,—তখন দেখবি সেখানে কেমন মজা হেঁ, হেঁ—।

পাঁড়েজি। (১ম দারোয়ানের তাড়ায় ভিখারীদের সঙ্গে পিছু হটিতে গিয়া হুঁচট্ খাইয়া ধূলি-ধূসরিতা ছিন্নবাসা রানী "মাগো" বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল ও রক্তাক্ত-জামা-কাপড়ে এবং বমির উপক্রম করিতে-করিতে, মুখ গুঁজিয়া কাত্‌রাইতে লাগিলে ২য় দারোয়ান তাড়াতাড়ি রানীর কাছে আসিয়া ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল)—ঠিক ঠিক—সেই কন্যাটি। আয় মা আমার সঙ্গে। (রানীর দিকে ঝুইয়া পড়িতেই) ১ম দারোয়ান তাহাকে "থাম্" (বলিয়া ধমক দিয়া সরাইয়া রানীকে ধাক্কা দিয়া "সাবধান!—করছিস কী? দেখছিস না, চারদিকে যে প্লেগ হচ্ছে! ও-যে প্লেগের রুগী"! (বলিয়া ব্যঙ্গ-স্বরে নাক-সিঁটকাইয়া রানীকে বলিল) "সরে যা"। (বিনি এসব দেখিয়া তাড়াতাড়ি সাহায্যের জন্য রানীর দিকে আগাইয়া যাইতেছিল। তখনই মাসি "বিনি, সরে আয়" বলিয়া হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া পা-চালাইয়া সরিয়া পড়িল। পতিত-অবস্থাতেই রানী কাতরস্বরে অন্নের প্রত্যাশায় থাকিয়া থাকিয়া কাত্‌রাইয়া উঠিয়া গাহিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—"উপ ...বাসী, ওগো পুর"—(নিবেদিতা ছুটিয়া আসিয়া রানীকে বুক দিয়া জাপ্‌টাইয়া ধরিল ও গাহিতে লাগিল—)

গান

নিবেদিতা। কেন চেয়ে আছ গো মা মুখ-পানে।
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,

আপন মায়েরে নাহি জানে ॥
এরা তোমায় কিছু দেবে না দেবে না—
মিথ্যা কহে শুধু কত-কী ভানে ।।
মনের বেদনা রাখো মা মনে নয়নের বারি নিবারো নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলি-শয়নে,—ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।
শূন্য-পানে চেয়ে প্রহর গনি' গনি', দেখো কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কী হবে জননী, নির্মম চেতনাহীন পাষাণে ॥

(ইত্যবসরে পাড়ার একদল লোক "বন্দেমাতরম্" বলিতে-বলিতে হাতে খাবারের-চাঙাড়ি লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দলের দুইজনের হাতে ধরা রহিয়াছে পতাকা। তাতে লেখা "দুস্থ-সেবা-সমিতি"। পিছু-ধরা ভিখারীদের "এই নাও চিঁড়ে" বলিয়া সেবকেরা চিঁড়ামুড়ি বিতরণ করিল। ভিখারীরা চলিয়া গেল। কিন্তু রানীর দিকে সেবকেরা অগ্রসর হইতে গিয়া তাহার রক্তাক্ত-জামা কাপড় আর কাশি ও বমির উদ্রেক দেখিয়া রোগ-সন্দেহে "এ-যে, সংক্রামক প্লেগের রোগী! বাবারে!" বলিতে বলিতে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। এদিকে ক্রুদ্ধ ১ম দারোয়ানটি তখন লাঠি-কাঁধে পায়চারি করিতে করিতে "দূর হ, দূর হ" বলিতে বলিতে রানীর প্রতি বিক্রম-প্রদর্শন-রত)

পাঁড়েজী। (রাগিয়া ১ম-দারোয়ানকে)—কোথাকার গণ্ডমূর্খ, পাষণ্ড নাস্তিক! (রানীর প্রতি)—আহা মা আমার।

১ম দারোয়ান। (সক্রোধে)—ম'লো ম'লো।—ঠাকুর কাছে এসো না!—প্লেগ! এ-যে প্লেগ!

(লোকগুলি "অ্যা"! বলিয়া ভয়ে-বিস্ময়ে হক্‌চকিয়া একটু পিছাইয়া গেল। অন্য দিক হইতে কিশোর-সহ মুকুন্দকে গাহিতে-গাহিতে আসিতে দেখা গেল)

মুকুন্দ। গান

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না ॥
তরী-খানা বাইতে গেলে মাঝে-মাঝে তুফান মেলে
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরব না ॥

(গাহিতে-গাহিতে উভয়ে কাছে আসিয়া পড়িল। কিশোর আগাইয়া যেই রানীকে দেখিতে পাইল—)

রানী। (অমনি) দাদা,—দাদা-না? (কান্না)

কিশোর। (চকিত হইয়া) কে ও ?

নিবেদিতা। কী হয়েছে ?

(কিশোর ভালো করিয়া রানীকে দেখিতে লাগিল ও বলিল)

কিশোর। (নিবেদিতাকে) ও আমার বোন যে !

রানী। দাদা, কী হবে ? (সরোদনে)

কিশোর। ভয় নাই। ভাবিস-নে !

রানী। দাদা, তুমি যেয়ো না। বাবা !—বাবা যে কোথায় গেল ! (কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল, কিশোর রানীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল)

কিশোর। এখন কি সে-কথা ভাববার সময় ?

রানী। (কম্পিত-স্বরে) আমার ভয় করছে।

কিশোর। ভয়-করবার সময় নয় এটা।

রানী। কী যে হবে, কিছুই জানি-নে ! (ফুঁপাইয়া কান্না)

নিবেদিতা। (রানীকে) চলো বোন,—উঠে চলো—

রানী। (নিবেদিতাকে দেখিয়া বিস্ময়ে) আহা, দেবীই বটে !

নিবেদিতা। (মুকুন্দকে) অমাদের দু-জনের পথে যে এমন যোগ হয়ে উঠবে, কে মনে করতে পারত। আমাকে ওর সেবার অধিকার দাও।

মুকুন্দ। সেবার ভার নিতে পারবে ?

নিবেদিতা। পারব।

মুকুন্দ। (নিবেদিতার প্রতি বিদায়-দেওয়ার ভাবে) তবে এসো— ।

(অতঃপর মুকুন্দ আপন মনে গাহিতে লাগিল, গানের ধুয়া ধরিল অন্যেরা—)

মুকুন্দ। গান

শক্ত যা তাই সাধতে হবে মাথা তুলে রইব ভবে —
সহজ পথে চলব ভেবে পাঁকের 'পরে পড়ব না॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ যদি এসে পড়ে ঘরের কোনে সরব না ॥

(নিবেদিতার সঙ্গে মিলিয়া কিশোর "সাবধানে" বলিয়া রানীকে ধরিয়া মাটি হইতে উঠাইয়া লইল, এবং বালিকাকে ধীরে-ধীরে হাঁটাইয়া লইয়া গেল। ওদিকে মুকুন্দের গান শেষ হইতেই প্রবেশ করিল এক ভিখারী। ঊর্ধ্বমুখে বিহ্বলভাবে ক্ষীণদৃষ্টি-ভিখারী ভিক্ষা-ঝুলি-কাঁধে গাহিতে-গাহিতে সামনে আসিলে দেখা গেল,

সে আর-কেহ নহে, দাড়ি-গোঁফে-চেনার-বাহিরে-যাওয়া পাগল-প্রায় রোগজীর্ণ চাষী-রঘুনাথ। সে গাহিতেছিল—)

রঘুনাথ। গান

সারা বরষ দেখি-নে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা॥
এলি কি পাষাণী ওরে দেখব তোরে আঁখি ভ'রে—
কিছুতেই থামে না যে, পোড়া এ নয়নের ধারা॥

(স্বগতোক্তি) ও আমার অভিমানী মেয়ে
ওরে কেউ কিছু বোলো না।
আয় বাছা, তুই কোলে ব'সে বল্
কী-কথা তোর বলবার আছে,
অভিমানে রাঙা মুখখানি
আন্ দেখি তোর এ বুকের কাছে।
ধীরে ধীরে আধো-আধো বল্
কেঁদে-কেঁদে ভাঙা-ভাঙা কথা,
আমায় যদি না বলবি তুই
কে শুনবে শিশু-প্রাণের ব্যথা।

(বৃদ্ধ-রঘুনাথ এদিক-ওদিক হাতড়াইতে লাগিল ও গাহিতে-গাহিতে হাত পাতিয়া ভিখ্ মাগিতে লাগিল)

রঘুনাথ। গান

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি॥
আমার ব'লে ছিল যারা আর-তো তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা, কোথায় তারা, কেঁদে-কেঁদে কারে ডাকি॥
বল্ দেখি মা, শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখলি-নে রে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি॥

(ধীরে ধীরে আগাইয়া গিয়া মুকুন্দ রঘুনাথের হাত ধরিল)

রঘুনাথ। তার ম্লান-মুখ দেখে কেউ কি তোমরা একটিবার তাকে তোমাদের ঘরে ডেকে নিয়ে যাও-নি? বালিকা কোথাও কি তবে একটু আশ্রয় পায়-নি?

আর ফেলে যাব না মা, তোকে ফেলে আর আমি কোথাও যাব না। একবার তুই দেখা দে মা!

মুকুন্দ। তুমি কোথা থেকে এসেছ?

রঘুনাথ। গ্রাম থেকে।

মুকুন্দ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

রঘুনাথ। (মুকুন্দের সঙ্গে যাইতে-যাইতে) মা-লক্ষ্মী কোথায় গেল? সন্তানের অনাদর নিশ্চয়ই মা'র মনে সয়-নি। (রুদ্ধকণ্ঠে মুকুন্দকে) জানো কি, মেয়েটি আমার কোথায় আছে—তোমরা কেউ কি তা জানো না?

(মুকুন্দ রঘুকে নিয়া চলিয়া গেল)

(দারোয়ান-দুইজন লাঠি-কাঁধে বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময়ে আনন্দমোহন, লিয়াকৎ ও বিশ্ববান্ধবের প্রবেশ)

বিশ্ববান্ধব। ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করছে। সেই আহ্বান যে আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত করছে তা তখনই বুঝতে পারি যখন দেখি আমরা—

লিয়াকৎ। যখন দেখি—আমরা জাতিবর্ণ-নির্বিচারে দুর্ভিক্ষ-কাতরের দ্বারে অন্নপাত্র বহন করছি—

আনন্দমোহন। যখন দেখি—সেবায় আমাদের সংকোচ নাই—

লিয়াকৎ। পরের সহায়তায় আমরা উচ্চ-নীচের বিচার বিস্মৃত হচ্ছি—

বিশ্ববান্ধব। এটা কিন্তু সুলক্ষণ।

লিয়াকৎ। এবার আমাদের উপর যে আহ্বান আসছে—

আনন্দমোহন। তাতে সমস্ত সংকীর্ণতার অন্তরাল থেকে—

বিশ্ববান্ধব। অন্তরাল থেকে আমাদিকে বাইরে আনবে।

আনন্দমোহন। হে মোর চিত্ত, পুণ্য-তীর্থে জাগোরে ধীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥
এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খ্রীস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান-ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল-ঘট হয়নি যে ভরা

সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ-নীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে ॥

(জনতার সঙ্গে গাহিতে-গাহিতে কবির প্রবেশ)

কবি। গান

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্ জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গলে যাক্,মুখ তুলে আজি চাহ-রে ॥
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি' হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি—
প্রভাত-গগনে কোটি-শির তুলি' নির্ভয়ে আজি গাহ-রে ॥
আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে
সব পাপ-তাপ দূরে যায় চ'লে পুণ্য-প্রেমের বাতাসে ॥
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ, না থাকে কলহ না থাকে বিষাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ বিমল-প্রতিভা বিকাশে ॥

(ক্রুদ্ধ ১ম-দরোয়ানও দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল। তাহার হাতের লাঠিটা ধীরে-ধীরে অগোচরে হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। হঠাৎ সচেতন হইয়া সে সাম্‌লাইয়া লইল ও গীতরত-জনতার দিকে চাহিয়া রহিল)

কবি। যে-দিন জগতে চলে আসি
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
সে-বাঁশিতে শিখেছি যে-সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীত-শূন্য অবসাদ-পুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে,
শুধু মুহূর্তের তরে দুঃখ যদি পায় তার ভাষা
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি, তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত-শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ ॥

(এই সময়ে পথে জনতার ভীড় জমিয়া গেল। প্রাসাদ হইতেও অনেক লোক আসিয়া পড়িল। কবি গান ধরিলেন, ধুয়া টানিতে লাগিল সকলে—)

কবি। গান

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ওমা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায় হায়রে—
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা-ক্ষেতে কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে-কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায় হায়রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন-জলে ভাসি ॥
ধেনু-চরা তোমার মাঠে পারে-যাবার খেয়া-ঘাটে,
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায় হায়রে—
ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল
তোমার চাষী ॥

কবি। (জনতার প্রতি) বন্ধুগণ, আজ আমাদের সম্মেলনের দিনে হৃদয়কে একবার সর্বত্র প্রেরণ করো, চিত্তকে প্রসারিত করো। যে চাষী তাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল তাকে সম্ভাষণ করো, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজাথী তাকে সম্ভাষণ করো, যে মুসলমান তাকে সম্ভাষণ করো, দেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করে দাও, সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্' গীতধ্বনি একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে যাক্।

জনতা। (ধ্বনি) বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

রঘুনাথ। (সাগ্রহে কবির দিকে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অগ্রসর হইতে হইতে বেদনার্তকণ্ঠে) কে, কে? বাবুমশায় না? বাবু, আমার মা? —সেই মেয়েটি কোথায়? (মাটিতে পতনোন্মুখ)

কবি। (রঘুনাথের হাত দুটি ধরিয়া ফেলিয়া উঠাইয়া) রঘুনাথ? তুমি এখানে?

রঘুনাথ। (রুদ্ধকণ্ঠে) হুজুর, আমার মা?

কবি। আমরাও তো মাকে খুঁজছি—তাঁর নামেই আজ মিলেছি। খুঁজে দেখব তোমার মেয়েকে-ও। ভেবো না। (মুকুন্দকে) চাষীকে নিয়ে যাও সেই আমাদের সেবার স্থানে। সেবাসূত্রেই দেশের ছোটোবড়ো, দেশের পণ্ডিত মূর্খ

সকলের মিলন ঘটবে। আর, দেখো, শুধু এই নয়, গ্রামে-গ্রামে ঘরে-ঘরে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে লোকের সঙ্গে মিলিত হতে হবে।

লিয়াকৎ। কিন্তু, সরকারের এই বঙ্গচ্ছেদ যে দেশের লোকের মধ্যে বিচ্ছেদের চেষ্টা—

কবি। হ্যাঁ, কিন্তু আবার এই বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করে তুলবে! পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হব। বাহিরের শক্তি প্রতিকূল হলে নিজেদের ভিতরের প্রেমের শক্তি জাগ্রত হবে।

বিশ্ববান্ধব। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ।

কবি। (জনতাকে) হ্যাঁ, আর দেখো, আমাদের দেশে নিজেদের মধ্যেও বিরোধ-বিচ্ছেদ আমাদের আছে কম নয়। সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ-ব্যবস্থার মধ্যে বেঁধে-তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো-শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। যথার্থ স্বায়ত্ত-শাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করে নেয়, বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করে রাখে। অতএব মতবিরোধ যখন কেবলমাত্র অবশ্যম্ভাবী নয়, তা মঙ্গলকর, তখন মিলতে গেলে নিয়মের শাসন অমোঘ হওয়া চাই। নিয়ম বজ্রের ন্যায় কঠিন হলে তবেই কর্ম অগ্রসর হবে—নতুবা, অনর্থপাত ঘটতে বিলম্ব হবে না। এবার একবার তোমরা সকলে মিলে করজোড়ে নতশিরে বিশ্ব-ভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—(কবির পরিচালনায় সকলের গান)

গান

জনতা। বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।

(গাহিতে গাহিতে দারোয়ানদ্বয়-বাদে সকলের প্রস্থান)

(চিন্তিতমুখে দারোয়ানদ্বয় ধীরে ধীরে ফিরিবার মুখে)

পাঁড়েজী। (১ম দারোয়ানকে) তোর দশা তো ভালো নয় দেখছি।

১ম দারোয়ান। (পাঁড়েজীকে) আর, তোর দশা? (পরস্পর নিরীক্ষণ। পাঁড়েজী ১ম দারোয়ানের কাঁধে সহস্তে চাপড় দিয়া ম্লানহাস্যে বলিল—)

পাঁড়েজী। দরিদ্র-সন্তান, খাব কী! চল্ চল্, ওদিকে যে চাকরি আছে!

১ম দারোয়ান। চাকরি, চাকরি, চাকরি—সারাক্ষণ চাকরি! (বিরক্ত ও অসহায়ভাবে) চল্—চাকরিই করি-গে।

(জনতার প্রস্থানপথের দিকে ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে)

পাঁড়েজী। (১ম দারোয়ানের দিকে চাহিতে-চাহিতে উদ্দীপ্তমুখে) বন্দেমাতরম্!

১ম দারোয়ান। (সমস্বরে)—বন্দেমাতরম্। (উভয়ের প্রস্থান)

দৃশ্য ১৩

(কলিকাতা। সকাল। —দুস্থসেবা-কুটীর। সম্মুখভাগ। গেটে দুইদিকে কুমার ও বিনি দাঁড়ানো, অনাথ ছেলেমেয়ে ও নরনারীর আনাগোনা চলিতেছে, কাঁধে ঝোলা ও হাতে পুটুঁলি লইয়া বাহিরের একজন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উপস্থিতি। ঘরের দুয়ারের উপর সাইনবোর্ডটি দেখিয়া লইয়া তাঁহারা ভিতরে প্রবেশোন্মুখ)

কুমার। কে তোরা?

বিনি। দাঁড়া এইখানে।

পুরুষ। কেন বাবা? এখানেও কি স্থান নেই।

স্ত্রী। মা গো! এখেনেও সেই সেপাই! পেলেগ্ শুনে ভয়ে বাঁচি-নে, তাড়াতাড়ি ক'রে পালিয়ে তো এলুম। কী যে হবে!

(শিবিরের ভিতর হইতে রানীকে সঙ্গে লইয়া নিবেদিতার বাহির হইয়া আসা)

নিবেদিতা। (পুরুষ ও স্ত্রীকে) তোমরা কে গো?

পুরুষ। আমাদের চাল নেই, চুলো নেই, মরবার জায়গাটুকু নেই। এখানকার মা'র কথা শুনেছি,—তাই আমরা এসেছি। মার কাছে হত্যা দিয়ে পড়ব। দেখি,—তিনি আমাদের কী গতি করেন।

স্ত্রী। তা, হাঁ গা, এখেনেও তোমরা সেপাই রেখেছ? রাজার দরজা বন্ধ, আবার, মায়ের দরজাও আগ্‌লে দাঁড়িয়েছ?

নিবেদিতা। না বাছা, এসো তোমরা। এখানে তোমাদের কোনো ভয় নেই। কে তোমাদের উপর দৌরাত্ম্য করেছে?

পুরুষ। আমরা সরকারের কাছে দুঃখ জানাতে গিয়েছিলুম, রাজদর্শন পেলেম না, ফিরে এসে দেখি আমাদের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়েছে। দুর্ভিক্ষে খাজনা দিতে পারি-নে—এই অপরাধ! আমাদের (কপালে করাঘাত করিয়া) ছেলেটিকে বেঁধে রেখেছে।

স্ত্রী। সরকার তাঁর দারোগা-পেয়াদা কত কুটুম্বদের এনে রাজ্য জুড়ে বসিয়েছে। তারা প্রজার বুকের রক্ত শুযে খাচ্ছে গো।

পুরুষ। চুপ কর্ মাগি! তুই কী জানিস? যে-কথা জানিস্ নে তা মুখে আনিস্ নে।

স্ত্রী। জানি গো জানি।—

নিবেদিতা। ঠিক বলেছ বাছা। পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। যাও, এখন বিশ্রাম করো-গে। (ভিতরে প্রবেশের নির্দেশ)

পুরুষ ও স্ত্রী। যে আজ্ঞে। (দুইজনের শিবিরে প্রবেশ)

রানী। (নিবেদিতাকে ব্যাকুলভাবে) আমি বাবার কাছে যাব। আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো-না! (এমন সময় রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া মুকুন্দের প্রবেশ)

রঘুনাথ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আর কত দূর? কোথায় পাব আশ্রয়, কোথায়?

(রঘুনাথের স্বর শুনিবামাত্র রানী ফিরিয়া চাহিয়া ক্ষণেক বিস্মিত হইল এবং আপাদমস্তক ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া আকুল-কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—)

রানী। বাবা! বাবা!

রঘুনাথ। সেই কণ্ঠস্বর। (চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল) কে রে তুই! (অনির্দিষ্টভাবে) আহা, সে-অনাথা না জানি কোথায়। কে তাকে আশ্রয় দেবে! কী করেছি,—কী বলেছি, সব ভুলে গেছি।

রানী। এই তো, আমি এসেছি বাবা! (ছুটিয়া রঘুনাথের কাছে আসিয়া জড়াইয়া ধরা)

রঘুনাথ। (রানীর গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া) কোথা থেকে এলি? কী ক'রে এলি-রে। আয় বাছা, কাছে আয়, (এবারে বুকে জোরে আঁকড়াইয়া ধরা) আয় তোকে বুকে করে নিয়ে ফিরে যাই সেই—

(কিশোরের প্রবেশ)

রানী। দাদা। দাদা! পেয়েছি। এদিকে একবার চেয়ে দেখো। (রঘুকে দেখাইল)

কিশোর। একী, একী,—একী দেখি! বাবা? বাবা! বাবা!

রঘুনাথ। এসেছিস্ বাপ? প্রভু, তোমারই ইচ্ছা! আমিও এসেছি! আয় তোরা, বোস্ তোরা কাছে। আজ সমস্ত মন—(আনন্দের আতিশয্যে বাক্‌রুদ্ধ হইয়া শুধু ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল)

মুকুন্দ। (নিবেদিতার প্রতি) ঘরে নাও, দেরি কোরো না। অতিথি-সৎকার করো। দেখো, যেন অযত্ন না হয়।

নিবেদিতা। (রানীকে ইশারা) ঘরে এসো বোন।

রঘুনাথ। কে তুমি গো—

নিবেদিতা। তোমাদেরি একজন।

রঘুনাথ। বেশ, বেশ, হরি যেখানে নিয়ে যান, সেইখানেই ভালো। দেখি তিনি কোন্‌খানে পৌঁছে দেন।

(সকলের কুটীরে প্রবেশ)

(দুঃস্থসেবা-কুটিরের সম্মুখভাগ, মাধব ও রঘুনাথ)

রঘুনাথ। (মাধবকে) কী! কী চাও?

মাধব। এসো, এই দিকে। (একপাশে দুইজনে সরিয়া গেল) গঙ্গাস্নানের যোগ। এই দেখো না কেন, তুমি আছ ব'লেই কলকাতায় আসা গেল। তবু একটু দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া গেল। (চাপাস্বরে) অনেক পাওনা বাকি। বুঝেছ? ওটা দিতে হবে।

রঘুনাথ। টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি,—টাকাটা কোথায় পাই। সব শুনেছ তো। —কিছুতেই মলেম না। যম বেটা তাচ্ছিল্য করে নিলে না! যখন হাসপাতালে প'ড়ে ছিলুম,—তোমার টাকার কথা তখন আমার সর্বদাই মনে হত।

মাধব। (একটু ভাবিয়া নিয়া) থাক্, টাকায় আমার কাজ নেই। —অত ভাবছ কেন?

রঘুনাথ। ভাবছি, ঋণশোধের উপায়? —আরেক কথাও ভাববার আছে। মেয়ের বিয়ে দিতে পারি-নে। এমন সোনার মেয়ে, বয়স হয়েছে—

মাধব। (সহসা আশান্বিত, অথচ আশ্বাস দিবার ভানে) উপায় আছে। (আরো একটু সরিয়া গিয়া) দাদা, এইটে তোমাকে করে দিতেই হবে।

রঘুনাথ। আরে আরে—কী করতে হবে?

মাধব। বিয়ের সম্বন্ধ।

রঘুনাথ। কার? পাত্র কি কাউকে মনে-মনে ঠিক করেছ?

মাধব। তা করেছি। পাত্রটি বেশ ভালোই—কিছুদিন হল তার বউটি মারা গেছে। মনের মতো বড়ো-মেয়ে পায়-নি ব'লেই এতদিন ব'সে আছে, নইলে সে কি পড়তে পায়? রানীর সঙ্গে ঠিক মানাবে। (একটু সঙ্কোচে মাথা চুল্‌কাইয়া সহসা উৎসাহের সঙ্গে) আমি প্রস্তুত আছি। (কানে-কানে বলা। কিন্তু কথা বলামাত্র—)

রঘুনাথ। তুমি মানুষ না পিশাচ? (বলিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল। মাধব তাহাকে লোভ দেখাইয়া চাপাস্বরে তখনই বলিল "হাজার টাকা! একেবারে হাতে-হাতে! এখনই নাও—"(বলিয়া নোটের তাড়া দিতে যাওয়া। রঘুনাথ চটিয়া লাল হইয়া—) এতদূর স্পর্ধা!

মাধব। ভেবে দেখো পুরুষের আশ্রয়।

রঘুনাথ। পুরুষের আশ্রয়!—তবে বিয়ে?

মাধব। (চিন্তিতভাবে) বিয়ে? তাইতো প্রণয়, ভালবাসা এক,—বিয়ে?—বিয়ে করা যে আর-এক ব্যাপার!

রঘুনাথ। (উত্তেজনায়) তবে? তবে কি ভেবেছ—প্রণয়ী হবে? পাষণ্ড! (ক্রোধে) সম্বন্ধটা যে সমাজ-বিরুদ্ধ! (বেগতিক বুঝিয়া তাড়াতাড়ি মাধব কথার সুর পাল্‌টাইয়া নিয়া নূতন হাবভাবে ভালোমানুষ সাজিয়া অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল)

মাধব। ভুল! ভুল বুঝছ। সম্বন্ধ সমাজ-বিরুদ্ধ না-ও হতে পারে। তা বেশ তো, বিয়েই হবে! পণ? পণই দেব না-হয় নগদ হাজার টাকা। (খুব গুরুত্বের সহিত চাপাস্বরে রঘুকে লোভ দেখাইয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, না-হয় ঐ দুহাজার টাকাই পণ দেব। আর, সবটাই একেবারে হাতে-হাতে! এখনই নাও! আর, ভেবে কাজ নেই। দিন-খন ঠিক করে ফেলা যাক্! তা, বলো যদি—দেখাশোনা? সেটা সেই একেবারে শুভদৃষ্টির সময়েই হবে? বুঝেছ তো—কী কথাটা হচ্ছে? তোমার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা বলছি।—আমি?—আমি প্রস্তুত আছি। (এতক্ষণ রঘুনাথ হা করিয়া ভাবিয়া যাইতেছিল, এবারে যেন ঘা-খাইয়া বলিয়া উঠিল—)

রঘুনাথ। দোহাই, রক্ষা করো। এ আমি পারব না।

মাধব। কেন? এ তো অতি ভালো কথা, উভয়-পক্ষেই ভালো। কন্যা-দায়! এতে যদি তোমাকে কোনো-দিক দিয়ে একটু সাহায্য করতে পারি।—এই, আর-কি!

রঘুনাথ। সে কি হয়?

মাধব। (হুম্‌কির স্বরে) তুমি যদি উদ্যোগী না হও তবে অনুতাপ করতে হবে। এ আমি বলে রাখছি। মেয়ের বয়স হয়েছে,—জাত-কুল-মান সব খোয়াবে, আর তুমি ব'সে-ব'সে সব দেখবে? যদি জাত ভাসিয়ে দিয়ে বিয়ে ক'রে বসে, তাহলে মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না!

রঘুনাথ। না-বাপু, এমন-সব কথা আমি সাত-জন্মেও শুনিনি। সমাজের কাছে আমি কী বলব? আমি কি নরকগামী হব? ওটা আমাদের হিন্দুসমাজে বাধে।

মাধব। আমি বলছি, তোমার কোনো ভয় নাই, সমাজে ঢুকিয়ে দেব। কেই-বা খবর জানবে? টাকা যখন আছে তখন কিছুতে বাধবে না, সবই চলে যাবে দেখো! কৈবর্তের-ছেলে কায়স্থ ব'লে চলে গেল। সে তো আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। সেখানে আমি চাষা-তোমার মেয়েকে দেখো ব্রাহ্মণের ঘরেই চালিয়ে দেব, কারও সাধ্য থাকবে না যে কথা বলে। আমি ব্রাহ্মণ!—(সগর্বে) সমাজের কর্তা যে আমি।—কর্তা! (হাসিয়া) এজন্য তোমাকে এত কান্নাকাটি ক'রে মরতে হবে না। (একটু থামিয়া সক্রোধে) এত বড়ো একটা সুযোগের কথায় কর্ণপাত নাই? (সহসা অদূরে ব্রতীন্দ্র ও রানীকে আসিতে দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে স্বগত) ঐ রে আসছে। সরে পড়ি। মেয়েটা খাসা দেখতে কিন্তু! কী চোখ। সবই তো হল, কিন্তু মেয়েটা—(রঘুর প্রতি) যদি কিছু একটু সাহায্য হয়—ভেবে দেখো –

রঘুনাথ। কিন্তু যে দেশের যেমন নিয়ম—

মাধব। (ব্যঙ্গের সহিত ধমক দিয়া) নিয়ম! বড়লোকের আবার নিয়ম কী? সবাই যদি নিয়ম মানবে তবে নিয়ম গড়বে কে?

রঘুনাথ! (হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া) টাকা হয়েছে ব'লে অহংকার? কাকে-কী বলতে হয় জান না? বুড়ো হারামজাদা। পাষণ্ড, পামর!

মাধব। (রানীর উদ্দেশে নেপথ্যে ইঙ্গিত করিয়া হুমকি) যদি মেয়েকে ছেড়ে না দাও তবে ভালো হবে না বলছি—(চুপি-চুপি) এ-কথা আর কা-কেও জানাবে না—

(আলাপরত ব্রতীন্দ্র ও রানীর প্রবেশ)

ব্রতীন্দ্র। (রানীকে) একমাস কিছু দীর্ঘকাল নয়। জেলে আমি কোনো কষ্ট গণ্যই করিনি।—ব্রতের জন্য আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে। সকলেরই সাধ্যমতো কোনো-না-কোনো হিতকর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে—এইটে হচ্ছে

সাধারণ ব্রত। তোমার বইগুলো আনো দেখি, কী তুমি পড়ো, একবার দেখে নিই।

রানী। (মাধবকে দেখিয়া সন্ত্রস্তে) ও কে?

ব্রতীন্দ্র। (রানীকে) ভয় নেই, তোমার ভয় নেই। ও-পাপ এ ঘরে এসে পৌঁছবে না। (মাধবকে হুম্‌কি দিয়া) পালাও, নইলে রক্ষা নেই। লক্ষ্মীছাড়া ব্যাটা। বেরো সামনে থেকে।

মাধব। (ক্রুদ্ধ ও সন্ত্রস্তভাবে) আচ্ছা! দেখা যাবে। (বলিয়া প্রস্থান)

রানী। (রঘুকে) বাবা, বাবা, ওই যে বুড়োটা—

ব্রতীন্দ্র। (মাধবকে দেখাইয়া রঘুকে) কে এসেছিল? ওটা কে? মাধব চাটুজ্যে?

রঘুনাথ। মেয়ের সম্বন্ধের ব্যাপার!—প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। ঋণ, কন্যাদায়, তার উপর এই আইবুড়ো-মেয়ে!

ব্রতীন্দ্র। তাই ব'লে যে যা-ই প্রস্তাব করবে—

রঘুনাথ। (চিন্তায়) কোথায় কে আছে? বুড়ো হয়ে পড়েছি।

রানী। বাবা, তবে পথে ভাসালে! (চোখে আঁচল-চাপা দেওয়া)

রঘুনাথ। (ভয়ে) লোক-নিন্দা! এতে লোকনিন্দা হবে না?

রানী। তাহলে আর তোমার মেয়ের মুখ দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।

রঘুনাথ। (উদ্বেগে) জাত-রক্ষা!—সে কথাটা-ও তো ভাবতে হবে?

রানী। যত ভাবতে হয় ভেবো, কিন্তু দেখো বাবা, আমার সকল যেন নষ্ট না হয়।

ব্রতীন্দ্র। (রানীকে) ঘরে চলো। যাও একটু ঘরের কাজ করো-গে। (স্নেহের হাসিতে) পাত্রের অভাব কী। আমি এনে দেব।

রানী। তোমার কাছে না থাকলে আমার ভালো হবে না। আমি অনেক কথাই বুঝতে পারি-নে। তুমি আমাকে বুঝিয়ে না-দিলে আমি কিনারা পাব না। (সকলের প্রস্থান)

(দুইজন কুটীরবাসী-উদ্বাস্তুর প্রবেশ)

১ম ব্যক্তি। (অপরকে ইশারা করিয়া) কে হে, ইনি কে? ব্যাপারখানা কী?

২য় ব্যক্তি। এখনো সন্ধান পাই নাই। কী-একটা ব্যাপার চলছে।

১ম ব্যক্তি। (কটাক্ষপাত করিয়া) ঠিক বটে—ঠিক-ঠিক। নিশ্চয় বিয়ে-থাওয়া।

(উভয়ের প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

(দুঃস্থ-সেবা-কুটীর-প্রাঙ্গণ)

(অপরাহ্ন।—একপ্রান্তে গাছতলায় রানী কিছু ফুল লইয়া একা বসিয়া মালা গাঁথিতে-গাঁথিতে ভাবিতেছিল। কুটীরবাসী তিনজন নিম্নসাধারণ-শ্রেণীর প্রবীণা উদ্বাস্তু-মেয়েমানুষ, রুক্মিণী ও তাহাদের দু'তিনটি শিশু এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, রানীর কাছে আসিয়া)

প্রথমা। (রানীকে সস্নেহে) কী হয়েছে? অমন চুপ ক রে যে?

দ্বিতীয়া। (ব্যঙ্গস্বরে) কী রে, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে? তাইতো, কী সুখেরই কপাল। (রানী তাহার ডালা হইতে ছোট-ছোট কয়েকটি মালা লইয়া শিশুদের গলায় পরাইয়া দিল)

রুক্মিণী। (হাসিয়া) তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস, আমাদের ভুলিস-নে।

তৃতীয়া। (আড়চোখে শিশুদের দেখিয়া লইয়া) হ্যাঁ গা, বিয়ে হবে! তা মুড়ি-মুড়কি বিলানো হবে না?

শিশুরা। (সানন্দে সমস্বরে) ওরে বিয়ে, দিদির বিয়ে।

দ্বিতীয়া। (কানে-কানে পরস্পরের মধ্যে কিছু বলিয়া চাপাস্বরে একে অন্যকে) আপত্তি করে নাই?

প্রথমা। বোঝা শক্ত। জানো তো মেয়ে-মানুষের মন, যখন না বলে তখন হ্যাঁ হয়।

দ্বিতীয়া। তখনই বুঝেছি! (নাক-সিট্‌কাইয়া ব্যঙ্গস্বরে) তখনই বুঝেছি কী-না—পড়াশুনা! এই ফাঁকে সমস্ত নির্লজ্জ মেলামেশা। সব খ্রীস্টানী-কাণ্ড।

রুক্মিণী। তা, সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে।

রানী। (মালা-গাঁথা রাখিয়া দিয়া সানুনয়-কাতরস্বরে) ওগো, পায়ে পড়ি, আর-তো সহ্য হয় না।—

দ্বিতীয়া। খবর তো আর চাপা রইল না, ঢাক বেজে উঠেছে, আমাদের কাছে আর ভাঁড়িয়ে কী হবে বলো!

শিশুরা। (তৃতীয়ার আঁচল ধরিয়া অসোয়াস্তিতে) চলো-না।

দ্বিতীয়া। (তৃতীয়াকে) হাঁলো অলঙ্গ, সেই যে কথাটা শুনেছিলুম, সে কি সত্যি?

তৃতীয়া। সে ভাই বেস্তর কথা। আমি যাই ভাই, সমস্ত কাজ পড়ে আছে।

দ্বিতীয়া। চলো ভাই চলো। একবার মেয়েটার রকম দেখো! বিয়েতে হবে আপত্তি?—ওর যে পরম সৌভাগ্য! (চুপি-চুপি কথা বলিতে-বলিতে দলের প্রস্থান। রানী শাড়ির আড়াল হইতে একখানি বই বাহির করিয়া পাঠে মন দিতে গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পূর্ববৎ ভাবিতে লাগিল, বই কোলের উপর পড়িয়া রহিল, ক্রমে উদাস-দৃষ্টিতে দূরে চাহিয়া থাকিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে আপন মনে গুণ্-গুণ্ করিয়া গাহিতে লাগিল।)

গান

রানী আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি।
গুণ যদি মোর থাকত তবে, অনেক আদর মিলত ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণ-প্রয়াসী॥

(অলক্ষিতে পিছন দিক দিয়া ধীরে ধীরে নিবেদিতার প্রবেশ, সন্তর্পণে গান-শ্রবণ ও রানীর পাশে উপবেশন করিয়া রানীর পিঠে হাত বুলাইয়া—)

নিবেদিতা। আমার কাছে মনের কথা বলো। লজ্জা কোরো-না—সমস্ত বলো।

রানী। (সলজ্জে চমকিয়া, কিছুক্ষণ নিবেদিতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সজল চোখে) আদেশ করেন তো বলি—(থামিয়া ইতস্তত-ভাব ঝাড়িয়া ফেলিয়া) কী কষ্টই-না গেছে? (শিহরিয়া উঠিয়া)

নিবেদিতা। কেন, তোর এত আবার কষ্ট ছিল কিসের?

রানী। (চোখ মুছিয়া) আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলাম! ঘরে আমার মা ছিল না—তাই যা হয়! (অতি কষ্টে) ভেবেছিলুম আবর্জনার মতো বাইরে এসে পড়েছি, কেউ নেবে না—কিন্তু উদ্ধার করতে সে এল।—এখানে দিনরাত্রি দাসীগিরি ক'রে তার জন্যে চিরজীবন থাকতে পারব।

নিবেদিতা। তোর মন বদল হল কখন্?

রানী। কী জানি কখন্ হয়ে গেল—জন্মের মতো বেঁচে গেলুম। আমাকে যেদিন তিনি (কুটীর দেখাইয়া) এই ঘরের ভার দিয়ে বললেন, "এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেখো, এই তোমার কাজ," তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় ক'রে নিলুম, কাজের শক্তি আপনি জেগে উঠল। (সচকিতে) তিনি আসছেন!—

নিবেদিতা। তুই কেমন করে টের পাস?

রানী। ঘরের সেবিকা, একটা বোধ জন্মে গেছে।

নিবেদিতা। (ক্ষণেক থামিয়া) হতভাগি, তবে মরেছিস্?—সত্যি বল্—তুই তাঁকে ভালোবাসিস্? তোর কী হয়েছে? তুই কী চাস?

রানী। (কিছুক্ষণ হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া থাকিয়া ধীরে-ধীরে মুখ উঠাইয়া) আমি তোমার সঙ্গে যাব।

নিবেদিতা। তুই কী বলছিস্?

রানী। তুমি যখন স্বদেশী করতে বিপদের মুখে চলেছ—

নিবেদিতা। পাগলের মতো বলিস-নে। তুই কোন্ সাহসে যেতে চাস?

রানী। সাহস আমার নেই, হয়তো ও-পথে যাবার শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমি যাব। সাহস আপনি আসবে, শক্তিও হবে।

নিবেদিতা। না, তোকে আমি নিতে পারব না।

রানী। তোমার সমস্ত ভালোমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি। আমাকে পর ক'রে রাখতে পারবে না। আমি যাবই।—ঐ যে তিনি আসছেন!

(ব্রতীন্দ্রের প্রবেশ)

নিবেদিতা। (ব্রতীন্দ্রকে) এই যে আপনি এসেছেন। বসুন। আপনার সঙ্গে আমাদের পরামর্শ আছে। আমরা একটি ছোটো-খাটো মেয়ে-ইস্কুল করতে চাই।

ব্রতীন্দ্র। মেয়ে-ইস্কুল করা অনেকদিন থেকে আমার জীবনের একটা সংকল্প।

নিবেদিতা। আপনাকে আমাদের এ-বিষয়ে সাহায্য করতে হবে।

ব্রতীন্দ্র। কী করতে হবে বলুন।

নিবেদিতা। বিদ্যালয়ের কাজ-কর্ম যে-নিয়মে যে-রকম ক'রে চালানো উচিত—সময় ভাগ করা, ক্লাশ ভাগ করা, বই ঠিক ক'রে-দেওয়া—এ-সমস্তই আপনাকে ক'রে দিতে হবে।

রানী। দিদি, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমার ঘরের কাজ বাকী আছে। (চিন্তিতভাবে প্রস্থান)

নিবেদিতা। (প্রস্থানরতা রানীকে অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া ব্রতীন্দ্রকে) সর্বদা কী-যেন ও ভাবে। (অর্থব্যঞ্জক-স্বরে) মনে এমন কোনো ভাবের উদয় হয়েছে যেটা সে—

ব্রতীন্দ্র। কী?—বিয়ের কথা?

নিবেদিতা। (ব্রতীন্দ্রের দিকে মুখ আগাইয়া নিয়া এদিক-ওদিক চাইতে-চাইতে কানে-কানে বলা)

ব্রতীন্দ্র। (সবিস্ময়ে) সত্যি না কি? আমি তো কিছুই জানি না। কোন্ দিক দিয়ে কী ঘটছে বুঝতেই পারি-নি!

নিবেদিতা। কিন্তু যখন ঘটে উঠল তখন তার দায়িত্ব তো গ্রহণ করতেই হবে। ওর মনের মধ্যে যে-কথাটা গভীর-ভাবে ছিল, সেইটেই হঠাৎ ঘা খেয়ে একেবারে বেরিয়ে এসেছে। এখন এ-কে চাপাচুপি দিতে গেলে মেয়ের পক্ষে ভালো হবে না। মেয়ে যে কত বড়ো একটা দায়! পল্লীতে সমাজের বন্ধন অনেক বেশি। ঋণের জাল, মহাজনের বাঁধন, সামাজিকতার হৃদয়হীন-দাবি, বিবাহোপলক্ষে কন্যার পিতার বোঝা—সে যে কী দুঃসহ।

ব্রতীন্দ্র। কী কর্তব্য! উপায় কী,—আমি ভেবে পাচ্ছি-নে। কী করলে ওর ঠিক—এখন করা যায় কী?

নিবেদিতা। করা যায় অনায়াসে রক্ষা।

ব্রতীন্দ্র। কেমন ক'রে?

নিবেদিতা। কেমন ক'রে কী?—যদি পৌরুষ থাকে,—বিয়ে ক'রে। যে-ধর্ম সেবা-রূপে, প্রেম-রূপে, করুণা-রূপে, আত্মত্যাগ-রূপে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-রূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কোথাও তাকে দেখা যায় না। যে-আচার কেবল রেখা টানে, ত্যাগ করে, পীড়া দেয়, যা বুদ্ধিকে আমল দিতে চায় না, যা প্রীতিকেও দূরে রাখে—তা-ই সকলকে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে। আমি জানি অসত্য-কথা ও অন্যায়-অত্যাচার বেড়ে উঠতেই থাকবে। লোক এমনভাবে কথা কচ্ছে যেন তোমাদের দুজনের মধ্যে গোপনে পরামর্শ হয়ে গিয়েছিল।

(আলাপরত রঘুনাথ ও রানীর প্রবেশ।
উক্তিরত-রানী রঘুনাথকে হাতে ধরিয়া আনিতেছিল)

রানী। উচিত-অনুচিত আমি ভালো বুঝি-নে।

রঘুনাথ। শীঘ্র বিয়েটা না হলে অনেক বিঘ্ন আছে। টাকাটা যদি না দিতে পারি তবে যে ও কী ক'রে বসে তার ঠিক নেই। আমি আর বিলম্ব করতে চাই-নে।

যে আমার কপাল! কোন্ দিন কী ঘটে সেই ভয়ে আমার ঘুম হয় না। বিয়ে দিতে দেরি করলে চলবে না, জানোই তো আমাদের সমাজের গতিক। তাই একটি পাত্র—না, তোমার ভয় নেই। সে আমি—

রানী। আমার মত নেই। আমি পারব না।

রঘুনাথ। তুমি তো আইবুড়ো থাকবে না?

রানী। কেন থাকব না?

রঘুনাথ। বুড়ো-বয়স পর্যন্ত এমনি থাকবে?

রানী। হ্যাঁ, মৃত্যু-পর্যন্ত।

রঘুনাথ। (রানীকে) কে আছে তোর? (ব্রতীন্দ্রকে) বয়স্থা কন্যা! বাবা, তুমি বললেই হয়ে যাবে, তোমাকে ও যে দেবতার মতো ভক্তি করে, তোমাকে গুরু ব'লে মানে।

ব্রতীন্দ্র। বেচারাকে কেন চিরজীবনের জন্য অসুখী করা?

রঘুনাথ। মেয়েটা কি চিরকালই এমনি আইবুড়ো থেকে যাবে? এ-ও কি কখনও হয়? কে ওকে আশ্রয় দেবে? দেখাশুনার জন্য তো একটা লোক চাই? গৃহস্থ মানুষ, অমনিতেই মেয়েছেলের বিয়ে দিতে জিভ বেরিয়ে পড়ে। তারপরে যদি—

রানী। বিয়ে আমি করব না।

ব্রতীন্দ্র। (রানীকে) তবে কী করবে?

রানী। (ব্রতীন্দ্রকে) দেশের কাজে তোমার সাহায্য করব। আমি কেন কাজ করব না? তবে আমাকে এতদিন শিক্ষা দিলে কেন? (আঁচলে মুখ ঢাকিয়া বেদনা ও ক্ষোভ গোপন)

ব্রতীন্দ্র। না, এ কখনোই হ'তে পারে না।—এ রকম স্থলে তো বিবাহ হ'তে পারে না।

নিবেদিতা। (রানীকে দেখাইয়া) এর তো একটা উপায় করতে হচ্ছে?

ব্রতীন্দ্র। তা বটে। সে কথাই বলছি—যে-লক্ষ্মী ভারতের শিশুকে মানুষ করেন, রোগীকে সেবা করেন, তাপীকে সান্ত্বনা দেন, তুচ্ছকেও প্রেমের গৌরবে প্রতিষ্ঠা দান করেন, যিনি দুঃখ-দুর্গতিতেও আমাদের দীনতমকেও ত্যাগ করেন নাই—সেই লক্ষ্মীর দিকে আমরা তাকাই নাই—এমন দুর্গতির লক্ষণ আর কিছুই নাই। আমাদের পৌরুষ আজ লাঞ্ছিত—(থামিয়া)—যদি সম্মতি থাকে (একটু চিন্তা করিয়া স্থির-মনে) আমি ওকে বিয়ে করব।

(নিবেদিতা ও রঘুনাথ চমকিয়া উঠিল। অভাবনীয়-ঘটনায় রানী হতবিহ্বল হইয়া বিস্ময়ে ও হর্ষে কাঁদিয়া ফেলিল)

রঘুনাথ। বাঁচালে প্রভু, রক্ষা করলে। (উর্ধ্বে ভগবৎ-উদ্দেশে কপালে দুই হাত ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া) আমি গরীব, আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না! আমার একটি-মাত্র মেয়ে। বিবাহ-ব্যতীত পথ দেখি না। (রানীকে) আর ভাবিস-নে, আর কাঁদিস-নে। কাছে আয় বাছা। (রানী কাছে গিয়া পিতাকে প্রণাম করিল। রঘুনাথ মেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিল ও বলিল) তুই কাজে যা, ভগবানের পৃথিবীতে অভাগাদেরও আশ্রয় মেলে, আমারও মিলবে। (এই বলিয়া রঘুনাথ ধীরে-ধীরে কুটীরের দিকে গেল)

রানী। (নিবেদিতার কাছে গিয়া) দিদি, তুমি আশীর্বাদ করবে না ?

নিবেদিতা। (রানীকে কাছে টানিয়া) আমি যে কত খুশী হয়েছি সে আর কী বলব ? তুই ওর যোগ্য হতে পারিস, এই আমি প্রার্থনা করি। এই কথাটি তোকে মনে রাখতে হবে, খুব একটা বড়ো-দেশে তুই জন্মেছিস্। সমস্ত হৃদয় দিয়ে এই বড়ো-দেশকে ভক্তি করবি, আর, সমস্ত জীবন দিয়ে এই বড়ো-দেশের কাজ করবি। ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।

(কবির প্রবেশ। সকলে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিবেদিতা কানে-কানে কবিকে কিছু বলিল)

কবি। (ব্রতীন্দ্রকে সব শুনেছি। ভালো ক'রে সকল কথা চিন্তা করে দেখেছ তো ? আর-কিছু সময় নিলে ভালো হয় না ?

ব্রতীন্দ্র। সময় নিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, অসত্য কথা ও অন্যায় অত্যাচার বেড়ে উঠতেই থাকবে।

কবি। চারদিকে যদি অশান্তি জেগে থাকে, অনুতাপ করবার কোনো কারণ দেখি না, ভালোই হবে, নিজের ব্যবহারটা খাঁটি থাকলেই হল।

ব্রতীন্দ্র। ভয় হয়, অসহ্য হয়ে পাছে হঠাৎ এমন-কিছু করে ফেলি—

কবি। তোমাদের মনে যে আবেগ উপস্থিত হয়েছে সেটা যে অমঙ্গল সে আমি বলতে পারি-নে। আমিও একদিন বিদ্রোহ ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলুম, কোনো সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তাই করি-নি। সমাজের উপর এই যে ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাত চলছে এতে বোঝা যাচ্ছে তাঁরই শক্তির কাজ চলছে। তিনি যে নানাদিক থেকে ভেঙে-গ'ড়ে শোধন ক'রে কোন্ জিনিসটাকে কীভাবে দাঁড় করিয়ে তুলবেন আমি তার কী জানি। সমাজ কী,—তিনি দেখছেন মানুষকে।

ব্রতীন্দ্র। (কবির কাছে গিয়া) আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি।—সে-ই আমাদের জীবনে সত্য-দীক্ষা হবে। আমাদের যা মঙ্গল, তা ঈশ্বর আপনার হাত দিয়েই দেবেন। ঘটনা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, (রানীকে দেখাইয়া) আমি যদি বিবাহ না করি তবে চিরজীবন সমাজে ওকে অন্যায় এবং অমূলক অপমান সহ্য করতে হবে।

কবি। হৃদয়ের নিত্য-ধর্ম সত্য চিরদিন। (রানীর দিকে চাহিয়া সহাস্যে) ভগবান এতকাল পরে আমার একটি অভাব দূর করে দিলেন, আমার মেয়ে ছিল না, আমি মেয়ে পেলুম।

ব্রতীন্দ্র। আমি যা দিনরাত্রি হ'তে চাচ্ছিলুম অথচ হ'তে পারছিলুম না, আজ আমি তা-ই হয়েছি। আমি অনেক জেলায় ভ্রমণ করেছি, নীচ-পল্লীতেও আতিথ্য নিয়েছি, কেবল শহরে সভায় বক্তৃতা করেছি মনে করবেন না, কিন্তু কোনোমতেই সকল লোকের পাশে গিয়ে বসতে পারি-নি—একটা অদৃশ্য-ব্যবধান নিয়ে ঘুরেছি। আজ আমি একেবারে ভারতবর্ষের কোলের উপর ভূমিষ্ঠ হয়েছি।

কবি। সত্যকে যখন পাই তখন সে তার সমস্ত অভাব অপূর্ণতা নিয়েও আমাদের আত্মাকে তৃপ্ত করে,—তাকে মিথ্যা উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে তোলার ইচ্ছা-মাত্রই হয় না। তোমার মাতৃক্রোড়ে তুমি যে অধিকার পেয়েছ সেই অধিকারের মধ্যে তুমি আমাদেরও আহ্বান করে নিয়ে যাও।

ব্রতীন্দ্র। (রানীকে) আমি আর তোমার গুরু নই, আমার হাত ধ'রে ওই গুরুর কাছে আমাকে নিয়ে যাও। (রানী ও ব্রতীন্দ্র উভয়েই কবিকে প্রণাম করিল)

কবি। (প্রণতা রানীর মাথায় হাত রাখিয়া)

তুমি একাকিনী
সর্বসুখ, সর্বসঙ্গ, সর্বৈশ্বর্যময়,
সকল সান্ত্বনা, একা সকল আশ্রয়।—
ক্লান্তির আরাম, শান্তি, ব্যাধির শুশ্রূষা,
দুর্দিনের শুভলক্ষ্মী, তামসীর ভূষা—
উষা মূর্তিমতী। তুমি হবে একাকিনী
সর্বপ্রীতি, সর্বসেবা, জননী গেহিনী।

(ভীত অথচ উত্তেজিতভাবে চুপি-চুপি সাবধানে পা ফেলিয়া জনকয়েক বস্তী-বাসী মজুরের সহিত কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর। চ-কে মেরে ফেলেছে—

কবি। এঁ্যা, বলিস কী-রে ?

সকলে। (উত্তেজিতভাবে) কী হয়েছে ? কে মেরেছে ?

কিশোর। —সরকার।

ব্রতীন্দ্র। কেন, মারতে গেল কেন ?

কিশোর। চ বনের মধ্যে পোড়ো-মন্দিরে ব'সে (পকেট হইতে বাহির করিয়া বোমার-খোল দেখাইয়া—চাপা-স্বরে) বোমা তৈরি করছিল। সেই খবর পেয়ে—

ব্রতীন্দ্র। আমি তো আর থাকতে পারছি-নে—আমি চললুম।—

রানী। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

নিবেদিতা। শোনো একবার, মেয়ের কথা শোনো।

ব্রতীন্দ্র। রোসো, আগে আমি ফিরে আসি, তারপরে যেয়ো।

রানী। আমি যাব-ই। আজ আমি সবার।

ব্রতীন্দ্র। চলো তবে, এখনি চলো। (সহাস্যে) দয়াময় হরি! শ্বশুরবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মতো ব'সে আছ! (কবির দিকে হাত জোড় করিয়া) তবে যাই—

কবি। (আশীর্বাদের উদ্দেশে ডান হাত উঠাইয়া ব্রতীন্দ্রকে) কী জানি কোন্ পথে এরা চলেছে। যদিও আমি কোনো কর্মেরই না, তবু মানুষের এই সংকটে ইচ্ছে হচ্ছে এদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

ব্রতীন্দ্র। না, এখনি না। আপনি ব'লে দিন, আপনার আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। বলুন, আমাকে কী করতে হবে ?

কবি। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

ব্রতীন্দ্র। এবার তাহলে বেরিয়ে পড়ি। (মজতুর-দলকে) চল-রে চল্—

কিশোর। লক্ষ্মী আমার, বোন আমার, আর দেরি করা নয়, এসো তবে।

রানী। (নিবেদিতাকে) দিদি, তুমি কী করবে ?

নিবেদিতা। আমিও এই দেশের কাজই করব।

রানী। তুমি আমাকে সাহায্য করবে তো ?

নিবেদিতা। হ্যাঁরে, চল্—আমরা ভাগ ক'রে ভিন্ন-ভিন্ন দিকে যাই। দাবানল জ্বলে ওঠবার আগে তা গুমরে-গুমরে ধোঁয়ায়; এখনও চরম সেই দাবানলের সময় যায়-নি।

কবি। তোমরা এগোও। আগুন জ্বলে উঠেছে—

গান

ওরে আগুন আমার ভাই, আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই ॥
তুমি দু'হাত তুলে আকাশ-পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে,
এ কী আনন্দময়, নৃত্য অভয় বলিহারি যাই ॥

ব্রতীন্দ্র। (নিবেদিতাকে) যাই তবে—

নিবেদিতা। সামনে যখন কাজ আছে তখন তো যেতেই হবে।—বিবাহ স্থগিত রইল, বেশি কী আর— জয়গর্বে ফিরে এসো।

ব্রতীন্দ্র। এমনি বিশ্বাসই চিরদিন রেখো।

নিবেদিতা। (স্বগত) এক-একবার মন কেমন ক'রে উঠছে। কত কথাই না মনে পড়ছে—(উদ্‌গত-অশ্রু রোধ করিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া লইয়া প্রস্থান)

কবি। (করজোড়ে প্রার্থনা)

তার পরে তাঁরে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের মুখে
সম্পদেরে করেন লালন; হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক-কান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি-অন্ধকারে;

ব্রতীন্দ্র। যিনি নানা কণ্ঠে ক'ন নানা ইতিহাসে
সকল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে,—
সকল চরম লাভে,—"দুঃখ কিছু নয়,

কবি। ক্ষত মিথ্যা ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্বভয়;

ব্রতীন্দ্র। কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার?
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।

কবি। ওরে ভীরু, ওরে মূঢ় তোলো তোলো শির।
আমি আছি তুমি আছ সত্য আছে স্থির।"

(নিবেদিতার প্রবেশ)

নিবেদিতা। (একখানি পাত্র হাতে ফিরিয়া আসিয়া) যাত্রামুখে দু'জনে একটু দাঁড়াও, ভাই, মাল্য-চন্দনটা সেরে

হইতে তুলিয়া লইয়া ব্রতীন্দ্র ও রানীর ললাটে রক্ত-চন্দনের তিলক ও গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিয়া রানীর কপালে চুমা দিল ও থালা হইতে শঙ্খ তুলিয়া লইয়া বাজাইল। ব্রতীন্দ্রের সঙ্গে রানী, কবি ও নিবেদিতাকে প্রণাম করিল)

কবি। জয়ী হও, যাত্রা তোমাদের শুভ হোক।

ব্রতীন্দ্র। (চাপাস্বরে) বন্দেমাতরম্।

(সকলে সমধ্বনি ও প্রস্থান)

জয়-স্যন্দন

(জয়-রথ)

"জনগণ-পথ তব জয়রথচক্র-মুখর আজি"

জয়-স্যন্দন

দৃশ্য ১

(বস্তি-অঞ্চল। মধ্যাহ্ন। পথপার্শ্বে বস্তিবাসী কুলিমজুর-দল। বীরেন ও অরুণ-সহ ব্রতীন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রতীন্দ্র। সর্দারের প্রতি) গান

ছিঃ ছিঃ, চোখের জলে ভেজাস-নে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক্‌-না ওরে বক্ষ-দুয়ার আঁটি,
জোরে বক্ষ-দুয়ার আঁটি॥
পরানটাকে গলিয়ে ফেলে দিস্‌নে রে ভাই পথেই ঢেলে
মিথ্যে অকাজে—
ওরে নিয়ে তারে চলবি পারে কতই বাধা কাটি,
পথের কতই বাধা কাটি॥
দেখলে ও তোর জলের ধারা ঘরে-পরে হাসবে যারা,
তারা চারদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস, যায় না কি বুক ফাটি ?
লাজে যায় না কি বুক ফাটি ?
দিনের বেলা জগৎ-মাঝে সবাই যখন চলছে কাজে
আপন গরবে—
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে করিস ঘাঁটাঘাঁটি॥

ব্রতীন্দ্র। একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস কেন ? মেরেছে ? বেশ করেছে। এতদিন আমার কাছে আছিস বেটারা, এখনো ভালো ক'রে মার খেতে শিখিলি-নে ?

অরুণ। হাড়-গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে ?

১ম মজুর। ছেলেমেয়েরা কাঁদছে ভাত না পেয়ে, অন্ন-বিনে মরছি-যে। ঘরের এমন দশা যে, চামচিকেগুলোর থাকবার কষ্ট হয়।

২য় মজুর। এদিকে পেটের জ্বালায় মরছি। ওদিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে !

৩য় মজুর। ঠাকুর, তুমি কোথায় চলেছ, বলো দেখি ?

ব্রতীন্দ্র। যাচ্ছি রাজ-দরবারে।

৪র্থ মজুর। তোমার উপর রাজার যে ভারি রাগ! তার কাছে গেলে কি তোমার রক্ষা আছে?

ব্রতীন্দ্র। তোরা যে মার সইতে পারিস-নে। সেইজন্যে তোদের মারগুলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্য স্বয়ং রাজার কাছে চলেছি।

৫ম মজুর। না, না, সে হবে না ঠাকুর, সে হবে না। তবে আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

ব্রতীন্দ্র। পেয়াদার হাতে আশ মেটে-নি বুঝি? যেতে চাস তো চল্‌। দেখে আসবি।

১ম মজুর। কিছু হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে। আমার তিনটে সড়্‌কি আছে।

২য় মজুর। আমার একখানা লাঙল আছে।

ব্রতীন্দ্র। কেন রে, হাতিয়ার নিয়ে কী করবি?

২য় মজুর। যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তাহলে—

ব্রতীন্দ্র। তাহলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়। কী আমার উপকারটাই করতে যাচ্ছ। তোদের যদি এই-রকম বুদ্ধি হয় তবে এইখানেই থাক্‌।

সকলে। না, না, তুমি যা বলবে তাই করব।

বুড়ো মজুর। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব?

ব্রতীন্দ্র। বলব (দৃঢ়কণ্ঠে)—আমরা খাজনা দেব না।

বীরেন ও অরুণ। দেব না!

বুড়ো মজুর। যদি শুধোয় কেন দিবি-নে?

ব্রতীন্দ্র। (দৃঢ়কণ্ঠে) বলব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তাহলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে-অন্নে প্রাণ বাঁচে তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই। ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

৩য় মজুর। এ-কথা রাজা শুনবে না।

ব্রতীন্দ্র। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে, ভগবান তাঁকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না?

বীরেন ও অরুণ। ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।

৪র্থ মজুর। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি! তাঁরই জিত হবে।

ব্রতীন্দ্র। এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই? তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছয়, তা জানিস?

বুড়ো মজুর। (অন্য সব মজুরদের প্রতি) তোরা অত ভাবনা করছিস কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

২য় মজুর। বাবা-ঠাকুর, রাজার কাছে যাচ্ছ, কিন্তু তোমাকে তিনি সহজে ছাড়বেন না।

ব্রতীন্দ্র। ছাড়বেন কেন? আদর করে ধরে রাখবেন।

২য় মজুর। সে আদরের ধরা নয়।

ব্রতীন্দ্র। ধরে রাখতে কষ্ট আছে বাপ—পাহারা দিতে হয়! যে-সে লোককে কি রাজা এত আদর করে? রাজবাড়িতে কত লোক যায়, দরজা থেকেই ফেরে— আমাকে ফেরাবে না। শিঙা বেজে উঠেছে। মুক্তির ডাক উঠেছে।

(ব্রতীন্দ্রের সঙ্গে সকলের গান)

গান

আরো আরো প্রভু আরো আরো।
এমনি ক'রে আমায় মারো।
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই?
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো॥
এবার যা করবার তা সারো সারো—
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা
কেবল হেসে-খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো॥

(একজন মজুরের ছুটিয়া প্রবেশ)

ব্রতীন্দ্র। কী রে, ছুটে এলি কেন?

মজুর। আমাদের দশজনকে ধরে নিয়ে গেছে। কাল রাত্রে জ্বালিয়ে দিয়েছে নন্দিগ্রাম।

ব্রতীন্দ্র। আয়রে, তবে যাত্রা করি।

গান

আমাকে যে বাঁধবে সে কি অমনি হবে?

(কিশোরের দ্রুত প্রবেশ)

কিশোর। (আগন্তুক-মজুরকে ইঙ্গিত করিয়া) কতদূর?

আগন্তুক। কতদূর কী? এসে পড়েছে-যে।

কিশোর। বলো কী?

আগন্তুক। স্পষ্ট দেখা—সৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো।

একজন মজুর। কী সর্বনাশ।—(বলিতে বলিতে দারোগা ও লাল-পাগড়ীধারী সিপাইদের প্রবেশ, সঙ্গে সংকুচিত ভীত মাধব, ইঙ্গিতে সে পুলিসদের 'ওই যে' বলিয়া ব্রতীন্দ্রকে দেখাইয়া দিল)

দারোগা। (দাপটে আগাইয়া আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে ব্রতীন্দ্রকে) তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ব্রতীন্দ্র। হাঁ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে, অমন কাজ করতে নেই।

দারোগা। (ব্রতীন্দ্রকে) তুমি এইখানেই রইলে! ("নিয়ে যাও" বলিয়া সিপাইদের প্রতি ব্রতীন্দ্রকে বন্দী করিবার ইঙ্গিত করা। তখনই বস্তীর-মেয়েদের সঙ্গে নিয়া রানী ও রুক্মিণী দ্রুত আগাইয়া আসিয়া—)

রানী। (দৃঢ়কণ্ঠে) আমাদের প্রাণ থাকতে সে তো হবে না।

মেয়েরা। (সমস্বরে) সে হবে না। —হবে না।

মজুর-দল। এ আমাদের সহ্য হবে না।

মেয়েরা। বলছি—এতে অকল্যাণ হবে।

ব্রতীন্দ্র। আমি বলছি, তোরা ফিরে যা। হুকুম হয়েছে—আমি দু-দিন রাজার কাছে থাকব। বেটাদের সহ্য হল না! (দারোগাকে)

গান

রইল ব'লে রাখলে কারে হুকুম তোমার ফলবে কবে
তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই, র'বার যেটা সেটাই র'বে॥
যা খুশি তাই করতে পারো,
গায়ের জোরে রাখো মারো,
যাঁর গায়ে সব ব্যাথা বাজে তিনি যা স'ন সেটাই স'বে॥
অনেক তোমার টাকাকড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি

অনেক অশ্ব অনেক করী অনেক তোমার আছে ভবে ॥
ভাবছ হবে তুমি যা চাও
জগৎটাকে তুমি নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে হয় না যেটা সেটা-ও হবে ॥

রানী। (ব্রতীন্দ্রকে) তুমি কি একলাই যাবে ?

দারোগা। (রানীকে) দেখো, আমরা এখানে সরকারের কাজ করতে এসেছি। —এতে যদি কোনো কথা বলো বা গোলমাল করো তাহলে মুশকিলে পড়বে।

রানী। (দারোগা "বাঁধো" বলিয়া ইঙ্গিত করিলে পুলিসেরা ব্রতীন্দ্রকে বাঁধিতে গেলে "ঘিরে দাঁড়াও" বলিয়া রানীর নির্দেশ। মেয়ের দল ব্রতীন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল)

রানী ও মেয়েরা। আমরা এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব। আমরা এখানে না খেয়ে মরব। দেখব তোমরা কেমন ক'রে এ-কে নিয়ে যাও !

মজুর-দল। আমরা বৈরাগী-ঠাকুরকে জোর ক'রে নিয়ে যাব, কেড়ে নিয়ে যাব।

দারোগা। এরা সব বৈরাগী-ঠাকুরের চেলা, এদের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। কিন্তু যে-রকম গোলমাল লাগিয়েছে—(সামনে গিয়া) সরে যাও।

(মেয়েরা আরো ঘন ও দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল)

রানী। কেন, সরব কেন, আমরা সব পথের কুকুর নাকি ?

রুক্মিণী। বলি, কুকুর নাকি, তাইতো !

দারোগা। (সক্রোধে) তবে, উচ্ছন্ন যাও—(দ্রুত গিয়া রানীকে ঠেলিয়া বুটের লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া ব্রতীন্দ্রকে হাতকড়া পরাইল)

মেয়েরা। (চীৎকার) আমাদের রানীর মতো লক্ষ্মীকে অপমান করলে ?

রুক্মিণী। লক্ষ্মীকে অপমান ?

কিশোর। (সরোষে দারোগাকে) অপরাধ ক'রে থাকি, শাস্তি দেবে। তা ব'লে আমাদের অপমান করবে ?

মাধব। (স্বগত বিবর্ণমুখে দারোগার উদ্দেশে) নিষ্ঠুর, পাষণ্ড !

ব্রতীন্দ্র। আমি হুকুম করছি, তোরা ফিরে যা।

মজুর-দল। তোমার হুকুম মানব, ফিরেই যাব, কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাব।

ব্রতীন্দ্র। ওদের সঙ্গে আমি না গেলে যুদ্ধ থামবে না। (পুলিসদল ব্রতীন্দ্রকে টানিয়া আনিতে গেলে রানী আবার গিয়া সামনে দাঁড়াইল)

দারোগা। তুমিও লড়বে নাকি ?

রানী। হাঁ, লড়ব।

দারোগা। তোমাকে লড়তে কে ডেকেছে?

রানী। আমার প্রাণ ডেকেছে।

দারোগা। (রানীকে দেখাইয়া পুলিসদের প্রতি নির্দেশ) ধরে রেখে দাও, ওকে যেতে দেওয়া হবে না।

মাধব। হুজুর, কাজটা কি ভালো হবে? বাড়াবাড়িটা ভালো নয়, দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

দারোগা। তাই যদি না হবে তবে এমন কাজে সুখ কী?

মাধব। হুজুরের কী ইচ্ছা?

দারোগা। সেও কি বলতে হবে? ওকে বলপূর্বক নিয়ে যাব। ইচ্ছা ক'রে সে এসেছে, তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে। (রানীকে দেখাইয়া দিয়া ইঙ্গিত-মূলক ঈষৎ-বক্রহাসিতে সোল্লাসে) বিধাতা এতক্ষণ পরে আমাদের ভাগ্যফল নিয়ে আসছেন। বলছ কি-না—আর তা অমনি ছেড়ে দেব?

মাধব। (দারোগাকে) এতদূর ভালো নয়। (স্বগত আহত-চিত্তে) কিন্তু কী হতে এ-কী হল! বলছে—"তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে····বিধাতা···· ভাগ্যফল নিয়ে আসছেন!" এ সব কী-কথা! রানী তোমাদের ভাগ্যফল? —ভোগের জিনিস?

দারোগা। (মাধবকে) অমনতরো সংকুচিত হয়ে আমার আড়ালে আপনাকে লুকিয়ে রেখো না।

মাধব। (ফ্যাকাশে-মুখে) আমাকে ছেড়ে দিন।

দারোগা। তোমাকে ছাড়তে পারছি-নে, তোমাকে এই কাজে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

মাধব। আমি অতি হীন ব্যক্তি, অভাজন, আমার দ্বারা—

দারোগা। তোমার মতো লোককে নিয়েই তো কাজ চালাবার সুবিধে।

(পুলিসেরা রানীকেও বন্দী করিতে আগাইয়া আসিল)

মজুর ও নর-নারীদল। (সগর্জনে) খবরদার—

মাধব। কী করলুম। কী সর্বনাশ হল। কী সর্বনাশ হল। ধিক্, ধিক্ আমাকে। সব নষ্ট করেছি। যে যাই বলুক, মেয়েটা কিন্তু-লক্ষ্মী-মেয়ে! (দারোগার প্রতি) ওকে এমন ক'রে বিদায় করলে কি ধর্মে সইবে? আমি পাপিষ্ঠ। আমার কী হবে! হরি, রক্ষা করো।

দারোগা। (মাধবকে ব্যঙ্গহাস্যে) তুমি তো ওকে বিদায় করতেই চেয়েছিলে? (রানীকে দেখাইয়া পুলিসদের প্রতি) চেয়ে-চেয়ে কী দেখছ? ওকে নিয়ে যাও।

মাধব। (স্বগত) কী হবে! (দারোগাকে) হুজুর, জামিনে খালাস দিন।

দারোগা। জামিন হবে কে?

মাধব। (ইতস্তত করিয়া) আমি হব।

দারোগা। তুমি জামিন হবে? তোমার এমন কী সাধ্য আছে। এমন মতি হল কেন?

মাধব। সহজে হয়-নি প্রভু। (দারোগার হাতে একটা টাকার থলি দিয়া) সমস্ত তোমার কাছেই রাখলাম। রক্ষা করো, আমি তোমার শরণাগত। (দারোগার পায়ে-পড়া)

দারোগা। (লাথি মারিয়া) না, না—সে হতে পারবে না।

মাধব। (জোড়-হাত বাড়াইয়া) তাহলে আমি ধরা দিচ্ছি। আমি অপরাধী। নিজের পাপ-মন্ত্রণায় আমি নিজেই ভুলেছিলাম! আমাকে বন্দী ক'রে নিয়ে চলো। এক-সঙ্গে বন্দী ক'রে রাখো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও।

দারোগা। কোথাকার পাগল এটা।—পালাও, পালাও।

ব্রতীন্দ্র। (মাধবকে) তুমি এখানে?

মাধব। (কপাল দেখাইয়া) সমস্তই অদৃষ্টের কুচক্র। পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। (রানীকে) ভয় কোরো না, মা!

রানী। ভয়?—ভয় কেন করব? ভয়ের দিন আমার আর নেই।

মাধব। আমি নরাধম।—কী লজ্জা! যদি আমাকে এখানে এভাবে লোকে দেখে তাহলে তারা যে হাসবে।

ব্রতীন্দ্র। লোকের ওই দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, তাই দেখেই লোকে হাসে। যেখানে এসেছ, এখানে তোমার মিথ্যে সব ঘুচে গেছে। এই আমাদের রানীকে দেখো, অপমানের আঘাতে রূপ আরো ফুটে পড়ছে।

(ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস-সাহেবের প্রবেশ)

পুলিস-সাহেব। (মাধবকে) চলো, চলো। আর কি কোথাও কেউ নেই বিদ্রোহী?—কর্তব্য তো পালন করতে হবে।

মাধব। (স্বগত) যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না, ততই আরো জড়িয়ে পড়ছি।

মজুররা। (ব্রতীন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া পুলিস-সাহেবকে) কিন্তু আমাদের ঐ ঠাকুর?

মেয়েরা। আর ঐ আমাদের মা-লক্ষ্মী?

জনৈক মজুর। আমাদের দয়া করছিল ব'লেই-না সে—(চোখ-মোছা—ধরা-গলায়) দু'বেলা মা আমাদের কত যত্ন ক'রে কত খাবার পাঠিয়েছে।

অন্যজন। দেবীর প্রতিমা গো।

মাধব। দেবী না রে! দয়া না রে! সে যে আমাদের ঘরেরই মেয়ে।

দারোগা। চোপ্‌রাও!

রুক্মিণী। (কোমরে কাপড় জড়াইয়া আগাইয়া দারোগাকে ধম্‌কাইয়া) চুপ্ কর্ মিনসেরা। (সরহস্য ব্যঙ্গ) আমাকে চিনতে পার কি গা?
একবার এইদিকে তাকাও-না।

দারোগা। (আগাইয়া রুক্মিণীকে ধম্‌কাইয়া) রুক্মিণী?—তুই কোথা হতে এলি মাগী? তোর মরণ নেই না-কি?

রুক্মিণী। বটে, পোড়ারমুখো! তোদের এখনও সর্বনাশ হল না,—আর আমি মরব? আগে তোদের ছাই গায়ে মাখি। তার পরে যমের সাধ মেটাব। তার আগে যমালয়ে আমার ঠাঁই নাই।

দারোগা। তোমার কখন যে কী মতি হয় ভালো বুঝতে পারি না।

রুক্মিণী। রোসো, তোমার মুণ্ডপাত করছি। (বলিয়া থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে ক্রোধে দারোগার মুণ্ড ধরিবার জন্য আক্রমণ করিতে আগাইল)

দারোগা। ("বাঁধো"—বলিয়া ইঙ্গিত করিলে পুলিসরা রুক্মিণীকেও বাঁধিয়া নিল)

রুক্মিণী। (অস্থিরভাবে) কিছুই হল না! (হাত-কড়াতে মাথা ঠুকিয়া) এই আমি মরলাম। এ স্ত্রী-হত্যার পাপ তোদের হবে। (স্বগত "কী অমঙ্গল"—বলিতে-বলিতে সিপাহীরা রুক্মিণীকে বাধা দিয়া পিছমোড়া করিয়া হাতকড়া পরাইয়া রাখিল)

পুলিস-সাহেব। (দারোগাকে) সকল মহাল থেকে টাকা এল, ওখান থেকে কী আদায় হল?

দারোগা। (জনান্তিকে চাপাকণ্ঠে) আজ্ঞে, প্রজারা তো হন্তে-কুকুরের মতো খেপে রয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। (ব্রতীন্দ্রকে) তুমি এই-সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ ?

ব্রতীন্দ্র। খেপাই বই কি। নিজে খেপি, ওদেরও খেপাই। এই তো আমার কাজ।

পুলিস-সাহেব। (জনতাকে) খাজনা বাকি—দেবে কি-না বলো ?

মজুর-দল। (ব্রতীন্দ্রকে) আচ্ছা, আমরা না-খেয়েই খাজনা দেব, কিন্তু তোমাকে ছাড়ছি-নে।

জনৈক-মজুর। আমাদের ছেলেমেয়েরা-পর্যন্ত কাঁদছে, সে কি কেবল ভাত না পেয়ে ? তা নয়, তুমি চলে এসেছ ব'লে। তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

ব্রতীন্দ্র। আরে চুপ কর্, চুপ কর্, ও-কথা বলিস-নে।

ম্যাজিস্ট্রেট। (ব্রতীন্দ্রকে ও রানীকে দেখাইয়া পুলিসদের প্রতি) ছাড়িস্-নে।

ব্রতীন্দ্র। (ম্যাজিস্ট্রেটকে) আহা-আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠুর সেজে এ কী লীলা হচ্ছে ? গদীতে বসে থাকবে, ধরা দেবে না ব'লে পণ করেছিলে—আমরা তোমাকে ধরব ব'লে কোমর বেঁধে বেরিয়েছি।

মজুর-দল। (ব্রতীন্দ্রকে) আমরা এইজন্যেই কি এসেছিলুম ? তোমাকেও হারাব ?

ব্রতীন্দ্র। হারাবি কী রে ব্যাটা ? আমাকে তোদের গাঁটে বেঁধে রেখেছিলি ? পালা, পালা,—আমি গারদেই যাব। সেখানে যত কয়েদী আছে তাদের গান শুনিয়ে আসব।

মাধব। (ম্যাজিস্ট্রেটকে হাত-জোড় করিয়া) হুজুর, অভয় দেন-তো বলি। গরিব এখন মহারাজের শরণাগত।

ম্যাজিস্ট্রেট। কথাটা কী, শুনি ?

মাধব। ঠাকুরকে ছেড়ে দিন, মহারাজ। প্রজাদের মনে একসঙ্গে এতগুলো বেদনা চাপাবেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট। সে দেখা যাবে। বিবেচনা করে দেখব।

(ব্রতীন্দ্র রানী ও রুক্মিণীকে নিয়া সরকারীদলের প্রস্থান। বিষণ্নমুখে মজুর-দল সেদিকে চাহিয়া রহিল।)

মাধব। (বন্দীদের পথের দিকে চাহিয়া অর্ধস্ফুট রুদ্ধকণ্ঠে) রেখে গেলে অপরাধী ক'রে! (একদৃষ্টে পূর্ববৎ চাহিয়া রহিল, পরে ব্রতীন্দ্রের উদ্দেশে বলিয়া উঠিল—) বৈরাগী-ঠাকুর, আমি তোমার সঙ্গ ধরলুম। আর ছাড়ছি-নে—(সম্মুখে

ব্রতীন্দ্রের প্রস্থান-পথের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া বস্তিবাসী-মজুরদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল)

জনতা। (মাধবকে) আর কী উপায় আছে বলো ?

মাধব। উপায় ?—তা কী হয়েছে ? ধর্ তো রে ভাই তোদের সেই দরজায়-ঘা-দেবার গানটা ধর্ দেখি ! সেই যে—"সবাই মিলে প্রাণটা দিলে সুখ আছে কি মরার চেয়ে"। সবাই মিলে চল্ জেলে।

কিশোর। তবে আর কী, এই বেলা—

অরুণ। চল্-রে চল্।

সকলে। চল্, চল্, চল্, চল্।

(সকলের প্রস্থান)

কলিকাতা। রাজপথ। পথিকেরা যাতায়াত-রত।

(নেপথ্যে ধ্বনিত)

নেপথ্যে। বাজেরে বাজেরে ওই রুদ্রতালে বজ্রভেরী—
দলে-দলে চলে প্রলয়-রঙ্গে বীর-সাজে রে।
দ্বিধা ত্রাস আলস নিদ্রা ভাঙো গো জোরে—
উড়ে দীপ্ত বিজয়-কেতু শূন্য-মাঝে রে।
আছে কে পড়িয়া পিছে মিছে কাজে রে॥

(বস্তীবাসীদের মিছিল চলিয়াছে। বীরেন, অরুণ ও কিশোরের পরিচালনায় সকলে গাহিতেছে—)

গান

আগে চল্ ভাই আগে চল্,
পড়ে-থাকা-পিছে মরে-থাকা-মিছে
বেঁচে-মরে কিবা ফল ভাই॥
প্রতি-নিমেষেই যেতেছে সময়
দিনক্ষণ-চেয়ে-থাকা কিছু নয়,

সময়-সময় ক'রে পাঁজি-পুঁথি ধ'রে
সময় কোথা পাবি বল্ ভাই ॥
পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে ক'রে—
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধ'রে।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন—
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন,
মিছে নয়নের জল ভাই ॥

(এই সময়ে সার্জেণ্ট ও সাহেব-বেশধারী চৌধুরীর আলাপ-রত-অবস্থায় প্রবেশ)

চৌধুরী। (সার্জেণ্টকে) এই যে খবরের কাগজে কটু-কথা বলছে, সমালোচনা চলছে,—এতে পীপল্-এর কোনো যোগ নাই; এ কেবল কতকগুলি শিক্ষিত-পুতুলনাচ-ওয়ালার বুজ্‌রুগি মাত্র। ভিতরে সমস্তই আছে ভালো।

(জনতার মধ্য হইতে কিশোর সরোষে চৌধুরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল—)

কিশোর। পরিত্যাগ করো বিদেশের বেশভূষা! বিদেশের বিলাস পরিহার করো।

(গ্রামবাসীরা একে-একে আগাইয়া চৌধুরীকে ধিক্কারের সুরে)

গ্রামবাসী ১। কে তুমি ফিরিছ পরি' প্রভুদের সাজ
ছদ্মবেশে বাড়ে নাকি চতুর্গুণ লাজ?
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে-না নিত্য অপমান?

গ্রামবাসী ২। চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান,
পৃষ্ঠে তব কালো বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান।
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি' তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে-না-কি তব স্বজাতিরে?

গ্রামবাসী-৩। সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি' এ কী অহংকার।
ওর কাছে-(নিজেদের পরিধেয় দেখাইয়া)
—জীর্ণ চীর জেনো অলংকার ॥

(চৌধুরী ও সার্জেণ্ট বেগতিক দেখিয়া জনতার প্রতি ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিতে করিতে স্থান ত্যাগ করিল)

(**'একতাই শ্রেষ্ঠ বল'**-লেখা পতাকা-সহ গাহিতে-গাহিতে দলে-দলে লোকের আগমন ও ক্রমে সকলেরই সে-গানে যোগদান)

গান

সকলে। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ॥
প্রাণের মাঝে থেকে-থেকে 'আয়' ব'লে ওই ডেকেছে কে,
সেই গভীর-স্বরে উদাস করে, আর কে কারে ধরে রাখে ॥
কতদিনের সাধন-ফলে মিলেছি আজ দলে-দলে,
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয়-রে মাকে।

কিশোর। বাংলাকে যেমনি দুইখানা করবার হুকুম হল—

অরুণ। অমনি পূর্ব হতে পশ্চিমে একটি-মাত্র ধ্বনি উঠল—

বীরেন। ধ্বনিত হল—"আমরা এক"।

সকলে। "—আমরা এক"। (সমস্বরে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়া "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে"—গাহিতে-গাহিতে সকলের প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

রাজপথ—অন্যত্র

(মুকুন্দ ও বিশু)

বিশু। (বিপরীত দিক হইতে আসিয়া) এই যে, ভালো আছেন? (সদর্পে) ইংরেজকে বলতে ইচ্ছা করছে, আমরা সম্পূর্ণ সক্ষম, সমর্থ, প্রস্তুত। আমরা কোনোমতেই তোমাদের অবজ্ঞার পাত্র নই। তোমরা যদি আমাদিকে অবজ্ঞা কর আমরাও তোমাদিকে অবজ্ঞা করতে পারি। এমনি ক'রে সব বলতে ইচ্ছে করছে।

মুকুন্দ। (বিস্মিত ও ক্ষীণ হাসিতে ব্যঙ্গস্বরে) এই ক'টা কথা খুব জোরে বলবার সুখই যদি আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে এই পালাই চলুক!

বিশু। (কৃত্রিম তেজে) স্বদেশকে উদ্ধার করতে হবে। ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাঁধের উপরে এমন—

মুকুন্দ। ইংরেজ ভারতবর্ষের কাঁধের উপরে!—(হাসিয়া) তাই-তো!—কিন্তু সে কি কেবল নিজের জোরে? আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ-মাত্র।

বিশু। 'বয়কট'-যুদ্ধ-ঘোষণা, স্বরাজ-মন্ত্র-গ্রহণ, সংগ্রাম, সাধনা—এ সবই আমাদের রয়েছে, আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। বিদেশী-রাজা চলে গেলেই দেশটা হবে আমাদের! দেশের যে-সকল যুবক উত্তেজিত—

মুকুন্দ। যে-সকল যুবক উত্তেজিত—তাঁদের প্রতি একটি মাত্র পরামর্শ এই—স্থির হও!

বিশু। (মুষ্টিবদ্ধ হাত উঠাইয়া) আজ আমরা দেশে যদি শক্তি-ধর্মকেই প্রচার করি—

মুকুন্দ। তবে তারও কি কোথাও বিপদের সম্ভাবনা নাই? যা শান্তির বিড়ম্বনা, শক্তিধর্ম-সাধনায় তার মতো সর্বনেশে বিঘ্ন আর-তো কিছুই নেই। বর্তমানে আমাদের দেশে তার অভ্যুদয়ের লক্ষণ চারিদিকে। (সহসা থামিয়া সতর্কভাবে স্বগত) নানা দিকে সরকারী চর! আর বিলম্ব নয়। (বিশুর দিকে সন্দিগ্ধভাবে চাহিতে-চাহিতে প্রস্থান)

বিশু। (প্রস্থানপর মুকুন্দের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ সচেতনভাবে স্বগত) যাও, তুমি যাও। আমি প্রস্তুত হচ্ছি। যাচ্ছি—কিন্তু ও-দিকে নয়, অন্যদিকে। আজ রাত্রের অন্ধকারে আমি গোপনে যাব। হঠাৎ স্বদেশীদের শিবিরে উপস্থিত হয়ে ঐ ব্যাটাকে বন্দী করতে হবে! পথ-ঘাট আমি সমস্তই সন্ধান করে ঠিক ক'রে রেখেছি, আজ আড়াই-প্রহর রাতে চাঁদ উঠবে, তার পূর্বেই কাজ শেষ করতে হবে। একটি কর্তব্য বাকি আছে।—পুলিসে খবর-দেওয়া—যুদ্ধের উদ্যোগ হ:চ্ছ!—একেবারে যুদ্ধ-কথাটাই লেখা যাক। সরকার পুরস্কার দিচ্ছে। মোটা পুরস্কার! সমস্ত দিনই তো খাটছি, আজ-পর্যন্ত দুটো-পয়সা মিলল না। দেখি এবার।—কেউ জানতে না পারে! একা যাব। (সন্তর্পণে পায়চারি করিতে করিতে শ্লেষের সহিত) কী বলছে ওরা,—আমি গুপ্তচর?—আমি গোয়েন্দা?—এবার সময় এসেছে! সময় এসেছে—সেই অপমানের শোধ-তোলার। আমার অনেক সুখের কল্পনা, ভোগেরও অনেক আশা ছিল—সমস্তই টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙেছে। আমার চেয়ে অনেক অযোগ্য, অনেক নির্বোধ-লোকের ভাগ্যে, অনেক অযাচিত-সুখ জুটেছে

—আমার জুটল না! জীবনটাকে ছারখার করে দিলে। আজ রাত্রে শিকার। বড়ো শিকার! ঐ শিকার আর-কারো নয়, একা-আমার। শিকারীর উপযুক্ত শিকারই বটে। এই যে পিস্তল—সবই সংগ্রহ করে রেখেছি—ভরাই আছে। এটাকে নিয়ে গিয়ে স্বদেশীদের শিবিরে লুকিয়ে রেখে দেব। কোথায় সে পালাবে? চোরাই-মাল-রাখার অভিযোগ হতে নিষ্কৃতি?—হা-হা-হা-হা-হাঃ—তোমার নামে পুলিস-কেস করব, তোমাকে জেলে ঠেলব, তবে ছাড়ব। চুরি ধরিয়ে দিয়ে—হাঃ-হাঃ-হাঃ (ভাবনার সহিত রসিকতার সুরে) কেবল যদি নিজে না-পড়ি ধরা—

(দ্বিধাগ্রস্থভাবে একবার এগোনো একবার পিছানো) যদি নিজে না-পড়ি ধরা! যদি— (প্রস্থান)

দৃশ্য ৩

[অপরাহ্ণ—জেলফটক]

(ফটকে বন্দুক-কাঁধে প্রহরারত প্রহরী। মাধবের পরিচালনায় গাহিতে-গাহিতে উত্তেজিত বন্দীবাসীদের ফটকের সম্মুখ-পথে প্রবেশ)

(গান)

জনতা। যমের দুয়োর খোলা পেয়ে ছুটেছে সব ছেলে-মেয়ে
হরিবোল, হরিবোল।
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা মরণ-বাঁচন অবহেলা!
ও ভাই সবাই মিলে প্রাণটা দিলে
সুখ আছে কি মরার চেয়ে!
হরিবোল্, হরিবোল্॥
বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক ঘরে-ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজ-কর্ম চুলোতে যাক—
কেজো-লোক সব আয়-রে ধেয়ে
হরিবোল্, হরিবোল্॥
রাজা-প্রজা হবে জড়ো থাকবে না আর ছোটোবড়ো,
একই স্রোতের মুখে ভাসবে সুখে
বৈতরণীর নদী বেয়ে।
হরিবোল, হরিবোল॥

প্রহরী। (জেলের ভিতর দিকে জেলর-প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিত করিয়া জনতাকে) চুপ চুপ !—এখনই সব কর্তাদের কানে যাবে-যে !—মুশ্‌কিলে পড়বে। তোমরা মিছে—(বলিতে-বলিতে সহকর্মী-সহ জেলরের প্রবেশ)

মাধব। 'বন্দেমাতরম্' (সকলের সমধ্বনি)

(পুলিসের প্রবেশ। কিশোর ও মাধবকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া প্রস্থান)

জেলর। কী হয়েছে ? এত ব্যস্ত কিসের ? কী তোদের অভিপ্রায় ?

বুড়ো মজুর। আমরা আর তো কিছু চাই-নে, যে-গারদে বাবা আছেন আমরাও সেখানে থাকতে চাই।

জেলর। ওরে 'চাই' বললেই হবে, এমন দেশ এ নয়। (একটু ভাবিয়া লইয়া) আচ্ছা, শোন্, আমি বলি—তোরা যদি দেরি না ক'রে এখনই চলে যাস তাহলে আমি নিজে—("বুঝেছ হে" বলিয়া সহকর্মীর প্রতি বিশেষ ধাপ্পা-ব্যঞ্জক-দৃষ্টিতে) মহারাজের কাছে দরবার করব। বুঝলে ? নিজেই গিয়ে দরবার করব।

বুড়ো মজুর। (দমিয়া গিয়া হতাশভাবে) আচ্ছা, আমরা শুধু দেখেই চলে যাব—তাঁকে না-দেখে আমরা কিছুতেই যাব না।

জেলর। প্রহরী, ওদের দুজনকে নিয়ে এসো।

(প্রহরীরা রানী ও ব্রতীন্দ্রকে বন্দী-অবস্থায় ফটকের ভিতরে নিয়া আসিল)

বুড়ো মজুর। (ফটকের বাহির হইতে) ঠাকুর, তোমার দুঃখে আমাদের কলিজা জ্বলে গেল। এ রাজ্যে কেউ আমাদের দিকে মুখ তুলে চায়-নি। —তুমি ছাড়া !

জেলর। (ব্রতীন্দ্রকে শ্লেষের সুরে) ও-ঠাকুর, তোমাদের রাজা কোথায় গেল ? সে-ব্যক্তি যে অসহ্য হয়ে উঠেছে ! সত্য ক'রে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য ?

ব্রতীন্দ্র। কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা ব'লে মনে করে—কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ-মানুষের মতো।

জেলর। বলো কী ? নিতান্তই সাধারণ-মানুষ ? নাম কী। তা, উনি কোন্ রাজগৃহে—

ব্রতীন্দ্র। ইনি যে-রাজগৃহে জন্মেছেন সে-গৃহে জগতের অনেক বড়ো-বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন— পুরাণ-ইতিহাস খুঁজে সে আমি পরে দেখিয়ে দেব।

জেলর। তুমি কে ?

ব্রতীন্দ্র। আমি তাঁর সেনাপতিদের একজন।

জেলর। সেনাপতি ? ভয় দেখাতে এসেছ ?

ব্রতীন্দ্র। আমাকেই আজ তিনি সেনাপতির বেশ পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন—বড়ো-বড়ো বীরদের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন।

জেলর। (হাস্য) আচ্ছা, উপযুক্ত-সমারোহে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব, তবে সভায় নয়—(গম্ভীর-ভাবে) রণক্ষেত্রে। কিন্তু, তোমাদের—

ব্রতীন্দ্র। সত্যি বলি, ওই কিন্তু-টি কিন্তু দেখা দেন না, কিন্তু ওঁর কাছে থেকে নিরাপদে পালাবার জায়গা কোথাও নেই।

জেলর। কে—কে-সে ?

একজন মেয়ে। (সঙ্গিনীদের প্রতি) যা বলিস ভাই, আজকের দিনটাতে আমাদের রাজার দেখা দেওয়া উচিত ছিল। একদিনও তাঁকে দেখলুম না, এ কি কম দুঃখের কথা ?

অন্য-মজুর। সবাই শুধোয়,—সবই দেখছি, রাজা দেখি-নে কেন ? কাউকে জবাব দিতে পারি-নে !

ব্রতীন্দ্র। আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়।

জেলর। তিনি মানুষটি কী-রকম, সেই জন্যেই আরো দেখতে ইচ্ছে করে।

ব্রতীন্দ্র। তিনি শুধু একজন কবি !

জেলর। (বিস্ময়ে) কবি ! কী বলছ ?—তিনি কবি ?

ব্রতীন্দ্র। এইসব প্রজারা তাঁকে মহারাজ ব'লেই জানে। কাব্য দেখে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো। আজ কবি রণক্ষেত্রে। কবি তোমার নামে যে গান বেঁধেছে, শোনো-নি বুঝি ? সে-যে ঘরে-ঘরে রটে গেছে।

জেলর। (ভীতিমিশ্র সাগ্রহে দৃষ্টিতে) তাই নাকি—বটে ?—কোথায় সে ?

ব্রতীন্দ্র। (দৃঢ়স্বরে) তিনি এসেছেন। (প্রহরীদের সতর্ক হইয়া দাঁড়ানো) (জেল দেখাইয়া) এসেছেন একেবারে জেলের মধ্যে !—ওই অচলায়তনে। অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফুটো ক'রে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়ায়ের ঝোড়ো-হাওয়া এনে দিয়েছি।

(প্রহরী ও জেলর প্রভৃতির উদ্‌ব্যস্তভাবে এদিকে-ওদিকে তাকানো। সবাই চুপচাপ। মজুর-দলেও পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি)

ব্রতীন্দ্র। (মজুর-দলকে) কবির সেই গানটা-তো জানিস—"আমরা সবাই রাজা" !—(তন্ময়ভাবে উক্তি) এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে-সুরে বেজে উঠেছে। গানের পর গান—গানের মধ্যেই তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো

ধুলোয় এসেছেন।—কে বললে তিনি নেই? বুঝতে পারছিস-নে, তিনি লুকিয়ে এসেছেন।—যে-সব খবরকে কোনো ভাষা দিয়ে বলা যায় না, কবি সেই-সব খবরকেই গানের মধ্যে, কতকটা কথায় কতকটা সুরে বেঁধে গাইতে থাকে, গেয়ে চলে মানুষের সেই অনাদি দুঃখ অনন্ত, সুখের কথা। রাজ্যের রাজা, দীন-দুঃখী প্রজা—তাঁর গান সকলেরই মুখে। দেশের চতুর্দিকে গান উচ্ছ্বসিত। আমরা গান গাই,—গেয়ে সকলকে বশ করি। কবির একটি অন্তরের কথা আছে। তিনি বলছেন—

জেলর। কী বলছেন শুনি?

ব্রতীন্দ্র। তিনি বলছেন,—"যে যেখানে ছড়িয়ে আছে, সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।" হার মানলে চলবে না! আজ সব রাস্তাই গানে-গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

জেলর। কবি? (ভাবিত) ঠিক। জানো তুমি? কোথাকার, কে সে কবি?

মজুর-দল। কে সে? (অনুমানে)—দাদাঠাকুর? (কেহ কেহ কৌতূহলে) আমাদের রাজা?

ব্রতীন্দ্র। কবি, তিনি আমাদের গুরু, আমাদের প্রভু, আমাদের রাজা। ওকে রাজা বলতে যাই, বন্ধু ব'লে ফেলি! হৃদয়ের ঈশ্বর, তিনি যে আমাদের হৃদয়ের সকল অভাব মোচন করেন!

(প্রথমে ব্রতীন্দ্র, পরে তাহার অনুসরণে মজুর-দল)

গান

এই একলা মোদের হাজার মানুষ—দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মজার মানুষ—দাদাঠাকুর।
সব মিলনে মেলার মানুষ—দাদাঠাকুর।
এই তো ঘরে-ঘরে এই তো বাহির করে,
এই আমাদের কোণের মানুষ—দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মনের মানুষ—দাদাঠাকুর॥

জেলর। লোকটা পাগল নাকি? কথা ভারি এলোমেলো।—বোঝাই যায় না।

সহকর্মী। কথা যত কম বোঝা যায় অবুঝরা ততই ভক্তি করে।

জেলর। কিন্তু আমাদের কাছে সে-ফন্দী খাটবে না-তো! আমরা স্পষ্ট কথার কারবারী।

ব্রতীন্দ্র। যে আজ্ঞে, চুপ করলুম।

জেলর। তুমি তো এই দেশের লোক। তোমাদের রাজার দেখা কোথায় পাব? পথ নিশ্চয় জানো, তোমাকে বলতেই হবে। নইলে তোমাকে দু'টুকরো ক'রে কেটে ফেলব। (ভীতি-প্রদর্শন)

ব্রতীন্দ্র। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ-বেরোবার উপায় হবে না হুজুর। (জেলরের ভ্রুকুটি-প্রদর্শন)

জেলর। (ব্রতীন্দ্রকে) যারা তোমার পিছে-পিছে ঘুরত তাদের দেখছি-নে বড়ো?

ব্রতীন্দ্র। ছেলেদের দল? তারা এবার লড়াইয়ে মরেছে।

জেলরের সহকর্মী। অ্যাঁ!—তারা সবাই মরেছে?

ব্রতীন্দ্র। হ্যাঁ,—তারা যে আমাকে বললে—[এস্থলে ছায়াছবির 'ফ্ল্যাশ-ব্যাক্' পদ্ধতিতে পশ্চাৎ-পটে প্রদর্শিত হইবে বিলাতীবস্ত্রের বহ্নি-উৎসবে 'স্বদেশী'-অনুরাগী জনতা বস্ত্রাদি একে-একে আহুতি দিতেছে। ব্রতীন্দ্র তাহাদের মধ্যে থাকিয়া গাহিতেছে—

গান

চিরদিন আছি ভিখারীর মতো জগতের পথপাশে,
যারা চলে যায় কৃপা-চক্ষে চায়—পদধুলা উড়ে আসে।
ধূলি-শয্যা ছাড়ি ওঠো ওঠো সবে মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার চেয়ে দেখো তবে—ওই আছে রসাতল ভাই॥
প'ড়ে-থাকা-পিছে মরে-থাকা মিছে! বেঁচে-ম'রে কিবা ফল ভাই?
আগে চল্ আগে চল্ ভাই॥

—এই সময়ে ব্রতীবালক-দল জনতার মধ্য হইতে মার্চ করিয়া ব্রতীন্দ্রের কাছে আসিয়া বলিল—

ব্রতীবালক-দল। (ব্রতীন্দ্রকে) পণ্ডিতেরা যা বলে আমরা কিছুই বুঝতে পারি-নে, তুমি-যে গান গাও তার সঙ্গেও গলা মেশাতে পারি-নে। কিন্তু, একটা কাজ আমরা করতে পারি, আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও] "জীবনটা সার্থক ক'রে আসি"—এই ছিল সেদিন তাদের শেষ-কথা। তা, যেমন কথা তেমনি কাজ। সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়াল, সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে। [ছায়াছবিতে পশ্চাৎপটে রণাঙ্গণের দৃশ্যে দেখা গেল—দুই পক্ষে, পুলিস ও ব্রতীবালক-সহ স্বদেশীদলে মিলিয়া সংঘর্ষ চলিতেছে। শ্রেণীবদ্ধ-পুলিসের উপর্যুপরি গুলিতে শ্রেণীবদ্ধ-ব্রতীবালক ও জনতা নিহত হইয়া একে-একে ধূলিস্মাৎ হইতেছে। সব-স্বদেশীদের এভাবে মারিয়া ফেলিয়া পুলিসদল চলিয়া গেল]

ব্রতীন্দ্র ও জনতা। গান

যিনি সকল কাজের কাজী, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর নানা রঙের রঙ্গ, মোরা
তাঁরি রসের রঙ্গী॥
তাঁরি বিপুল ছন্দে-ছন্দে মোরা যাই চ'লে আনন্দে
তিনি যেমনি বাজান ভেরী মোদের
তেমনি নাচের ভঙ্গী॥
এই জন্ম-মরণ খেলায় মোরা মিলি তাঁরি মেলায়
এই দুঃখ-সুখের জীবন মোদের
তাঁরি খেলার অঙ্গী।
ওরে ডাকেন তিনি যবে তাঁর জলদ্-মন্দ্র রবে,
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দ'লে,
সাগর-গিরি লঙ্ঘি'॥

সহকর্মী। (বিস্ময়ে) এ কী! গান? হ্যাঁ, গানই বটে! তাই-তো!

জেলর। (উপস্থিত-বস্তীবাসীদলকে দেখাইয়া, ব্রতীন্দ্রকে) এখন এই দল নিয়ে কী লীলাটা চলছে?

ব্রতীন্দ্র। রাজকার্যে ছোটোদেরও অবজ্ঞা করতে নেই। অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড়ো হয়ে ওঠে।

জেলর। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না।

বুড়ো মজুর। (ব্রতীন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া জেলরকে) আমাদের ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে যাবে তো? (সক্রোধে) যাবে কি যাবে না?—সত্যি ক'রে বলো?

মেয়েরা। (রানীকে দেখাইয়া দিয়া জেলরকে) ঐ সঙ্গে ঐ মা-কেও নিয়ে যাবে তো?

জেলর। চেষ্টা করব। ("কী বলো!" বলিয়া সঙ্গীর দিকে বিশেষ-ধাপ্পা-ব্যঞ্জক কটাক্ষ) কিন্তু, আর দেরী না। এই মুহূর্তে তোরা এখান থেকে বিদায় হ।

মজুর-দল। আচ্ছা, আমরা বিদায় হলুম। (মজুরদের প্রস্থান)

জেলর। (ব্রতীন্দ্রকে ঠাট্টার ছলে) এতক্ষণ কী বলছিলে?—সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে? আবার বললে—"রাজা আমাদের আহ্বান করেছেন,"—সে

সবই তো বোঝা গেল,—এবার রাজার আহ্বানের কারণ কী, সেটুকু খুলে বলো দেখি ?

ব্রতীন্দ্র। ঐ-টে বলতে পারলুম না। ঐ-টে আমায় কেউ বুঝিয়ে বলেনি।

সহকর্মী। তুমি বড়ো কঠিন স্থানে এসেছ—কথা গোপন করো-তো বিপদে পড়বে।

জেলর। (ব্রতীন্দ্রকে) যা জানো বলে ফেলো।

ব্রতীন্দ্র। রাগ কোরো না। সকল জিনিসেরই কি কারণ থাকে ? যদি-বা থাকে তো সকল লোকে কি টের পায় ? যারা পরামর্শ করে সেটা কেবল তারাই জানে। তা, অধিক ভেবো না,—বোধ করি, কারণটা অবিলম্বেই টের পাবে।

সহকর্মী। কাকে-কাকে নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছ ?

ব্রতীন্দ্র। যেখানে যে আছে!—সকলকেই ডাক পড়েছে। কেউ বাদ যাবে না।

জেলর। যাও ঠাকুর। (জেলরের নির্দেশে প্রহরীরা ব্রতীন্দ্রকে লইয়া জেলের ভিতরে চলিয়া গেল। সহকর্মীকে) সমস্ত অবস্থা বুঝলে তো ? কর্তাদের কাছে শীঘ্র একটা লোক পাঠাও। বোলো, অবিলম্বে সকলে একত্রে মিলে একটা পরামর্শ করা আবশ্যক।

সহকর্মী। যে আজ্ঞে। (জেলর ও সহকর্মীর জেলের ভিতরে প্রবেশ। জেলের ভিতর হইতে ব্রতীন্দ্রের কণ্ঠে গীত হইতে লাগিল)

ব্রতীন্দ্র। (নেপথ্যে) গান

তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই,
সেই মনোহরণ চপল-চরণ সোনার হরিণ চাই ॥
সে যে চম্‌কে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় যায় না তারে বাঁধা,
তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে লাগায় চোখে ধাঁধা,
তবু ছুটব পিছে মিছে-মিছে পাই-বা নাহি পাই,
আমি আপন মনে মাঠে-বনে উধাও হয়ে ধাই ॥
তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস রাখিস ঘরে ভ'রে,
যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া লাগল কেন মোর ?
আমার যা-ছিল তা দিলেম কোথা যা-নেই তারি ঝোঁকে,
আমার ফুরোয় পুঁজি ভাবিস বুঝি মরি তাহার শোকে !
ওরে আছি সুখে হাস্যমুখে দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন মনে মাঠে-বনে উধাও হয়ে ধাই ॥

(আবার গান)

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে
তারে আজ থামায় কে রে।
সে-যে আকাশ পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে॥
ওরে ভাই নাচ্‌রে ও ভাই নাচ্‌ রে
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌-রে—
লাজ-ভয় ঘুচিয়ে দে-রে।
তোরে আজ থামায় কে রে॥

রানী। (নেপথ্যে) গান

যা হবার তা হবে।
যে আমারে কাঁদায়, সে কি অমনি ব'সে র'বে॥
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে
পথ যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায়, সেই তো ঘরে লবে॥

(ফটকের সম্মুখে বন্দুক-ঘাড়ে প্রহরীর যথাপূর্ব পায়চারি : মাঝে-মাঝে উৎকর্ণ হইয়া নেপথ্যের গান-শোনা)

দৃশ্য ৪

[কলিকাতা। গুপ্তগৃহ]

(একটি কক্ষে আনন্দমোহন ও বিশ্ববান্ধবের কথোপকথন)

বিশ্ববান্ধব। ব্যাপারখানা কী? হঠাৎ যে ডাক পড়ল?

আনন্দমোহন। অস্ত্রশালার মধ্যে একটি জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন। তিনি বায়ু-অস্ত্র, না, নাগপাশ, না কী, সেটা সন্ধান নেওয়া উচিত।

বিশ্ববান্ধব। কলিযুগেও এমন ব্যাপার ঘটে নাকি?

আনন্দমোহন। আজ্ঞে, কলিযুগেই ঘটে, সত্য-যুগে নয়। কাছে গেলেই সমস্ত বুঝতে পারবেন।

বিশ্ববান্ধব। (কৌতূহলী হইয়া কাছে যাইতেই) এ কী!—(বিস্ময়ে হতবাক্ হওয়া। অদূরে কক্ষের মাঝামাঝি-টাঙানো পর্দা সরাইতেই দেখা গেল—ভিতরে খাটুলির উপরে বিশু শয়ান। বোমা-বিস্ফোরণে তাহার চোখ-মুখ ঝল্‌সানো। বিছানার দুইপাশে আনন্দমোহন ও বিশ্ববান্ধব অবাক হইয়া বিষণ্ণ-মুখে ঝুঁকিয়া বিশুকে দেখিতে লাগিলেন)

বিশু। (জ্ঞানে ও অজ্ঞানে মাঝে-মাঝে যন্ত্রণায়-কাতরানো ও ভুল-বকা) তামাশা ক'রে....আমাকে এখানে বন্ধ ক'রে রেখে....মজা দেখা হচ্ছে?

বিশ্ববান্ধব। এ ঘরটা তো তামাশার ঘর নয়, এখানকার তামাশা যে ভয়ঙ্কর তামাশা! এখানে তোমার আগমন হল কী ক'রে?

বিশু। (ভুল-বকা) আজ রাত্রে শিকারে যাব...অস্ত্র খুঁজতে এসেছিলাম।.. অন্ধকার ঘর এই বারুদের ভাণ্ডারে দেশলাই জ্বালতেই অগ্নিকাণ্ড। আগুন ধ'রে উঠ্‌বে মনেও করিনি ..বেরোবার পথ শীঘ্র ব'লে দাও—রক্ষা করো রক্ষা করো, চারদিক আগুনে ঘিরেছে।—মরে গেলুম! (ভয়ে-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করা)

(বীরেনের প্রবেশ)

বীরেন। (ব্যঙ্গস্বরে) কেন? আরো যাও! ভিতরে ঢুকে পড়োগে'।—(বলিতে বলিতে বীরেন আসিয়া বিশুর বিছানার পাশে দাঁড়াইল)

বিশ্ববান্ধব। (ঔৎসুক্যের সঙ্গে তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন) ব্যাপার কী?

বীরেন। (বিশুকে দেখাইয়া আনন্দমোহন ও বিশ্ববান্ধবকে বলিল) লোকটা আজ আশেপাশে সন্ধান নিয়ে ফিরছিল। আমাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কত কথাই-না জিজ্ঞেস করলে। আমি তেমনি বোকা আর-কি? আমিও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জবাব দিতে লাগলাম। অনেক খোঁজ ক'রে শেষকালে চলে গেল। (বিশুকে) তুমি মনে করেছ, তোমার ছদ্মবেশ আমার কাছে ধরা পড়ে-নি? তোমাকে তো বাবা, বিলক্ষণ চিনি! তোমার উপর বিশ্বাস কী-রকম সে তো তুমি জানোই। তুমি যদি পায়ে ধরতে যাও তাহলেও সন্দেহ হয়,—নিশ্চয় জুতোজোড়াটা তোমার সরাবার মতলব আছে।

বিশ্ববান্ধব। এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে। বলো-তো কী হয়েছে?

বীরেন। ও যে শত্রুচর। এখানে খানাতল্লাস করতে এসেছে। পুলিসের হাতে আমাদের সমর্পণ করবার উদ্যোগ চলছে।

বিশু। আসছে! রাজার সৈন্য আসছে! ঐ-তো আমাদের সব-দল-বল। দেখবে তখন পাণ্টা সাজা!

আনন্দমোহন। (বিশ্ববান্ধবকে) আমাদের উপর পুলিসের দৃষ্টি পড়েছে, কী ফ্যাসাদ ঘটবে বলা যায় না।

বিশু। (ক্লিষ্ট-স্বরে) জ—ল, একটু জ—ল।

(আনন্দমোহন এদিকে-ওদিকে খুঁজিয়া একটা ঘটি হইতে বিশুর মুখে জল ঢালিতে গেল)

বিশু। হিন্দুর পানীয়? (আনন্দমোহন মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে 'হ্যাঁ' বলিয়া বুঝাইলে বিশু জল পান করিল)

বিশ্ববান্ধব। (আনন্দমোহনকে) এর কি মা-বাপ নেই?

আনন্দমোহন। আছে, না-থাকারই মতো।

বিশ্ববান্ধব। সে কী-রকম?

আনন্দমোহন। পুলিসের উৎপাত চলছিল পাড়ায়-পাড়ায়। তাতে গ্রামের বহুলোক হয় পলাতক। (বিশুকে দেখাইয়া) শহরে পালিয়ে এসেছে—এ-ও সেই গ্রামেরই লোক। গোটা-পরিবারটা আজ নিরন্ন। লোকটা পেটের জ্বালায় হয়েছে গুপ্তচর। ছোটো একটি ভাই ওর ছিল, গোলেমালে সেও যে সেই নিরুদ্দেশ হল,—গ্রামের লোকরা আর তাকে দেখে নাই।

বিশু। (আনন্দমোহনের দিকে চাহিয়া ভুল-বকা) কে তুমি? দরোগা বুঝি? চরে যে উৎপাত করছ সমস্ত খবর নিয়েছি। যদি সাবধান না হও তাহলে…। সাহেবদের গোমস্তা-গিরি করে খাই—(কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর) কে? দোকানী? পয়সা চাই?—পয়সা তো আর নেই। কাপড়ের দাম? কার কাপড়ের দাম? পেটের জ্বালায় মরছি। দাদা, তুমি কী তা বুঝবে? খিদে পেলে মানুষের কী-রকম হয়! (হঠাৎ উত্তেজিত ও ভীতস্বরে) পুলিস? এবারে পুলিস আসছে? পালাতে হবে? (চীৎকার করিয়া) সবাই পালিয়েছে? (ভাবান্তর) রাগ কোরো না দাদা, তুমি যে পুলিসের দারোগা। তোমাকে যমের পেয়াদা বললে কি গাল দেওয়া হয়? তা, দেখো বাঘ মানুষ মেরে খায়, সে বোষ্টম নয়, সে তো জানা-কথা। কী করবে? তাকে যে খেতে হবে। তাই দেখো-না—আমি গুপ্তচর, গোয়েন্দা! চক্রান্ত ক'রে ডেকে এনে স্বদেশীদের বিরুদ্ধে সরকারকে সাক্ষী জোগাড় করে দিয়েছি। একমুঠো খেতে হবে যে! এতদিন কোনো-প্রকারে টিঁকে ছিলুম, আর টিঁকতে পারব না। ভাই—ভাই আমার! চাই সন্ধান!—কিন্তু তার সন্ধান কি আর মিলবে? (অত্যধিক উত্তেজনায় চোখ-মুখ কপালে তুলিয়া হাঁপাইতে লাগিল। আনন্দমোহন ও বিশ্ববান্ধব ঝুঁকিয়া পড়িয়া একজন বিশুর বুকে হাত বুলাইতে লাগিল, অন্যজন চোখে-মুখে জল

দিতে লাগিল। আবার ভুল-বকা ও যন্ত্রণায়-কাত্‌রানো) আমি পাপ করেছি। ওগো, আমি যে পাপ করেছি!

বিশ্ববান্ধব। ভয় নেই, তোমার কোনো ভয় নেই। কী করেছ?

বিশু। সে আমি বলতে পারব না। ভয়ানক পাপ।

বিশ্ববান্ধব। সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তোমার হয়ে আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব। (বিশুর মাথায় হাত-বুলানো)। তোমার কোনো ভয় নেই ভাই।

বিশু। আমি উত্তরদিকের—

বিশ্ববান্ধব। উত্তরদিকের?

বিশু। হাঁ, উত্তরদিকের জানালায়—

বিশ্ববান্ধব। জানালায় কী?

বিশু। জানালায়,—দেখে ফেলেছি!

বিশ্ববান্ধব। দেখে ফেলে?—কী করলে?

বিশু। একবার দেখেই তখনই বন্ধ ক'রে ফেলেছি। দেখলুম চ—বনের মধ্যে পোড়ো-মন্দিরে!—এর পরেই যে নামল বজ্র! ওই আবার বজ্র—পাষাণের বেড়া বিদীর্ণ হয়ে গেল, সমস্ত যে ভেঙে-চুরে একাকার হল—বজ্রের পর বজ্র—দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে। (উত্তেজনায় মাথা উঠাইতে গিয়া) উঃ!—হারু, হারু! সঙ্গীটির চিহ্ন-ও যে দেখতে পাচ্ছি-নে! বজ্রের পর বজ্র!—দগ্ধ করে দিলে, সব দগ্ধ করে দিলে! হারু! হারু!—বেচারা! (সরহস্যে)—গোড়া ঘেঁসে লাগাল কোপ,—বেচারার হল আদি অন্ত লোপ!—বাজের ঘায়ে সেদিন বেচারা সেখানেই লোপাট হয়ে গেল! (ত্রাস, রহস্য ও সমবেদনার উচ্ছ্বাসে কথাগুলি বলিয়া বিশু সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেল। বিশ্ববান্ধব তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বিশুর মাথা কোলে লইয়া বসিল)

আনন্দমোহন। (বিশ্ববান্ধবকে) সেই—বোমা। সেই-যে পোড়ো-মন্দিরের ব্যাপারটা

বিশ্ববান্ধব। কী মূঢ়তা, আর তার কী ভয়ানক শাস্তি।

বিশু। (বিশ্ববান্ধবের দিকে চাহিয়া আবার ভুল-বকা-শুরু) গায়ে হাত দিয়ো না। ভালো হবে না বলছি। আমি ভদ্রলোক। উঃ,—করো কী? লাগে যে! বাবা, আজ সমস্ত দিন কেবল মুড়ি খেয়ে আছি। (আনন্দমোহনকে) পেয়াদা-বাবা, বরঞ্চ কিছু জলপানি নাও; হায় হায়, একটি পয়সাও নেই। দাদা, বয়স হয়ে গেছে—লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে ভালো লাগে না। (বিশ্ববান্ধবকে)

দারোগা সাহেব, যদি চোর ধরতে চাও, চলো, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ও কী ও। ধ'রে টেনো না। এ কী—একী!—ঘর-ভরা অন্ধকার—বজ্রের শব্দ—আবার শব্দ! সে আর থামে না যে! (আবার হতচেতন)

(উত্তেজিত ও ব্যস্তভাবে অরুণ ও কুমারের প্রবেশ)

বিশ্ববান্ধব। (কুমার ও অরুণকে) তোমরা এত ব্যস্ত কেন?

কুমার। খবর এল, শত্রুসৈন্য আসছে যে! (ক্রোধে চোখ-পাকাইয়া ছোরা উঁচাইয়া বিশুকে) আমাদের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তাহলে—(অরুণকে) শুনছ? ওই শুনছ?

বীরেন। দূরে থেকে নানাপ্রকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

কুমার। (আরো উত্তেজিত হইয়া বিশুকে দেখাইয়া) তোমরা ধরো, ওকে বলি দেব।

অরুণ।—হাঁ, বলি দেব!

বিশ্ববান্ধব। (বিস্ময়ে) বলি দেবে? বলছ কী?

কুমার। (হতবিহ্বল হইয়া) ও-কে কি কোনো শাস্তি দেব না?

বিশ্ববান্ধব। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে, সেখানে তোমাদের—(ক্ষীণ হাসিয়া কুমারের হাতের ছোরা দেখাইয়া) ঐ ছোরা-তলোয়ার কিছুই পৌঁছয় না। (কর্মীদের কাছে আগাইয়া একটু ঝুঁকিয়া দেখিয়া লইল)

বীরেন। খতম্। (মুখ-বিকৃতির ভাবেই বোঝা গেল—বিশু মৃত; অগত্যা সকলে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল)

বিশ্ববান্ধব। (কর্মীদ্বয়কে ব্যথিত ও গম্ভীরভাবে) দেখো, অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠছে, কাউকে বলতে পারছি-নে। মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখতে পারছি-নে। সে কেবলই বলে উঠছে—বৃথা-বৃথা—সমস্তই বৃথা।

আনন্দমোহন। বলেন কী! বৃথা? সমস্তই কি বৃথা? কেন হঠাৎ মন এমন উদ্‌ভ্রান্ত হল?

বিশ্ববান্ধব। (বিশুকে দেখাইয়া কর্মীদ্বয়কে) তাই কেবলি ভাবছি—মূঢ়তা যে কত বড়ো আর এর শাস্তি যে কতখানি! শুধু কি এ-ই? সমস্ত জাতটা-ই যে মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে আছে। চারদিকে হীনতার আকর্ষণ। লোক নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে কী ক'রে?—বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। তোমরা আছ নিজেদের ভদ্রতা আর শিক্ষার অভিমান নিয়ে।—সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দিব্য নিশ্চিন্ত

হয়ে তোমরা থাকতে পারো—এটা আমি বারম্বার দেখেছি,—বারম্বার দেখেছি ব'লেই তোমাদের আমি সাবধান করে দিতে চাই যে, নীচের লোকদের নিষ্কৃতি না দিলে কখনোই তোমাদের যথার্থ নিষ্কৃতি নেই।

কুমার। (বিশ্ববান্ধবকে) না, এ আমি কিছুতেই সহজে সহ্য করতে পারব না। (বিশুকে দেখাইয়া) ওই যে—ভূত এসে পুলিসে ধরিয়ে দিতে গিয়ে চ-কে মেরে গেছে তার মার আমাকে লাগছে। আমার সমস্ত দেশকে লাগছে।

বিশ্ববান্ধব। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তুমি মনে-মনে কী ভাবছ। তুমি ভাবছ—এর প্রতিকার নেই। তুমি ভাবছ—এই যে অভাব, ভয় এবং মিথ্যা-চক্রান্ত—সমস্ত ভারতবর্ষকে চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এ-কে ঠেলে ফেলতে পারবে কে ? কিন্তু আমি এ-রকম ক'রে ভাবতে পারি-নে। যা-কিছু আমার দেশকে আঘাত করছে তার প্রতিকার আছেই,—তা সে, যত-বড়ো প্রবল হোক !—প্রতিকার তার আছে. আর, একমাত্র আমাদের নিজেদের হাতেই তার প্রতিকার আছে।

কুমার। এত-বড়ো দেশজোড়া প্রকাণ্ড দুর্গতির সামনে বিশ্বাসকে খাড়া ক'রে রাখতে আমার সাহসই হয় না।

বিশ্ববান্ধব। অন্ধকার প্রকাণ্ড আর প্রদীপের শিখা ছোটো। সেই এত বড়ো অন্ধকারের চেয়ে এতটুকু শিখার উপরে আমি বেশী আস্থা রাখি। দুর্গতি চিরস্থায়ী হ'তে পারে, একথা আমি কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারি-নে। মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যার দ্বারা। আর, ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যাকে ভঙ্গ করে।

কুমার। (বিশ্ববান্ধবকে) নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।

বীরেন। (বিশ্ববান্ধবকে) এ-সব আপনি কী বলছেন। পরমাত্মা যে বলহীনের কাছে প্রকাশই পান না ?

আনন্দমোহন। (বিশ্ববান্ধবকে) শক্তির প্রথম-জাগরণে মত্ততা থাকেই, তার বেগ তার দুঃখ, তার ক্ষতি আমাদের সকলকেই সহ্য করতেই হবে। সেই সমুদ্রমন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে।

বিশ্ববান্ধব। কিন্তু—তা'বলে অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধার ? এ নীতি অবলম্বন করলে কাজ আমরা অল্পই পাই ; যদি অন্যায়কে-ও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কা'কে কোন্‌খানে ঠেকাব ? চারদিকে দেখা দিচ্ছে একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতা।—দেশের কল্যাণময় চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করছে। এমন সময় যজ্ঞক্ষেত্রে এ কিনা হচ্ছে রক্ত-বৃষ্টি ? (বিশুকে দেখাইয়া) যাক্, সময় তো হয়েছে। (সহসা বিশুর দেহ নড়িয়া উঠিল—মুখ উঁচাইয়া সে বলিয়া উঠিল—)

বিশু। (স্বগত-প্রলাপে) কুমার, ভাই!—এখনো তোমার রাগ গেল না? (কুমার সে-কথা শুনিবামাত্র বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ফিরিয়া বিশুর মুখের দিকে নত হইয়া ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল) সেই চোখ, সেই নাক,—মুখ গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা; তবে কি ছদ্মবেশী। (অরুণ বিশুর হাতের দিকে চাহিয়া হঠাৎ হাতটা তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিল)

অরুণ। হাতে আংটি যে!

কুমার। (ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দারুণ-ঔৎসুক্যে অরুণকে) কই, দেখি-দেখি,—আংটি? (বিশুর হাতের আংটি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিতে-দেখিতে হঠাৎ খুলিয়া নিয়া চোখের সামনে ধরিয়া) বি!–বিশু? তবে, যা ভেবেছিলাম—(হঠাৎ চীৎকারে) দাদা, দাদা- (বিশুর পায়ের উপরে মাথা-গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল)

বিশু। (চীৎকার-শব্দে হঠাৎ সজ্ঞানে) কুমার, কুমার, ছোটো-ভাইটি আমার! —আঃ বাঁচলুম ভাই। তুমি আসবে জেনেই এত দেরি ক'রে বেঁচে ছিলুম। তুমি অভিমান ক'রে চলে গিয়েছিলে ব'লেই আমি যেতে পাচ্ছিলুম না। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে ভাই। মা যে কোল পেতেছেন। মা, মা—আঃ, কী শান্তি!

কুমার। দাদা, মার্জনা করলে কি?

বিশু। সমস্তই, সমস্তই। এখানকার যা-কিছু-ছিল এই রক্ত দিয়ে মার্জনা করে গেলুম। কিছুই বাকি রাখিনি। (আবার ভুল-বকা) ঐ যে, শোনো··· রাখীবন্ধন অরন্ধন–ভাই-ভাই এক ঠাঁই—বন্দেমাতরম্! ভা-ই, সা···ব····ধা·· ন! —সৈন্য আ-স-ছে! (বিশু কাৎ হইয়া বিছানায় পড়িয়া গিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল)

কুমার। হায়, হায়, এ কী প্রতিশোধ! (কুমার ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, অন্য সকলে স্তব্ধ হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল)

বিশু। (ভুল-বকা) আমি শুনে হাসি আঁখি-জলে ভাসি
এই ছিল মোর ঘটে।
তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ
আমি আজ চোর বটে।

বিশু। আমি আজ চো-র ব-টে! চোরই ব টে! (কপালে করাঘাত) কান পাতো,—শোনো-দেখি,—কে ডাকছে-না? বাবা-বাবা! ডাকছে-না? ও, কার কান্না?

কুমার। দাদা!

বিশু। চুপ। সবাই যে শুনতে পাবে। ভাই,—এখন থেকে বাড়িতে থাকবে তো? আমার অধিক কিছুই নাই। আজ আমি সমস্তই তোমার হাতে—

কুমার। (সান্ত্বনার সুরে) আচ্ছা। বাড়িতেই থাকব দাদা।

বিশু। এবার তবে ঘুমুই। (নিদ্রায় অভিভূত-হওয়া)

বিশ্ববান্ধব। (সকলকে) চলো, ওকে একটু বিশ্রাম দেবে না?

আনন্দমোহন। চলুন। (অন্যান্যদের প্রস্থান। কুমার বিশুর পায়ে চাদর-ঢাকা দিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল, ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। বাঁ-হাতে ছোটো একটি মশাল ও ডান-হাতে পিস্তল লইয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া অতি সন্তর্পণে ভয়াবহ দৃঢ়-মুখভাবে বিনির প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়াই চাপাকণ্ঠে কুমার—)

কুমার। কে? বিনি? হাতে কী রয়েছে?

বিনি। (বিশুকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া চাপাকণ্ঠে) গুপ্তচর! ও যে গুপ্তচর! এখানে এইবেলা! খুন, ওকে খুনই করব। (বলিয়া গুলি করিবার উপক্রম করিতেই)

কুমার। (দুইহাত তুলিয়া —না-না-না। (বলিয়া মানা করিতে-করিতে ছুটিয়া বিনির কাছে চলিয়া আসিল এবং মুখে আঙুল রাখিয়া চাপাকণ্ঠে বলিল) চুপ।

বিনি। কেন, চুপ কেন? (স্তব্ধ-থাকা)

কুমার। (আঙুল দিয়া বিশুকে দেখাইয়া পুনরায় নিজেকে দেখাইয়া) ও যে দাদা,—আমার আপন দাদা! (দুই-হাতে মুখ ঢাকা দিয়া বিশুর বিছানার পাশে গিয়া বসিয়া-পড়া)

বিনি। দাদা? (বলিয়া বিস্ময়ে তাড়াতাড়ি পিস্তল শাড়ির ভাঁজে লুকাইয়া লইয়া কুমারের কাঁধে হাত রাখিয়া) হায় ভগবান! (বলিয়া শোক ও অনুশোচনার উচ্ছ্বাসে চাপা-ক্রন্দনাবেগে বিনিরও নতমস্তকে ক্রমশ আরো কুমারের পাশে-ঘেঁসিয়া বসা। বাতাসে মশাল নিভ-নিভ। ঘর অন্ধকার হইয়া-আসা।)

দৃশ্য ৫

[কলিকাতা। জেল-প্রাঙ্গণ]

(নেপথ্যে, চারিদিক হইতে ব্রতীন্দ্র, রানী, রুক্মিণী, মাধব, কিশোর ও কয়েদীদের সমবেত-সংগীত)

গান

আর নহে আর নয়, আমি করি-নে আর ভয়।
আমার ঘুচল বাঁধন ফলল সাধন হল বাঁধন ক্ষয়॥
ঐ আকাশে ঐ ডাকে আমায় আর কে ধরে রাখে,
আমি সকল দুয়ার খুলেছি আজ যাব সকল-ময়॥
ওরা বসে বসে মিছে শুধু মায়াজাল গাঁথিছে,
ওরা কী-যে গোনে ঘরের কোনে আমায় ডাকে পিছে।
আমার অস্ত্র হল গড়া আমার বর্ম হল পরা,
এবার ছুটবে ঘোড়া পবনবেগে করবে ভুবন জয়॥

(জনকয়েক প্রহরীসহ জেলর ও তাহার সহকর্মীর জেল-প্রাঙ্গণে দ্রুত-প্রবেশ)

সহকর্মী। (উচ্চকণ্ঠে) চুপ্ চুপ্,—

জেলর। এ-সব ভালো হচ্ছে না, আমাকে-সুদ্ধ বিপদে ফেলবে দেখছি।

(কারাগারের বাহির হইতে জনতার কোলাহল)

কোলাহল। কই, মা কোথায়? আমরা তোকে ছাড়ব না। আমরা তোকে ফিরিয়ে আনব মা।

জেলর। (উদ্‌ব্যস্তভাবে সঙ্গীকে) ওরা কা'রা?

প্রহরী। ওরা দাদাঠাকুরের দল। প্রাচীর ভাঙতে শুরু করেছে।

জেলর। প্রাচীর ফুটো করে দেবে? পাগল হয়েছ?

বাহিরে। (জনতার কণ্ঠে) কতদিন হল! মাকে এবার ফিরিয়ে দাও,—জেলে আর কতদিন রাখবে?

বাহিরে। (সিপাইদের কণ্ঠে) রাজার আজ্ঞা, আমরা কী করব। চুপ কর্,— মিছে গোল করিস্-নে।

বাহিরে। (জনতার মধ্য হইতে জনৈক-কণ্ঠে) প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

জনতা। দেব ধুলোয় লুটিয়ে। দেব লুটিয়ে।

সহকর্মী। তবে কি সৈন্য জড়ো করতে হুকুম দেব?

(আদেশের অপেক্ষায় অধীর)

জেলর। না, না, কিছু করতে হবে না। তাহলে বিষম অনর্থ ঘটবে।

সহকর্মী। যেমন আদেশ করেন, তাই হবে। অনর্থের আশঙ্কা করছেন কেন?

জেলর। তুমি জানো না, (নেপথ্যে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া) ঐ কন্যাটিকে আমি আজ কী-রকম ভয় করছি!—সে আমাদের ঘরের মধ্যে শনি। ভূমিকম্প উপস্থিত। ওদের ঐ বন্দেমাতরম্, ও যে এক মর্মভেদী আহ্বান। অন্তঃপুরেও কি এ আহ্বান প্রবেশ করে নাই মনে করো?

(সদলে আলাপরত ম্যাজিস্ট্রেট ও তৎসহ নরমপন্থী-চৌধুরীর প্রবেশ। পশ্চাতে সিপাইবেষ্টিত হইয়া বন্দী-ব্রতীন্দ্র, রানী, রুক্মিণী, কিশোর ও মাধবের প্রবেশ। সিপাহীদের মধ্যে একজন ছত্র-বাহক—অন্যজন দপ্তরের কাগজপত্র ও কালি-কলম-সাজানো ট্রে-বাহক)

ম্যাজিস্ট্রেট। (চৌধুরীকে) প্রজারা দরখাস্ত নিয়ে দিল্লীতে চলেছিল, হাতে-হাতে ধরা পড়েছিল—সেও কি তুমি অবিশ্বাস করো?

চৌধুরী। আজ্ঞে না, অবিশ্বাস করছি-নে। তবে—

ম্যাজিস্ট্রেট। ওরা তাতে লিখেছে, তাদের ইচ্ছা যে—

চৌধুরী। সে-দরখাস্ত তো আমি দেখেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। এর চেয়ে তুমি আর কী প্রমাণ চাও? প্রজারা এখানে এসেছিল কি-না?

চৌধুরী। হঁ্যা।

ম্যাজিস্ট্রেট। (ব্রতীন্দ্রকে দেখাইয়া) ওরা ওকেই রাজা করতে চেয়েছিল!—চেয়েছিল কি না?

চৌধুরী। হঁ্যা, চেয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট। তুমি বলতে চাও—এ-সকলের মধ্যে (ব্রতীন্দ্রকে দেখাইয়া) ওর কোনো-হাত ছিল না?

চৌধুরী। যদি হাত থাকত তাহলে এত প্রকাশ্যে এ কথার আলোচনা হত না।

ম্যাজিস্ট্রেট। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার নিঃসংশয় নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েই বসে থাকো। কিন্তু আমি বরঞ্চ নির্দোষকে দণ্ড দেব কিন্তু যেখানে রাজ্যের কিছুমাত্র অহিত-ঘটবার আশঙ্কা আছে সেখানে বিপদটা একেবারে ঘাড়ে-এসে-পড়ার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকব না।

চৌধুরী। ঘটনা যে এতদূর পৌঁছতে পারে তা-ই দেশের অধিকাংশ লোক কল্পনা করে নাই।

ম্যাজিস্ট্রেট। দেশের মনের জ্বালা ক্রমশই যে অগ্নিমূর্তি।

বাহিরে। (কোলাহল) জয় মা, জয় মা।

ধ্বনি। (জেলের ভিতর হইতে নেপথ্যের বন্দীরা অনুধ্বনিতে—"বন্দেমাতরম্")

বাহিরে। (জনতা) বন্দেমাতরম্।

চৌধুরী। এ কী, ভূমিকম্প নাকি?

ম্যাজিস্ট্রেট। হয়-তো আর-কোনো দল এসে পড়ল।

জেলর। তা হতে পারে, কিন্তু তাহলে তো সংবাদ পাওয়া যেত।

(একজন সিপাই-এর দ্রুত প্রবেশ)

জেলর। সংবাদ আছে নাকি?

সিপাই। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ—

বাহিরে। (জনতা) ঠাকুর, ঠাকুর। (জনতার জনৈকের-কণ্ঠে) রাজা তোমাকে ছাড়বে না, আমরা তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব। তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

জেলর। ঐ কোলাহল—

বাহিরে। (জনতা) আর-কতদিন? আর-কতদিন?

বাহিরে। (সিপাই-এর কণ্ঠে) চুপ কর্।—আস্তে—

বাহিরে। (জনতার একজন) আজ কালকার দিনে আস্তে বললে শোনে কে?

বাহিরে। (সিপাই) কী বলিস রে, তোদের বড়ো আস্পর্ধা হয়েছে!

বাহিরে। (জনতার একজন) প্রাচীরের উপর দিয়ে পথ তৈরি করে দেব। আমাদের রাজার রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

জনতা। (সকলে) চলবে, চলবে।

আগন্তুক সিপাই। যদি প্রাচীর ভাঙে তাহলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

চৌধুরী। আমার কাছে এটা কিন্তু দুর্লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। ভয়ের চক্ষে সব-লক্ষণই দুর্লক্ষণ। ওদিকে আমাদের সৈন্যদল প্রস্তুত।

চৌধুরী। তবে—মার্শাল-ল? মার্শাল-ল—শব্দের অর্থই,—প্রতিহিংসা-পরায়ণ পাশবিকতাকেই প্রয়োজন-সাধনের সর্বপ্রধান সহায় ঘোষণা করা। প্যুনিটিভ্ পুলিসের নির্বিবেক-বর্বরতাও এই জাতীয়।

বাহিরে। (জনতা) জয় গুরুজীর জয়।

ব্রতীন্দ্র। নির্মম নির্ভীক।

হাজার-কণ্ঠে "গুরুজীর জয়" ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
এসেছে সে একদিন,
লক্ষ পরানে শঙ্কা না জানে না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন॥

ম্যাজিস্ট্রেট। এ-সব কাব্যালংকারের ঝংকার মাত্র।

চৌধুরী। (ম্যাজিস্ট্রেটকে) রাম পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করেছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। (কথায় বাধা দিয়া) শত্রুকে ক্ষমা? রেখে দাও তোমার ধর্ম-কথা!

ব্রতীন্দ্র। মনে রেখো অতি দর্পে হতা লংকা। (ব্যঙ্গস্বরে) রুশিয়ার পদধ্বনি মাত্র অনুমান করেই তোমরা আজ কিরূপ চকিত, তা বিলক্ষণ অনুভব করি।

চৌধুরী। ইংরেজ জেলে দিতে পারে, ফাঁসি দিতে পারে, কিন্তু, অক্ষমের-ও বেদনার হিসাব কি কেউ রাখছে না, মনে করো?

ম্যাজিস্ট্রেট। (চৌধুরীকে) তোমরা কোনো কর্মের নও। স্বদেশী-আন্দোলন? —ও তো অকৃতার্থের অসন্তোষ,—অকৃতজ্ঞতা।

চৌধুরী। মিথ্যাবাক্য! ব্রিটিশ-পশুরাজ ভীমগর্জন করলেও সেই অসত্যের দ্বারা আমরা কোনো শুভফল পাব না। তোমার গায়ের জোর আছে বটে, তবু সত্যের বিরুদ্ধেও তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ করবে, এত জোর নাই।

ম্যাজিস্ট্রেট। ইংরেজের একমাত্র অপরাধ সে বিদেশী, কিন্তু তাদের ভারত-শাসনের মুখ্য-উদ্দেশ্য যে,—ভারতবর্ষেরই উন্নতি। আমাদেরই তো সুবিধা, এ-যে আমাদেরই কাজ।

চৌধুরী। সেই আমাদের-কাজের জন্য আমাদের-লোকেরও সাহায্য প্রার্থনীয়। রুচিপূর্বক আহার করলে তবে পরিপাকের সহায়তা হয়। কার্য-সাধনের সঙ্গে-সঙ্গে সন্তোষ-সাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নতুবা উপকারের গ্রাসও গলাধঃকরণ করা কঠিন।

ব্রতীন্দ্র। কেন-না, তা অন্তরে-অন্তরে অন্তর্দংশ-বেদনা আনয়ন করে।

ম্যাজিস্ট্রেট। (ব্রতীন্দ্রকে) যত-সব ষড়যন্ত্রকারী বাবু-সম্প্রদায়, মুখ-সর্বস্ব বাক্যবীর! তোমরা কে? তোমরা তো গুটিকয়েক বাক্যবিশারদ ইংরেজি-নবিশ মাত্র।

মাধব। (ম্যাজিস্ট্রেটকে) কী বলছ!—আমরা বাক্যবীর? কিন্তু, কথা

তোমরাও কিছু কম বল না। তোমরা যদি আরম্ভ কর তো আমরা কি তোমাদের সঙ্গে কথায় পারি? তোমাদের কাছেই তো আমাদের শিক্ষা।

ব্রতীন্দ্র। কথাই তোমাদের ঊনবিংশ-শতাব্দীর ব্রহ্মাস্ত্র। কামান বন্দুক ক্রমশ এখন নীরব।

চৌধুরী। তোমরা প্রভু, তোমরা কর্তা, তোমরা বিজেতা, তোমাদের পক্ষে সহিষ্ণু হওয়া, উদার হওয়া, ক্ষমা-পরায়ণ হওয়া কত অনায়াস-সাধ্য।

মাধব। আমরা দুর্ভাগা, দরিদ্র, অসহায়।

ম্যাজিস্ট্রেট। (বিরক্তির সহিত) চুপ্।

ব্রতীন্দ্র। (ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যঙ্গ-হাসিতে) এত বিরক্ত হও কেন? ওই শোনো—

(কারার ভিতর ও বাহির হইতে সমস্বরে প্রথমে কয়েদী ও পরে যোগ-দেওয়া জনতার গান)

গান

হা-রে রে-রে রে-রে! আমায় ছেড়ে দে-রে দে-রে,
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে-রে॥
ঘন শ্রাবণ-ধারা যেমন বাঁধন-হারা,
বাদল-বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে॥
হা-রে রে-রে-রে-আমায় রাখবি ধরে কে-রে!
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে॥
বজ্র যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে॥

চৌধুরী শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা শুধু শক্তের ভূষণ নয়—সময়-বিশেষে শক্তের ব্রহ্মাস্ত্রও ক্ষমা।

ম্যাজিস্ট্রেট রেখে দাও তোমার ধর্ম-কথা,—এ তো ধর্ম-মানা নয়, এ যে ভয়কে মানা।

চৌধুরী। সংসারে বাস্তবের সঙ্গে কখনও আপস, কখনো-বা লড়াই করতে হয়।

জেলর। রাজার প্রধান কাজ—আপনার মান রক্ষা-করা।

চৌধুরী। রাজার প্রতি প্রজার ভয়, এ কি গৌরবের? শাসন-শৃঙ্খল কিংবা আত্মীয়-সম্বন্ধ-বন্ধন?—কোন্‌টা চাও?

ব্রতীন্দ্র। দু'শো-বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানব-সম্বন্ধের এই কি অবশেষ?

বাহিরে জনতার একজন। ওরে ভাই, কান্নার দিন নয়, অনেক কেঁদেছি, তাতে কিছু হল কি ?

জনতার অন্যজন। কান্নাকাটি ঢের হয়েছে, দেখি অন্য-উপায় আছে কিনা।

বাহিরে। (সিপাইরা জনতাকে) তোরা সব ফিরে যা। পালা—পালা—সৈন্য আসছে।

জনতার একজন। বল কী। (দ্বিগুণ উত্তেজনায় দৃঢ়-কণ্ঠে) ওরে আয় রে তোরা মায়ের সন্তান,—মা,-মা, কোথায় মা।

রানী। ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা।

জেলর। (রাণীকে) রাজ্য রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নয়।

রানী। পদে-পদে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলবেন না।

জেলর। (রানীকে) আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়।

চৌধুরী। কঠিন আইন ও জবরদস্তিতে সম্পূর্ণ উল্টা ফল ফলবে—(অপেক্ষাকৃত নম্রস্বরে বিনয়ের সহিত) বৃহৎ অনুষ্ঠান-মাত্রেই আপস-ব্যতীত কাজ চলে না। যদি কোনো অন্যায়-অবিবেচনার কথা ব'লে থাকি, ক্ষমা ক'রো। সাবধান হ'তে বলি। তাই অনুরোধ, (ব্রতীন্দ্র, রানী, রুক্মিণী, কিশোর ও মাধবকে দেখাইয়া) এদের মুক্তি দাও।

বাহিরে। (জনতা) দোহাই সরকার-বাহাদুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) মুক্তি ? মুক্তি চাচ্ছ ? মুক্তি দেব—যাও (অঙ্গুলি-নির্দেশে স্বদেশীদলকে দেখাইয়া দিয়া চৌধুরীকে) এদের সঙ্গে করে নিয়ে যাও-না! কিন্তু—(আবার কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে) থামো! (স্বগত) তাইতো, শাসন-শৃঙ্খল—না, আত্মীয়-সম্বন্ধ-বন্ধন! এখন কী করা! কোন্ পথ ধরা যায়!

চৌধুরী। আজ্ঞে, দুই পক্ষের মধ্যে আপোসে বোঝাপড়া! (মৃদুহাস্যে) তাহলে আত্মীয়-বন্ধনটাই—ভালো নয় কি ?

ম্যাজিস্ট্রেট। আচ্ছা বেশ, তাই ক'রেই না-হয় দেখা যাক্।

চৌধুরী। তা-হলে, অনুমতি যদি হয়—

ম্যাজিস্ট্রেট। (বন্দীদের প্রতি) এবারকার মতো যাও, কিন্তু (ভাবিতে ভাবিতে) মুক্তি দেব, কিন্তু সেটা তো একেবারে বিনা-মূল্যে দেওয়া চলবে না। (ব্রতীন্দ্রকে গুরুত্বব্যঞ্জক-স্বরে) দিল্লীতে দরবার হচ্ছে!—জানো তো ? (শাসানোর

সুরে) রাজ-নিমন্ত্রণ-অবহেলা, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ !—বার বার বলে দিচ্ছি—এসব থেকে দূরে থেকো।

চৌধুরী। দরবার ?—দরবার তো রাজার সহিত প্রজাদের আনন্দ-সম্মিলনের উৎসব। সেদিন যে ক্ষমা-করবার, দান-করবার, রাজ-শাসনকে সুন্দর ক'রে সাজাবার শুভ-অবসর। কিন্তু, এখানে বদান্যতা-খর্ব !—এতে যে কেবল প্রতাপই উগ্রতর—এই দরবারের দুঃসহ-দর্পে দেশের হৃদয় যে পীড়িত। আমরা বলকে কেবল বল-রূপে সহ্য করতে পারি না। আমাদের হৃদয়-বশ-করা তো ফুলর, প্যুনিটিভ-পুলিস আর জোর-জুলুমের কর্ম নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। (ব্রতীন্দ্রকে) যাও, ঘরে যাও, আপন-সমাজের কাজ করো-গে।

ব্রতীন্দ্র। আমরা সমাজের কাজ করি না-করি, সে-খবর তোমরা রাখ কি ?

ম্যাজিস্ট্রেট। (রানীর দিকে চাহিয়া) কারাবাসিনী তার এই-বয়সে কি জীবনের সুখ জলাঞ্জলি দেবে ? (ব্রতীন্দ্রকে) গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের ?

ব্রতীন্দ্র। রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ—তেমনি আনন্দ। আমার গারদ-ভাইকে মনে থাকবে—

(ব্রতীন্দ্র ও রানীর দ্বৈত-সংগীত)

গান

ওরে শিকল, তোমায় কোলে ক'রে দিয়েছি ঝংকার।
তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে ভেঙে অহংকার ।।
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা সুখে-দুঃখে কাটল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি' দিলে বেড়ী,-বিনা-দামের অলংকার ।।
তোমার 'পরে করি-নে রোষ, দোষ থাকে তো আমারি দোষ,
ভয় যদি হয় আপন-মনে তোমায় দেখি ভয়ংকর।
অন্ধকারে সারারাতি ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি' তোমায় করি নমস্কার ।।

ম্যাজিস্ট্রেট। (স্মিতহাস্যে) শাসন-শৃঙ্খল,—না,—আত্মীয়-সম্বন্ধ ?— আচ্ছা, বেশ—(ট্রে-বাহক-সিপাহীর দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি-নির্দেশে তাহাকে ডাকিয়া, তাহার নিকট হইতে সরকারী মুক্তি-নামার কাগজ লইয়া তাহাতে বন্দীদের মুক্তির আদেশ লিখিয়া সিপাহীকে প্রত্যর্পণ করা ও বন্দীদের বলা)—আত্মীয়-সম্বন্ধই স্থির !—যাও,—তোমাদের মুক্তি। (অন্য-সিপাহীকে ইশারা করিয়া) মুক্তি দাও।

সিপাহী। (বন্দীদের প্রতি) বাবু, চলো যাও।

মাধব। যেতে বল, যাব।

ব্রতীন্দ্র। (রানীকে) এসো তবে। (সকলের প্রস্থান)

বাহিরে। (জনতা) দেবী কই? ফিরে দে, ফিরে দে!—(ফটক-খোলার শব্দ) ওরে আয় রে, আয়, জননী ফিরেছে। জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক, বন্দেমাতরম্। (কারাগারের ভিতর হইতে কয়েদী-কণ্ঠে অনুধ্বনি) বন্দেমাতরম্।

দৃশ্য ৬

[কলিকাতা। দুঃস্থসেবা-কুটীর-প্রাঙ্গণ]

(প্রাক্-সন্ধ্যা। নিবেদিতা বসিয়া আপন-মনে গাহিতেছিল)

গান

নিবেদিতা। আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।
তার লাগি' পথ চেয়ে আছি
আমায় পথে যে-জন ভাসায়॥
যে-জন দেয় না দেখা যায় গো দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন-ভালোবাসায়॥

(ক্রমশ কাছে-আসিতে-আসিতে নেপথ্যে রানীর গান)

গান

রানী। বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে,
মন যে কেমন করে মনে-মনে তাহা মনই জানে॥
তোমারে হৃদয়ে ক'রে আছি নিশিদিন ধ'রে
চেয়ে থাকি আঁখি ভ'রে মুখের পানে॥
বড়ো আশা, বড়ো তৃষা, বড়ো আকিঞ্চন
তোমার লাগি'
বড়ো সুখে বড়ো দুখে রয়েছি জাগি'।
এ-জন্মের মতো আর হয়ে গেছে যা হবার
ভেসে গেছে মনপ্রাণ মরণ-টানে॥

(রানীর প্রবেশ)

রানী। দিদি, এরা সব পাথর।

নিবেদিতা। যা হোক, এতদিনে তো একটা জহুরী জুটেছে। দাম যা দিতে চাচ্ছে তাতে আর দুঃখ করবার কিছু নেই, এখন আর আমাদের মতো আনাড়িদের কাছ থেকে আদর যাচবার দরকারই হবে না।

রানী। হবে না বৈ কি,—খুব হবে। (বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া) তোমার আদর আমার বরাবরই চাই—সেটা ফাঁকি দিয়ে আর-কাউকে দিতে গেলে চলবে না।

নিবেদিতা। (রানীর কপোলের উপর কপোল রাখিয়া) কাউকে দেব না—কাউকে দেব না।

রানী। কাউকে না? একেবারে কাউকেই না? (নিবেদিতা সলজ্জ-ভাবে চাপা-হাসিতে শুধু মাথা নাড়িল)

নিবেদিতা। সেই গানটি গা—তোর গান শুনতে আমার বড়ো ভালো লাগে।

রানী। গান

কে বলেছে তোমায় বঁধু এত দুঃখ সইতে।
আপনি কেন এলে বঁধু আমার বোঝা বইতে॥
প্রাণের বন্ধু বুকের বন্ধু সুখের বন্ধু দুখের বন্ধু
তোমায় দেব না দুখ্ পাব না দুখ্
হেরব তোমার প্রসন্ন-মুখ,
আমি সুখে-দুঃখে পারব বন্ধু চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা-কথায় মনের কথা কইতে॥

(নিবেদিতাকে) তুই অমন চুপ করে থাকিস কেন ভাই? যা বলার আছে বলিস-নে কেন?

নিবেদিতা। আমার কী বলার আছে?

রানী। না ভাই, আমার বুকের ভিতর এখনো কেঁপে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে কী-যেন একটা হবে। মনে হচ্ছে যেন কা-কে সাবধান ক'রে দেবার আছে। আমার কিছুই ভালো লাগছে না। আচ্ছা, তিনি এখনো এলেন না কেন?

(গাহিতে গাহিতে সহাস্যে ব্রতীন্দ্রের প্রবেশ)

গান

ব্রতীন্দ্র। আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।
ভয় পেয়ো না সুখে থাকো, বেশিক্ষণ থাকব নাকো
এসেছি দণ্ড-দুয়ের তরে॥
দেখব তোমার মুখখানি শোনাও যদি শুনব বাণী
না-হয় যাব আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্তরে॥

নিবেদিতা। (চাপা-সলজ্জ-হাসিতে-উচ্ছ্বসিত-মুখ-রানীর চিবুক ধরিয়া ব্রতীন্দ্রকে ঠাট্টায়) হাসি দেখবার জন্য তো আড়ালে যেতে হল না। এবার তবে দেশান্তরের উদ্‌যোগ করো।

ব্রতীন্দ্র। না, না, অত সহজে না। অমনি যে ফাঁকি দিয়ে হেসে তাড়াবে তেমন পাত্র-ই নই। (অর্থপূর্ণ-দৃষ্টিতে) দিদি, চোর ধরা প'ড়ে গেলে চতুর্দিক থেকে শাস্তি পায়। আমি তোমাকে অনেকদিন থেকেই চিনি। কিন্তু কারো কাছে কিছু ফাঁস করিনি, চুপ ক'রে বসে আছি—মনে-মনে জানি বেশিদিন কিছুই চাপা থাকে না।

নিবেদিতা। (রানীকে) যা মনে-মনে প্রার্থনা কর আমি জানি। (রানীকে দেখাইয়া চাপা-হাস্যে ব্রতীন্দ্রকে) কখনো কাঁদে, কখনো চুপ থাকে, যখন বলি "তবে কাজ নেই"—তখন আবার সে অস্থির। (ব্রতীন্দ্রের প্রতি বিশেষ-ইঙ্গিত-মূলক দৃষ্টিতে) ছেলেটির দশা কী, তুমি নিজেই তো ভালো জানো !

রানী। (বাঁকা-হাসিতে নিবেদিতাকে) কেমন ক'রে তোর দিনরাত্রি কাটবে। (ব্রতীন্দ্রকে) একটা যা-হয় উপায় করে দাও।

ব্রতীন্দ্র। সেও কি আমাকে বলতে হবে না কি ?

রানী। (হঠাৎ শঙ্কিতভাবে) আবার তো কিছু বিপদ ঘটবে না ? আমার বুকের মধ্যে এমন-একটা ভয় ধ'রে গেছে, কিছুতে ছাড়ছে না। (নিবেদিতাকে) তোর চোখে যদি জল দেখতুম তাহলে আমার মনটা যে খোলসা হত। তোর হয়ে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে ভাই। সব কথাই কি এমনি করে চেপে রাখতে হয় ?

নিবেদিতা। কোনো কথাই তো চাপা রইল না।

ব্রতীন্দ্র। জগতে সব দাহ-ই জুড়িয়ে যায়। সব ভাঙা-চোরা জুড়ে আবার দেখতে-দেখতে ঠিক হয়ে যায়।

নিবেদিতা। ঠিক না-ও যদি হয়ে যায় তাতেই-বা কী? যেটা হয় সেটা তো সইতেই হয়। আমার কথা ছেড়ে দাও।

(মুকুন্দের প্রবেশ)

ব্রতীন্দ্র। এই যে দাদা, এসো এসো। (নিবেদিতাকে সোৎসাহে) একবার চেয়ে দেখো, কে এসেছেন।

নিবেদিতা। (সলজ্জ-বিষন্ন-হাসিতে) জানি! তা, এলই-বা।

ব্রতীন্দ্র। (মুকুন্দকে) আমি ছাড়া পেয়েছি, দাদা! তোমাকে পেয়েছি, আর আমার সুখের কী অবশিষ্ট রইল?

নিবেদিতা। এ-মুহূর্ত আর কতক্ষণ থাকবে! (মুকুন্দের দিকে বাঁকা-দৃষ্টিতে) প্রহরীরা আসবে, ওকে যে ধ'রে নিয়ে যাবে!

ব্রতীন্দ্র। কিন্তু কী করা যাবে—দাদা, এবার তোমাকে জিতে আসতেই হবে।

মুকুন্দ। জয়ের ভাবনা কী ভাই।

ব্রতীন্দ্র। না দাদা, ঠাট্টা করছিলুম। যদি হারো তাতেও তোমার গৌরব নষ্ট হবে না। (গম্ভীরভাবে) আন্দোলন উত্তাল। বিরাগ, বিদ্রোহ, খাজনা-বন্ধ, কারাগার, স্বদেশী, স্বাধীনতা—সব হয়ে এবারকার যুদ্ধ-ঘোষণার ধ্বনি হচ্ছে—'স্বরাজ চাই'। আজ বড়ো শক্ত সময় এসেছে।

মুকুন্দ। শক্তটা কিসের? ভগবানের যখন ইচ্ছা হয় তখন মরাও শক্ত নয়, বাঁচাও শক্ত নয়, খুবই সহজ। (একটু সহাস্যে শিথিলভাবে) তুমি পালাবার চেষ্টা করো—যুদ্ধের ভার আমার উপর রইল।

ব্রতীন্দ্র। (সহাস্যে মুকুন্দকে) গান গেয়ে-ই বেড়াও বটে—কিন্তু তুমি যে আমাদের অস্ত্রগুরু। তোমার মুখে তো এ উপদেশ সাজে না। তা-ছাড়া, পথই-বা কোথায়। আজ মরবার যেমন চমৎকার সুযোগ এসেছে, পালাবার তেমন নয়। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আবার আমি কারাগারে ফিরে যাই।

মুকুন্দ। সে যখনকার তখন হবে। 'এখনো সময় নয়'। ভাই, "তোমার কাছেতে ধরা দেবে ব'লে আসে লোক কতশত। স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি, প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি"—। তোমার জায়গা আমি ঠিক ক'রে রেখেছি।

ব্রতীন্দ্র। কোথায়?—আমি তোমাকে জোড়হাত করে বলছি, আর আমাকে বসিয়ে-রাখার কাজে লাগিয়ো না। তোমার ওই বীরবেশে আমার মন ভুলেছে—তোমাকে এমন মনোহর আর-কখনো দেখি-নি।

মুকুন্দ। ভয় নেই। আমি বলছি—তুমি লোকের সকলের-চেয়ে-আপন। সেইজন্যেই তোমার সব-চেয়ে দরকার কেন্দ্রস্থলে, দেশের সাধারণ-লোকের মনে, সামান্য লোকেরও হৃদয়ের মধ্যে; যে-জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি তাদেরই নির্বাক-হৃদয়ের গোপন-স্তরের মধ্যে জেলায়-জেলায় পল্লীতে-পল্লীতে, মানুষের ঘরে-ঘরে।

নিবেদিতা। মানুষের অত্যন্ত কাছে-যাবার যে ক্ষমতা—সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা। ইংরাজের বিস্তর ক্ষমতা আছে কিন্তু সেটি নাই। হৃদয়ের সহিত কাজ না করলে হৃদয়ে তার ফল ফলে না।

মুকুন্দ। অন্ন-বস্ত্র সুখ-স্বাস্থ্য শিক্ষা-দীক্ষা-দানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান সহায়।

ব্রতীন্দ্র। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত। দেশের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য কী গভীর! আমরা শিক্ষিত-কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান। আমরা একদেশে এক-সুখদুঃখের মধ্যে একত্র বাস করি, আমরা মানুষ, আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম।

মুকুন্দ। সকল বিষয়ে সকল কাজই বাকী আছে; স্বরাজ তো আকাশ-কুসুম নয়; প্ল্যান কী? আয়োজন কী? একটা সুযোগ এসেছে—এ-সময়কে যেন আমরা নষ্ট না করি। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ,—দেশের সাধারণ-লোকের মনে শক্তি-সঞ্চার,—স্বাধীনতা বা স্বরাজের যথার্থ অধিকার-লাভ—এই আমাদের সাধনা।

নিবেদিতা। (ব্রতীন্দ্রকে) স্বরাজ, স্বাধীনতা বাইরে থেকে একটা মজার জিনিস, কিন্তু স্থির হয়ে ব'সে তার ভিতর থেকে সার-পদার্থটা বের করে নিতে হয়।

মুকুন্দ। (ব্রতীন্দ্রকে) কিছুদিনের জন্যে ঠাণ্ডা হয়ে বসো। ভিতরকার দিকটাতে পাক-ধরাবার সময় পাবে। দেশের এক-একটি জায়গায় এক-একটি মানুষ বিরলে ব'সে যে-কোনো-একটি কর্মকে প্রতিষ্ঠিত করো।

ব্রতীন্দ্র। তাহলে কি—

মুকুন্দ। হ্যাঁ, গ্রামে-গ্রামে। ওখানে অনেক কাজ। যুদ্ধে রক্তের সঙ্গে রক্ত মিলে গিয়েছে তো?

ব্রতীন্দ্র। হাঁ, মিলেছে।

মুকুন্দ। সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা-ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী ক'রে দাঁড় করাও। আজ মহাভারতবর্ষ-গঠনের ভার আমাদের উপর। আমাদের

দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। স্বদেশী-সমাজ গঠন ও চালনের জন্য মেলো তোমরা নারী-পুরুষ দুই-দলে, (মেয়েদের দিকে চাহিয়া)। স্ত্রীলোক সমাজের শক্তিস্বরূপ, লাগো তোমাদের কাজে।

ব্রতীন্দ্র। তাই লাগব। প্রস্তুত আছি। ভারতবর্ষের নানাপ্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের সঙ্গে একদলে মিলে ধুলোয় গিয়ে বসতে আমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না।

নিবেদিতা। (মুকুন্দকে) আর, এই (নিজেকে দেখাইয়া) চির-অপরাধীর কী বিধান করলে? ভাবছি, কাল যে কী দশা হবে।—আমি কাল তোমার সঙ্গে যাব।

মুকুন্দ। সে তো বেশ কথা। কেউ গায়ে হাত দেবে না, সে-ভয় নেই।

নিবেদিতা। কেন? শাস্তি তো একজন-কাউকে না দিয়ে সরকার ছাড়বে না।

মুকুন্দ। সে তো আমি আছি।

নিবেদিতা। ও-কথা বোলো না।

মুকুন্দ। বলতে বারণ কর তো বলব না। কিন্তু বিপদের জন্যে কি প্রস্তুত হ'তে হবে না।

নিবেদিতা। বিপদ ঘটবে কেন? সব বিপদ আমি নেব।

মুকুন্দ। তুমি নেবে, তার চেয়ে বিপদ কিছু আছে নাকি?

নিবেদিতা আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। ভাবনার কথা কী জানো?

মুকুন্দ। কী, বলো দেখি?

নিবেদিতা। (রানীকে দেখাইয়া দিল) মেয়েটা একে তো ভারী চাপা মেয়ে,- তারপরে—

মুকুন্দ। (রানীর মাথায় হাত রাখিয়া) ভগবান ওকে দুঃখ যথেষ্ট দিলেন, তেমনি সহ্য করবার শক্তিও দিয়েছেন। বাস্, আর সময় নেই—চললুম্। (ব্রতীন্দ্রকে) এসো, একবার আলিঙ্গন করে যাই। (ব্রতীন্দ্রকে আলিঙ্গন-দান)

ব্রতীন্দ্র। কতদিন কত অপরাধ করেছি, আজ সমস্ত মার্জনা করে যাও।

মুকুন্দ। কোনোদিন কোনো অপরাধ জমতে দাও-নি, হাতে-হাতে সমস্তই নিকেশ করে দিয়েছ—আজ মার্জনা করব এমন তো কিছুই রাখো-নি। তোমার নির্মল প্রাণ, কোনো ফুলের কাছেই সে ম্লান হবে না।

ব্রতীন্দ্র। তবে দাও একটু পায়ের ধুলো। (ব্রতীন্দ্র ও রানীর মুকুন্দকে প্রণাম)

মুকুন্দ। ও কী করো, ও কী করো। অপরাধ হবে যে। (রানীকে সস্নেহে হাত ধরিয়া উঠাইলেন)

(স্বগত) রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা—
মোর সন্ধ্যা-দীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি-চোখ
যত্নে-গাঁথা মালা।
খেয়াতরী যাক ব'য়ে গৃহফেরা লোক ল'য়ে
ও-পারের গ্রামে,
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী ধীরে প'ড়ে যাক খসি',
কুটীরের বামে,
রাত্রি মোর শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ—
আবার চলিনু ফিরে বহি' ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান।

ব্রতীন্দ্র। সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্র-শত তোমার দুয়ারে,
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি' পথের দু-ধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি' বিদায় পাই-নে দেবী ডাকো ক্ষণে-ক্ষণে,
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই বহি প্রাণপণে।
সেই গর্বে জাগি র'ব সারারাত্রি দ্বারে তব অনিদ্র-নয়ান,
সেই গর্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্য-সম তোমার আহ্বান।
বলো তবে কী বাজাব ফুল দিয়ে কী সাজাব তব দ্বারে আজ।
রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব কী করিব কাজ?
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর টুটিবে না বীণা।
নবীন প্রভাত লাগি' দীর্ঘ রাত্রি র'ব জাগি' দীপ নিবিবে না।
কর্মভার নব-প্রাতে নব-সেবকের হাতে করি' যাব দান—
মোর শেষ-কণ্ঠ-স্বরে যাইব ঘোষণা ক'রে তোমার আহ্বান।

(রানীর প্রস্থানোদ্যোগ)

নিবেদিতা। কী! পালাচ্ছিস কোথায়?

রানী। (ইঙ্গিতে) ঐ দেখো,—কে আসছেন।

(আবৃত্তিরত কবির প্রবেশ)

কবি। ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ মোহ-বন্ধন, ওরে আশা নাই
আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন, ওরে গৃহ নাই,
নাই ফুল-সেজ রচনা।
আছে শুধু পাখা আছে মহানভ-অঙ্গন উষা দিশাহারা
নিবিড়-তিমির-আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ ক'রো-না পাখা।

(সকলের কবিকে গিয়া প্রণাম-নিবেদন)

কবি। (মুকুন্দকে) খবর কী? সব ভালো তো? (নিবেদিতাকে ও রানীকে দেখাইয়া) ওরা ভালো আছে তো?

নিবেদিতা। সমস্তই মঙ্গল।

কবি। (ব্রতীন্দ্রকে) সাবাস ভাই, দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো—পুরস্কারের পাত্র!—তুমি একটি ছেলে বটে! (পিঠ-চাপড়ানো। রানীকে)

সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন,
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্বাদ করো মা, গ্রহণ।
এ গান যেন রে হয় তোর ধ্রুবতারা
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সারা।
তোমার মুখের 'পরে জেগে থাকে স্নেহভরে
অকূলে নয়ন মেলি' দেখায় কিনারা।
এ গান বাঁচিয়া যেন থাকে তোর মাঝে,
আঁখিতারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে।
এ যেন রে করে দান সতত নূতন প্রাণ
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে।
যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি',
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি।
যবে হায় সব গান হয়ে যাবে অবসান,
এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি।

মুকুন্দ। (নিবেদিতাকে) চলো প্রস্তুত হই-গে'। (কবিকে) অনুমতি দিন।

কবি। (মুকুন্দকে) যাও, শুধু এই কথা মনে রেখো—নিজের জন্যেই কি, দেশের জন্যেই কি, যা সকলের চেয়ে উচ্চ-সত্য তাই একমাত্র সত্য। কোনো উপস্থিত-ক্রোধে লোভে বা কোনো ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির উত্তেজনায় ধর্মকে খর্ব করতে গেলে কখনো মঙ্গল হ'তে পারে না। নিজের প্রয়োজন বা প্রবৃত্তির অনুসারে ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ না ক'রে মরুভূমির পথে ধ্রুবতারার মতো একাগ্র-লক্ষ্যে তার দিকে দৃষ্টি রাখলে দুঃখ পাই আর যা-ই পাই, পথ হারিয়ে বিনাশের মধ্যে পড়তে হবে না।

নিবেদিতা। (কবিকে) তুমি?

কবি। আমি তো কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি, একটা ঢেউ লাগলেই বাস্। আমার ভয় কা-কে?

(নিবেদিতা ও সকলে কবির উদ্দেশ্যে)

সকলে। গান

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো পাগল ওগো ধরায় আসো॥
এই অকুল সংসারে দুঃখ-আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে।
ঘোর বিপদ-মাঝে কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাসো॥
তুমি কাহার সন্ধানে সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে,
এমন আকুল ক'রে কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাসো॥
তোমার ভাবনা কিছু নাই কে যে তোমার সাথের সাথী ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে' কোন্ অনন্ত প্রাণ-সাগরে আনন্দে ভাসো॥

(কবিকে সকলের প্রণাম)

গান

কবি। আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে॥
কত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা,
কে আছে নাম ধরে মোর ডাকতে পারে।
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিনতে পারি দেখে তারে॥

নিবেদিতা। (রানীর চিবুক ধরিয়া) আমি যাই ভাই। (রানী চোখে আঁচল দিয়া চোখ ফিরাইল। সকলের নীরবে প্রস্থান)

(গাহিতে-গাহিতে রুক্মিণী ও মাধবের প্রবেশ ও গাহিতে-গাহিতে প্রস্থান)

মাধব ও রুক্মিণী। গান

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন তুমি এলে হে নাথ মৃদু চরণ-পাতে॥
ভেবেছিলেম জীবনস্বামী
তোমায় বুঝি হারাই আমি
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে॥
যে-নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো
তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।
তোমার পথে চলা যখন
ঘুচে গেল দেখি তখন
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চলো সাথে॥

দৃশ্য ৭

(পল্লীতে জমায়েৎ। সকাল। মুকুন্দ ও কর্মীদল)

মুকুন্দ। এ যুগ মানুষে-মানুষে মিলে যাত্রা-করবার যুগ। হুকুম আসছে—চলতে হবে,—আর-একটুও বিলম্ব না।

(মুকুন্দের নেতৃত্বে জনতার গান)

গান

জনতা। আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর,
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গনি
ওগো কর্ণধার,—

এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি' পার,
তোমারে করি নমস্কার॥
এখন রইল যারা আপন ঘরে চাব না পথ তাদের তরে
ওগো কর্ণধার—
যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কে-বা কার,
তোমারে করি নমস্কার।
মোদের কেবা আপন কেবা অপর কোথায় বাহির কোথায়-বা ঘর
ওগো কর্ণধার—
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার।
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা নিয়েছি দাঁড় তুলেছি পাল তুমি এখন ধরো গো হাল
ওগো কর্ণধার—
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী-বা তার—
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা সহায় খুঁজে দ্বারে-দ্বারে ফিরব না আর বারে-বারে
ওগো কর্ণধার—
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি এই জেনেছি সার—
তোমারে করি নমস্কার॥

সকলে। আমরা স্বাধীনতা চাই।

(আনন্দমোহন ও নিবেদিতার প্রবেশ)

আনন্দমোহন। তোমাদের কোনো দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে না—একটি গ্রামকে বিনা-যুদ্ধে দখল করো। কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কেবল ধৈর্য এবং প্রেম, নিভৃতে তপস্যা।—মনের মধ্যে কেবল এই একটি-মাত্র পণ যে—দেশের মধ্যে সকলের-চেয়ে যারা দুঃখী তাদের দুঃখের মূলগত-প্রতিকার-সাধনে—সমস্ত জীবন-সমর্পণ।

মুকুন্দ। (আগাইয়া আসিয়া) আমি গ্রামে-গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজ স্থাপন করতে চাই। সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই প্রতিকৃতি,—

আনন্দমোহন। খুব শক্ত কাজ, অথচ না হলে নয়।

(মুকুন্দের নেতৃত্বে জনতার গান)

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?

আমরা যা-খুশি তাই করি তবু তার খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ?
রাজা সবারে দেন মান, সে-মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো ক'রে রাখে-নি কেউ কোনো অসত্যে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী-স্বত্বে ?
আমরা চলব আপন মতে, শেষে মিলব তারি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী-সত্বে ?

মুকুন্দ। অনেক ত্যাগের অবশ্যক—সেইজন্যে মনকে প্রস্তুত করছি।—গ্রামে গ্রামে স্বরাজ-স্থাপন করতে চাই।

পুলিস-সাহেব। (মুকুন্দকে) স্বরাজ-স্থাপন করতে চাও? তার মানে? —তোমাদের হাতে দেশের কর্তৃত্ব নেবে ? (এই বলিয়া পুলিসদের মুকুন্দকে দেখাইয়া বলিলেন) বাঁধো ওকে। (ইঙ্গিতে অন্য-সকলকেও বাঁধিবার হুকুম দিলেন। মুকুন্দকে পুলিসেরা বাঁধিতে লাগিল, সেই-সঙ্গে আরও-জনকয়েককেও। মুকুন্দ বলিতে লাগিল)

মুকুন্দ। এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল, জাগিয়া উঠিছে কল-কোলাহল
তরণী পতাকা চল-চঞ্চল কাঁপিছে অধীর রবে।
সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥
বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর ?
কিসেরই-বা সুখ ক'দিনের প্রাণ!—ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান,
অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে,
সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥

নিবেদিতা। (পুলিস-সাহেবের কাছে আগাইয়া) আমাকে ছেড়ে দিয়ো না, প্রহরীদের হুকুম দাও।

পুলিস-সাহেব। তুমি চলে যাও!

(মুকুন্দসহ অন্য-বন্দীদের লইয়া পুলিস-সাহেব সদলে চলিয়া গেলেন। বন্দী-মুকুন্দ গাহিতে-গাহিতে গেল—)

গান

মুকুন্দ। আমি ফিরব না রে ফিরব না আর ফিরব না রে—
এখন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী কূলে ভিড়ব না আর
ভিড়ব না রে॥

(সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। মুকুন্দের যাওয়ার-পথের দিকে ধীরে-ধীরে আগাইয়া যাইয়া সহসা নিবেদিতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল)

নিবেদিতা। ভেবেছিলাম চেয়ে নেব চাই-নি সাহস ক'রে,
সন্ধ্যাবেলায় যে-মালাটি গলায় ছিলে প'রে—
আমি চাই-নি সাহস ক'রে।
এ তো মালা নয় গো, এ-যে তোমার তরবারি,
জ্ব'লে ওঠে আগুন যেন বজ্র-হেন ভারী—
তোমার তরবারি।
আজকে হতে জগৎ-মাঝে ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

(আনন্দমোহন কাছে যাইয়া নিবেদিতার পিঠে হাত রাখিয়া স্মিতহাস্যে বলিতে লাগিলেন)

আনন্দমোহন। দেশের ব্রতে যারা কর্মযোগী, কণ্টকক্ষত তাদিকে পদে-পদে সহ্য করতেই হবে!

বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে কিসের লাগি' দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥
রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥
আমরা সুখের স্ফীতমুখের ছায়ার তলে নাহি চরি,
আমরা দুখের বক্রমুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন-ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,

ছিন্ন-আশার ধ্বজা তুলে' ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥
(আবৃত্তিরত কবির প্রবেশ)

কবি। দুর্দিনের অশ্রুজল-ধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি', তারি-মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে জীবন-সর্বস্ব-ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম-জন্ম ধরি'।

নিবেদিতা। কে সে?

কবি। জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তার লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। তাহারে অন্তরে রাখি'
জীবন-কণ্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে-দুঃখে ধৈর্য ধরি' বিরলে মুছিয়া অশ্রুআঁখি,
প্রতিদিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি,'
সুখী করি' সর্বজনে।

(কবিকে প্রণাম করিয়া ভাবিতে-ভাবিতে নতমস্তকে দলের সহিত নিবেদিতার প্রস্থান)

(নেপথ্যে আবহ-সংগীতের-সুরে বাজিবে—
রবীন্দ্র-সংগীত :
—"দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন")

(কর্মীদের সঙ্গে রঘুনাথ, কিশোর ও রানীর প্রবেশ)

রঘুনাথ। (কবিকে) হুজুর, প্রণাম। (আগাইয়া গিয়া বলিল) ছেলেটিকে আশীর্বাদ করো।

(কবি আগাইয়া আসিয়া কিশোর ও রানীকে দুইদিকে লইয়া দাঁড়াইলেন। রানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন)

কবি। (রঘুকে) তোমারি মেয়ে? এতদিন আমাকে বলো-নিকেন?

কিশোর। (দুই ভাই-বোনে একত্রে কবিকে প্রণাম করিয়া) আমাকে শিষ্য করুন।

রানী। গুটি-দুই ফুল এনেছি। (কবির পায়ে ফুল নিবেদন করিল)

কবি। আমিও যে তোমাদেরি মতো একজন। ওঠো মা, ওঠো। (উঠিয়া দাঁড়াইলে কবি তাহাদের দুইজনের কাঁধে হাত দিয়া গাহিতে লাগিলেন—)

গান

কবি। বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি।

শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে উর্ধ্বমুখে নরনারী ॥

না থাকে অন্ধকার না থাকে মোহ-পাশ

না থাকে শোক, পরিতাপ।

হৃদয় বিমল হোক প্রাণ সবল হোক

বিঘ্ন দাও অপসারি' ॥

(বিনি ও কুমারের প্রবেশ, উভয়ের কবির চরণে প্রণত হওয়া ও আশীর্বাদ-গ্রহণ)

কুমার। (রহস্যমাখা-হাস্যে)

কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যারবি

শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।

বিনি। মাটির-প্রদীপ ছিল, সে কহিল, "স্বামী,

আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।"

(অঞ্জলি-পাতা)

কবি। (বিনিকে) বৎসে, চিত্তে ধরো ধ্রুব শান্ত নির্মল আলোক।

বিনি। আমরা মৃত, জড়,—তবু কানে এসে বাজে মুক্তির সংগীত।

কবি। ভেবো না, অবসান হবে,—বিভাবরী অবসান হবে। মহাক্ষণ নিকটে।

(প্রস্থান)

(উদ্বিগ্না মাসির দ্রুত-প্রবেশ)

মাসি। (স্বগত) কতদিন আর চোখে-চোখে রাখি। (বিনিকে হঠাৎ দেখিয়া) মা-গো, মা, তোকে নিয়ে কী করি বল্ তো।

বিনি। (অভিভূতভাবে মাসিকে) কাজ আছে মাসি—মহাক্ষণ নিকটে—!

আনন্দমোহন। (বিনিকে দেখাইয়া মাসিকে) কন্যা যে লোকলক্ষ্মী।

মাসি। (জনান্তিকে) শোনো কথা। (বিনিকে) তুই জগৎলক্ষ্মী?—তবে আমাদের ঘরের মা কে! তুই চলে যাবি?

বিনি। (মাসিকে) মাসি, আর আমাকে বাঁধিস না। মহাক্ষণ আজ নিকট! কত-কাজ প'ড়ে আছে!

আনন্দমোহন। (হাসিয়া মাসিকে) দেবী কি শুধু তোমাদেরি ?—নবধর্ম যে!

মাসি। অবাক কাণ্ড! (ব্যঙ্গ) নবধর্ম! (বিনিকে শাসাইয়া) একবার বিয়েটা দিয়ে নিই, বর দেখে দূর হবে নবধর্ম! (দাপটে নথ ঘুরাইয়া প্রস্থান। চকিতে কুমার ও বিনির দৃষ্টি-বিনিময় ও হঠাৎ হাসিয়া সকলের সহিত প্রস্থান)

দৃশ্য ৮

(কলিকাতা। হাজত। গরাদের ভিতর মুকুন্দ, আর, বাহিরে ঝাঁটা-বাল্‌তি-হাতে জেলের ফালতু কয়েদী-ফরু সর্দার।)

ফরু। (এদিক-ওদিক চাহিয়া লইয়া চুপি-চুপি) একটু কথা আছে। শুনি, বাইরে নাকি চলছে—

মুকুন্দ। হ্যাঁ, চলছে,—নিষ্ঠুর পীড়ন।

ফরু। হুজুর আজ বন্দী; এ-সমস্ত তো আমাদেরই জন্যে ?

মুকুন্দ। সিংহাসনে বিদেশের রাজা। বিদেশীর অত্যাচারে দেশের প্রজা জর্জর।

ফরু। সে কী ?

মুকুন্দ। ঘরে-ঘরে দুঃখ, ভয়,— রাজ্য জুড়ে ক্রন্দন।

ফরু। এর প্রতিকার ?

মুকুন্দ। আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে।

ফরু। দূর করো,—এই দণ্ডে দূর করো। যত-সব বিদেশী দস্যু।

মুকুন্দ। একদিনে কী করবে তার।

ফরু। লড়াই।—সমূলে নাশ।

মুকুন্দ। (হাসিয়া) অস্ত্র চাই, লোক চাই।

ফরু। বিড়ম্বনা! তবে—(ভাবিয়া) প্রজারা রাজ্য ছেড়ে চলে যাক-না!

মুকুন্দ। ঝড় উঠেছে। লোকসমুদ্রে আন্দোলন দেখা দিয়েছে।—মারী, দুর্ভিক্ষ, পথে-পথে ফিরছে সব গৃহহীন-প্রজা। ঘরে-ঘরে কেঁদে মরছে পতিপুত্র-হীনা নারী,—প্রতিদিন চলছে নির্যাতন। লাঠালাঠি বেঁধে যাচ্ছে। বাইরে ভীষণ-আন্দোলন।

ফরু। আমার পরিবার, ছেলে,—কে কোথায়, কিছুই জানি না।—এ কি বেঁচে থাকা ? সমস্ত রাত কাল ঘুম হয়-নি।

মুকুন্দ। সব শুনেছি। এ জীবন তোমার একার নয়, এটাই সহস্রের জীবন। ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো! (সচকিতে) বিলম্ব হয়ে গেছে—আজ থাক্। পুলিস সর্বদা সতর্ক। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কেন বিপদ ঘনিয়ে তুল্‌বে? উঃ, আজ সমস্ত দিনটা মেঘ রয়েছে। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। যাও এখুনি চলে যাও!

ফরু। (স্বগত) তাইতো মেঘ রয়েছে, বৃষ্টিও পড়ছে—ঠিক, এইতো সুযোগ! আজই আমাকে পালাতে হবে। না-জানি সেই অনাথিনী ছেলেটাকে নিয়ে কী করছে! সে আজ আশ্রয়-হীনা। বুঝি-বা পথে-পথে কুকুরের মতোই ফিরছে। কিন্তু, কোথায় তাদের খোঁজ পাই? (ভাবিয়া) ঠিক, ভাই-রমজানই তো তা বলতে পারবে। বিচার-বিবেক ওসব পরে হবে। আজ পাপ-পুণ্য নাই! চারদিকে আছে হিংসা, এই হিংসাই তবে ভালো। অত্যাচার চলছে। (রক্তচক্ষুতে) বিদেশী! একদিন নেব, নিতেই হবে এর প্রতিশোধ!—যে করে'ই হোক নিতেই হবে!

মুকুন্দ। (আবৃত্তি) অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।

ঐ দেখো—(অন্যমনে পায়চারি। ফরু পথ ঝাঁট দিতে লাগিল, বন্দুকধারী প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। কোন্ হ্যায় রে?

ফরু। আমি, ঝাড়ুদার। হুজুর, সেলাম। এখন তবে আসি। (চলিতে-চলিতে স্বগত) অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে (প্রতিহিংসার হাসি)—

(চিন্তিত-মুখে উভয়ের প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

[কলিকাতা। এঁদো গলি।]

(রাত্রি। রমজানের সচকিতে প্রবেশ)

রমজান। (পায়চারি করিতে করিতে স্বগত) গৃহহীন পলাতক ফরু,—তবু তুমি সুখী! আমি কোন্ সুখে ফিরছি! তাকে কেমন ক'রে হাতে পাই! সে না-হলে যে সুখ নাই—বুঝি, বাঁচাই বৃথা! সে কি পালাবে?—তাকে যা খবর পাঠিয়েছি, সে কি কিছু সন্দেহ করবে? না, না, হ'তেই পারে না,—এখন তার সে-মনই নয়—পাগলের মতো চলে আসবে! কিন্তু, কই? আসছে না-যে!—ঠিক, ঐ আসছে—লুকিয়ে থাকি। (সরিয়া গিয়া লুকানো)

(উন্মাদিনীর মতো আলুথালু-বেশে ফরিদার প্রবেশ)

ফরিদা। (স্বগত) ঘোর অন্ধকার! কী বিদ্যুৎ! এই তো সেই পথ। এই পথেই তো আসতে বলেছিল। কিন্তু কই সে? কোথায়? শুনলাম, কাল সন্ধ্যাবেলা জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। (হঠাৎ সচকিত হইয়া) কিন্তু, এ সব কী বলছি—কেউ শুনল না তো? (শঙ্কায় জিভ-কাটা) এখুনি হয়তো আসবে—একটু এগিয়ে যাই। (অগ্রসর হইয়া চারদিকে ভীতভাবে চাহিয়া লইয়া) কই, এল না তো?—কী করি! চলে যাব? (ভাবিয়া) এখুনি যদি সে এসে পড়ে, আমাকে না পেয়ে যদি ফিরে যায়! আর যদি কোনোদিনই সে না আসে—যদি ফের্ ধরা পড়ে! (ভীতভাবে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে কাঁদা)।

রমজান। (আড়াল হইতে একটু একটু আগাইয়া-আসিতে-আসিতে) তার আশা? সে-আশা ছাড়ো! সে কি আবার আসে?

ফরিদা। (চমকাইয়া সশঙ্কে) কে বলল? কী বলল?—আসবে না? আর সে কি আসবে না? আমি যাব,—ওগো কে আছ ব'লে দাও কোন্‌দিকে যাব কোন্ পথে! তুমি কে?

রমজান। তাকে যে জেলে দিয়েছে,—সে-যে এখন জেলের কয়েদী।—আজো জেলই খাটছে। জেলের ঘানি টানতে হয়। তুমি গিয়ে কী করবে? (বলিতে-বলিতে সামনে-আসা। তখনি বিদ্যুৎ-চমক)।

ফরিদা। (রমজানকে দেখিয়া শিহরিয়া) তুমি? তুমি কোন্ সাহসে আজ এখানে?

রমজান। আমি—আমি প্রস্তাব করছি, এখান হতে পালাই, চলো। পালিয়ে গিয়ে দুজনে আমরা বিবাহ করি-গে'।

ফরিদা। বিয়ে? এতদূর?—স্পর্ধা তো কম নয়।

রমজান। স্বামীর সঙ্গে তোমার কোনোকালে আর মিলন হবে না। চলো—

ফরিদা। (দৃঢ়কণ্ঠে) না, সে হ'তে পারে না। (উল্টোদিকে যাইতে উদ্যত)

রমজান। খুব যে ডাঁট! বলি,—থাকবি কোথায়, খাবি কী?

ফরিদা। তার উপায় আছে।

রমজান। কোথায় থাকবি?—স্বদেশী-কুটিরে? কোথায় সিংহাসন, আর, কোথায় কুটির!

ফরিদা। সিংহাসনের চেয়ে কুটির বেশি ভালো।

রমজান। (ঝোলার মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখাইল) দেখছিস?—এই ছাখ-

না, শাড়ি, কত টাকা! গহনা!—আর নয়, চলে আয়। দেরি করলে গাড়ি ফেল্ করব।

ফরিদা। (ধমক্ দিয়া) আর কোনো কথা নয়। প্রতারক, পাপিষ্ঠ, মাথায় তোর বাজ পড়ল না?

রমজান। থাক্, আর কাজ নেই। দেখা যাক্ আমিই-বা কেমন। (হঠাৎ ফরিদার মুখে কাপড় জড়াইয়া বাঁধিয়া ফেলিতে লাগিল)

ফরিদা। (প্রাণপণে টানিয়া বাঁধন একটু আলগা করিয়া)—রক্ষা করো—রক্ষা করো (বলিয়া চীৎকার করিতেই)—বটে? (বলিয়া রমজান ফরিদার মুখ চাপিয়া ধরিল। তখন ফরিদা মরিয়া হইয়া রমজানের হাতে কামড় দিতেই রমজান "উঃ" করিয়া উঠিল। ফরিদা সঙ্গে-সঙ্গেই রমজানকে এক প্রকাণ্ড ধাক্কা মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া পালাইয়া গেল। আচম্বিতে সঙ্গে-সঙ্গে উদ্বিগ্নভাবে ফরুর দ্রুত-প্রবেশ। রমজান উঠিয়া দাঁড়াইতেই সামনে দেখিল,—ফরু। স্বগত বলিয়া উঠিল—"কে?—ফরু!" বলিয়া ভয়ে-বিস্ময়ে চম্‌কাইয়া উঠিল)

ফরু। ও কে? কে-ও? কাতর-শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

রমজান। ও পাগ্‌লি। পথ দিয়ে চলেছে। এককালে ছিল মানুষের মতো।

ফরু। (ইতস্তত চাহিয়া) এখনো এখানে সে এল্ না কেন। খবর কী?

রমজান। চিন্তা নেই বাপু। আসবে। (দুই-জনের নীরবে-পায়চারি) রাস্তায় যখন লোক থাকবে না, তখন সে গোপনে আসবে।

ফরু। সান্ত্বনার কথা বোলো না। এখনো সে বেঁচে রয়েছে কি? তাকে দেখতে ইচ্ছে করে। একবার একটু দেখে যাই!

রমজান। তার সমূহ-বিপদ যে! ছেলেটি জ্বর-বিকারে মরছে।—রাজার পাপেই প্রজা কষ্ট পায়। ঘরে-ঘরে চলছে বিদ্রোহ।—রাজার অন্যায়-বিচারে আমাদের তো অন্ন মারা গেল।

ফরু। তোমার ভাবে তো তা বোধ হচ্ছে না।

রামজান। (হাসিয়া) বোধ হচ্ছে না? (হাস্য) না ভাই, কথার-কথা বলছি-মাত্র। অন্নমারা আজ না যায়, দশদিন পরে তো যাবে।

ফরু। ও-সব কথায় আমাদের কাজ কী। তুমি বড়োলোক-মানুষ, তুমি রাজা-উজির মারো, সে শোভা পায়, আমি গরিব মানুষ, আমার অতটা ভরসা হয় না।

রমজান। রাগ করছ কেন। কথাটা শোনোই-না। তোমাকে ভাবতে হবে না। (কানে-কানে কথা)

ফরু। দেখো, আমি তোমাকে স্পষ্টই বলছি, আমার কাছে অমন কথা তুমি উচ্চারণ কোরো না।

রমজান। এ যে-গবর্মেন্টের চাকরি!—পুরস্কার দেবে।

ফরু। গোয়েন্দাগিরি? দেশের বিরুদ্ধে? (ঘৃণাভরে থুথু ফেলিয়া রমজানকে ভর্ৎসনা) আমি হব শত্রুচর? ধিক্—বরং না-খেয়ে মরব! (বলিয়া উন্মনা চলিয়া গিয়া থমকিয়া) তমিজ, বাবা আমার, মানিক আমার। আহা, সে কি বেঁচে আছে? ওর মা-ই-বা কোথায় গেল! এখনো তো এল না।। (ইতস্তত-দৃষ্টি)

রমজার। তা, অমন উতলা হচ্ছ কেন? সন্তান মরবে না।

ফরু। বউকে এবার ঘরে আনব।

রমজান। ঘর আর কোথায়? আশা ছাড়ো। বউ? বউকে—তোমার স্বদেশীরা নিয়ে গেছে।

ফরু। (ভয়ে-বিস্ময়ে-ক্রোধে) অ্যাঁ। নিয়ে গেছে? স্বদেশীরা? তবে কি স্বদেশী বিদেশী,—গরীবের পক্ষে সবাই সমান?

রমজান। যে-রকম গতিক দেখছি—বিষম বিপদ!—তবে আসি! (যাইতে-যাইতে হঠাৎ মুখ-ফিরাইয়া) ওহে, বউ-বউ করছ? বউ যে তোমার দাসী হয়েছেন! দাসীর কাজ করছেন! এটা কি পিতৃপুরুষের অপমান নয়? ইজ্জতের আর কী রইল?

ফরু। (হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া) দাসী? দাসীই যদি সে হয়ে থাকে, সে-মেয়েকে তবে কি আর আমি ঘরে আনি?

রমজান। তুমি "ঘরে' আনি—ঘরে আনি" করো,—আমি আমার কাজে যাচ্ছি। (চাপা-হাস্যে) এখনই যেতে হবে, নইলে যে বিপদে পড়ব। ওহে সর্দার, সরে পড়ো, জানো-না?—সৈন্য ফিরছে যে! ফিরছে তোমারি সন্ধানে! (প্রস্থান)

ফরু। (স্বগত) হায় আল্লা! তাকে তবে নিয়ে গেছে? এরা কী বলছে? এ তো ভালো কথা নয়। আমি আছি কোনো—মতে লুকিয়ে, না, না,—যেমন ক'রেই হোক,—জরুকে খুঁজে বের করতেই হবে। প্রাণ যায়, সেও ভালো। আর এক-মুহূর্ত-ও এখানে নয়। (প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

[কলিকাতা। পথ]

[মৌলবী লিয়াকৎ ও রমজান দুইদিক হইতে দুইজনের প্রবেশ]

লিয়াকৎ। এসো, এসো সাহেব! মুখ অমন মলিন দেখছি কেন? মেজাজ ভালো তো? হাসিখুশি নেই কেন?

রমজান। মনে আর সুখ নেই। আমরা কে?—আপনি না হাসলে আমাদের হাসবার ক্ষমতা কী! আপনার সব ভালো তো?

লিয়াকৎ। সে কী কথা, সাহেব। আমার তো অসুখ কিছুই নাই। আমি নিজে হাসি, নিজের আনন্দে নিজে থাকি। আমার অসুখ কী সাহেব?

রমজান। এখন আর আপনার তেমন গান-বাদ্য শুনা যায় না। আপনি আর-সে সেতার বাজান কই? সেতারটা কোথায়?

লিয়াকৎ। সেতার আছে, সুর মেলে না। আমার গান শুনবে সাহেব?

লিয়াকৎ। গান

এসো হে আর্য, এসো অনার্য হিন্দু-মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি' মন, ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান-ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গল-ঘট হয়-নি যে ভরা।
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে॥

[জনতা জমিয়া গেল। গান শেষ হইলে তাহারা চলিয়া গেল]

রমজান। (লিয়াকৎকে) কী বললেন?—"এই ভারতের"—বলি, ভারতের রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে তো পথের মধ্যে আমরা খুব আসর জমিয়েছি। এদিকে আজকে আমাদের নিজেদের কুরুক্ষেত্রে কী ঘটছে তার খবর কেউ রাখি-নে!

লিয়াকৎ। (বিস্ময়ে) কী খবর?

রমজান। ফক্রুর পরিবার!—ঘুরে এলুম, কোথাও-তো তাকে পাওয়া গেল না।

লিয়াকৎ। এ কী বলছ?

রমজান। মনে ধাঁদা লেগেছে, কিন্তু কিছু স্থির করতে পারছি-নে।

(লিয়াকতের সঙ্গে কানে-কানে কথা)

লিয়াকৎ। (স্বগত) কংগ্রেসের সময় নিকটবর্তী। গুজব রটিয়ে......দাঙ্গা? (সক্রোধে) প্রকাশ্যে আমরা অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত হব?—এ কী বলছ?

রমজান। (স্বগত) ঈস্, ইনি-যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে আমাদের সকলের উপর টেক্কা দিতে এসেছেন। (প্রকাশ্যে) অদ্ভুত ঠেকছে! সন্দেহের কি কোনো কারণ নাই?

লিয়াকৎ। (রমজান-সম্বন্ধে স্বগত) এ যে শত্রুচর! এর কথার মধ্যে একটা কী যেন চক্রান্তের সুর আছে। (দ্বিধায়) তাই-তো! ব্যাপারটা যে বোঝা শক্ত। (প্রকাশ্যে) কী যে হতে পারে ভালো বুঝতে পারা গেল না। বউটা কোথায় গেল। দেখি, কী করতে পারি। এখন তো চলো। (উভয়ের প্রস্থান)

দৃশ্য ৯

[কলিকাতা। দুস্থ-সেবা-কুটির-প্রাঙ্গণ]

(প্রাক্-সন্ধ্যা। নিজের মনে পায়চারি করিতে করিতে নিবেদিতা গাহিতেছিল)

গান

বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে।
মন যে কেমন করে মনে-মনে তাহা মনই জানে॥

(ফরিদা আসিয়া নিবিষ্টমনে শুনিতে-শুনিতে পিছনে বসিল)

ফরিদা। দিদি!

নিবেদিতা। কে? (ফিরিয়া তাকাইল)

ফরিদা। বাছার-আমার কী হল? তিনদিনের জ্বর,—বিছানায় প'ড়ে আছে। কী হবে? জেনে-শুনে কিছু তো দোষ করি-নি।

নিবেদিতা। ভয় কোরো না। আল্লার নাম করো। আল্লা মালেক।

ফরিদা। (দুই হাত তুলিয়া প্রার্থনা) আল্লা, হায় আল্লা। (দীর্ঘ-নিঃশ্বাস

ফেলিয়া) কতদিন কেটে গেল। (চোখে আঁচল দেওয়া) কতকগুলো মিথ্যে ওষুধ আর কেন? এমন-একটা ওষুধ দাও (নিজের বুকে অঙ্গুলি রাখিয়া)—শীঘ্র এই পোড়া-প্রাণটা যাতে যায়।

নিবেদিতা। এমন কথা বলবে না।

ফরিদা। একে-একে সকল কথা যে মনে পড়ে! (কিছুক্ষণ থামিয়া) তার চেয়ে গান শুনি—গাও--

নিবেদিতা। অনেকদিন তাকে দেখিস নাই। তোর মন কেমন করবেই তো। (নিজের চোখ-মোছা)

ফরিদা। আমার-মতো অনাথার সংসার ঠিক স্থান নয়। একলা থাকলেই আমার সমস্ত কথা আমাকে যেন ঘিরে বসে; ভয় হয়, পাছে পাগল হয়ে যাই। যে-মানুষ ডুবে মরছে তার পক্ষে ভেলা যেমন, আমার তেমনি—আমার ছেলে, আমার বুকের ধন।—এখন ওই তো সম্বল! (অশ্রুপাত)

নিবেদিতা। ও কী, কাঁদছিস কেন?

ফরিদা। আর-জন্মে নিশ্চয়ই তুমি আমার মা ছিলে। না-হলে এ-সংকটে তোমাকে পাব কেন? নিরুপায়ের উপায় কে করত?

নিবেদিতা। তোমাকে যেন কতকাল জানি, একটুও পর মনে হয় না।

ফরিদা। আমি মূর্খ! লোকটা আমাকে প্রতারণা করল। এতদিনে নষ্ট হ'তে পারতাম। তোমার কী গুণ—। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করবার জন্য—

নিবেদিতা। আচ্ছা ভাই, স্বামীকে তোমার—

ফরিদা। স্বামী তো নিরুদ্দেশ। মনে পড়ে তার জেলের দুঃখ, তার একঘেয়ে জীবন। সব কথা তো শোনো নাই—

নিবেদিতা। কিছু বলতে হবে না, সব জানি।

ফরিদা। আমাকে কি তোমার ভালো লাগবে?

নিবেদিতা। আমি তোমাকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি।

ফরিদা। পায়ে স্থান দিতে হবে। সেবা করতে পারলে আমি আর কিছুই চাই না।

নিবেদিতা। ছেলে আছে, তার জন্য রীতিমতো খাটতে হবে।

(আলাপরত কবি ও লিয়াকতের প্রবেশ)

কবি। রুগ্ন ছেলে। আহা, বেচারা বড়ই কষ্ট পাচ্ছে!

লিয়াকৎ। বড়ই কষ্ট পাচ্ছে—তা ঠিক,—সন্তানের কষ্ট মার কাছে অত্যন্ত দুঃসহ। শীঘ্রই একটা-কিছু ব্যবস্থা করছি—তাকে আমি নিজে তার-বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।

কবি। এখন নয়; ডাক্তার আশা ছেড়ে দিলেই যে রোগী সব-সময় মরে তা নয়। তার বাড়ি কোথায়?

ফরিদা। (আগাইয়া আসিয়া লিয়াকৎকে) তাড়িয়ে দিয়েছে—জানো না তো, —সমস্ত সংসার আমাকে যে তাড়িয়ে দিয়েছে! বাড়ি?—আমার আবার ঠাঁই?

লিয়াকৎ। সমস্ত সংসারই যে তাড়িয়ে দিয়েছে—এমন কেন ভাবছ!

ফরিদা। (কবির দিকে চাহিয়া) শেষে তাই এসেছি এই পিতার কোলে।

কবি। জননি, তুমি যে আমার,—প্রভুর দান।

লিয়াকৎ। চলো মা, তোমার বাড়ি,—আমার সঙ্গে চলো।

ফরিদা। ওগো, কোথায় যাব? ঘর কোথায়? আমার স্থান নাই। এখানে বেশ আছি।

(দ্রুত রমজানের প্রবেশ)

রমজান। (ফরিদাকে অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া লিয়াকতকে) জনাব, ওই যে ফরুর পরিবার। হতভাগিনী স্বামীকে ত্যাগ করে এসেছে। মনে ওর দোষ ঘটেছে।

ফরিদা। (রমজানকে দেখিবামাত্র ফরিদা আঁৎকাইয়া উঠিয়া—'ও মাগো'—বলিয়া চীৎকার দিয়া নিবেদিতার পায়ে গিয়া পড়িল। নিবেদিতা 'ভয় নেই' বলিয়া ফরিদাকে তুলিয়া লইল। রমজানকে দেখাইয়া ফরিদা নিবেদিতার কানে-কানে বলিল—"ওই তো আমাকে সেই রাত্রে ভুলিয়ে পথে—")

(তখনই শোনা গেল—বাহিরে নেপথ্যে গেটে-প্রবেশকারী ফরুর সঙ্গে অরুণের উত্তেজনা-পূর্ণ কথাবার্তা)

অরুণ। ও কী! কী করছ? কে তুমি?

ফরু। তোরা কে?

অরুণ। হঠাৎ অমন খাপ্পা হয়ে উঠলে কেন? যদি প্রবেশের চেষ্টা কর, অপমান হ'তে হবে।

ফরু। আমার বউকে যদি ছেড়ে না দাও ভালো হবে না বলে রাখছি।

অরুণ। গোল করিস-নে! না, না, বলছি এখানে ঠাঁই মিলবে না। দূর হ! —ভিখারি।

(ফরুর গলা শুনিয়া ভিতরে ফরিদা চম্‌কাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল)

ফরিদা। কে? ও কে? (বাহিরের দিকে আগাইয়া যাওয়া)

কবি। (বাহিরের অভিমুখে আদেশ) কে এসেছে? ওকে ভিতরে নিয়ে এসো।

(ছুটিয়া রক্তচক্ষু-ফরুর প্রবেশ ও রোষে কবির দিকে ধাওয়া, ফরিদা গিয়া ফরুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইল)

ফরু। ছুঁসনে, ছুঁসনে, রাক্ষসি, দূর হ—(ঝাঁকুনি দিয়া ঠেলিয়া দেওয়া)

লিয়াকৎ। সমস্তই কী সুন্দর অথচ কী নিদারুণ-আঘাতে সমস্তই আজ কী বিচ্ছিন্ন।

ফরিদা। (কাতর অনুনয়ে ফরুকে) তুমি আমাকে ত্যাগ করবে? যতদিন জীবন আছে, কেবল সেবা করব, আর কিছু চাই না। পাগলের মতো তোমাকে অনেক খুঁজলাম। (রমজানকে দেখাইয়া) ঐ, ঐ-যে শয়তান—ও-যে ছলনা করলে। আমি ওর বুদ্ধিতে প'ড়ে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলাম। ও ইচ্ছে করেই তোমার নাম ক'রে আমাকে সে-পথে দাঁড় করিয়েছিল।—কী চক্রান্ত! তখন কি অত বুঝেছি? না, ভাবতে পেরেছি?

ফরু। (রমজান এক-পা দুই-পা করিয়া ভয়ে পলাইতেছিল, তাহাকে দেখিতে পাইয়াই ক্রুর-হাস্যে কোমর হইতে ছুরি তুলিয়া)—রাত্রে সেদিন পথে কী বলেছিলে? বলেছিলে-না, ও এক পাগ্‌লি?—এককালে ছিল মানুষের মতো! তুমি এত শয়তান? (রমজানের দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল, ফরিদা শক্ত মুঠিতে ফরুর হাত ধরিয়া রহিল)

রমজান। (কবির পা জড়াইয়া আর্তকণ্ঠে) হুজুর, রক্ষা করো, রক্ষা করো। আশ্রয় না দিলে আমাকে এখনই মরতে হবে।

ফরু। পাপিষ্ঠ, কখনোই তোকে ছাড়া হবে না।

কবি। (লিয়াকতকে) সাহেব, ব্যাপার কী? (রমজানকে) তোমার কী বলবার আছে?

রমজান। হুজুর, আমিই একা অপরাধী। ফরুর পরিবার নষ্ট হয় নাই। ফরিদা সতীলক্ষ্মী।—হুজুরের শ্রীচরণ-ছাড়া এখন আমার আর কোনো ভরসা নাই। হুজুর মাতা-পিতা। (পায়ের উপর পড়া)

কবি। (বিস্মিত-দৃষ্টিতে লিয়াকতকে) তাই তো, এ সব কী? ভূতের কাণ্ড?

লিয়াকৎ। না, এ ভূতের কাণ্ড নয়। (রমজানকে দেখাইয়া) এ একজন নির্বোধ, বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ডের কাজ। উদ্দাম-প্রবৃত্তির উত্তেজনার সম্মুখে স্নেহ দয়া ধর্ম সমস্তই ওর তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল!

রমজান। (ফরুকে) আমাকে ক্ষমা করো।

কবি। (ফরুকে স্মিতহাস্যে) তুমি আমাকে মারতে চাও? কার মন্ত্রণায়? ভাই, তোমার আমার একই রক্ত। সেই রক্তপাত করতে চাও তো করো। (ফরুর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন)

ফরু। ভুল, ভুল। সবই দেখছি প্রবঞ্চনা! চাতুরী! (লজ্জায় মুখ ফিরাইল। রমজানকে) দালাল, শত্রুচর!—তোমার পেটে এত কুমতলব ছিল। কী কৌশল!—কেন তখন ব'লে বেড়াচ্ছিলে—

রমজান। আমি পাপিষ্ঠ, আমার ছলনা ধূলিসাৎ। আমি এখন নিরাশ্রয়। (কবির পায়ে পড়িয়া) কোথায় যাব—(নিজেকে দেখাইয়া) আমি শত্রুচর, গোয়েন্দা! দেশে ফিরে গেলে আমার সর্বনাশ হবে।

কবি। তুমি আমারই কাছে থাকো, আর-কোথাও যেয়ো না।

রমজান। মহারাজ, আমি আপনার অধম সেবক। আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নাই। আমার কিসে ভালো কিসে মন্দ কিছুই জানি না। আপনার পথ-ছাড়া আমার অন্য পথ নাই।

লিয়াকৎ। (ব্যঙ্গহাস্যে রমজানকে) বাবা,—ঘটনা চুকে যায়, চরিত্র যে থাকে।

কবি। (লিয়াকৎকে) সন্তানকে মানুষ করতে স্নেহের-ও প্রয়োজন হয়।

লিয়াকৎ। (কবিকে সেলাম করিয়া অভিভূত-ভাবে) প্রজারা যদি ঠিক জানত, তাহলে আপনাকে তারা নিজেদের একজন-ব'লেই চিনতে পারত।

কবি। (ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া ভক্তিতে) তাঁরই জয় হোক।

ফরিদা। (নিবেদিতাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া) দিদি, তুমি তবে চললে?

নিবেদিতা। রুগ্ন-ছেলেটা যে ওদিকে বিছানায় পড়ে রয়েছে।

ফরিদা। যাও তুমি। ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রাখো-গে।

ফরু। (আগাইয়া গিয়া ফরিদাকে) বউ, সমস্ত জীবন কত কষ্ট-না তোকে দিনু। এই বেলা চলো ঘরে যাই।—লোকে বলবে কী?

ফরিদা। যাব কোথায়?—কোথায় যেতে বলছ? (কণ্ঠে অসহায়-নিঃসম্বলের বেদনা ঢালিয়া) কোথায় কী আছে যে যাবে? ঘরে? সে-আশা আর কোরো না গো।

ফরু। তা ঠিক! আমার আর কিছুই নাই। তবু, তুমি তো আছ? তাই আমার সব আছে।—আমার সবই আছে গো সবই আছে।

লিয়াকৎ। (ফরিদাকে) কোনো ভয় নাই, তুমি ওই মহৎ-আশ্রয়েই থাকো। (কবিকে) মহারাজ, কন্যা তাঁর পিতৃগৃহেই আছে। (ফরুকে) স্ত্রীকে শিশুকে মানুষ ক'রে তুলতে হবে না?

ফরু। তুলতে তো হবেই। (কবিকে দেখাইয়া লিয়াকৎকে) উনি যদি আশ্রয় না দেন?—তবে কী হবে।—(নিজেকে দেখাইয়া) আমি তো পলাতক। জেলের কয়েদী! আমি জেলেই যাব। বিদায়—

কবি। (ফরুকে) কোথায় যাচ্ছ?

ফরু। —পাপের শাস্তি নিতে।

কবি। (ফরিদাকে দেখাইয়া) শাস্তি নয়,—ঐ যে রয়েছে তোমার পুণ্যের পুরস্কার,—ও যে সাক্ষাৎ-মহাপুণ্য?

ফরু। (কবিকে) জামিন দিতে পারবে?

কবি। (ফরুকে) সে পরে দেখা যাবে। এখন ঘরে এসো। (ফরিদাকে) এসো মা।

লিয়াকৎ। এ কী দৃশ্য! (কবিকে) আজ আপনার দ্বারে শত্রু-মিত্র-সকলে একত্র হয়েছে।

কবি। আমার কী সৌভাগ্য।

লিয়াকৎ। মহারাজ, আমিও কিন্তু তোমার এক শত্রু। তবে যা সন্দেহ ছিল,—সমস্ত সন্দেহ আজ ভেঙে গেছে। আমিও তোমার হাতে ধরা দিলাম।

তমিজ। (নেপথ্যে কাতর-ক্ষীণকণ্ঠে) মা কোথায়? মা, তুই যাস না।

ফরু। বাপ আমার, মানিক আমার।

(রুগ্ন-তমিজকে কোলে লইয়া নিবেদিতার প্রবেশ)

তমিজ। বাবা, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

লিয়াকৎ। (তমিজকে দেখাইয়া রহস্যের সহিত সহাস্যে নিবেদিতাকে) এ কী করেছ? ঐ তমিজ—ও যে ম্লেচ্ছ? ওকে কোলে নিয়েছ? (কোল হইতে নামাইয়া দেওয়ার ইঙ্গিত)

নিবেদিতা। (সহাস্যে) ছোটো-ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে, জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না।

লিয়াকৎ। (কবির দিকে তাকাইয়া) তাই কি?

কবি। আমার কোনো জাত নাই। আমার জাত,—মানুষ। মানুষ যখন মরছে তখন কিসের জাত?

নিবেদিতা (তমিজকে দেখাইয়া কবিকে) ছেলের চোখে যে ঘুম নেই, কী করি! (তমিজকে) চলো, মনি, পুতুল দেব। চলো—

ফরিদা। (নিবেদিতাকে) তোমার ঋণ আমি কোনো-জন্মে শোধ করতে পারব না। (ফরু তমিজকে কাছে নিয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিল)

তমিজ। (ফরুর অনাবৃত সর্বাঙ্গ দেখিতে দেখিতে) বাবা, তোমার কিছু কি নেই বাবা?

ফরু। কিছুই নেই বাবা, কেবল তুমি আছ।

কবি। (আগাইয়া গিয়া নিজের গায়ের শালখানি খুলিয়া ফরুকে দিয়া) ছেলের গায়ে এটা জড়িয়ে দাও। শীত পড়েছে। ছেলেটা কাঁপছে! ঢেকে রাখো।

ফরু। (কবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল) তুমিই জড়িয়ে দাও।

কবি। না, তুমি দাও। আমি দিলে কোনো ফল নাই। তুমি দাও,—আমি কেবল তোমার ছেলের মুখে আনন্দের হাসিটুকু দেখি। আমি কোনো কাজ করতে পারি না। কী করলে একটি ক্ষুদ্র বালকের রোগের কষ্ট একটু নিবারণ হবে, তাও জানি না, কেবল অসহায়ভাবে শোক করতেই জানি। এবার থেকে আমি আর ঘুরে বেড়াব না। এখন থেকে লোকালয়ের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে শিখব।

(ফরু নিবেদিতার কাছে গিয়া ছেলের গায়ে শালখানি জড়াইয়া দিল, ছেলে চুপ করিয়া রহিল)

লিয়াকৎ। (ফরুকে দেখিয়া) আহা, এ কী সুখী।

কবি। (নিবেদিতাকে) তোমার কাজ দেখলে আমার লোভ হয়।

(কবি ও নিবেদিতার কথার ফাঁকে ফরুকে কাছে ডাকিয়া নিয়া রমজান চুপে-চুপে কী বলিতে লাগিল, হঠাৎ ফরুর ভাবান্তর ঘটিল। ভয় ও ক্রোধের সঞ্চার হইতে দেখা গেল)

নিবেদিতা। (কবিকে) আমি তোমারই তো এক অংশ। তুমি না থাকলে আমি কি কাজ করতে পারতাম? আমরা এখন আসি। (ফরু ও ফরিদাকে ডাকিয়া নিয়া চলিতে গেলে)

ফরু। মহারাজ, ছেলেকে আশীর্বাদ করো।

কবি। (তমিজের মাথায় হাত রাখিয়া) বেঁচে থাকো, বাবা। (নিবেদিতাকে)

তুমি কাজে যাও। (তমিজ-কোলে নিবেদিতা, চিন্তা-ব্যাকুল মুখে রুরু ও শান্তিভরা-মুখে ফরিদার প্রস্থান; সেইদিকে চাহিয়া—লিয়াকৎকে) মেয়েটি কালো বটে, কিন্তু বেশ শ্রী আছে। কী স্বাধীন-ভঙ্গী! (ফরিদাকে দেখাইয়া) এই এরা, যারা নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে, এদের মধ্যেও আকর্ষণ আর মনো-রঞ্জনের চেষ্টা আছে। এদের ঠিক-অবস্থাটা, ঠিক মনের ভাবটা ভারি জানতে ইচ্ছা করে। যাক, ছেলে-পিলে জুটল। এখন একটা পাঠশালা খুলি। তাদিকে পড়াই, খেলি, পীড়া হলে দেখি, মানুষ গড়তে লাগি, মনুষ্য-জন্ম সার্থক করি—সার্থক না হয়, অন্তত, সার্থক করার চেষ্টায় নিজের অসম্পূর্ণ-জীবন বিসর্জন করি। দুঃখ এই যে আমার কার্য আমি নিপুণরূপে সম্পন্ন করতে পারছি না।

লিয়াকৎ। জীবনের মূল্য কে বোঝে। একটি মানুষের জীবন যে কত মহৎ ও কী-প্রাণপণ-যত্নে পালন ও রক্ষা করবার দ্রব্য। বরঞ্চ, রাজ্য-পরিত্যাগ করা সহজ, কিন্তু আমাদের আজন্মকালের ছোট-ছোট অভ্যাস আমরা অনায়াসে ছাড়তে পারি না।

কবি। মানবের হাস্যালাপ, ওঠা-বসা, চলা-ফেরার মধ্যে এক অপূর্ব নৃত্যগীতের মাধুরী দেখতে পাই। যখন দুই ছেলেকে পথে খেলা করতে দেখি, দুই ভাইকে, পিতা পুত্রকে, মাতা ও শিশুকে একত্র দেখি, তারা ধূলিলিপ্ত হোক, দরিদ্র হোক, কদর্য হোক—তাদের মধ্যে দূর-দূরান্ত-ব্যাপী মানব-হৃদয়-সমুদ্রের অনন্ত গভীর প্রেম দেখতে পাই। একটি শিশুক্রোড়া-জননীর মধ্যে যেন অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানব-শিশুর জননীকে দেখি, দুই বন্ধুকে একত্র দেখলে সমস্ত মানবজাতিকে বন্ধুপ্রেমে সহায়বান অনুভব করি। পূর্বে যে পৃথিবীকে মাঝে-মাঝে মাতৃহীনা বোধ হত, সেই পৃথিবীকে আনত-নয়না চিরজাগ্রত জননীর কোলে দেখতে পাই। কোথা কর্মক্ষেত্র। —কোথা জনস্রোত। কোথা জীবন-মরণ। কোথা সেই মানবের অবিশ্রাম সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পদ তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস। আমি আর ঘুরে বেড়াব না, এখন থেকে লোকালয়ের মধ্যেই কাজ করতে শুরু করব।

(উক্তিরত বিশুর প্রবেশ)

বিশু। (কবিকে) তোমার সঙ্গে শত্রুতা করলেও লাভ আছে। এখানে এ যে দেখছি আজ ছোটবড়ো সকল ভাইয়ের মিলন।

কবি। এ কী, তুমি কোথা থেকে? দেখছি দৈব আজ অনুকূল। (বিশুকে আলিঙ্গন করিয়া) এসো ভাই এসো, ভালো আছ তো? পালাস-নে যেন ভাই।

বিশু। (কবিকে) আমি কাছে থাকলেই তো তোমার বিপদ ঘটবে। জানো-না, আমি কে ?

কবি। (হাসিয়া) এ-বয়সে আর বিপদ ? —তুমি আর কে হবে—তুমি যে আমার ভাই !

বিশু। আমার আর দুঃখ নাই—এখন শান্তি পাচ্ছি !

কবি। শান্তি সুখ আপনার মধ্যে আছে ; কেবল জানতে পাই না।

লিয়াকৎ। এ যেন মাটির হাঁড়িতে অমৃত আছে,—কারো বিশ্বাস হয় না। হাঁড়ি ভাঙলে তবে অনেক-সময় সুধার আস্বাদ পাই। হায়, হায়, এমন জিনিসও এমন জায়গায় থাকে।

কবি। আজ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে নবজাতির জন্মসংগীত আমি শুনতে পাই। প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলি—সুদূর সম্ভাবনাগুলি-পর্যন্ত দেখতে পাই—তাই আমার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আশা। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধ-স্থাপনই চিরকাল ভারত-বর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। এইবার সময় এসেছে যখন প্রত্যেকে জানবে আমি ক্ষুদ্র হলেও কেউ আমাকে ত্যাগ করতে পারবে না, আর ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করতে পারব না।

বিশু। (রমজানকে দেখিয়া) কে গো ? তুমি ? এখানে ? সরকারী-কর্মে না কি ?

রমজান। না দাদা। ও-পাপ আর না। (কবিকে দেখাইয়া) দাদার বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত করতে পারব না। ও-সব বিদেশী-সাহেবের কাছে আর ঘেঁযব না।

লিয়াকৎ। (ঠাট্টাচ্ছলে বিশুকে) তুমি-দাদা আবার প্রহরীর হাতে স্বদেশীদের ধ'রে তুলে দেবে না তো ?

বিশু। (লিয়াকৎকে) বেঁচেছি। বেঁচেছি ! বান্দা ওদিকে ?—আর না। (আঙুল দিয়া নেপথ্যে ইঙ্গিত করিয়া চুপি-চুপি) ওদিকে যে মজলিশ ! গুপ্ত-আলোচনা, নানা পরামর্শ চলছে—সব স্বকর্ণে শুনেছি। দিল্লী-দরবারের উদ্‌যোগ হচ্ছে। সম্রাটের অভ্যর্থনা-উৎসব হবে ! আরো কত-কী ! দেশেরও একদল এ-নিয়ে মেতে উঠেছে।

লিয়াকৎ। (ঘৃণায় ও ক্রোধে) দরবার ?—অভ্যর্থনা-উৎসব ?—যত-সব ভিক্ষুকের দল !—এক-এক সময় দেশের লোকের উপর আমার এমন অসহ্য রাগ হয়—ইংরেজকে দেশ-থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না ব'লে নয়, কিন্তু, কোনো-বিষয়ে এরা কিছু করছে না ব'লে। এরা দেশের লোককে কিছু শেখাতে চায় না, দেশের ভাষাকে

অবজ্ঞা করে—এরা মনে করে কংগ্রেস ক'রে সকলে মিলে দুই হাত তুলে গবর্ণমেণ্টের দোহাই পেড়ে এরা বড়লোক হবে।—ছিঃ-ছিঃ!

(আনন্দমোহনের প্রবেশ)

আনন্দমোহন। সে-গুড়ে বালি! (কবিকে) ওদিকে যে যজ্ঞভঙ্গ!—কংগ্রেস তো গেল!

লিয়াকৎ। এবারকার কংগ্রেসে একটা উপদ্রব ঘটবে,—এ আশংকা সকল পক্ষেরই মধ্যে পূর্ব-থেকেই চলছে।

কবি। হায়! মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয়-দলই কংগ্রেস অধিকার-করাকেই যদি দেশের কাজ করা একান্তভাবে না মনে করতেন! দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্নের অভাব মোচন করবার জন্ত যদি নিজের শক্তিকে নানা পথে নিয়োজিত রাখতেন! যদি দেশের জনসাধারণ দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতেন! হায়, সে কি আর কখনো হবার!

আনন্দমোহন। সমস্ত মানুষগুলো যেন উপচ্ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি পরিণত-মনুষ্যত্ব কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। যখন এরা ভাবের কথা বলে তখন সেণ্টিমেণ্টাল্ হয়ে পড়ে, আর, যখন যুক্তির কথা পাড়ে তখন ছেলেমানুষি করে।

কবি। এ আমার অন্তরের আক্ষেপ। জীবনের অনেকটা অবসাদ এই মানুষের অভাবে।

ফিরায়েছি মুখ রুধিয়াছি কান
লুকায়েছি বনমাঝে।
সুদূর মানব-সাগর অগাধ
চিরক্রন্দিত ঊর্মি-নিনাদ
হেথায় বিজনে রয়েছি মগন
আপন গোপন-কাজে।

(উক্তিরত মাধবের প্রবেশ)

মাধব। কিন্তু রাজা, তুমি মুখ ফিরিয়ে চলেছ কোথায়? তোমাকে ছাড়ছি-নে।

সকলে। তোমাকে ছাড়ছি-নে!

(উক্তিরত রঘুনাথের প্রবেশ)

রঘুনাথ। (কবিকে) তোমাকে না-দেখে থাকতে পারি নে-যে।

বিশু। (কবিকে) তুমি ছাড়লে আমি ছাড়ি কই?

কবি। (হাসিয়া বিশুকে) তোদের তো বড়ো আস্পর্ধা হয়েছে।

লিয়াকৎ। (কবিকে) তোমাকে দেখে আজ আমার সর্বগায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

রমজান। (কবিকে) তোমার কথা আমি তেমন বুঝি-নে কিন্তু তোমাকে বুঝি। তা আমার রাজায় কাজ নেই, তোমার পাছেই রয়ে গেলুম।

(হাতে কিছু কাগজ-পত্রের ফাইল লইয়া কুমার, বীরেন, অরুণ ও উক্তিরত-বিনির প্রবেশ)

বিনি। (হাসিয়া ইঙ্গিত-পূর্বক কবিকে)—ঠক্‌লুম না তো?

কবি। (বিনিকে সহাস্যে) আমাকে নিয়েই যদি সম্পূর্ণ চলে, তাহলে ঠক্‌লি-নে। আমার আমার চেয়ে বেশি যদি কিছু দরকার থাকে তাহলে ঠক্‌লি বৈ কি!

কুমার। (কবিকে) তোমাকে খুঁজে আমাদের দেরি হয়ে গেল।

কবি। (কুমারকে) আজ আমাকে অন্য-জায়গায় খুঁজলে মিলবে কেন?

(অদূরে কুটিরের শরণাগতরা আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল, এবারে তাহারা কবিকে নমস্কার করিয়া বলিল—)

শরণাগতরা। মহারাজের জয় হোক। (নমস্কারান্তে প্রস্থান)

কবি। (প্রস্থানপর-শরণাগতদের প্রতি হাত তুলিয়া আশীর্বাদান্তে তাহাদের দেখাইয়া লিয়াকৎকে) এরা-সব সরল লোক—চুপ ক'রে এদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও এরা ভাবে, এদের যেন কত সেবা করলুম।

লিয়াকৎ। (কবিকে) আর, যারা মস্ত-লোক?

আনন্দমোহন। (লিয়াকৎকে) তাদের কাছে মুণ্ডটাও যদি খসিয়ে দেওয়া যায়—

বিশু। তারা মনে করে—

মাধব। মনে করে, লোকটা বাজে-জিনিস দিয়ে ঠকিয়ে গেল।

কবি। কাল আমাদের পুণ্যাহ শেষ হয়ে গেল। বিস্তর প্রজা এসেছিল। বুড়ো-প্রজা রূপচাঁদ বললে, কতদিন পরে দেখা—এক-বৎসর তোমায় দেখিনি। আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র-জমিদার হতুম তাহলে আমি এদের বড়ো সুখে রাখতুম—এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সুখে থাকতুম। আজ আমি এক অনামিকা-চিঠি পেয়েছি। আমাকে সে কখনো দেখেনি। কিন্তু আজকাল আমার সাধনার মধ্যে সে আমাকে দেখতে পায়। (পকেট হইতে চিঠি লইয়া পড়া—) লিখেছে—"তোমার সাধনায় রবিকর পড়িয়াছে, তাই রবি-উপাসক যত ক্ষুদ্র যত দূরের থাকুক তবুও তার জন্যেও আজি রবিকর বিকীর্ণ হইতেছে। তুমি জগতের কবি, তবুও সে ভাবিতেছে আজি তুমি তাহারও কবি।" ইত্যাদি-ইত্যাদি।

অরুণ। মানুষ ভালোবাসার জন্যে এতই ব্যাকুল যে, শেষকালে—

বীরেন।—নিজের আইডিয়াকে নিয়ে ভালোবাসতে থাকে।

বিনি। (হাসিয়া ইঙ্গিত-মূলকভাবে কবির দিকে চাহিয়া আবৃত্তি)

মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে
সেই লোকালয় হতে।
সুপ্ত-নিশীথে জেগে উঠে' তাই
চমকিয়া উঠি' বলি—'যাই-যাই'
প্রাণমন-দেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানব-স্রোতে।

(হাতের ফাইল দেখাইয়া কবিকে মিষ্টি-মিষ্টি হাসিতে) পত্রিকার আগামী মাসের জন্য লেখা?

কবি। হয়নি।

কুমার। সম্পাদকের তাড়া আছে।

আনন্দমোহন। (কবিকে) পোলিটিক্যাল প্রবন্ধটা?

কবি। (আনন্দমোহনকে) আজ যেমন ক'রেই হোক সেটা শেষ করতেই হবে।

অরুণ। (কবিকে) কাছারির চিঠিগুলি?

কুমার। প্রুফও স্তূপাকার জমেছে।

বীরেন। সেগুলি যে ছাপাখানায় দেবার সময় হয়েছে।

কবি। যত বিচিত্র-রকমের কাজ হাতে নিচ্ছি, কাজ-জিনিসটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ততই বাড়ছে। আমি ভেবে-পাই-নে কোন্‌টা আমার আসল-কাজ। মন ভালো থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব, কৃতকার্য হব। আমি নিশ্চয় জানি—'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'। ক্রমে-ক্রমে আমি দেশের মন হরণ ক'রে আনব—নিদেন আমার দু'চারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে!

আনন্দমোহন। (হাসিয়া সগর্বে কবিকে উৎসাহের সহিত) দিন-দিন যে খ্যাতি বাড়ছে।

কবি। (হাসিয়া) অন্যদিকে যে লোকের ভিড়-ও তেমনি বাড়ছে। (ভাবান্তর) আমি লোক-ভালোবাসি-নে ব'লে যে আমি লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে চাই তা নয়, আমার মন নড়বার-চড়বার এবং কাজ-করবার জন্যে অনেকখানি জায়গা চায়।—'সাধনা' আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক-অরণ্য-ছেদন করবার জন্যে এ-কে আমি ফেলে রেখে মর্‌চে-পড়তে দেব না—এ-কে

আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না-পাই-তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।

(চৌধুরীর প্রবেশ)

চৌধুরী। (কবিকে) সভা হচ্ছে—সভা! সভায় তোমাকে আসতে হচ্ছে—বাঁড়ুয্যের বক্তৃতা হবে।

কবি। (সহাস্যে চৌধুরীকে) এসো, এসো,—তুমি এসেছ, তোমাকে দেখে ভাই, খুবই খুশি হয়েছি।—"সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত"—। তোমরা ভাবো,—আমি আজকাল সাধারণের সঙ্গে মিলেমিশে', আলাপ-আতিথ্য ক'রে খুব-একজন দিগ্‌গজ পাব্লিকম্যান হয়ে উঠেছি · সেটা কিন্তু অত্যন্ত ভুল।

চৌধুরী। (কবিকে) চারদিকে বিষম গোলমাল। ঠিক-মতো প্রতিকারের চেষ্টা কোথাও নাই। দুই-দলই কেবল নিজের বল-বৃদ্ধি করবার জন্য চেষ্টা করছে।—গুণ্ডাগিরি—! কেউ ভুলবে না, কেউ ক্ষমা করবে না, নিজেদের ঘরে আগুন-দিতেই সবাই নিযুক্ত। আপনার পার্সোন্যাল-ইনফ্লুয়েন্সের দ্বারা—যদি কিছু—

কবি। আমার পার্সোন্যাল-ইন্‌ফ্লুয়েন্সের দ্বারা দেশের উপকার-সাধন?—ওরে বাস্-রে। আমার এমন সংগতি নেই যে, কারো দুঃখ দূর করতে পারি। কাজ কী ভাই?—পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াই। কিন্তু জানি, অন্যায় দমন করবার জন্য প্রত্যেক মানুষের যে স্বগায় অধিকার আছে যথা-সময়ে তা যদি খাটাতে না পারি তবে মনুষ্যের নিকট হেয় এবং ধর্মের নিকট পতিত হব। অবস্থা হচ্ছে ব্যাধি, ব্যবস্থা হচ্ছে তার প্রতিকার। উত্তেজিত-হবার কোনো প্রয়োজন নাই। সত্যকে যদি আমরা রক্ষা করি ও মঙ্গলকে বিশ্বাস করি তবে ধৈর্য শান্তি ও উদারতা আমাদের পক্ষে সহজ হবে; তবে বিলম্বে অসহিষ্ণু, পীড়নে ভীত, বা পরাজয়ে হতাশ্বাস হব না।

চৌধুরী। বুদ্ধির পার্থক্য ও মতের অনৈক্য,—এসব?

কবি। সব সহ্য করব।

চৌধুরী। স্বাধীনতা বা স্বরাজের—কী হবে?

কবি। এই ক'রেই স্বাধীনতা বা স্বরাজ্যের যথার্থ অধিকার লাভ করতে পারব।

চৌধুরী। আন্দোলনের দ্বারা ফল হবে?

কবি। জয় হবে, ভারতবর্ষেরই জয় হবে। ভারতবর্ষের ধর্ম,—সমস্ত সমাজেরই ধর্ম। এক-কে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা

—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ এই করেই চলেছে। ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য এবং বিপরীতের মধ্যে সেতু-স্থাপন ক'রে সকল সত্যের মধ্যে আপনার অধিকার-বিস্তার—একদিকে নত না হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হওয়াতেই হচ্ছে আপনার প্রকৃত উন্নতি।—এবারে আর নয়—উঠতে হল।

—তোমরা তবে এসো। (সকলে প্রস্থানোদ্যত) ঐ দেখো—(কুটীরের বালক-বালিকাদের লইয়া সান্ধ্য-প্রার্থনার জন্য উপাধ্যায় বিশ্ববান্ধব, ব্রতীন্দ্র ও রানীর প্রবেশ)

কবি। (ক্রমশ সন্ধ্যার-আঁধার-ঘেরা চারিদিকের অবস্থা দেখাইয়া)

অন্ধকার-বনচ্ছায়ে সরস্বতী-তীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য, আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ-ভার করি' আহরণ
বনান্তর হতে;—শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি, নিভৃত আশ্রম।

(আগন্তুক বালক-বালিকাদিগকে) এসো, সব এসো।

(সকলে নীরবে নতমস্তকে প্রার্থনায় দাঁড়াইল। কবি মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। সকলে আবৃত্তি করিয়া নমস্কার করিল)

প্রার্থনা-মন্ত্র

ওঁ ইতি ব্রহ্ম।
ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

চৌধুরী। (কবিকে) কাজ অনেক করেছ। এবারে তোমার গান শুনব—

(কবি গান ধরিলে সকলে মিলিয়া গাহিতে লাগিল)

গান

শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল, শান্ত হ'রে ওরে দীন।
হেরো চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে সর্বচরাচর লীন॥
শুন-রে নিখিল হৃদয়-নিস্পন্দিত, শূন্যতলে উথলে জয়-সংগীত,
হেরো বিশ্বে চির প্রাণ তরঙ্গিত, নন্দিত নিত্য নবীন॥
চির আনন্দ, বিরাম চিরন্তন, প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন, সান্ত্বনা অন্তবিহীন॥

বিশ্ববান্ধব। চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে,—এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন, গাও, গাও—

গান

রানী। আমারে করো তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে।
উঠিবে বাজি' তন্ত্রী-রাজী মোহন অঙ্গুলে॥
কোমল তব কমল-করে পরশ করো পরান-'পরে
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ-মূলে॥
কখনো সুখে কখনো দুখে কাঁদিবে চাহি' তোমার মুখে
চরণে পড়ি' র'বে নীরবে রহিবে যবে ভুলে,
কেহ না জানে কী নব-তানে উঠিবে গীত শূন্য-পানে,
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে॥

বিশ্ববান্ধব। পৌঁছেছে, গান একেবারে আকাশের পারে পৌঁছেছে।

চৌধুরী। আর-একটি গান।

ব্রতীন্দ্র। এইবারে গান শেষ করি।

সকলে। গান

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ-গান বাজে।
সে-গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া-মাঝে॥
বাতাস-জল আকাশ-আলো, সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়-সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা-সাজে॥

রানী। নয়ন-দুটি মেলিলে কবে পরান হবে খুশি,
যে-পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি'।

ব্রতীন্দ্র। রয়েছ তুমি এ-কথা কবে জীবনমাঝে সহজ হবে,

সকলে। আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব-কাজে॥

কবি। আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই,—আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক, আমাদের চতুর্দিক প্রশান্ত এবং প্রশস্ত হোক, আমাদের সংসার যাত্রা আড়ম্বর-শূন্য এবং কল্যাণ-পূর্ণ হোক, আমাদের অভাব অল্প এবং উদ্দেশ্য উচ্চ, চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কাজ আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক।

(গানের পর নমস্কার করিয়া সকলের নীরবে প্রস্থানমুখে উত্তেজিতভাবে ফক্কুর প্রবেশ)

ফক্কু। (কবিকে সেলাম করিয়া) না বাবা, আমি পারব না। ভালো বুঝতে-ই পারছি-নে। ও-সবে আমার কাজ নেই। আমার যা আছে, সেই ভালো।

চাই প্রতিশোধ। এবার সব-অত্যাচারেরই প্রতিশোধ নেব। যত-সব বিদেশী দস্যু! এদের জন্যই তো দেশের এ অবস্থা! জীবনটা আমার খাক্ করে দিলে। কিন্তু তুমি আমাকে কী-যেন মন্ত্র করেছ। তোমার কাছ-থেকে না-পালালে আমার তো রক্ষে নেই। আমি চললেম। (সকাতরে) তমিজ, আমার মণি,—সেই তমিজ তোমারই কাছে রইল, দেখো—

কবি। তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ, একটু বিশ্রাম করো।

(আড়াল হইতে রমজান ফরুকে চলিয়া যাইতে ইশারা করিল)

রমজান। (কবিকে অধীরভাবে) সময় নেই। উপায় নেই—সংবাদ পাওয়া গেল,—সৈন্যদল আসছে।

চৌধুরী। কী সর্বনাশ।

মাধব। বোধ-হয় কোনো দুষ্ট লোক পুলিসের কানে লাগিয়েছে—

রমজান। সে যা-ই-হোক,—পুলিস এসে পড়ল-যে!

চৌধুরী। (কবিকে) দেখো, গুটিকতক ছেলেকে নিয়ে কেমন তুমি জমিয়ে তুলেছিলে! আর-ঐ সরকারটা তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ-উৎসবটাকে কেবল নষ্টই করতে পারে। সরকারটা কী দুর্ভাগা।

মাধব। চুপ করো, চুপ করো, কে আবার কোন্‌দিক থেকে শুনতে পারে। মনের ভাব মনেই রেখে দাও।

আনন্দমোহন। কী-মুশকিলেই পড়লেম। (রমজানকে) ওহে, তুমি এখানে বসে-বসে কী শুনছ?

চৌধুরী। এখান থেকে যাও-না।

রমজান। (হাসিয়া) যাই, এমন আমার সাধ্য কী!—একেবারে-যে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছে ক'রে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

(ফরু প্রস্থানে উদ্যত)

কবি। (ফরুকে) যাও কোথায়?

রমজান। (ফরুকেই আরো অধৈর্যে) সময় হয়ে গেছে। দেরি করলে-যে ও পুলিসের হাতে ধরা পড়বে।

ফরু। (কবিকে) আমাকে এখন যেতেই হবে।

কবি। তোমাকে আমি ছাড়ছি-নে।

ফরু। না, না, আমি চললুম।

কবি। কোথায় ?

ফরু। গ্রামে-গ্রামে যাচ্ছি।

কবি। কিসের জন্য যাবে ?

ফরু। যাব, লড়াই করতে!

বীরেন। (বিস্মিত ও উদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে অরুণকে) ফরু বলে কী, শুনছ ?

অরুণ। তাই তো! বলছে,—লড়াই করতে যাবে!

কবি। লড়াই ? কিসের লড়াই ? কার সঙ্গে, কিসের জন্যে লড়াই ?

ফরু। শুনেছি, রাজার পাপেই প্রজা কষ্ট পায়। পথে-পথে ফিরব, গ্রামে-গ্রামে ঘরে-ঘরে গিয়েও বলব—দেশকে স্বাধীন করতে কে তোরা প্রাণ দিবি ? বলব, যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে—কে লড়বি আয়!

অরুণ। তুমি গ্রামে-গ্রামে ঘরে-ঘরে যাবে ? এ-সব কী বলছ ?

বীরেন। (অরুণের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া সোৎসাহে) এই তো চাই।—ফরু-ভাই, আমরা আছি। তোমার সঙ্গে আমরাও যাব। চলো, চলো।

কবি। তা-ব'লে যুদ্ধ কেন ?

ফরু। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য। বিস্তর কাজ। আমি চললুম। সেলাম! (দ্রুত প্রস্থান। "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিয়া অরুণ ও বীরেনের ফরুর পশ্চাদ্ধাবন। সকলের সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকা)

বিনি। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—

কুমার। সর্দার বাঘের বাচ্চা।

কবি। (আরো গম্ভীর হইয়া) কিন্তু যথার্থভাবে গভীরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখতে হলে ক্ষুদ্র-প্রবৃত্তির হাত থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে হবে। নিজেকে ক্রুদ্ধ এবং উত্যক্ত অবস্থায় রাখলে এইরূপ চাঞ্চল্য-দ্বারা দুর্বলতার বৃদ্ধিই হয়। দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই দেশের মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পরের প্রতি বিদ্বেষের উপর নয়,—পরের প্রতি অন্ধ-নির্ভরের উপরেও নয়। (বিপরীত দিক হইতে পুলিসদলের প্রবেশ)

দারোগা। (পুলিসদের প্রতি নির্দেশ) খানাতল্লাস করো। (পুলিসেরা কুটীরের দিকে যাইতে উদ্যত)

দারোগা। (রমজানকে দেখিয়া সাগ্রহে) এই যে! আসামী কোথায় ? সে গেল কোথায় ?

রমজান। (দারোগাকে) হুজুর, আপনাকে খবর দিয়ে-এসে দেখি, সে চলে গেছে। আবার যদি এদিকে আসে—

(আনন্দমোহন ও মাধব স্বগত "শয়তান!" বলিয়া রমজানের দিকে নিষ্ফল-আক্রোশে চাহিয়া রহিল। পুলিসেরা ফিরিয়া দাঁড়াইল)

দারোগা। পলাতক-আসামী!—সহজে যদি সে নিষ্কৃতি পায়—জেনো, তাহলে সকলেরই মুশকিল আছে! (পুলিসদের প্রতি) চলো, চলো, দেখি, ব্যাটাকে ধরা যায় কিনা! (পুলিসেরা কিছুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল)

রমজান। (পুলিসদলের-প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) পুলিস! তা, এতক্ষণে ওরা চলে গেছে! তবে আর কোনো ভয় নেই। (কবিকে) হুজুর, অধীনের এসব কর্মফল! এ আমারই দড়ি, আমারই কলসী। এখন আমাকে দণ্ড দাও। বলো, কী আমার সাজা? পুলিসকে খবর দিয়ে এনে ফরুকে আমিই শেষে সরিয়ে দিয়েছি।

সকলে। (সশ্রদ্ধ ও বিস্মিতভাবে) আশ্চর্য!

(আলুথালু-বেশে দ্রুত ফরিদার প্রবেশ)

ফরিদা। (এদিক-ওদিক খুঁজিয়া) পাগল করবে! কোথায় সে? গেল কোথায়? (চলিয়া যাইতে উদ্যত)

কবি। (ফরিদাকে) তুমি আবার কোথায় চলেছ?

ফরিদা। যদি তাকে পাই! (স্বগত) দেখা যদি হল, অমনি চলে গেল? আর যে পারি-না। বারবার এভাবে বুক যে ভেঙে গেল! যাও, ছেড়ে চলে যাও। সুখী হও, তবু তুমি সুখী হও। কিন্তু আরেকটু যদি থাকতে! পোড়া-অদৃষ্ট—চলে গেল, কোথায় গেল। এই সন্ধ্যায়, কোথায় যে যাই!

রমজান। (ব্যাকুলভাবে বেদনায়) আমি আর থাকতে পারছি-নে। এ তো আর দেখা যায় না! আমি চললুম। ফিরিয়ে আনব। (ফরিদাকে) বোন, কথা দিয়ে যাচ্ছি—স্বামীকে তোমার ফিরে পাবে। তাকে পেলে তবেই দু'জনে ফিরে আসব, নয়তো, এই আমাদের শেষ। (প্রস্থান)

কবি। (কুমার ও অরুণকে) ওরে, যে-যেখানে আছিস্- তাকে খোঁজ্। (ফরিদাকে) মা, ঘরে চলো।

বিনি। (ফরিদার হাত ধরিয়া) চলো ঘরে, ছেলেটা রয়েছে যে! তাকে দেখতে হবে না? ওগো আবার তাকে পাবে। (বিনির কাঁধে অশ্রুসিক্ত-মুখ রাখিয়া ফরিদা কুটীরের দিকে আগাইল—সকলের প্রস্থান-মুখে)

চৌধুরী। (কবিকে মনে করাইয়া দিবার জন্য পুনরুক্তি) সভায় আসতে হচ্ছে। —বাঁড়ুয্যের বক্তৃতা শুনবে না?

কবি। বলছ যখন, চলো,—তবে, সভাপতি হব, কিন্তু, সভায় শান্তিরক্ষা করতে পারব কিনা সন্দেহ। চলো— (সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ১১

(কলিকাতা। নরম পন্থীদের ক্লাবে সান্ধ্য-মজলিশ। সাহেবী-বেশধারী নবীন-প্রবীণ সদস্যদের সমাবেশ। পরস্পর আদর-আপ্যায়নে ও হাস্যালাপে রত। দেওয়ালে বড়-বড় অক্ষরে লেখা 'Welcome' ও 'God save the King'। কক্ষটি উৎসব-সাজে ফুলে-মালায় ও লতাপত্রে সাজানো। কক্ষে-উপবিষ্ট সমবেত তরুণ-কণ্ঠের গান)

তরুণদল। গান

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল।
ভবের পদ্মপত্রে জল সদা করছি টলমল।
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য-হাওয়া নাইকো ফলাফল॥
আমরা এবার খুঁজে দেখি, অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভব-সাগরে।
যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল॥
আমরা জুড়ে সারাবেলা করব হতভাগার মেলা,
গাব গান খেলব খেলা গো,
কণ্ঠে যদি গান না আসে করব কোলাহল॥

("হিপ্-হিপ্-হুর্‌রে" ধ্বনি)

(কবিকে সঙ্গে লইয়া বাঁড়ুজ্যের গাহিতে-গাহিতে প্রবেশ)

বাঁড়ুজ্যে। (গানে কবিকে)

খেপা তুই, আছিস আপন খেয়াল ধ'রে।
যে আসে তোরি পাশে সবাই হাসে দেখে তোরে॥
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি,
তারা, পায় না বুঝে তুই কী খুঁজে বেড়াস জনম ভ'রে॥
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোরে,
তুই কী সৃষ্টিছাড়া নাইকো সাড়া রয়েছিস কোন্ নেশার ঘোরে॥

(অনুরোধের সুরে কবিকে) আমার কণ্ঠে সুর আসছে না। তুমিও ধরো—

কবি। (বিরক্তিভরে) গান

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা
শুধু মিছে-কথা ছলনা॥
এ যে নয়নের জল হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা দরিদ্রের আশ,
এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরম-বেদনা॥
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালী
কথা গেঁথে-গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে
মিছে কাজে নিশি-যাপনা।
কে জাগিবে আজ কে করিবে কাজ
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা॥

(গানের মধ্যে-মধ্যে এক-একজন করিয়া সদস্য স্থান-ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে লাগিল, আবার ফিরিয়া আসিতে লাগিল। মজলিশ জমিল না)

বাঁড়ুয্যে। ওরে ভাই, ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে, মিছে তুই তারি লাগি' আছিস জাগি' না জানি কোন্ আশার জোরে॥

কবি। (বাঁড়ুয্যেকে) সম্পূর্ণ মিলন কোনো কালেই হবে না।

(স্বগত) সৃষ্টি-ছাড়া সৃষ্টি-মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন, তাই মোর অপরূপ-বেশ,
আচার নূতনতর, তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল,—

(বলিতে বলিতে উদ্‌ভ্রান্তভাবে কবি যেন অসহ-নিগূঢ়-ব্যথা বুকে চাপিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন—।

বাঁড়ুয্যে। (সঙ্গে-সঙ্গে ডাকিয়া কবির হাত ধরিয়া রহস্য-ভরে)—গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ ক'রে তোমাকে একটা উচ্চ-উপাধি দেব।

কবি। (গম্ভীরভাবে) দোহাই আপনার, আপনি আমাকে রাজা বলুন, বাবু

বলুন, যা-ইচ্ছা ডাকুন, কিন্তু আমাকে এমন উপাধি দেবেন না যা আজ ইচ্ছা করলে দান করতে পারেন, কাল ইচ্ছা করলে হরণ করতে পারেন। আমার প্রজারা আমাকে মহারাজ-অধিরাজ ব'লেই জানে। সে-উপাধি হতে কেউ আমাকে বঞ্চিত করতে পারে না। (বলিতে-বলিতে কবি এবারেও উঠিতে উদ্যত হইলেন। বাঁড়ুয্যে বলিলেন,—)

বাঁড়ুয্যে। (কবিকে) কোথায় যাচ্ছ?

কবি। আসছি।

বাঁড়ুয্যে। চলো। (উভয়ের প্রস্থান)

(উক্তিরত তরুণ-দল-সহ বিশুর প্রবেশ)

বিশু। (কৃত্রিম-উৎসাহে) আমাদের রাজা আসছেন।

তরুণ-দল। (সোৎসাহে) রাজা? কোথাকার রাজা?

বিশু। (ঈষৎ বক্রহাস্যে) আমাদের এই-দেশের রাজা!

তরুণ-দল। (বিস্ময়ে) এই-দেশের রাজা? সে কী?

বিশু। তিনি এসে স্বয়ং উৎসব করবেন! আমরা রাস্তা ঠিক করে রাখি।

তরুণ-দল। সত্যি নাকি? গাও গাও—

সমবেত গান

রাজ-রাজেন্দ্র জয়-জয়তু-জয় হে।
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে॥
দুষ্টদল-দলন তব দণ্ড ভয়কারী
শত্রুজন-দর্পহর দীপ্ত-তরবারি—
সংকট-শরণ্য তুমি দৈন্য-দুঃখহারী
মুক্ত-অবরোধ তব অভ্যুদয় হে॥

('হিপ্-হিপ্-হুর্‌রে' ধ্বনি। সার্জেণ্টের প্রবেশ)

সার্জেণ্ট। ঘরে ঢুকতে পারি কি?

তরুণ-দল। আসুন আসুন—

বিশু। সরে যাও, সব সরে যাও—তফাৎ যাও। (সাদরে অভ্যর্থনা জানাইয়া) সমস্ত আপনারই—আপনারই ঘর, আপনারই বাড়ি। আপনি এখন অনুগ্রহ ক'রে—

সার্জেণ্ট। ধন্যবাদ জানবে। বড়ো পরিতোষ লাভ করলাম।

বিশু। কৃতার্থ হলাম।

সার্জেণ্ট। রাজা আসছেন—। দিল্লিতে দরবার।

তরুণ-দল। (সমস্বরে) ওরে, রাজা-রে,-রাজা!

বিশু। আমরা কি রাজা চিনি? আজ আমরা তোমাকেই রাজা করে দিচ্ছি, ওরে, দেখ্‌বি আয়। (হাস্য)

তরুণ-দল। Three cheers।

বিশু। হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে।

সার্জেণ্ট। (বিশুকে বিরক্তির সহিত) Babu, You are a howling idiot.

বিশু। (ব্যঙ্গস্বরে) Beg your pardon! Beg your pardon! আপনাদের মতো নায়কগণ দেশের কাজে যোগ না দিলে দেশের উপায় নাই!

তরুণ-দল। (সোৎসাহে) উপায় নাই!

সার্জেণ্ট। (বিশুকে) Babu, what nonsence are you talking.

বিশু। (হঠাৎ রাগিয়া গিয়া সার্জেণ্টের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া) কী বললে?—"Idiot—nonsence?"—আমাকে তবে অপমান? এত বড়ো অপমান আমাদের বংশে আর-কখনও হয়নি।

জনৈক তরুণ। (বিশুকে) অপমানিত হ'তে থাকলে অভিমান প্রকাশ করা আমাদের শোভা পায় না।

বিশু। (ব্যঙ্গ) কী-না দরবার হচ্ছে!—দরবার! হৃদয় দেব না, অথচ রাজ-ভক্তিও চাই। দিল্‌-দরাজ মোগল-সম্রাটের আমলে দিল্লীতে দরবার জমত। আজ সে-দিল্‌ নাই, তবু একটা নকল-দরবার করতে হবে!

(সকলের অলক্ষ্যে ব্রতীন্দ্র ও কুমারের প্রবেশ। ব্রতীন্দ্র এক-কোনে গিয়া দাঁড়াইল)

কুমার। (সার্জেণ্টের দিকে আগাইয়া) হঠাৎ একটা খাপ্‌ছাড়া দরবার কেন?

সার্জেণ্ট। (কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া) কেন? উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই নাই। তোমরা কিছুদিন থেকে বড়ো বিরক্ত করছ। তাই তোমাদের মুখ বন্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

বিশু। (ব্যঙ্গস্বরে) বলি,—আগামী দরবারে বাদশাহ কী সম্মান, কী সম্পদ কোন্‌ অধিকার দান করবেন?

সার্জেণ্ট। রাজা, রায়বাহাদুর—কত খেতাব দেওয়া হবে! —দেখো!

কুমার। জনগণের থেকে দেশপতিগণ যে-খেতাব লাভ করতেন তা আধুনিক খেতাব অপেক্ষা অনেক উচ্চে।

সার্জেণ্ট। দেখছ-না?—আমরা তোমাদের ভালো-করবার জন্যেই তোমাদের দেশ শাসন করছি। এখানে সাদায়-কালোয় অধিকার-ভেদ নাই, এখানে বাঘে-গরুতে এক-ঘাটে জল খায়।

বিশু। (ব্যঙ্গস্বরে) ইংরেজ নানা-প্রকারে শুনতে চায়—আমরা রাজভক্ত, তার চরণতলে স্বেচ্ছায় আমরা বিক্রীত। আমরা তো রাজভক্ত!—এদিকে ভক্তি করব কাকে তার ঠিকানা নাই। —ভক্তি করব কি তবে আইনের-বইকে? না, কমিশনার-সাহেবের চাপরাশকে,—না, পুলিসের দারোগাকে? গবর্ণমেণ্ট আছে কিন্তু মানুষ কই? কাছেও ঘেঁষবে না, অথচ আবার রাজভক্তিও চাই!

কুমার। আগামী দরবার-উপলক্ষে কোন্ পীড়িত আশ্বস্ত হবে? কোন্ দরিদ্র সুখ-স্বপ্ন দেখছে? সেদিন যদি কোনো দুর্দশাগ্রস্ত দুর্ভাগা দরখাস্ত-হাতে অগ্রসর হ'তে চায় তবে কি পুলিসের-প্রহার-পৃষ্ঠে তাকে ফিরতে হবে না? প্রশ্রয়-প্রাপ্ত পুলিস দস্যু-বৃত্তি করে, গবর্ণমেণ্টের প্রসাদ-ভোগী-পঞ্চায়েত গুপ্তচরের কাজ করে; এই ক'রে দেশের হৃদয় বিদীর্ণ। দুঃখ আরও কত সহ্য করতে হবে জানি না।

বিশু। আগামী দরবার মেকী। নিতান্ত ভুল আড়ম্বর!

কুমার। পুলিসের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সঙীনের দ্বারা কণ্টকিত, সংশয়ের দ্বারা সন্ত্রস্ত, সতর্ক কৃপণতার দ্বারা সংকীর্ণ, দয়াহীন এই দরবার—এ দিয়ে কী হবে?

বিশু। (ব্যঙ্গ) হবে কেবলমাত্র দম্ভ-প্রচার! তাতে যদি আমাদের হৃদয় পীড়িত ও লাঞ্ছিত হয় —হোক!

সার্জেণ্ট। (ক্রুদ্ধস্বরে) I only wish to teach these cowards a lesson। আমি এই কাপুরুষদিকে আচ্ছা ক'রে একটা শিক্ষা দিতে চাই! (সরোষে আগাইয়া গিয়া বিশুকে পদাঘাতে উদ্যত)

তরুণ-দল। (সার্জেণ্টের সম্মুখে হাতজোড় করিয়া মেকী কাকুতি) মাপ করুন, মহারাজ, মাপ করুন।

সার্জেণ্ট। (দম্ভ ও অবজ্ঞায়) মাপ করব? হ্যাঁ,—তা, মাপ করবো না-তো কী? ও যে আমার দণ্ডের-ও যোগ্য নয়। (বিশুর দিকে চাহিয়া) তবে কিনা, ভাঁড়টাকে নিয়ে একটু আমোদ করতে পারতাম। তার কথা শুনতে মজা আছে।

বিশু। ঈস্, তাইতো! মস্ত লোকই বটে!

(গীতরত বিনির প্রবেশ)

বিনি। গান

তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে-পলে মরি সেও ভালো সহি 'পদে-পদে অপমান।
আপনি নামাও কলঙ্ক-পশরা যেয়ো-না পরের দ্বার,
পরের পায়ে ধ'রে মান-ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার ছার!

'দাও দাও' ব'লে পরের পিছু-পিছু
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু,
মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ করো আগে দান॥

বিশু। (আগাইয়া গিয়া সার্জেণ্টকে) হতভাগা ব্যাটা!

(ক্রূর-দৃষ্টিতে বিশুর দিকে চাহিয়া সার্জেণ্টের হঠাৎ রিভলভার বাহির করিয়া বিশুকে গুলি করিবার জন্য ছুটিয়া-আসা; তখনি কুমারের আগাইয়া আসিয়া সার্জেণ্টের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়ানো। সার্জেণ্ট কুমারকেই গুলি করিতে উদ্যত হইলে বিনি আগাইয়া আসিয়া কুমারকে আড়াল করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। এই-সব দেখিয়া বিনিকে লক্ষ্য করিতে গিয়া সার্জেণ্টের ইতস্তত-ভাব দেখা দিল। ইতিমধ্যে আড়ালে-আড়ালে নীরবে দ্রুত আসিয়া ব্রতীন্দ্র পিছন হইতে সার্জেণ্টের রিভলভার সাবধানে ছিনাইয়া লইল ও দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সার্জেণ্টকে বাহির হইয়া যাইতে আদেশ জানাইল)

বিশু। (ভীতত্রস্তভাব কাটাইয়া উঠিয়া সতেজে) এত-বড়ো দেশটা—সমস্ত নিঃশেষে নিরস্ত্র! আর, এদিকে একটা হিংস্র পশু দ্বারের কাছে! দ্বারে অর্গল-দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই—!

(হঠাৎ তরুণ-দল পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া একসঙ্গে হাততালি দিয়া দুয়ো-দেওয়ার ভঙ্গীতে সার্জেণ্টকে চারিদিকে ঘিরিয়া গাহিতে লাগিল)

তরুণদল। গান

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল ভবে পদ্মপত্রে জল
সদাই করছি টলমল,
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য-হাওয়া নাইকো ফলাফল॥
নাহি জানি করণ-কারণ নাহি জানি ধরন-ধারণ,
নাহি মানি শাসন-বারণ গো,
আমরা আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল॥

(তরুণদের তাড়ায় সার্জেণ্ট রাগে চোখ-মুখ লাল করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল,—বাহির হইয়া যাইবার আগে সহসা বিনির প্রতি চাহিয়া সলজ্জ ও সসম্ভ্রম-দৃষ্টিতে মাথা নোয়াইল ও ব্রতীন্দ্রকে অনুতপ্তকণ্ঠে বলিল—)

সার্জেণ্ট। নিজের ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত। আশা করি, আমাকে ক্ষমা করবে। (ব্রতীন্দ্রের দিকে হাত বাড়াইল)

ব্রতীন্দ্র। থ্যাঙ্কস্। (বলিয়া সার্জেন্টের সহিত কর-মর্দন করিল ও রিভলভারটি ফিরাইয়া দিল, সার্জে'ন্ট বাহির হইয়া গেল)

(পত্রিকা পড়িতে-পড়িতে কবির প্রবেশ)

কবি। (ব্রতীন্দ্রকে) আরে, এসো এসো।

ব্রতীন্দ্র। তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। আমাদের নটরাজ তুমি। এখন চলো। তুমি যে আমাদের উৎসবের সূত্রধর।

কবি। না ভাই, আজ আমার এইখানেই চলা। সকলের চলাচলেই আমার আবার মন ছুটেছে। আমার গাইয়ে-দাদার খবর কী। সে যে সেদিন গ্রামে স্বরাজ-স্থাপন করতে গিয়ে শেষে পুলিসের হাতে ধরা দিয়ে "ফিরব না রে, ফিরব না" গাইতে-গাইতে চলে গেল,—তার জন্য প্রাণ বড়ো অধীর হচ্ছে!—তার খবর আগে বলো। সে ভালো আছে তো?

ব্রতীন্দ্র। দাদার কারাদণ্ড হয়েছে। জেলখানায় ফৌজ-পাহারায় তাকে বন্ধ করে রেখেছে।

কবি। তাকে বন্ধ করে রেখেছে?—একবার বেরোতেও দেয় না? একলা কারাগারে আছে? কী করা যায়?

ব্রতীন্দ্র। চেষ্টা ক'রে দেখতেই হবে। (বিনি আঁচল হইতে একখানি খামের-পত্র খুলিয়া লইয়া কবিকে দিল। কবি বিনির বেণী-নাড়িয়া পিঠ-চাপড়াইয়া আদর করিলেন। বিনি স্মিতোজ্জ্বল মুখখানি বাঁকাইয়া প্রণাম করিল। কবি খামের পত্রখানি পড়িলেন ও নাড়াচাড়া করিতে-করিতে বলিলেন)

কবি। সকলে আমার কাছে যত-কিছু চায়, সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে? (এই সময়ে খবরের কাগজ-হাতে বাঁড়ুয্যের সোৎসাহে প্রবেশ। পত্রিকার প্রথম-পাতার হেড-লাইনে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া জোরে-জোরে পড়িতে-পড়িতে কবিকে লেখাগুলি প্রদর্শন। সেখানে হেডিং-এ বড়ো অক্ষরে লেখা—"আসন্ন দিল্লী-দরবার ও সম্রাট-সংবর্ধনা।" কবি বিরক্তির সহিত লেখাগুলি দেখিলেন ও হাতের-পত্রখানি দেখাইয়া একটু ম্লান-হাসিতে আবৃত্তির স্বরে বলিলেন—)

কবি। আবার আহ্বান?

বাঁড়ুয্যে। (হাসিয়া) জাগো সবাই আর কোরো না দেরি, রাজার ধ্বজা হেরি।

বিশু। (ব্যঙ্গহাস্তে) কোথায় আলো কোথায় মাল্য কোথায় আয়োজন?

রাজা আমার দেশে এল কোথায় সিংহাসন॥

ব্রতীন্দ্র। (পরিহাস-স্বরে) হায় রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা কোথায় সজ্জা।

বাঁড়ুয্যে। বৃথা এ ক্রন্দন, করো অভ্যর্থন।
আজকালকার ভারতীয়-রাজপুরুষদের সঙ্গে সমান-চালে চলবার চেষ্টা করলে আমাদের অনিষ্টই হবে। ভারত-শাসন-ব্যাপার একটা উৎকট হিষ্টিরিয়ার-আক্ষেপ হয়ে উঠছে। সেটা কি আমাদের পক্ষে একটা ভালো দৃষ্টান্ত?

ব্রতীন্দ্র। (জনান্তিকে) বাঁড়ুয্যের বক্তৃতা! (বিগুর হাসি গোপন করা)

কবি। (গম্ভীরভাবে) দেশের ইচ্ছা একটিমাত্র উপলক্ষ্যে যে-ই আপনাকে সফল করছে, অমনি তা দেখো জাতীয়-জীবন-যাত্রার সমস্ত ব্যাপারেই সহজে ধাবিত হবে।

বাঁড়ুয্যে। আমি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্ব-শাসন চাই।

ব্রতীন্দ্র। আমি সাম্রাজ্য-নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য চাই।

কবি। সাযুজ্যই বলো আর স্বাতন্ত্র্যই বলো, গোড়াকার কথা এক-ই, অর্থাৎ, তা কর্ম। সেখানে একই পথ। নেতা, নেতা চাই, চাই ঐক্য—চাই রচনা-কার্য। মহাজাতি-রচনা-কার্য। এত ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার—আর-কোনো-একটি-মাত্র দেশে নাই। শৃঙ্খলার দ্বারা কাজ চলে মাত্র, ঐক্যের দ্বারা প্রাণ জাগে। বিজ্ঞানে কি সমাজে,—শ্রেণীবদ্ধ-করা আরম্ভের কাজ, কলেবর-বদ্ধ-করাই চূড়ান্ত ব্যাপার। আমাদের দেশে শ্রেণীবিভাগ আছে কিন্তু রচনাকার্য অগ্রসর হ'তে পারে নাই। ভারতবর্ষে শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর-অসংলগ্ন। শাসনকর্তাদের জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়সাধ্য। এক-পক্ষে বড়ো-বড়ো বেতন, মোটা পেনসন এবং লম্বা চাল, অন্যপক্ষে নিতান্ত ক্লেশে আধপেটা-আহার। অবস্থার এই অসংগতি একেবারে গায়ে-গায়ে সংলগ্ন। যে-দেশে মহাজাতি নাই সে-দেশে স্বাধীনতা হ'তেই পারে না।—চাই মহাজাতি-রচনা।

বাঁড়ুয্যে। (সোৎসাহে কবিকে) জানো, ওদিকে দিল্লীতে দরবার!

ব্রতীন্দ্র। (বাঁড়ুয্যেকে) আর, এদিকেও-যে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন।

(অতঃপর কাগজের উপর আঙুল দিয়া লেখার ইঙ্গিত করিয়া বাঁড়ুয্যে কৌতুক-স্বরে বলিলেন)

বাঁড়ুয্যে। (কবিকে) রাজা আসছেন, রাজা আসছেন যে! বলি, কত-কিছুই তো লিখলে! এখন এই নিয়েই একটা-কিছু লেখো-না! (সোৎসাহে সরহস্যে)

—গাও বীণা, বীণা গাও রে—

(তাঁর শব্দটিতে বিশেষ জোর দিয়া)

অমৃত-মধুর 'তাঁর' প্রেম-গান মানব-সবে শুনাও রে।

(অতঃপর বাঁড়ুয্যে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার প্রস্থান-পথের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে কবির স্বগতোক্তি—)

কবি। উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি' বক্ষস্থল ফেলিছে গ্রাসি'
প্রকাশ-হীন চিন্তারাশি করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডিমাঝে শান্তি নাহি মানি॥

(আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিলেন)

কবি। তব কাছে এই মোর শেষ-নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে, প্রভু মোর।
বীর্য দেহ ক্ষুদ্র-জনে
না করিতে হীন জ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহ চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি'।
বীর্য দেহ তোমার চরণে পাতি' শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

(প্রণতি। কবি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থভাবে কাটাইয়া ব্রতীন্দ্রের দিকে চাহিলেন)

ব্রতীন্দ্র। (কবিকে) কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে!
উঠ বঙ্গকবি মায়ের ভাষায় মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায় সে-ভাষা করিবে পান।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে ভাসিবে নয়ন-জলে।
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে মায়ের চরণতলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই ব'লে কাঁদিছে বঙ্গভূমি।
গান গেয়ে কবি জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।

বিশু। একবার কবি মায়ের ভাষায় গাও জগতের গান,
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায় ঘুচে যায় অপমান।

কবি। তথাস্তু।—সবাই বড়ো হইলে তবে স্বদেশ বড়ো হবে,
যে-কাজে মোরা লাগাব হাত সিদ্ধ হবে তবে।

গান

প্রথমে কবি
পরে সকলে। সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।

সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥
শুধু আপনার মনে নয় আপন-ঘরের কোনে নয়
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে
সেই সবা-মাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে।
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥

কবি। ভারতবর্ষে বিশ্ব-মানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হবে। পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র—সেই বিচিত্রকেই আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ দেখব,—সর্বত্র ব্রহ্মের উদার-উপলব্ধির-দ্বারা।

(কবি পকেট হইতে খাতা লইয়া তদ্‌গতচিত্তে লিখিয়া যাইতে লাগিলেন ও কিছু পরে আবৃত্তির সুরে হাত্‌ নাড়িয়া লিখিত-গানের প্রথম-অনুচ্ছেদটি পড়িয়া গেলেন)

কবি। জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্যহিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে,
গাহে তব জয়-গাথা—
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা,
জয় হে জয় হে জয় হে জয় জয় জয় জয় হে॥

হকার। (হকার কাগজের বাণ্ডিল বগলে লইয়া একসীট্‌ খবরের-কাগজ-হাতে করিয়া নাড়িয়া-নাড়িয়া "এই যে টেলিগ্রাম, এই যে টেলিগ্রাম !"—হাঁকিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। "দেখি দেখি" বলিয়া অনেকে কাগজ কিনিয়া পড়িতে ব্যস্ত হইল—এই-সময় উল্লাসের সহিত ছুটিয়া আসিয়া সান্ধ্য-সংস্করণ খবরের কাগজ-হাতে আনন্দমোহন প্রবেশ করিল ও কবির সম্মুখে পত্রিকাখানি মেলিয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল—"বঙ্গভঙ্গ-আইন প্রত্যাহার ; কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন।" কবি-কর্তৃক আনন্দধ্বনি—"বন্দেমাতরম্‌"।—সকলের সমধ্বনি)

ব্রতীন্দ্র। (সোল্লাসে কবিকে) যাবে কখন,—চলো।

আনন্দমোহন। (কবিকে) এবার কর্তৃপুরুষের সহিত সংঘাতে বাঙালী জয়ী।

কবি। (স্মিতহাস্যে আনন্দমোহনকে) জয় করতে পারার একটা সুখ আছে, কিন্তু দেশের ভালো করতে পারার সুখ তার চেয়ে বড়ো।—(ব্রতীন্দ্রকে) যাও ভাই, দল বেঁধে আজ আমোদ করো গে। (বিনিকে) খুব ভালো করে শিখে নাও। খুব ধুম হবে। আমি নিজে পদ রচনা করছি। (সুরে)—"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।"—একেবারে নিখুঁত ক রে গাইতে হবে।

(বিনি হাসিয়া উৎসাহে "নিশ্চয় নিশ্চয়" বলিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল)

ব্রতীন্দ্র। বন্দেমাতরম্‌।

সকলে। বন্দেমাতরম্‌। (সকলের প্রস্থান)

অভিবন্দন

"হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার-ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।"

দৃশ্য ১

[কলিকাতা। জাতীয়-উৎসবক্ষেত্র]

(কবি, উপাধ্যায়-বিশ্ববান্ধব, আনন্দমোহন, মৌলবী-লিয়াকৎ, ব্রতীন্দ্র, অরুণ, কুমার প্রভৃতি কর্মীদল ও রঘু, মাধব, বিশু, নিবেদিতা, রানী, রুক্মিণী, ফরিদা, তমিজ ইত্যাদি সমবেত। বিনি ও রানীতে মিলিয়া শঙ্খবাদন। সকলের 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনি। ব্রতীন্দ্র ও নিবেদিতার পরিচালনায় গান)

সকলে। গান

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া
বলো—'উঠ উঠ' সঘনে, গভীর নিদ্রা-মগনে॥
চলো যাই কাজে মানব-সমাজে
চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে॥
যায় লাজ ত্রাস, অলস, বিলাস কুহক মোহ যায়।
ওই দূর হয় শোক-সংশয় দুঃখ-স্বপন-প্রায়।
ফেলো জীর্ণ চীর পরো নব সাজ,
আরম্ভ করো জীবনের কাজ—
সরল সবল আনন্দমনে, অমল অটল জীবনে॥

বিশ্ববান্ধব। বহুদিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় নিয়েই আসে কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই নূতন-আবির্ভাবের সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গ নয়, তা স্থায়ীও হয় না। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, বজ্রের গর্জন আর বায়ুর উন্মত্ততা আপনি শান্ত হয়ে আসবে, তখন মেঘে-মেঘে জোড়া লেগে আকাশের পূর্ব-পশ্চিম স্নিগ্ধতায় আবৃত হয়ে যাবে। মঙ্গলে-পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পর আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছে। একথা নিশ্চয় জেনে আমরা যেন আনন্দে প্রস্তুত হই। (বাদ্যোদ্যম। বিশ্ববান্ধবের উপরোক্ত ভাষণের বর্ণনানুসারে আলোক-সম্পাত ও দৃশ্যাবলী-যোগে নৃত্যনাট্য-আঙ্গিকে ব্যঞ্জনা-দান ; তখন ঐ-নৃত্যের সঙ্গে নেপথ্যে বাজিতে থাকিবে রবীন্দ্রসংগীত—"ঐ ঝঞ্ঝার ঝংকারে ঝংকারে বাজল ভেরী")

কবি। আজ বিশ্বদেবতাকে দর্শন করতেই হবে। আজ প্রকাণ্ড উৎসব! এই উৎসব কোনো বিশেষ স্থানের নয়, কোনো বিশেষ জাতির নয়,—এই উৎসব সমগ্র মানব-জাতির জগৎ-জোড়া উৎসব। এসো আমরা সকলে একত্র হই, বাহির হয়ে পড়ি। দেশে কোনো রাজার যখন আগমন হয়, তাঁকে দেখার জন্য যখন পথে বাহির হয়ে আসি তখন মলিন-জীর্ণ-বস্ত্রকে ত্যাগ করতে হয়, তখন নবীন বস্ত্রে দেহকে সজ্জিত করি। আজ দেশের রাজা নয়, সমগ্র জগতের রাজা এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন, নত করো উদ্ধত মস্তক। দূর করো সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জনা। মনকে শুভ্র ক'রে তোলো, শান্ত হও, তিনি তোমাদের শিরে আশীর্বাদ ঢেলে দিন্—মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।

(গাহিতে গাহিতে মুকুন্দের প্রবেশ)

গান

মুকুন্দ।

এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু, তব শুভ-আশীর্বাদ
তোমার অভয় তোমার অজিত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা॥
অনির্বাণ ধর্ম-আলো সবার উর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো,
সংকটে দুর্দিনে হে,
রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে॥
বক্ষে বাঁধি' দাও তার বর্ম তব নির্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি' জয় নিষ্ঠা তবুও রয়,—
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে॥

কবি। (মুকুন্দকে) এসো, এসো।

মুকুন্দ। আমি আজ মুক্ত। মুক্তিলাভ ক'রে প্রথমেই আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন?

কবি। কেন?

মুকুন্দ। আপনার কাছেই মুক্তির মন্ত্র আছে। সেইজন্যই আপনি আজ কোনো সমাজেই স্থান পান-নি। আপনি আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন,—যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই,—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি ভারতবর্ষের দেবতা। (আগাইয়া

কবিকে প্রণাম করিল, সেই সঙ্গে নিবেদিতা ও ব্রতীন্দ্র-ও আসিয়া কবির পায়ে প্রণত হইল)

কবি। (নিবেদিতাকে তুলিয়া উঠাইয়া সস্নেহে মাথায় হাত রাখিয়া) মা, তুমিই আমার মা। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই,—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ।

(কুমারের সঙ্গে বিশুর বলিতে-বলিতে প্রবেশ)

বিশু। (কবিকে) আমাকেও কিন্তু ভুলো না।

কবি। সে আর দেরি হবে না। এখন দেখতে দেখতে রঙ ফিরে যাবে।

বিশ্ববান্ধব। আমরা এক-এক কালের লোক, কালের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে কোথায় যাব—কোথায় থাকবে আমাদের যত ক্ষুদ্রতা, মান, অভিমান, তর্ক-বিতর্ক বিরোধ—কিন্তু বিধাতার নিগূঢ়-চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে-স্তরে আমাদের দেশকে উপরের দিকে তুলবে। সেই মেঘমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করো, যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলতে পারবে—এ সমস্ত আমাদের। আমাদের মাঠ উর্বর, জলাশয় নির্মল, বিদ্যা বিস্তৃত, চিত্ত নির্ভীক, বলতে পারবে আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ—এই সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে, ধর্মে কর্মে প্রতিষ্ঠিত, বীর্যে বিধৃত জাতীয়-সমাজ এ আমাদেরই কীর্তি—যেদিকে দেখি, সমস্তই আমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন-নূতন আশা-পথের যাত্রীদের অক্লান্ত-পদভারে কম্পমান।

(চৌধুরীর সঙ্গে বাঁড়ুয্যের প্রবেশ)

চৌধুরী। আজ কী-সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে!

বাঁড়ুয্যে।—তাই শোনবার জন্য প্রাণটা ছট্‌ফট্ করছে।

চৌধুরী। সত্যি, প্রাণটা ছট্‌ফট্ করছে।

রঘুনাথ। দয়াময় হরি,—কী আনন্দ, তোমার এ কী আনন্দ।—

—(মঙ্গল-কলসের একখানি মালা নিয়া রঘুর গলায় পরাইয়া দিয়া কবি তাহাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিলেন) এ কী সমারোহ! আজ এ কী কাণ্ড।

কবি। তোমাদের নিয়েই তো এ-সমারোহ।

রঘুনাথ। আমরা তো শাস্ত্র কিছুই জানি-নে—তোমাদের দেবতা আমাদের ঘরে আসে না।

বিশ্ববান্ধব। ঘরের সমাজের দেশের যে-সমস্ত আড়ালগুলাকেই মুক্তির চেয়ে বেশী আপন বলি—সে-সমস্তকে—

ব্রতীন্দ্র। সে-সমস্তকে ঝড়ের মুখের খড়কুটার মতো শূন্যে বিসর্জন দিতে হবে।

আনন্দমোহন। সে-জন্যে মন প্রস্তুত হোক। (রুক্মিণী আগাইয়া আসিয়া কবিকে প্রণাম করিয়া বলিল)

রুক্মিণী। পতিতা, পাপীয়সী,—দয়াময় আমার উপায়?

কবি। (রুক্মিণীর মাথার হাত রাখিয়া সস্নেহে) ভাবনা নেই মা, আজ ঘরের ভিত্ যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, যাক্ না—আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে মিলন।

কিশোর ও রঘু। এখন আমরা কী করব?

কবি। আমাদের সঙ্গে মিলে' ভাঙা-ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে।

কিশোর ও রঘু। বেশ বেশ—রাজি আছি।

(উক্তিরত চরমপন্থী ও মধ্যমপন্থী তরুণদলের প্রবেশ)

মধ্যমপন্থী তরুণদল। (এক-একজন করিয়া) তাহলে, কী বলছ?—ইংরেজ কি এদেশে সম্পূর্ণ আকস্মিক? সে কি অপ্রয়োজনীয়? ইংরেজের নিকট কি আজ আমাদের কিছুই শেখবার নেই?—নূতন-নূতন জ্ঞান?

চরমপন্থী তরুণদল। আমরা স্বাধীনতা চাই।—ইংরেজ আমাদের প্রার্থনা পূরণ করবে না। আমরাও তাদের কাছে যাব না,—বাস্।

জনৈক চরমপন্থী তরুণ। হায়, সে কী সুখ, হাতে লয়ে জয়তূরী, অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণছুরি!

জনৈক মধ্যমপন্থী। চরমপন্থীরা কি কেবল চরমের কথাই ভাববেন? উপস্থিত-কর্তব্য সম্বন্ধে তারা তো একেবারেই নিশ্চেষ্ট দেখছি। তাহলে, দিল্লীর-দরবার, আর রাজসম্বর্ধনা?

চরমপন্থীদল। বর্জন, বর্জন।—ইংরেজ-বর্জন!—দরবার, সম্বর্ধনা—ওদের সব-কিছু আমাদের বর্জন করতে হবে।

জনৈক মধ্যমপন্থী। তা-বলে-কি ওদের জ্ঞানবিজ্ঞানও বর্জন?—আবার যদি শুরু হয়—ধর্-পাকড়, ফাঁসি, জেল, অন্তরীণ?

কবি। (বিরক্তির সহিত) চরমপন্থী মধ্যমপন্থী—এ-যে কেবলই চলছে কথা-নিয়ে-কলহ। আজ নিখিল-মানবের সঙ্গে জ্ঞান-প্রেম-কর্মের নানা আদান-প্রদানে আমাদের অনেক প্রয়োজন আছে। সকলে শোনো, ঐ শোনো জাগ্রত-ভগবানের আহ্বান।—

("আমরা স্বরাজ চাই"-ধ্বনি দিয়া বীরেন ও অরুণের পরিচালনায় একদল স্বেচ্ছা-সেবক-সেবিকার পতাকাহাতে গাহিতে-গাহিতে প্রবেশ)

গান

স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকা দল। দেশ-দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি—সবজন-পশ্চাতে
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি' সবার সাথে।
প্রেরণ করো ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥
বিঘ্নবিপদ দুঃখদহন, তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যুদহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
নিশ্চল নির্বীর্য-বাহু কর্মকীর্তিহীনে
ব্যর্থ-শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে, জাগ্রত-ভগবান হে॥
নূতন-যুগ-সূর্য উঠিল ছুটিল তিমির-রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি' মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
গত-গৌরব, হৃত আসন, নত-মস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন করো নরসমাজ-মাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও দাও দাও স্থান হে, জাগ্রত-ভগবান হে॥
জনগণপথ তব জয়-রথ-চক্র-মুখর আজি,
স্পন্দিত করি' দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি'।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
দৈন্য-জীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি মৌন-কণ্ঠ পূর্ণ বাণী করো দান হে, জাগ্রত-ভগবান হে॥
যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর-মাঝে
বর্জিল ভয় অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?

আত্ম অবিশ্বাস তার নাশো কঠিন-ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ-ভার হানো অশনি-পাতে।
ছায়া-ভয়-চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে! জাগ্রত-ভগবান হে॥

কবি। (ব্রতীন্দ্রকে) আমার খেলার দলটি ভেঙে গিয়েছে, আবার তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে এসো গে। এইবেলা ডাকো।

ব্রতীন্দ্র। (কবিকে) ডাকতে হবে না। ওই যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, এল ব'লে।

অরুণ। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা আগে চলে এসেছি।

বীরেন। ঐ যে, ফরু-দল আসছে।

কবি। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব। কাউকে বাদ দিতে পারব না। (এই সময়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে লইয়া ফরু ও রমজানের পরিচালনায় একটি মিছিল আসিয়া উৎসবক্ষেত্রে পৌছিল। তাহারা গাহিতেছিল—"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।" মিছিল আসিয়া পৌছিতেই সকলে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে তাহাদের স্বাগত করিল। তখনই সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া চরম ও মধ্যপন্থীদলও গানের দ্বিতীয় পংক্তি—"ঘরের হয়ে পরের মতো ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে"—গাহিবার কালে প্রীতিতে মাতিয়া উঠিল ও পরস্পর সকলে আলিঙ্গন বিনিময় করিল। তমিজ ছুটিয়া আসিয়া "বাবা, বাবা"—বলিয়া ফরুকে জড়াইয়া ধরিল। ফরু তাহাকে "বাবা আমার" বলিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া চুমু দিল। নিবেদিতা তখন ফরিদার কাছে গিয়া বলিল—"কী গো!-বলি, ফিরে পেলে তো?" বলিয়া স্মিতহাস্য বিনিময় করিল। রমজান ও ফরু গিয়া—"হুজুর, সেলাম" বলিয়া কবি ও অন্যান্য-বিশিষ্টদের শ্রদ্ধা জানাইলে তাঁহারাও পরপর প্রীতি-নমস্কার জানাইল। কবি হাত তুলিয়া আশীর্বাদে বলিলেন—"আজ গ্রামের সকলকে জুটিয়ে নিয়ে এসেছ। সাবাস, সাবাস ভাই, সাবাস!")

মুকুন্দ। আমার বুকের মধ্যে কী আনন্দ যে লাগছে সে আমি বলে উঠতে পারি-নে। এই মাটিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে।

(গানে যোগ দিতে সকলকে ইঙ্গিত করিয়া মুকুন্দ গান ধরিল)

মুকুন্দ ও সকলে। গান

এখন, আর দেরি নয় ধর্-গো তোরা হাতে-হাতে ধর্ গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-স্বর্গ॥

ওরে ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে খুলল দুয়ার মন্দিরে যে—
লগ্ন ব'য়ে যায় পাছে ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য ॥
এখন যার যা-কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালার 'পরে,
আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গলঘট ভর্ গো।
আজ নিতেও হবে দিতেও হবে, দেরি কেন করিস তবে—
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে মরতে হয় তো মর্ গো ॥

বিশ্ববান্ধব। (কবিকে) এবারে তোমার সভার-ভাষণে কী লিখে এনেছ শোনাও। তুমিই পড়ে শোনাও।

কবি। কী আর লিখব, দেশের জনগণমনের যিনি অধিনায়ক তাঁরই গান আমাদের এই মহাজাতীয়-সম্মেলনের পুণ্য-উৎসবে নিবেদন করতে এসেছি। আমার ভাষণে যা শুনবে, সুরের অর্ঘ্য-থালায় শেষে তারই পরিবেশন হবে। পড়ছি শোনো,—(ভাষণ-পাঠ) যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে একসূত্রে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে সিদ্ধি-দান করিবার পথ মুক্ত করিয়াছেন, যিনি আমাদের এই সূর্যালোকদীপ্ত নীলাকাশের নিম্নে যুগে-যুগে সকলকে একত্রিত করিয়া এক বিশেষ বাণীর দ্বারা আমাদের সকলের চিত্তকে এক বিশেষভাবে উদ্বোধিত করিতেছেন, আমাদের চিরপরিচিত ছায়ালোক-বিচিত্র অরণ্য-প্রান্তর-শস্যক্ষেত্র যাঁহার বিশেষ মূর্তিকে পুরুষানুক্রমে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশমান করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের পুণ্য নদীসকল যাঁহার পাদোদকরূপে আমাদের গৃহের দ্বারে-দ্বারে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, যিনি জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টানকে এক মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া আশেপাশে বসাইয়া সকলেরই অন্নের থালায় স্বহস্তে পরিবেষণ করিয়া আসিতেছেন, দেশের অন্তর্যামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরন্তন অধিপতিকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোনো বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান্ আবেগের ঝড়ে পর্দা একবার একটু উড়িয়া যায়, তবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইব—আমরা কেহই স্বতন্ত্র নহি, বিচ্ছিন্ন নহি—দেখিতে পাইব, যিনি যুগযুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সমুদ্রবিধৌত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক ধনধান্য, এক সুখদুঃখ, এক বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া তুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা দুর্জেয়, তাঁহাকে কোনোদিন কেহই অধীন করে নাই, তিনি ইংরেজী-স্কুলের ছাত্র নহেন, তিনি ইংরেজ-রাজার প্রজা নহেন, আমাদের বহুতর দুর্গতি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, তিনি প্রবল,

তিনি চিরজাগ্রত, ইহার এই সহজমুক্ত স্বরূপ দেখিতে পাইলে তখনই আনন্দের প্রাচুর্যবেগে আমরা অনায়াসেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মসমর্পণ করিব। কোনো উপদেশের অপেক্ষা থাকিবে না। তখন দুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তখন পরের প্রসাদকেই জাতীয়-উন্নতিলাভের চরম সম্বল মনে করাকে পরিহাস করিব এবং অপমানের মূল্যে আশু-ফললাভের উঞ্ছবৃত্তিকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।

—এ আমার ভাষণ নয়, এ আমাদের সকলের অন্তর্যামী বিশ্বেশ্বর সেই মানব-বিধাতারই ডাক।

মুকুন্দ। (কবিকে) ডাকো, ডাকো, তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেলো। গান, গান—চাই সেই মহাগীত! তুমিই তো একদিন লিখেছিলে—

ব্রতীন্দ্র। (কবিকে) হ্যাঁ, লিখেছিলেই তো: দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা—
স্বর্গের অমৃত লাগি—

বিনি। (কবিকে) তাতেই তো রয়েছে— তবে ধন্য হবে মোর গান
শতশত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

বিশ্ববান্ধব। ঠিক, ঠিক, কবি,—এই সেই মহাগীত। মানুষের শতশত অসন্তোষ তোমার মহাগীতেই একদিন নির্বাণ লাভ করবে।

আনন্দমোহন। সেদিন যতটা শুনেছি কেবলি মনে হয়েছে একদিন এটিই হবে আমাদের মহা-জাতীয় সংগীত।

সকলে। এবারে তুমিই সেই মহাগীত শোনাও—গানটি তুমিই সকলকে ধরিয়ে দাও—

কবি। তবে গাও (কবির পরিচালনায় মিলিত-কণ্ঠে সকলে গাহিতে লাগিল)

সকলে। **জাতীয়-সংগীত**

(গানের সঙ্গে-সঙ্গে ছায়াছবিতে গানের প্রত্যেক-অনুচ্ছেদের ব্যঞ্জনা দান)

জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে
গাহে তব জয়গাথা।

জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে জয় হে জয় হে জয় জয় জয় জয় হে॥
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি' তব উদারবাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা—
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে জয় হে জয় হে জয় জয় জয় জয় হে॥
পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর-পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি তব রথ-চক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট-দুঃখ-ত্রাতা।
জনগণপথ-পরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে জয় হে জয় হে জয় জয় জয় জয় হে॥
ঘোরতিমিরঘন-নিবিড়-নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখ-ত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে জয় হে জয় হে জয় জয় জয় জয় হে॥
রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্বউদয়গিরি-ভালে,
গাহে বিহঙ্গম পুণ্য-সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণ রাগে নিদ্রিত ভারত জাগে,
তব চরণে নত মাথা।
জয় হে জয় হে জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে জয় হে জয় হে জয় জয় জয় জয় হে॥

দিক্‌-স্পন্দন

"স্পন্দিত করি' দিক্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি'।"

দিক্-স্পন্দন

জাতীয়-সংগীত 'জনগণমনে'র প্রতি

স্বাধীন-ভারতের গণপরিষদ ও দেশবিদেশের আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধার্ঘ্য*

নেপথ্য-ঘোষণা : ১৯১১ সনের ২৭শে ডিসেম্বর ভারতীয়-কংগ্রেসের কলিকাতা-অধিবেশনে 'জনগণমন' গানের প্রথম অনুষ্ঠান। ১৯১৭ সনের ডিসেম্বরে কলিকাতায় ভারতীয়-কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধু :

(দেশবন্ধুর মঞ্চে প্রবেশ)

পশ্চাৎপটে ছায়াছবিতে দেশবন্ধু। (ভাষণ-দান)

Brother delegates at the very outset I desire to refer to the song which you have just listened. It is a song of the glory and victory of India. We stand here today on this platform for the glory and victory of India.

[প্রতিনিধি ভ্রাতৃবৃন্দ, এই-মাত্র যে-সংগীতটি আপনারা শুনলেন, আমি সর্বপ্রথম তারই উল্লেখ করছি। এটি ভারতের মহিমা ও বিজয়-সংগীত ; ভারতের এই বিজয় ও মহিমার উদ্দেশ্যেই আজ আমরা এখানে সমবেত। (জনগণের জয়ধ্বনি—বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্)]

নেপথ্য-ঘোষণা : ১৯৩৭ সনের ৩রা নভেম্বর। সংবাদপত্রের বিবৃতিতে মাদ্রাজের অধ্যক্ষ ডঃ জেমস্ কাজিনস্ :

পশ্চাৎপটে ছায়াছবিতে ডঃ জেমস কাজিনস্। (বিবৃতি-পাঠ)

My suggestion is that Dr. Rabindranath's own intensely patriotic, ideally stimulating, and at the sametime world-embracing Morning-song of India (Janaganamana) should be confirmed officially as what it has for almost twenty years, been unofficialy namely the true National Anthem of India.

[আমার প্রস্তাব এই, ডঃ রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত গভীর দেশাত্মবোধক, আদর্শ-

---

*এই শ্রদ্ধার্ঘ্যের তথ্যাংশ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'জনগণমন-অধিনায়ক' নামক রচনা থেকে সংগৃহীত।

উদ্দীপক, সে-সঙ্গে বিশ্ব-স্বাঙ্গীকারক ভারতীয়-বৈতালিক-সংগীত এই 'জনগণমন' গত বিশ-বছর ধ'রে এমনিতেই ভারতের জাতীয়-সংগীত-রূপে গীত হয়ে আসছে ;—তাকে এখন কার্যত যথারীতি স্থায়ীভাবে আনুষ্ঠানিক-স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

(সকলের জয়ধ্বনি : বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্)]

নেপথ্য-ঘোষণা : ১৯৩৭ সনের ২০শে নভেম্বর,—পত্রে রবীন্দ্রনাথ :

পশ্চাৎপটে ছায়াছবিতে রবীন্দ্রনাথ। (পত্রপাঠ)

আমি 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানে সেই ভারত-ভাগ্যবিধাতার জয়-ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথী, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক। (জনগণের জয়ধ্বনি : বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্)

১৯৪৩ সনের ৫ই জুলাই। জর্মনিতে আজাদ্-হিন্দ্-বাহিনীর আর্জি-হুকুমতই-আজাদহিন্দের নির্দেশনামায় নেতাজী :

নেপথ্য-ঘোষণা : পশ্চাৎপটে ছায়াছবিতে নেতাজী।

(আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর অভিবাদন-গ্রহণে নেতাজী) (নির্দেশনামা পাঠ)

Tagore's song Jayaho has become our National Anthem.

[রবীন্দ্রনাথের রচিত "জয়-হে"-সংগীতটি আমাদের জাতীয়-সংগীত হল। (আজাদ-হিন্দ্-বাহিনীর জয়ধ্বনি : জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্)]

নেপথ্য-ঘোষণা : ১৯৪৬ সনের ১৯শে মে-র 'হরিজন'-পত্রিকায় মহাত্মাজী :

পশ্চাৎপটে ছায়াছবিতে মহাত্মাজী। (পত্রিকা-পাঠ)

National Song.—Divotional hymn.

[এটি একটি জাতীয়-সংগীত,—তেমনি ভগবৎ-সংগীত-ও]

(জনতার জয়ধ্বনি—বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্)

নেপথ্য-ঘোষণা : ১৯৪৮ সনের ৩রা মার্চ ও ২৬শে অগস্ট। ভারতীয়-গণপরিষদের অধিবেশনে নেহেরুজী :

(মিলিটারী-ব্যাণ্ড কর্তৃক 'জনগণমন'-সুর বাজানো)

পশ্চাৎপটে ছায়াছবিতে নেহেরুজী। (ভাষণ-দান)

The most important part of a National Anthem was the music of it. When played before a large gathering it was very greatly appreciated, and representatives of many nations asked for a musical score of this new tune which struck them as **distinctive** and **dignified** from various countries we received

massages of appreciation and congratulation of this tune, which was considered by experts and others as superior to most of the National Anthems which they had heared.

[সুর হচ্ছে জাতীয়-সংগীতের একটি বিশেষ দরকারী বিষয়। বৃহৎ জনসমাবেশের মধ্যে যখন এর সুরটি বাজানো হয়েছিল, সকলেই তখন এটিকে খুব উপভোগ করেন,—নানা জাতির প্রতিনিধিরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুরটির সাংগীতিক উচ্চ-মানের কথা তাঁরাও বিশেষ করেই জানিয়েছিলেন; তাঁদের কাছে এটি লেগেছিল যেমন মর্যাদাসম্পন্ন তেমনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নানা দেশ থেকেও এই সুরটি সম্বন্ধে আমরা বহু গুণীর উপলব্ধি-ও অভিনন্দন-পূর্ণ বাণী পেয়েছি, তাতে বিশেষজ্ঞরা ও অন্য অনেকেই বলেছেন, এ-যাবৎ তাঁরা যতগুলি জাতীয়-সংগীত শুনেছেন, তার মধ্যে এটিই হচ্ছে উৎকৃষ্ট।

(জনতার জয়ধ্বনি : জয়-হিন্দ্, জয়-হিন্দ্, জয়-হিন্দ্)]

নেপথ্যে ঘোষণা : ১৯৫০ সনের ২৪শে জানুয়ারি। Rabindranath Tagore's Song ·Jana-gana-mana was adopted as the National Anthem of India on January 24, 1950. The song was first sung on Decembar 27, 1911, during the Indian National Congress session of Calcutta. The song was first published in January 1912, under the title Bharat Vidhata in the Tattvabodhini Patrika, of which Tagor himself was the editor.—India 1961, P 28-(The Publications Division)

[১৯৫০ সনের ২৪শে জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত 'জনগণমন'-গানটি ভারতের জাতীয়-সংগীত ব'লে গৃহীত হয়। গানটি ১৯১১ সনের ২৭শে ডিসেম্বর ভারতের জাতীয়-কংগ্রেসের কলিকাতা-অধিবেশনে প্রথম গীত হয়। ১৯১২ সনের জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। (জনতার জয়ধ্বনি : জয়-হিন্দ জয়-হিন্দ)]

নেপথ্য-ভাষণ :—(ছায়াছবিতে আবহসংগীতের সঙ্গে ভাষণের প্রাসঙ্গিক দৃশ্যাদি প্রদর্শন) এই জাতীয়-সংগীত যখনই যেখানে গীত হোক, এর রচয়িতা রবীন্দ্রনাথকেও সেখানে তখন মনে পড়া স্বাভাবিক। আবার, কবিকে মনে পড়লেই মনে পড়বে কবির এই-কথাটাও যে,—আমরা যেখানেই জন্মে থাকি, আমরা শুধু সে-দেশেরই নয়, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি-অনুসারে সব-মানুষই আমরা সব দেশের। এটা বাইরের

ভৌগোলিক দেশের সীমার-বাধা না মেনেই সহজে স্বতই মুক্ত-আরেক আত্মিক-অনুভূতির টানে মনে পড়বে। এই টানটি কবি নিজে উপলব্ধি ক'রেই বলেছেন—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে-দেশে মোর দেশ আছে আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে-দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়ে সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে-ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

কথা-কটি একবার শুনতে পেলে সাধারণ-লোকের মনেও চিরদিন মানুষের একাত্মতার একটু ছাপ পড়ে যাবে,—যেমন প'ড়ে আসছে পথে-ঘাটে পদ-কর্তাদের মহাজন-পদাবলীর এক-একটি কথায়। শুধু মানুষই নয় কবির এই উপলব্ধিতে স্থল-জল অন্তরীক্ষ নিয়ে বিশ্বের অণুপরমাণু পর্যন্ত সব-কিছুই কবির মনে আত্মীয়তার অখণ্ড এক অনন্তবন্ধনে মিলে রয়েছে। আর, কবির সমগ্র-জীবনের বহুমুখী বিপুল সাধনা এই মিলনের সাক্ষ্যই বহন করে আসছে যে,—বহু ও বিচিত্রের মধ্যে তিনি কেমন ক'রে অনেককে মিলিয়ে চলেছেন। সকলের অন্তর্নিহিত মৌলিক-এক-কে শুধু অন্তরের ভাবেই তিনি অনুভব করেননি, বাস্তবেও তাকে রূপে-অরূপে সাহিত্যে দর্শনে বিজ্ঞানে আর শিল্পে-সংগীতে, সবিস্তারে বা ইঙ্গিতে, মূর্ত ক'রে ধরেছেন। তাঁর এই উপলব্ধির মূল-সূত্রধারা তাঁর জীবনে খুঁজতে গেলে, যতই তিনি বলে থাকুন—'কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে"—তবু অনুরাগী-কৌতূহলী সন্ধানীদের কাছে শুরুতেই মিলবে কবির উপর কবির পরমপূজ্য পিতৃ-সাধনার পূত-প্রভাব, পরে মিলবে তাঁর পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক শহর-কলকাতার সাংস্কৃতিক-আবহাওয়ারও সংযোগ। এরপরে কবির জীবন কেটেছে নদীমাতৃক-বাংলাদেশের সুজলা-সুফলা প্রাকৃতিক-আবেষ্টনে; সাধারণ জন-জীবনের সঙ্গে কবির যোগ ঘটেছে এখানেই বেশি; মানুষ ও প্রকৃতির সহজ-সরল অনুভূতি-মাখা-আবেদন তাঁকে মাতৃকোলের মতো দেহে-মনে স্বাস্থ্য ও পরিপুষ্টি দান করেছে। কিন্তু এরও পরে তাঁকে যেখানে পাওয়া যায়,—সে তাঁর কর্মযজ্ঞের সাধন-স্থল বীরভূমের রুদ্রমধুর বিচিত্র-পরিমণ্ডলে। এখান থেকেই

ক্রমে বিশ্বপরিক্রমায় বের হয়ে তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত 'দেশে-দেশে'র জীবন-যোগে এবং 'বিশ্বকবি' ব'লে বিশ্ব-স্বীকৃতির মধ্যেও মহান-এক-কে প্রত্যক্ষ করেন। তারপরে আপামর-সকলকে নিজের সেই উপলব্ধ-সত্যে উত্তীর্ণ করে তোলবার জন্য দেশে-দেশে আহ্বান জানিয়ে তাঁর সত্য-সুধার বিতরণ-কেন্দ্র শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী'র মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও আনন্দের অফুরন্ত বিবিধ-আয়োজনে বিশ্বব্যাপী-সদাব্রতে ব্রতী হন। সেই থেকে শান্তিনিকেতন শুধু এদেশেরই নয় দেশবিদেশের নানা জাতি ও তাদের নানা-সংস্কৃতির যোগকেন্দ্র হয়ে ওঠে। দিনে-দিনে এই যোগের বহুবিচিত্র ধারার বিস্তারে সমাগত যত জনেরই যত ঐশ্বর্য ও মর্যাদার সমাবেশ ঘটুক, সব-সমৃদ্ধির মধ্যে কবির উপলব্ধ সেই 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে',—বাণীর 'মোর ঘর'-টির অনুভব যদি সব-কিছুর মধ্যে সকলের মনে জাগ্রত না থাকে, তবেই ভাবনার কারণ হয়ে পড়ে। কবির নাম ক'রে যতই সাধনা যতই উৎসব চলুক তাতে তাঁর আত্মার কামনার মতো—সকলের মধ্যে একেকে দেখার, সকলের মধ্যে নিজেরও এক হয়ে যাবার—কাজটি যদি না হয়, তবে তাঁর পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটবে কিনা—এটুকুই ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পরিতৃপ্তির কথাতেই এখানে আবার মনে পড়ে যায়—কবিরই শেষের দিনের আবেদনটি—যাতে তিনি বলেছেন সকলকে ডেকে—

যখন রব না আমি মর্ত্য-কায়ায় তখন স্মরিতে যদি হয় মন,—
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায় যেথা এই চৈত্রের শাল-বন।
বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে, ভাষা-হারাদের সাথে মিল যার,
যে-আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে রাখিয়া যে যায় নাই ঋণ-ভার,
সে-আমারে কে চিনেছে মর্ত্য-কায়ায়,—কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ-ছায়ায় যেথা এই চৈত্রের শাল-বন।

সহজ-পরিবেশের নিভৃত ছায়ায় ব'সে ভাষাহারা প্রকৃতি ও মানুষদের মনে মন মিশিয়ে কবির কর্মসাধনার নিগূঢ়-উপলব্ধিজাত 'দেশে-দেশে'-ছড়ানো তাঁর দেশ আর 'ঘরে-ঘরে' ছড়ানো তাঁর 'পরমাত্মীয়দে'র কথার আলাপনের ও অনুধ্যানের মধ্যে কবিকে-পাওয়ার আমন্ত্রণ কবি নিজেই রেখে গেছেন—এই 'স্মরণ' কবিতাটিতে। তার মধ্যে প্রধান-অপ্রধান, মান-অপমান, রাগ-দ্বেষ, লাভালাভ, এমন কি, ভালো-মন্দেরও কোনো কথা নেই। কিন্তু একদিন কালের-ধারায় বাস্তবের-কবির মতোই তাঁর ঐ বাস্তবের 'শালবন'-টিরও অদৃশ্যে-চলে-যাওয়া বিচিত্র নয়। তখন রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে যেখানেই যখন বন্ধুগণ মিলে' নিবিড়-মনে বসি, কবির 'শাল-বন'কে চিরদিনই সেখানে আমরা পাব আমাদের অন্তরঙ্গতায়, আর তখন, মানুষের বা প্রকৃতির মিলন-

প্রসঙ্গের মধ্যে পাব অন্তরঙ্গী-মানুষ চিরজীবী-রবীন্দ্রনাথকে। ভারতের জাতীয়-সংগীত 'জনগণমন-অধিনায়ক'-এ এবং কবির কর্মসাধন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান-'বিশ্বভারতী'তে বিশ্বের মানুষকে ঘরের-মানুষ ক'রে তোলবার সন্ধান দিয়ে, মর্ত্যকে নন্দনের-আনন্দে ভরপুর ক'রে রেখে গেছেন এই মহা-স্রষ্টা ভাগবৎপুরুষ রবীন্দ্রনাথ। এ-যে আমাদের কত বড়ো অন্তহীন এক পরমসৌভাগ্য, তা কালে-কালে গভীর থেকে গভীর ক'রে ক্রমে-ক্রমে একান্ত-অভিনিবেশ ও নানা পরিপক্ক-অভিজ্ঞতায় আরো-বেশি ক'রে বোঝাবার বিষয়-তাতে সন্দেহ নাই।

মর্ত্য-নন্দন

প্রথম অংশ ঃ লোকমাতা

দ্বিতীয় অংশ ঃ ভুখা-ভগবান

অংশ নিয়ে সমগ্রতা, সে-সমগ্র একমাত্র তুমি,
আর-সব-ই অংশ-সত্য, জুড়ে আছে ক্ষুদ্র খণ্ড-ভূমি।
সে যার আশ্রয় হোক, সমস্ত জীবন-মরণেই
একমাত্র তুমি-ছাড়া আমার আশ্রয় অন্য নেই।
আছ তুমি কিংবা নেই, কে তুমি,—সে-তর্ক অবান্তর,
'তুমি'—এ ধ্যানের সত্যে মুক্তি পায় আমার অন্তর।
অসীম-সে প্রকাশের অন্তহীন সম্ভাবনা-মাঝে
অবাধ এ-মুক্তিস্বাদ আর-সে কিছুতে মেটে না-যে!
সেইখানে দেখি আমি একমাত্র ঘোচে সব গ্লানি,
সব ক্ষুদ্র ভেদ মেটে, সমান অমূল্য ক'রে মানি—
একত্রে একের মধ্যে ছোটোবড়ো—সকল-কিছুকে
সবারে নিয়েই তুমি, সেই তুমি যেখানে সম্মুখে।
সেখানে যে নাই কিছু দেশ-কাল-পাত্রের সীমানা,
সব সীমা অসীমেতে, অজানাতে মেশা সব জানা॥

লোকমাতা

নিবেদন

বিশ্বে আজ খাদ্য-সংকট সকল-সংকটকে প্রায় ছাড়িয়ে উঠ্‌ছে। তাকে কেন্দ্র ক'রে সর্বত্র জোর রুটির-লড়াই চলছে; চলছে অবশ্য তা বাঁচবার জন্যই, কিন্তু তাতেই আবার কুরুক্ষেত্রের মরণোৎসবের-মতো মানবজাতি তার আত্ম-লোপের চরম মুহূর্তটিকে ঘনিয়ে আনছে। এর থেকেই বাধছে যত শ্রেণীসংগ্রাম, এর থেকেই ঘটছে মানুষে-মানুষে ছোটয়-বড়োয় যত বিদ্বেষ-বিচ্ছিন্নতা। অথচ সর্বত্রই সকল-পক্ষে এক-মানবতারই দোহাই দিয়ে মানুস আজ ধ্বংসের পথে উন্মত্ত। রহস্যের বিষয়—ওদিকে কিন্তু আবার দেখা যায়,—প্রাকৃতিক জৈব-রীতিতে আবাল-বৃদ্ধগত ছোটোবড়োর ক্রমপর্যায় রক্ষা ক'রেই চিরকাল এই সৃষ্টিধারা রয়েছে চির-চলমান।

বর্তমানে একদিকে বৈষয়িক-ক্ষেত্রে আথিক-সমবণ্টনের ব্যবস্থায় শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীসংগ্রামের সমাধান-চেষ্টা চলছে; তেমনি অন্যদিকে আবার চলছে,—আত্মিক-ক্ষেত্রেও বোধ-বিকাশের দ্বারা মানুষের মধ্যে সমপ্রাণতা আনবার চেষ্টা। দুই-পক্ষেরই সাধারণ লক্ষ্য দেখা যায়—মানুষকে বাঁচানো। কিন্তু, বাঁচতে হলে গোড়াতেই সকলের প্রয়োজন,- খাদ্য। জন্মিয়েই শিশুর কান্না—পেটের ক্ষুধার। খাদ্য চাই যেমন পেটের-ক্ষুধার, খাদ্য চাই তেমনি মনের-ক্ষুধারও। বড়ো-হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মনের ক্ষুধারও সমস্যা হ'তে থাকে ক্রমবর্ধমান।

কিন্তু, ক্ষুধা দেহেরই হোক আর মনেরই হোক,—এর থেকেই সংগ্রাম বেধে যেমন ব্যাপ্ত হচ্ছে জীবনের ধ্বংসের ধারা, তেমনি ভুললে চলবে না যে, এই ক্ষুধাই আবার বিশ্বজীবন-সৃষ্টির মূল-উৎস। শান্তি অপেক্ষা করছে মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত-াণময়-প্রসমন্বয় ও সামঞ্জস্য-সাধনের উপর।

সুসম-বৈষয়িক ও মানসিক ব্যবস্থার দ্বারা, ছোটো-বড়োর সনাতন-ধারাকে সংবেদনশীল ঐ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের পথে মোড় ফিরিয়ে নিয়েই, সর্বনাশা ধ্বংসের পথ থেকে মানুষই মানুষকে বাঁচাতে পারে। মানুষের চোখের সামনে ধ'রে দেখাতে হবে সমবেদনা-ভিত্তিক ঐক্য ও আনন্দের একটি শুভ-প্রাণলোক। এই প্রাণ-লোকের সম্ভাব্য-ছবিটিই 'মর্ত্য-নন্দন'-নামক দু'পর্যায়ের এক পালাগানে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

সৃষ্টি-ধারার রহস্য অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তির নিজের মধ্যে সকলকে

এবং সকলের মধ্যে নিজেকে এক-ক'রে-পাওয়ার আকুলতা নিয়েই যেন একটা মৌলিক শক্তি অহরহই নানাভাবে নানাজনের নানাকাজে সংসারের ঘাটে-ঘাটে নানা-সম্বন্ধের পাক খেয়ে ফিরছে, যাকে কবিও বলেছেন,—"আমার মিলন লাগি' তুমি আসছ কবে থেকে—"। এই পাক খেয়ে-খেয়ে জড়িয়ে-পড়ার মধ্যেই আবার আকর্ষণে—বিকর্ষণে নানা ঘটনায় গড়ে উঠছে কোথাও সংঘাত, কোথাও সংহতি। সংঘাতে বিচ্ছেদ, সংহতিতে মিলন। মিলনে আত্ম-পরের সমস্যা মিটে গেলেই হয় আত্মীয়তার বিকাশ। পক্ষান্তরে, আত্মীয়তার অভাবে হয় যত দুঃখ, যত ব্যথা, যত বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি। এই অনাসৃষ্টির থেকে ত্রাণ পেতে হলে চাই মানুষে-মানুষে সমব্যথী ও সমপ্রাণ হয়ে প্রতিবেশীর-মতো সুখে-দুখে এক হয়ে চলবার চেষ্টা। উপনিষদে বলেছে—"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি, সর্বভূতেষু আত্মানং ততোহনবিনশ্যতি"! গীতায় বলছে—"সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।" যদি তুমি বুঝতে পার—যে, তুমি সর্বজনের বন্ধু, তবেই তুমি শান্তি পাবে। সামাজিক-সমষ্টিভূত ভাগবৎ-সত্তা-বোধের সাধনায় সকলের দৃষ্টি জীবনযাত্রার সকল-ক্ষেত্রে ঐক্য-মন্ত্রে নিবদ্ধ রাখবার জন্য ভারতের জাতীয়-সংগীতেও একালে 'জনগণমন-অধিনায়ক'-রূপী জনতা-ভগবানের জয় দিয়ে উদ্‌গীত হয়ে চলেছে—"জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা"। বক্ষ্যমান "মর্ত্য-নন্দন"-আখ্যানটিতে সর্বজনের মিলনমূলক শাশ্বত সেই ভাগবৎ-তত্ত্বটিকেই নানা-ঘটনায় সাজিয়ে ধরা হয়েছে রসরূপে।—সেখানে দুটি-পর্যায় মিলিয়ে দেখা যাবে, রাজা-প্রজা,—সমাজের সর্বস্তরের লোকই পরস্পর নানা-ভূমিকায় সংঘাত-সংহতির মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষটায় মিলেছে একটি সমপ্রাণতাময়—'আনন্দলোকে'।

লোকমাতা

দৃশ্য ১

(বৈশালী-রাজ্যের রাজধানী। রাজকক্ষ। সকাল। উক্তিরত রাজা ও সেনাপতি-সুরজিৎ-সিংহের প্রবেশ)

বৈশালীরাজ! বি-বা-হ? রাজকন্যার সঙ্গে? না, না, সুরজিৎ—এ তুমি কী বলছ, বৎস। কথাগুলি বলতে তোমার একটুকুও বাধল না?

সুরজিৎ। বাধবে কেন মহারাজ? যা সত্য, যা স্বাভাবিক তা বলব না?

বৈশালীরাজ। স্বাভাবিক বলছ?

সুরজিৎ। নিশ্চয়ই।

বৈশালীরাজ। কিন্তু, তোমার স্বাভাবিকটা আমার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছে-যে বাবা।

সুরজিৎ। কেন মহারাজ?

বৈশালীরাজ। বললেও তুমি কি তা বুঝবে? তুমি আমার প্রধান-মন্ত্রীর একমাত্র পুত্র, শৈশবেই পিতৃমাতৃহারা; আর, সংসারে আমারও ছিল মা-হারা একমাত্র কন্যা। তার সঙ্গে তুমিও সন্তানবৎ-সস্নেহে একত্রেই হয়ে এসেছ রাজপুরীতে বর্ধিত।

সুরজিৎ। জানি মহারাজ, আর, এ-ও জানি,—বড়ো হলে আমাকে রাজকর্মে সেনাপতি-পদ-ও দিয়েছিলেন আপনিই।

বৈশালীরাজ। এই কি তার প্রতিদান? তা-ছাড়া, মেয়ে-আমার এখন বড়ো হয়েছে, তুমিও যথেষ্টই বড়ো হয়েছ। দু'জনের মেলামেশার-বয়সও তো অনেক আগেই দুজনে পেরিয়ে এসেছ। তবু বড়ো-ভাইয়ের মতোই তুমি তার কাছে হয়ে আছ তেমনি শ্রদ্ধেয়। তার সেই 'দাদা'-ডাকটিও কি তুমি এত সহজে ভুলে গেলে? —সমস্তটাই যে কী অস্বাভাবিক!

সুরজিৎ। না, আপনি যা বলছেন এটাই তো অস্বাভাবিক, এমন কি, হাস্যকরও বটে! মেয়েকে সুধাবেন, বড়ো হয়ে সেও এখন নিশ্চয়ই আমাকে তার জীবন-মরণের সঙ্গী ব'লেই জানে। এ যে বয়সের ধারা! শৈশবের শ্রদ্ধা যৌবনের প্রেম হয়ে ওঠা কি এতই অস্বাভাবিক?

বৈশালীরাজ। আমি বিশ্বাস করি না। এ তো সবই তোমার স্বভাব-অনুরূপ—

অনুমান-মাত্র। সুরজিৎ, বিকৃত এইসব অন্যায়-অনুমানকে কিছুতেই আমি প্রশ্রয় দেব না। তুমি নিজেকে এখনো সংযত করো।

সুরজিৎ। ধৃষ্টতা মাপ করবেন মহারাজ, আমি যা বলেছি কিছুমাত্র অন্যায় বলি নি। একালে এটাই সত্য।

বৈশালীরাজ। কী বললে?—এটাই সত্য?—ক্ষুধা, ক্ষুধা!—এ শুধু রক্তমাংসের ক্ষুধা! বয়োধর্মে অন্ধ-মোহাবেগের খেলা! সে-আবেগে ডুবে' তুমি নিজের পদ-মানও ভুলেছ! ক্ষুধার তাড়নে বিবেক হারিয়ে তুমি তোমার নিজের এ কী-এক অসামাজিক-পরিচয় দিচ্ছ? এসব কী বলছ?—তা ব'লে, ভাই-বোনে বিয়ে? প্রজারাই বা কী বলবে?

সুরজিৎ। আপনিই বা কী বলছেন? ক্ষুধা? শুধু অন্ধ-মোহ? এ-যে যৌবনের স্বাভাবিক প্রাণধর্ম। প্রত্যাখ্যানে এ'কে বাধা দিলে, সে ও যে কী-এক অমানুষিকতা হবে! আপনার এ-সবটাই যে একটা কুসংস্কারের মত্ততা!

বৈশালীরাজ। তুমি কেবল সংস্কারই দেখলে? আমার এই হৃদয়ের দিকটায় তোমার-ও এত অন্ধতা?

সুরজিৎ। সে-সব আমি বুঝিনে, প্রত্যাখ্যানই যদি শেষ-কথা হয় তবে আমিও জানিয়ে দিচ্ছি, আজই আমি এ-রাজ্য ত্যাগ করছি। (প্রস্থানোন্মুখ)

বৈশালীরাজ। বাবা সুরজিৎ, তোমার মধ্য দিয়ে আমি-যে আমার বন্ধুপুত্র আর একজন সুযোগ্য-সেনাপতিকে-ও একই সঙ্গে হারাতে যাচ্ছি!—সেটা কি আমার পক্ষে কম-মর্মান্তিক? আর, সংস্কারের কথা বলছ? সংস্কার যে সমাজ-জীবনের নীতি-শৃঙ্খলার ধারক।

সুরজিৎ। তাতে কী হয়েছে?—বাধছে কোথায়?

বৈশালীরাজ। সেই নীতি-শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্বটা যে হচ্ছে রাজার। আমি পিতা, তেমনি আমি রাজা!—সমাজের নীতি-শৃঙ্খলার রক্ষক যে আমি! রক্ষক হয়ে আজ নিজের মেয়ের বিবাহের স্বার্থে আমিই কি হব শেষে নীতি-শৃঙ্খলার ভক্ষক?

সুরজিৎ। আমিও তো সেনাপতি!

বৈশালীরাজ। তোমার দায়িত্ব সে-স্থলে একদিককার, ক্ষুধাও তোমার একজনারই।—কিন্তু, রাজাকে যে দেখতে হয় রাজ্যের হাজার-হাজার লোকের হাজার-দিককার সমস্যা।

সুরজিৎ। আমি কি সেই হাজার-হাজার-জনের-ই একজন নই?

বৈশালীরাজ। নিশ্চয়ই একজন। কিন্তু, তাহলে শোনো সেটাও,—তুমি যে

আমাদের সবর্ণ নও। জাতিবর্ণের উপরেই তো সমাজের ভিত্তি। তাই তো আমি আশা করছি—হাজার-হাজার বছর ধ'রে হাজার-হাজার লোক যা মেনে চলেছে তুমিও তা মেনে চলবে। আর, দেখো, তুমি যদি রাজাই হতে চাও, তাও আমি ভেবে রেখেছি, মেয়েটার বিবাহ দিয়ে তোমাকেই আমি রাজ্যভার দিয়ে অবসর নেব। —তার জন্য এত অধীর হতে হবে না—সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তবে, আর কী রইল?—এই তো হোলো?

সুরজিৎ। শেষে এই রাজ্যের-প্রলোভনে আমাকে আপনি ভোলাবেন ভেবেছেন?—ধিক্!

বৈশালীরাজ। প্রহরী!

সুরজিৎ। (সক্রোধে) প্রহরী?—থাক্ মহারাজ। (প্রস্থানোদ্যত)

বৈশালীরাজ। (ব্যস্তভাবে আগাইয়া) না, না,—না বৎস, প্রহরীকে তোমার জন্য ডাকিনি। দ্বারে অপেক্ষমান বিদর্ভরাজের দূত। মেয়ের বিয়ের পাকা-পত্র তাকে দিতে হবে। মেয়ের মত জেনে নিয়ে বহুদিন থেকে তাকেই যে আমি কন্যা-সম্প্রদানে আছি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সুরজিৎ। (স্বগত) কী শুনছি? বিয়ের আজ পাকা-পত্র? তা নিতেই দ্বারে বিদর্ভের দূত? তাহলে, যা শুনে এসেছি, তাই সত্য? তা হোক,—(মুখ ফিরাইয়া রাজাকে) তবে আপনিও শুনুন মহারাজ,—এ আমি ভুলব না, জীবন-থাকতে নয়। আজকের এই প্রত্যাখ্যান আর অপমানের প্রতিফল একদিন আপনাকে পেতেই হবে। রাজকন্যা-ঐন্দ্রিলাকে আমার চাই-ই-চাই!—যে-কোনো প্রকারে আর যতদিনে হোক! (দ্রুত প্রস্থান)

বৈশালীরাজ। (পিছন হইতে ডাকিয়া) শোনো সুরজিৎ, বাড়াবাড়িটা ভালো নয়, রাজদণ্ড সেটা ক্ষমা করবে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ—

বৈশালীরাজ। প্রহরী, বিদর্ভের দূতকে এ-পত্র দিয়ে এসো। (পত্র-প্রদান ও পত্র লইয়া নমস্কার দিয়া প্রহরীর প্রস্থান। রাজার পায়চারি) না না, কিছুতেই না, এসব অন্যায়ের প্রশ্রয়-দেওয়া কোনোক্রমেই হতে পারে না। আজ তাই মনে পড়ছে—রানী থাকলে এত ভাবতে হত না। যাক্, বিদর্ভরাজকে বিবাহের সম্মতি দিয়ে দিলাম। এখন কোনোমতে বিবাহটা হয়ে-গেলেই হয়। কিন্তু, তারপরে? শূন্য-ঘর আর রাজত্ব?—সেও তো কতই করা গেল। জানি না, কোন্ মুহূর্তে আবার

কোন্‌দিক দিয়ে কোন্‌ ঝড় এসে কী ঘটিয়ে বসে! (প্রস্থানমুখে সহসা উৎকর্ণ হইয়া শোনা—)

নেপথ্যে। গান

ওরে ভীরু, তোমার হতে নাই ভুবনের ভার!
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার॥
তুফান যদি এসে থাকে তোমার কিসের দায়,
চেয়ে দেখো ঢেউয়ের খেলা কাজ কী ভাবনায়?
আসুক নাকো গহন রাতি হোক্‌ না অন্ধকার,
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার॥

(ভাবিতে ভাবিতে রাজার প্রস্থান)

দৃশ্য ২

[বিদর্ভ। প্রাক-সন্ধ্যা। বন]

(বিদর্ভ-রাজের দ্রুত-প্রবেশ)

বিদর্ভরাজ। (চারিদিকে ত্রস্ত চাহিয়া) হরিণটা কি তবে পালাল? কোথায় গেল? (আগাইয়া গিয়া) তাই তো, এ কী? এ কোথায় এসে পড়লাম? নিবিড় বন। আমার লোকজন? এদিকে যে দেখছি সন্ধ্যা হয়ে আসছে! কিছুই যে ভালো ঠাহর হচ্ছে না,—কী করা যায়? আর-এগোনো-ও তো ঠিক হবে না। পেছবই-বা কোথায়? (এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা; হঠাৎ নেপথ্যে ব্যাঘ্রগর্জন। চকিত হইয়া ও কী?—বাঘ? (হাতের ধনুকে তীর-যোজনা) আবার গর্জন? (বাঘের দিকে রাজার তীর ছুঁড়িবার উপক্রমেই বাঘের অন্তিম-চীৎকার) এ কী, বাঘটা অদূরে ছিট্‌কে পড়ে অসাড় হয়ে রইল যে!

(রক্তাক্ত-তরবার-ধারী ছদ্মবেশী সুরজিৎ-সিংহের প্রবেশ)

সুরজিৎ। (রাজাকে) বাঘটাকে সাবাড় করেছি। এখন আসুন আমার সঙ্গে।

বিদর্ভরাজ। (সুরজিৎকে) কে তুমি? তোমার নাকমুখচোখ সব যে দেখছি রক্তাক্ত, বিকৃত।—এ কি বাঘের থাবা খেয়ে?

সুরজিৎ। আমি বিদেশী সৈনিক, চলেছি চাকুরির খোঁজে বিদর্ভরাজ্যে—এদিক দিয়ে মাঠ পেরোতে যাচ্ছি,—আপনাকে ধনুক-হাতে দ্রুত এই বনে ঢুকতে দেখেই ভাবলাম, নিশ্চয়ই শিকারের পিছু নিয়েছেন; যোদ্ধা আমি, অমনি আপনার বিপদাশঙ্কা ক'রে আমিও আপনার পিছু নিলাম। কিন্তু, বনে ঢুকেই পড়লাম ঐ বাঘটার সামনে। আর, বুঝতেই পারছেন—যুঝতে গিয়েহ-না ক্ষতবিক্ষত হলাম। তবু যে বাঘটাকে খতম ক'রে আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি—এইটেই পরম সান্ত্বনা।

বিদর্ভরাজ। তোমার নাম?

সুরজিৎ। নাম? (ইতস্ততঃ স্বগত), তাইতো! এখন কী করি! ঠিক আছে। (রাজাকে) আমার নাম শিলাদিত্য। আপনি?

বিদর্ভরাজ। আমি বিদর্ভের রাজা।—শিকারের নেশায় দূরে এসে পড়েছি।

শিলাদিত্য। মহারাজ, অভিবাদন গ্রহণ করুন। (স্বগত) সম্মুখে স্বয়ং বিদর্ভরাজ? (রাজাকে) রাজদর্শনে ধন্য হলাম। কিন্তু, কী দিয়ে এখন মহারাজের সম্মান করি!

বিদর্ভরাজ। সে-সব পরে হবে। তাড়াতাড়ি আমাদের রাতের আগেই বন থেকে বেরুতে হবে। অবিলম্বে তোমার ক্ষতের চিকিৎসা আবশ্যক। হাঁটতে পারবে? চলো, আমার কাঁধে ভর দিয়ে। আজ তুমি যে বীরত্ব দেখিয়েছ,—তাতে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি।

(নেপথ্যে কোলাহল)

রাজ-অনুচরদল। (নেপথ্যে উৎকণ্ঠায় উচ্চকণ্ঠে পরস্পর-আলাপ) মহারাজকে তবে কোথায় পাই? ওরে, ঐদিকে নয়, এই-দিকটায় দেখ্ দেখি। ঐ যে, ঝোপ-ঝাড়গুলি এই দিকেই তো এলোমেলো করা রয়েছে দেখছি।—ওরে বাবারে, সামনে প'ড়ে ওটা কীরে? কেন রে, হঠাৎ ভূত দেখলি নাকি? অমন দৌড়াচ্ছিস্ কেন? —কী বলব, দাদা! একটা বিরাট বাঘ! কিন্তু, ওটা নড়ছে না তো! ঘুমুচ্ছে নাকি?—নড়বে কীরে? ঘুমুচ্ছেই বটে, তবে ও-ঘুম আর ওর ভাঙবে না!—দেখছিস না?—ওর মাথায় যে একটা তরোয়ালের কোপ রয়েছে। তাই-তো! শিকারটা মারা পড়ল কার হাতে? মহারাজ বেঁচে আছেন তো?

বিদর্ভরাজ। লোকজন ঐ এসে পড়েছে—এবার চলো যুবক, আমরাই আগে এগিয়ে গিয়ে ওদের চমক লাগাই!

(সুরজিৎকে লইয়া রাজার প্রস্থান)

দৃশ্য ৩

[পূর্ণিমা-সন্ধ্যা। বিদর্ভ-রাজধানী। রাজবাড়িতে রাজরানীর বিবাহ-সম্বর্ধনার উৎসব-আসর]

(জনতার প্রবেশ)

গ্রামের মেয়ে-পুরুষের আলাপন। যাক্, এতদিনে দুঃখ তবে ঘুচল। এই সোনার-রাজ্য বিদর্ভে রাজা ছিলেন, রাজ্য ভ'রে প্রচুর সুখ-শান্তিও ছিল, লক্ষ্মীর আশীর্বাদও ছিল তেমনি। ছিলেন না কেবল একটি রানী। এইটিই ছিল মনে-মনে সকলের দুঃখের কারণ। বৈশালীর থেকে এবার রানীও এলেন। রাজার বিয়ের উৎসবে আজই আমাদের গাঁয়ের গাওনার-দিন! (মেয়েদের প্রতি পুরুষেরা) দেখিস্ গো, ভালো ক'রে নাচিস, উৎসবের আসরটা বেশ জমে যেন। (মেয়েরা) তা আর বলতে? গাঁয়ের নাম রাখতে হবে তা? তোমাদের দিকটাও তোমরা দেখো তেমনি। (রাজারানীর প্রবেশ। 'জয় আমাদের রাজারানীর জয়'' ধ্বনি দিয়া রাজারানীকে সকলের নমস্কার করা, লাজবর্ষণ, উলুধ্বনি, শঙ্খ ও বিবিধ-বাজনার কলরবের মধ্যে বরকনেকে মেয়েদের বিবিধ-ছন্দে বরণ, উপঢৌকন-দান ও মাল্যভূষিত করা। পরে নৃত্যগীত)

গান

গ্রামবাসীগণ। আনন্দের নাই ওর,

দেখ্-না রে ভাই, চাঁদের সনে মিলেছে চকোর।
কতদিনের চাওয়ার শেষে পাওয়ার সাধটি মিটল দেশে,
লক্ষ্মী এলেন রানীর বেশে, সুখে সবাই ভোর॥
দোরে-দোরে মঙ্গল-ঘট, মাল্য রাশি-রাশি,
গানে-গন্ধে বরণ-ডালায় বাজে প্রাণের বাঁশি।
কাটল নিরস-একাদশী, পূর্ণিমা দেয় দিক্ হরষি',
জ্যোৎস্না ঢেকে অমা-র মসি ঝরছে যে অঝোর॥

বিদর্ভরাজ। (জনতার প্রতি) গ্রামবাসীগণ, দূর-দূর থেকে তোমরাও এসেছ? তোমাদের এই প্রাণের-গড়া সুন্দর-অনুষ্ঠানে এসে খুবই আমরা খুশী হ'লাম। তোমাদের রাজ্যবাসী-সকলের ভালোমতো সেবা করতে পারি, তবেই-না আমাদের দুজনের জীবন হবে সার্থক। এখন তোমরা আনন্দ করো, আমরা অন্য-আসরগুলিও একবার দেখে নিই। (উঠিয়া জনতাকে নমস্কার ও উভয়ের প্রস্থান)

জনতা। (সমস্বরে) জয়, বিদর্ভের জয়, জয় বৈশালীর জয়।

(পরস্পর আলাপ) সত্যি ভাই, প্রজাদের সঙ্গে দেশের রাজাও আজ এত খুশী যে, সে যেন আমাদেরই-একজন হয়ে গেছে। যে-কেউ গিয়ে তাঁকে ধরছে, সবাই কিন্তু কিছু-না-কিছু পেয়ে যাচ্ছে। (একজন) যা বলেছ, এই ফাঁকে এক-একজন তো তালুক-মুলুকের নায়েবিতেও বহাল হয়ে যাচ্ছে। দেখোনি, শিলাদিত্য-নামে কোথাকার কে-একজন যে— গাঁয়ের যুবক-চাষী-কুঞ্জলালের অস্থির-পায়চারি)

কুঞ্জলাল। (বিরক্তিতে) রাজারানী চলে গেলেন—এখন, এর মধ্যে আবার শিলাদিত্যকে টেনে-আনা কেন? লোকটা সেদিন-মাত্র বুধকোট-অঞ্চলের অমাত্য হয়ে এল—শুনেছি, শিকারে একদিন বাঘের মুখ থেকে রাজাকে বাঁচিয়েই নাকি লোকটার হঠাৎ এই এত বাড়-বাড়ন্ত। দুদিন যেতে দাও—তারপরে দেখা যাবে লোকটা কেমন, কী-দরের!

(উক্তিরত রাজার বাল্যসখা সুবন্ধুর প্রবেশ)

সুবন্ধু। (জনতাকে) তোমরা এখানেই ব'সে আছ?—ভোজে চলো। দেরি দেখে রাজরানী যে তোমাদের ডেকে নিতে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। তারপরে, ভালো তো সব? বলো দেখি, রানী-তোমাদের কেমন হল? কেমন সব দেখলে? মনে ধরল তো?

জনতা (একে-একে)। খুব ভালো, ঠাকুর, খুবই ভালো। এমন রানী আমাদের ভাগ্যে-পাওয়া, ভগবানের দান! সত্যি যেন সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মীটি! তা হবেই-বা-না কেন! আমাদের রাজাও যে তেমনি সাক্ষাৎ-নারায়ণ। তোমার তো আরো মজা হোলো দেখছি ঠাকুর! ছিলে রাজার ছোটোবেলার বন্ধু, শুনলুম, বিয়ের-তোড়ে তুমিও হ'লে একেবারে কেষ্ট-কেটা নয়,—রাজপুরোহিত। তুমি আবার মন্ত্রতন্ত্র জানো না-কি? তুমি তো আমাদের দাদাঠাকুর গো! বলি, এখন আমাদের মনে রাখবে তো? গাঁয়ে যাওয়া-আসাটা তেমনি বজায় থাকবে তো? না, রাজবাড়ির রাজভোগ খেয়ে-খেয়ে পায়া-ভারী হয়ে যাবে? তখন এই গেঁয়ো-গরীব-গরবারদের মুড়ি-মুড়কী আর মুখে রুচবে কি?

সুবন্ধু। তা, বলবি বই-কি!—বলে নে' ভাই! তবে, জানিস তো, রাজবাড়ীর ব্যাপার। বড়র পীরিতি যে বালির বাঁধ। -বেনো-জলের ধাক্কা পড়লে বাঁধ ভাঙতে কতক্ষণ! যাই-হোক, আমার কাছে জানই-তো,—রাজাও যেমন, তোমরা-প্রজারাও তেমনি। কারবারের মূলধন আমার মানুষের-মনটুকু। আমি পণ্ডিত-ও নই, পুরোত-ও নই,—তবু, কী মনে-ক'রে যে রাজাও যেমন ডাকেন, তোমরাও তেমনি ডেকে থাকো, সে তোমরাই জানো। চালচুলো নেই, আমার-মনে আমি চলি-ফিরি।

কেমন ক'রে বলব,—কবে কী হবে, আর, কবে যে কেমন কী করব ! এখন ভোজটা খেতে চলো তো !

জনতা। চল্‌রে চল্‌, রাজারানী নয়তো আবার কী মনে করবেন। (ধ্বনি) জয় বিদর্ভের রাজারানীর জয় ! সমস্বরে গীত,—"আনন্দের নাই ওর, দেখ্‌-না রে ভাই, চাঁদের সনে মিলেছে চকোর" (গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ৪

(বিদর্ভ-রাজপুরী। পুষ্পোদ্যান। সন্ধ্যা)

বিদর্ভরাজ। (গাহিতে-গাহিতে পায়চারি)

গান

সখি, কী যেন দেখেছি কবে,—
আন-জনে কি তা বোঝানো যায় গো, বুঝি নিজে অনুভবে।
সে নহে তোমার চারু-বেশবাস নহে কালো এলো কুন্তল-পাশ,
ভ্রমর-চপল নয়নও সে নহে, কে বলিবে সে কী তবে !
কথার গাঁথুনি ব্যথা হানে বুকে বুঝাবারে যাই যবে ॥

(রানী-ঐন্দ্রিলার প্রবেশ)

ঐন্দ্রিলা। (মৃদুহাস্যে রাজাকে) তাই-তো রাজামশাই, মুশকিল হচ্ছে যত তোমাকে নিয়েই। সারাক্ষণ কাছে ব'সে-থেকে কেবল কথায়-কথায় সময়-কাটানো। এত কথা আর এত সময় সেদিনের মতো কি আর আমাদের আছে ? আমি ও-সব পারিও না, বিশেষ তো, রাজ্যভরা এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে ওতে মনও যায় না।

বিদর্ভ। রানী, হুঁঃ ! দিনে-দিনে তুমি কেমনই যেন উন্মনা হয়ে যাচ্ছ—একেবারে যে গভীর-গম্ভীর রসহীন হয়ে উঠছ ! মনে করো দেখি, আমাদের বিয়ের সেই সুধাময়-দিনগুলি !

ঐন্দ্রিলা। মাঝে যে ক-বছর কেটে গেল ! এ তো হবেই রাজা ! কী-এমন তাতে আশ্চর্য। চিরদিনই কি লোকের সমান যায় ?

বিদর্ভরাজ। (মৃদুহাস্যে) কী করব বলো, রাজ্য-সাম্রাজ্য ঘর-সংসার তুমি যে রানী,—সবকিছু ভুলিয়ে দিচ্ছ।

ঐন্দ্রিলা। সব ভুললে চলবে কিসে ? দুর্দিনে এই নিরুপায়-নিঃসহায় প্রজাদের তুমি বলো তো—কোথায় ফেলবে ?

বিদর্ভরাজ। (বিরক্তির বক্রদৃষ্টিতে) আঃ! রেখে দাও রানী, তোমার ঐ নিত্যকার-যত নীতি-উপদেশ। বলছি ও-সব পচে গেছে। ধেৎ, সন্ধ্যাটা আজো ছাই তেমনি মাটি করলে। ভালো, তাই হবে। কাল থেকে যখন-তখন আর এদিকে এরূপ আসব না। তবেই তো হোলো? (গম্ভীর-মুখে প্রস্থানরত হইয়াই ফিরিয়া) হ্যাঁ, তোমার সেই পুরুতটিকে তো ক'দিন দেখছি না। সে গেল কোথায়?

ঐন্দ্রিলা। কেন, সে তো তোমারই বাল্যবন্ধু! তুমিই আবার তাকে করেছ—রাজপুরোহিত। তার কথা তো তুমিই জানবে!—তা নয়-তো, জানব কি আমি? ভেবে দেখো, কোন্ দরকারে তাকে কখন্ তুমিই কোথায় পাঠিয়েছ!

বিদর্ভরাজ। তা বেশ! সে ফিরে এলে পর তার সঙ্গে তুমি বসে-বসে যত পারো তোমার রাজ্য আর প্রজাদের প্রসঙ্গই কোরো। রাজ্যের খবর তো সব সে-ই রাখে।—ভালো ক'রে তার জোগান দিতে পারবে ঐ সুবন্ধু-ঠাকুরই (বাঁকা নজরে), আর, সেটা ভালোও লাগবে আশা করি! (প্রস্থানোন্মুখ)

ঐন্দ্রিলা। (তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া) ও কী রাজা, কোথায় যাচ্ছ? (রাজার হাত ধরিয়া গান)

গান

বঁধু, মিছে রাগ কোরো না,—
মম মন বুঝে দেখো মনে-মনে, মনে রেখো কোরো করুণা॥

বিদর্ভরাজ। (রানীর চিবুক ধরিয়া সহাস্যে) এখনো তবে বাতিল হইনি? অভাগার প্রতি এখনো মন আছে?

গান

বিদর্ভরাজ। ছুঁইনি যে ফুল, গাঁথিনি যে মালা, পরি নাই যারে গলে,
ফাগুন-বাতাসে যার আশা ভাসে কম্পিত-বনতলে।
অমরাবতীর মানস-কাননে কুঁড়িগুলি যার কাঁপে খনে-খনে,
সুর-বালিকার বেণীর বাঁধনে চরম বিরাম লভে,
তারই মতো তুমি আমার স্বপনে বিরাজো সগৌরবে॥

নেপথ্যে কঞ্চুকী। মহারাজ, সুবন্ধু-ঠাকুর এসেছেন।

বিদর্ভরাজ। (বিরক্তিতে) বাধা আর বাধা। দুদণ্ড রেহাই নেই, যে, ঘরে ব'সে দুটো মনের কথা বলি। (কঞ্চুকীকে) কঞ্চুকি, ঠাকুরকে এখানেই নিয়ে এসো। ব্যাপারটা চুকিয়েই দিই। (কঞ্চুকীর "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রস্থান)

ঐন্দ্রিলা। (রাজাকে বাঁকা-নজরে দুষ্টুমি-ভরা হাস্যে) কিছু মনে কোরো না রাজা, কী করব, ওদিকে ঘরের কাজ রয়েছে।— চললাম। (কৌতুক-কটাক্ষে প্রস্থান)

বিদর্ভরাজ। হায় রানী, আমার যাবার কথা, না, তুমিই-যে দেখছি আগে চলে গেলে? যাও,—তবে, আমিও এখনি আসছি। (রানীর প্রস্থান-পথের দিকে কাতর-দৃষ্টি)

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সুবন্ধুর প্রবেশ)

বিদর্ভরাজ। (সুবন্ধুকে) আসতে এত দেরী?—ক'দিন ছিলে কোথা?

সুবন্ধু। সব ভুলে গেলে? রাজ্যের অবস্থা জেনে নিয়ে তোমাকে সব আমার জানাতে হবে—এই না ছিল কথা? শোনো রাজা,—খবর ভালো নয়! - সংকট উপস্থিত।

বিদর্ভরাজ। (উদ্বেগে) কিসের সংকট?

সুবন্ধু। রাজ্যের সংকট। অজন্মার থেকে এখন দিকে-দিকে দেখা দিচ্ছে দুর্ভিক্ষ, মহামারী—আরো কত-কী।

বিদর্ভরাজ। তা তো জানি,—তারপরে?

সুবন্ধু। দিনের-পর-দিন না-খেয়ে-খেয়ে প্রজারা আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠছে-যে!

বিদর্ভরাজ। একেবারে বিদ্রোহী?—সে কী!

সুবন্ধু। বহুকালের বাপ-পিতামো'র বাস্তু ছেড়ে, খাদ্যের সন্ধানে তারা দলে-দলে অন্য-রাজ্যে পালাচ্ছে!

বিদর্ভরাজ। তাই তো, সংকটের কথাই বটে। রোসো, একটু ভেবে দেখি। আগে, পরামর্শের জন্য অমাত্য-শিলাদিত্যকে ডেকে নিয়ে একবার বসতে হবে! আজ এমনিতেই কিছু ব্যস্ত আছি—আর-একদিন এসো, কী বলো। (প্রস্থান)

সুবন্ধু। (রাজার উদ্দেশে) চলে গেলে?—যাও রাজা! তোমার রানী আছে, আছে আবার শিলাদিত্য! ভাববে তুমি, দেখবে তুমি, তারপরে তুমি তোমার শিলাদিত্যকে নিয়ে বসবে। তবেই হয়েছে! ঘরে আগুন লেগেছে, গৃহস্থ অসাড় নিদ্রাগত! এখন কাকে বলি, কে শুনবে কার কথা!

দৃশ্য ৫

[বিদর্ভ-রাজধানী। সকাল। পথপার্শ্বে বটতলা। দূরে দৃশ্যমান স্বর্ণমন্দির-চূড়া।
(উক্তিরত দুইজন গ্রামবাসীর প্রবেশ)

১। কোনোদিকেই তো কোনো পথ দেখ্‌ছি-নে। এসো এই বারোয়ারি বটতলাটিতেই একটু বসা যাক্‌। স্থানটা দেবস্থান আছে। একটু নাম-গান ক'রে—দেখি,—দৈবের দয়ায় কিছু হয় কিনা।

২। আর-কিছু না-হোক, মনে তো একটা ভরসা থাকবে। তুমি ধরে দাও :

গান

উভয়ে। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি, বলো ভাই ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে ধন্য হরি রাজ্য-পাটে,
ধন্য হরি শ্মশান-ঘাটে ধন্য হরি ধন্য হরি॥

(পোঁটলাপুঁটলি-সহ দেশত্যাগী আরো দুই ব্যক্তির প্রবেশ)

নূতন দলের ১। (প্রথম দলের প্রতি) ওহে, ও-সব নামগানে কিছু হবে না দাদা! আজকালকার গান শুনেছ? ঐ যে, পথে-ঘাটে ভিখারীরা যা গেয়ে ফিরছে-গাইছে দুয়ারে-দুয়ারে! লোকের মুখে-মুখে শুনতে পাবে যার পদগুলি—শোনো-নি যদি, শোনো তবে—

আগন্তুক নূতন দুই ব্যক্তি।

গান

না-খেয়ে কি মানুষ পারে বাঁচতে?
(ওদিকে) শাসন-শোষণ, স্বজন-পোষণ,—গাঁ-উজাড় ঠগ্‌ বাছ্‌তে!
অজন্মাতে চাষার হাতে অচল কোদাল-কাস্তে।
চলছে খরা, দেশটা ভরা বেকারীর দরখাস্তে—
ফুলছে হুজুর!—শ্রমিক-মজুর ফুঁসছে-যে বরখাস্তে॥
ভুখ্‌ মেলেছে ভোগের থাবা, কী ঘটাবে যায় না ভাবা,
দেশ ছেড়ে তাই চলছে সবাই শেষের-দিন না-আসতে॥
যা গেল যার, মিলবে কি আর ভেবে কী লাভ তবে?
তাই তো ছুটি,—ভাবছি, দুটি অন্ন কোথায় হবে।
ভাই বন্ধু দেশের-মাটি যতই ছাড়ছি ধরছে আঁটি',
(হায়) চলা কঠিন, (এদিকে) চলছে না দিন—চললে আস্তে-আস্তে॥

ভুখের মুখে গেল ঢুকে—সুখের গড়াগড়ি,
রুটির জন্যে হয়ে হন্যে লাগল লড়ালড়ি।
রাজা-প্রজা ভূত বা ওঝা সবাই যে আজ সবার বোঝা,—
(শুনি, একজন) ওপর-আলা আছেন কালা, (শুধু) নাম্‌কেই-ওয়াস্তে !

প্রথম-দলের ২। কিছুতেই যদি কিছু না হয়, তখন আমরাও শেষে ওদের মতো দেশ ছেড়েই একদিকে চলে যাব।

১। তাই চল্, অন্য দেশে গিয়ে না-হয় উদ্বাস্তু হব,—প্রাণ তো বাঁচাতে হবে।

(উদাসীন-ক্ষ্যাপাচাঁদের প্রবেশ)

ক্ষ্যাপাচাঁদ। তা ভাই, যেখানেই যাও, আর যে-ভাবেই থাকো, মনে রেখো কেবল নিজেকে নিয়েই নয়, নিজের-মতো ক'রে অন্য-সকলকেও যদি আপন ভাবতে পারো, তবেই সব-জায়গায়-ই সকলে-মিলে বাঁচতে পারবে।

দ্বিতীয় দলের ১। বাঁচাবাঁচি পরে !—ওরে চল্ চল্ এখন শিগগির চল্, ঐ দেখ্-না —কারা আসছে !

(ক্রুদ্ধমুখে রাজা ও শিলাদিত্যের প্রবেশ)

শিলাদিত্য। (ক্ষ্যাপাচাঁদকে দেখাইয়া) ঐ দেখুন মহারাজ, যা বলেছিলাম তা ঠিক কিনা। ধর্মের নামে আপনি সোনার মন্দির গড়েছেন ; তাই দেখিয়েই সকলকে ও বলছে আপনার মন্দিরে নাকি দেবতা নাই ! এই ব'লেই লোকটা প্রজাদের খেপিয়ে তুলছে।

বিদর্ভরাজ। তাই-তো, সামনেই যে সব দেখতে পাচ্ছি ! এই মুহূর্তে ওকে সাবধান ক'রে দাও—বাড়াবাড়ি ভালো নয় - (ক্ষ্যাপাচাঁদকে) ওহে, আমার অমন বিশলাখ্ টাকার স্বর্ণমন্দির ফেলে, তুমি এই পথের ধুলায় বুড়ো-বটগাছটার তলায় এসে বসেছ কেন ? আমাকে ?—না, আমার দেবতাকে অপমান করতে ?

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (রাজাকে সহাস্যে) তোমার ও-মন্দির তো মন্দির নয়, রাজা, ও যে তোমারই লোক-দেখানো এক ঐশ্বর্যের স্তম্ভ। তা না-হলে, সেবার আগুন লাগল,—পাড়ার পর পাড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আশ্রয়ের জন্য লোকগুলো চারদিকে ছুটে পালাল, তুমি তাদের আশ্রয় না-দিয়ে সে-বছরই গড়লে ঐ সোনার মন্দির ! কারো দিকে একটু ফিরেও চাইলে না। ঐ মন্দিরে দেব নাই, তোমার অহংকার—অভিমানই হয়ে আছে দেবতা ! সকলের মধ্যে যেখানে আমি আমার দেবতাকে পাই—সে এই বটতলাটিতে। তাই, এখানেই মাঝে-মাঝে এসে বসি।

বিদর্ভরাজ। (শিলাদিত্যকে) এখুনি ওকে এখান থেকে দূর করে দাও।

শিলাদিত্য। (ক্ষ্যাপাচাঁদ ও অন্য-দুইজনকে) দূর হও মূর্খ, মতিচ্ছন্ন—যত দুর্জন।

পূর্ববর্তী দুইজন। (অনুচরদ্বয়কে) না! বটতলা ছেড়ে আমরা যাব না, আমরা আমাদের গান গাইবই।

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (লাঠিধারী-অনুচরদ্বয় আগাইয়া-আসিলে তাহাদের প্রতি) গানে বাধা দেবে?

অনুচরদ্বয়। (ক্ষ্যাপাচাঁদের প্রতি) দেবই তো।

গান

ক্ষ্যাপাচাঁদ। বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে॥
লুটকরা-ধন ক'রে জড়ো কে হতে চাস সবার বড়ো?
এক-নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে॥

শিলাদিত্য। (অনুচরদ্বয়ের প্রতি) এই! দেরি কেন? সরিয়ে দে! (ক্ষ্যাপাচাঁদকে) বারবার বলছি, ভালোয়-ভালোয় এখনো সরে পড়ো।

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (রাজাকে) ভেবেছ এখানেও তুমি রাজা হয়ে বসবে? বসলেই কি রাজা হওয়া যায়? আমাদের রাজা যে বসত করেন আমাদের মনের বেদীতে।—সেখানে কি তোমার এসব-লাঠিসোটা পৌছবে? তাঁর কাছে এই হচ্ছে আমাদের প্রাণের গান। শুনে যা-হয় করো। পার তো তুমিও গাও-না—এ তো সবারই গান—

গান

ক্ষ্যাপাচাঁদ। আমরা, বসব তোমার সনে।
তোমার শরিক হব রাজার রাজা তোমার আধেক-সিংহাসনে।

অনুচরদ্বয়। তবে রে! (ক্ষ্যাপাচাঁদের দিকে লাঠি উঁচাইয়া আগাইয়া-আসা)

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (অনুচরদের লাঠির সামনে বুক পাতিয়া দিয়া) মারো মারো, দেখি, কত মারতে পারো!

অনুচরদ্বয়। তাই তবে দেখো (লাঠি মারিতে উদ্যত হইতেই রাজার হাত তুলিয়া নিষেধ জ্ঞাপন-করা)

রাজা। (অনুচরদের প্রতি) থাম্। ওরা কী-গান গাইল, শুনলি? কিছু তার বুঝলি কি? ওরা যে সোজা-ভগবানকেই ডেকে বলল,—"আমরা বসব তোমার সনে।"—এ যে চরম-দাবি। রাজারাজড়া ওদের কাছে তো তুচ্ছ। দেখছিস-না,

এই দাবি নিয়ে যে ওরা আজ মরতে প্রস্তুত হয়েই এখানে এসেছে। ওদেরকে রুখ্‌বি তোরা? ছ্যাঃ! (শিলাদিত্যকে) ওদেরকে এবারকার-মতো সাবধান করে দিয়ে তোমরা চলে এসো।

শিলাদিত্য। (প্রস্থানমুখী ক্ষ্যাপাচাঁদ ও জনতাকে) শোনো ভণ্ডদল—ভালো চাও তো এখনো বলছি পথে-ঘাটে লোক-জমিয়ে আর-কখনো গানের-নামে হুল্লোড় জুড়ে দিয়ো না।

ক্ষ্যাপাচাঁদ। তা-ব'লে আমরা নামগান করব না?

শিলাদিত্য। না, করবে না। ও-সব বুজ্‌রুকি চলবে না। বারবার বলে দিচ্ছি।

ক্ষ্যাপাচাঁদ। চলবে না,—সে তো পরের কথা। তার আগেই ঐ দেখো,—ও'দিকে কারা আসছে!—সামনের ধাক্কাটা সামলাও! —তবে তো বুঝি হিম্মতটা!

ক্ষ্যাপাচাঁদ। গান

ওরে বাঘ ভেঙেছে খাঁচা!

(চাষী-যুবক কুঞ্জলালের লাঠি-হাতে প্রবেশ)

কুঞ্জলাল। (শিলাদিত্যকে)—সাবধান, সাবধান-রে চাচা!

সকলে। (ঐক্যসুরে)

ধনী মানী কুলীন কাজী যারাই করো যে-কারসাজি,
মিথ্যা ভড়ং ছেড়ে আজই পালিয়ে পরান বাঁচা॥

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (শিলাদিত্যকে)

কারো দুখে হও-না দুখী যেন-রে পরগাছা,
যে-গদীতে চেপে আছ মঞ্চ নয়,—সে মাচা!

সকলে। যে যা-ই করো স্বেচ্ছামতে ফতোয়া দাও পথে-পথে,
পথেই বসবে দুদিন গতে,—মাচার ভিত্‌ যে কাঁচা॥

ক্ষ্যাপাচাঁদ। সমাদরের আফিম-গুলি কাজ দেবে না বাছা!
গোলা-গুলি খাচ্ছে গিলে' (জনতার) ভুখা-বাঘ-সে সাঁচা॥

সকলে। ছেড়ে মনের মেকী-গরম প্রাণ ঢেলে দে থাকলে শরম,
ও ভাই সময় থাকতে হয়ে নরম ধর্‌ মানুষের ধাঁচা॥

কুঞ্জলাল। (শিলাদিত্যকে) কী হে মুরুব্বি, বলি,—আমাদের ক্ষ্যাপা-দাদাকে নিয়ে এতক্ষণ কী-মশ্‌করা হচ্ছিল? শুনলাম, তোমরা নাকি তাকে ধমকাচ্ছিলে?—কী বলছিলে, বলো-না একবার শুনি!

শিলাদিত্য। বটে? কৈফিয়ৎ-তলব? গেঁয়ো চাষা!—তোদের এতদূর স্পর্ধা? রোসো,—আমি শিগ্‌গিরই গাঁয়ে যাচ্ছি।

কুঞ্জলাল। (শিলাদিত্যকে ব্যঙ্গস্বরে) গাঁয়ে যাবে? বেশ তো, গাঁয়ে গেলে ভালোই হবে! স্পর্ধার সীমাটা কার কদ্দুর তুমিও তা কর্তা, ভালো ক'রেই তাহলে বুঝে আসতে পারবে! তুমি তো বিদেশী! কেমন ক'রে এদেশে এসে কিসের থেকে কী ক'রে কী হলে, ভাবছ কি আমরা তার কিছুই জানিনে? রাজাকে হাত ক'রে বেপরোয়া ঐ অমাত্যগিরি আর-তো অমন চলবে না। পুরনো কর্তা-ভজার দিন চলে গেছে। (সকলের প্রস্থান)

শিলাদিত্য। (চাপা-ক্রোধে ক্ষ্যাপাচাঁদের দলের প্রতি শাসাইয়া) বটে? আচ্ছা, অমাত্যগিরি চলে কি না-চলে সবই দেখতে পাবে শিগগিরই!

(অনুচরদ্বয়কে লইয়া—শিলাদিত্যের চিন্তিতভাবে প্রস্থান)

দৃশ্য ৬

[বিদর্ভ। রাজবাড়ি। উৎসব-প্রাঙ্গণ]

(রাজা, বাল্যসখা সুবন্ধু, সভাসদ ও গানের দল)

বিদর্ভরাজ। সব প্রস্তুত তো?

সুবন্ধু। হাঁ, মহারাজ। এক-রকম প্রস্তুত; কিন্তু—

বিদর্ভরাজ। কিন্তু! আমাদের উৎসবের ভিতরেও 'কিন্তু' এসে পড়ে? এ-তো রাষ্ট্রনীতি নয়। তাহলে আরম্ভ করে দাও।

(সনৃত্য গান)

গানের দল। মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি',
কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয়-স্পন্দে॥
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত, উড়ে বসনাঞ্চল প্রান্ত—
আলোকের নৃত্যে বনান্ত মুখরিত অধীর আনন্দে॥

(বাহিরে চীৎকার)

জনতা। অন্ন দাও—অন্ন দাও! মহারাজ—অন্ন দাও!

বিদর্ভরাজ। (গায়ক-দলের প্রতি) গাও গাও, আরেকটা—

গায়কদল। গান

তৃষ্ণার শান্তি, সুন্দর কান্তি,
তুমি এলে বিরহের সন্তাপ-ভঞ্জন।
দোলা দাও বক্ষে এনে দাও চক্ষে
স্বপনের মায়া দিয়ে নীলিমার অঞ্জন॥

(নেপথ্যে নারীকণ্ঠের গীত)

গান

ওগো পুরবাসী,—
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী॥
হেরিতেছি সুখ-মেলা—ঘরে-ঘরে কত খেলা—

(নেপথ্যে দ্বারে প্রহরী ও ভিখারিনী)

নেপথ্যে প্রহরী। (ভিখারিনীকে সরোষে) তুই আবার এখানে এসেছিস—শিগ্‌গির দূর হয়ে যা। ফের্ চেঁচাবি তো বেদম মার খাবি।

ভিখারিনী। ভিখ্ মেগে-মেগে কোন্ দূর গাঁ থেকে এসেছি! আমি যে সেই সরলা-গো। কোথাও কিছু মেলেনি বাবা। ওগো, আমাকে মেরো না গো, মেরো না! ছেলেমেয়ে নিয়ে তো না-খেয়ে এমনি মরছি, তুমি আর মেরো না, বাবা। এক মুষ্টি চাল দিলেই তো চলে যাই।

প্রহরী। মর্, মর্। মরতে আর জায়গা পাস্‌নি হতভাগী! এখানে কি মচ্ছোব হচ্ছে?—নানা! ওগো, এখানে যে নাচ-গান চলছে? গোল করিস-নি। রাজা রেগে যাবেন। দূর হ। (গলাধাক্কা দেওয়া, সরলার ভূমিস্মাৎ হওয়া)

নেপথ্যে-জনতা। তা ব'লে, মেয়ে-মানুষকে গলাধাক্কা? শানে প'ড়ে মেয়েটা যদি মাথা-ফেটে মরে যেত? (চীৎকার) খুন, খুন—মেয়ে-মানুষ একটা খুন হয়ে গেল গো—মার্, মার্ বেটাকে। ওর দারোয়ানির পোশাকগুলি কেড়ে নে তো! দেখি, ওর কোন্ বাবা এসে ওকে বাঁচায় (হল্লা)

(বাহিরে বুভুক্ষু-প্রজাদের ক্রন্দন-কোলাহল)

বিদর্ভরাজ। (সুবন্ধুকে) দেখো তো সখা, বাইরে কারা গোল করছে। বারণ করো—আমি একটু শান্তি চাই।

সুবন্ধু। দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। প্রজারা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে, মহারাজ!

বিদর্ভরাজ। আমার তো সময় নেই—আমি শান্তি চাই।

সুবন্ধু। তারা বলছে, তাদের সময় আরো অনেক অল্প—তারা মৃত্যুর দ্বার প্রায় লঙ্ঘন করেছে।—তারা-ও শান্তি চায়।—তবে,—ক্ষুধার শান্তি!

বিদর্ভরাজ। ক্ষুধার শান্তি? এ সংসারে কি ক্ষুধার শান্তি আছে? ক্ষুধানলের শান্তি চিতানলে।

(উন্মত্ত-দৃষ্টিতে সদলে ক্ষ্যাপাচাঁদের ভিতরে প্রবেশ-চেষ্টা)

ক্ষ্যাপাচাঁদ। ওদিকে প্রজার যায় প্রাণ, এদিকে রাজা জুড়েছেন গান? বলি, আজ এই চরম-দুর্দিনে মানুষের এমন নাচতে-গাইতে লজ্জা করে না? দেশের যিনি রাজা, তিনি নিজেই যদি এমন বিবেকহীন উদাসীন অপদার্থ হন তবে তাঁর রাজ্যের এদশা হবে না কেন?

(ধুলাভরা জামাকাপড় আর ছেঁড়া-পাগড়ি-পরা প্রহরীকে লইয়া চাবুক-হাতে ক্রুদ্ধ-শিলাদিত্যের দ্রুত-প্রবেশ)

শিলাদিত্য। (প্রহরীকে শাসাইয়া) ভিখারীটাকে শীঘ্র সরিয়ে নে, নয়তো রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে এই চাবুক তোর পিঠেই পড়বে। ওকে ভিতরে ঢুকতে দিলি কেন?

প্রহরী। কী করব হুজুর? বাইরে লোকগুলি যে আমাকে ঘিরে ধরল। এই দেখুন,—আমার জামাকাপড়ের অবস্থা! (ক্ষ্যাপাচাঁদকে) দূর হ হতভাগা। (ক্ষ্যাপাকে গলাধাক্কা ও রুলের গুঁতা দিতেই তাহার পিছনে দুয়ারে-দাঁড়ানো-লোকগুলি ঝাঁপাইয়া প্রহরীর উপর পড়িল। প্রহরী এবং শিলাদিত্যের সহিত ক্ষ্যাপাচাঁদের সংঘর্ষ বাঁধিয়া গেলে বিবদমানদল-দুইটি বাহিরে চলিয়া গেল)

বিদর্ভরাজ। (সুবন্ধুকে) কে? ও কে? কে এসেছিল—কংকাল? এখানে কেন এসেছিল?

সুবন্ধু। মহারাজ, ও একজন উদাসীন, ভিখারী, গান গেয়ে ভিখ্ মেগে বেড়ায় —আপনারই প্রজা। তাহলে মহারাজ, ওই হতভাগ্যদের—

বিদর্ভরাজ। (বিরক্তিতে) ওই-হতভাগ্যদের প্রতি এই (নিজেকে দেখাইয়া) হতভাগ্যের উপদেশ এই যে, কাল-ধীবরের জাল ছিন্ন করবার জন্যে ছট্‌ফট্ করা বৃথা। শ্মশানেশ্বর-শিব যেখানে ডমরুধ্বনি করছেন, সেখানে সেই শ্মশানেই সকলের সব প্রার্থনা ছাই-চাপা পড়বে। কেন তবে মিছে গলা-ভাঙা। (স্বগত) এর মধ্যে রানী আবার এসে না পড়লে হয়! পুরোতটাও দেখছি দিন-দিন রানীর প্রশ্রয় পেয়ে বেড়ে উঠছে। (বিরক্তিতে প্রস্থান, বাইরে গোলযোগ-বৃদ্ধি)

নেপথ্যে। রাজা কোথায়, আমাদের রাজাকে এনে দাও, (গায়কদলেরও রাজার অনুগমন) আর কারো কথাই আমরা শুনব না। রাজাকে চাই।

(ভীতত্রস্ত গায়কদলের পুনঃ-প্রবেশ)

সুবন্ধু। (গায়কদলকে) তোমরা ফিরে এলে কেন? কিসের ঐ কোলাহল? কী দেখে এলে,—কী হচ্ছে বাইরে?

জনৈক গায়ক। দ্বারীরা দ্বারের বাইরে জনতাকে ঠেকিয়েছে। শিলাদিত্যের হুকুমে সেখানে বেপরোয়া মারধর চলছে। প্রহরীর মারের চোটে ওখানে একটা ভিখারী-মেয়ে মূর্ছা গেছে, তাই তার থেকেই তো সংঘর্ষটা বাধল!

সুবন্ধু। (উদ্বেগে) জনতাকে দারোয়ানেরা ঠেকিয়েছে, মারধোরও চলছে,—মানুষও খুন হল এরই মধ্যে? তবে আজ থেকে রাজার সঙ্গে বিচ্ছেদ প্রকাশ্যেই ঘটল?—আজ কি এই নিয়েই উৎসব? একদিকে প্রজাবিদ্রোহ অন্যদিকে গীতি-উৎসবের সমারোহ! (উৎকর্ণ হওয়া। উক্তিরত জনতার ভিতরে প্রবেশ)

কুঞ্জলাল-সহ জনতা। মার্ মার্, ভাঙ্ ভাঙ্, ভেঙে ফেল্ সব। ওরে, এই উৎসবের মণ্ডপটাতেই আগুন লাগিয়ে দে,—মরুক পুড়ে অত্যাচারীরা। মা, মা! আমাদের মা কোথায়? রানী-মা গো! তুই এত কাছে থেকেও কি সন্তানের ডাক শুনবি না?

(বিচলিতা-রানী-ঐন্দ্রিলার দ্রুত প্রবেশ)

ঐন্দ্রিলা। বৎসগণ, আমি আছি, কাছেই আছি, কিন্তু এখন কী দিয়ে কী করতে পারি বল্? কেন তোরা একেবারে নগরেই চলে এলি? রাজপুরী তো পাষাণ-পুরী। এখানে কে তোদের দেখবে বল্? শুধু কেন মিছে-ই নিজেদের লাঞ্ছনা বাড়াবি। তার চেয়ে যা তোরা আজ ঘরে ফিরে যা। সময়-মতো আমিই নিজে যাব তোদের ঘরে-ঘরে।

জনতা। (ধ্বনি) জয় মা, জয় মা-লক্ষ্মী। যাবি যদি,—চারটি অন্ন নিয়ে যাস্ মা—খিদের জ্বালা আর-যে সইতে পারছি-নে। তাইতো মরীয়া হয়েই আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে এসেছিলাম।

(রানীর সহিত প্রজাদের প্রস্থান)

দৃশ্য ৭

[বুধকোট। প্রাক্‌সন্ধ্যা। চাষী-কুঞ্জলালের গৃহ-প্রাঙ্গণ]

(অমাত্য-শিলাদিত্যের অনুচরদ্বয় ও কুঞ্জলালের বোন চন্দ্রা)

অনুচর ১। (চন্দ্রাকে ধমকাইয়া) টাকা না থাকে, ঘরে নিশ্চয়ই চাল জমানো রয়েছে। ভালো চাস্‌-তো ও-সব বের ক'রে দে। ভিতরে-ভিতরে চোরা-কারবার চলছে বুঝি ?

চন্দ্রা। চোরা-কারবার কী বলছ ? সে আবার কী ? আমরা চাষী। চাষের চাল পেলে বছরের খাওয়ার মতো রেখে বাকিটা গঞ্জে বেঁচে দিয়ে খাজনা মিটিয়ে দিই। আকালে ফসল হয়নি তো—কী করব ? এবার খাবই-বা কী—খাজনাই-বা দিই কোথা থেকে ?

অনুচর ২। কোথা থেকে দিবি তা আমরা কী জানি ?

চন্দ্রা। দুর্ভিক্ষ দেখছ না ?

অনুচর ১। দেখলে কী হবে ? রাজার খাজনা যে !—যেমন করে হোক ও তো দিতেই হবে। হুজুর যে তাই আমাদের খাজনা-আদায়ে পাঠিয়েছে। খাজনা আদায় ক'রে নিতে না পারলে আমাদের যে নোক্‌রি যাবে !

চন্দ্রা। এ কি খাজনা আদায় ? - না,—দিনে-ডাকাতি ?

২। চুপ কর্‌। বলি, তুই কে ? বাড়ির আর-সব কোথায় ?

চন্দ্রা। আমার দাদা-বৌদি গেছে পাড়ায়, চালের খোঁজে। আর, এই বাজারে চাচ্ছ চাল ? বুঝতে পাচ্ছ না, চাল যে আজ আমাদের বুকের রক্ত। ঘরে-ঘরে ভাঁড়ার শূন্য,—কার থেকে কী নেবে ?

অনুচর ১। বাজে-কথা বলবার সময় নেই। তবে, চাল বের করে দিবিই-নে ? সহজে যখন দিবিই-নে, তখন শোন্‌ হুজুরের হুকুম—

অনুচর ২। দরকার হলে বাড়িঘর ভেঙেচুরে মেজে-খুঁড়ে, চাল বের করে নিতে হবে, নয়তো শেষে আগুন্‌ লাগিয়েও ফিরতে হবে।

চন্দ্রা। মোটে চাল নেই বলছি,—তা খুঁজলে কী হবে ? আর, দু-চার মুঠো খুদকুঁড়ো যদি মিলে-ও তাতেই-বা কী হবে ? তা দিয়ে তোমাদের কাজ-কারবারের সুবিধে হবে কি ?

অনুচর ১। কী বলছ, আমরা চাল নিয়ে কারবার করি ? যত বড়ো মুখ নয়, ততবড়ো কথা ? জানিস-নে, চাল যে আজ সোনার চেয়েও বেশি,

সাত-রাজার ধন মণিমাণিক্যের চেয়েও সে দামী! সাধে কি চালের উপর হুজুরের এত ঝোঁক।

২। মেয়েটা তো দেখ্‌ছি বড় বেয়াড়া। হুজুর যা ব'লে দিয়েছে তাতে ওকে তো হাতছাড়া করলেও চলবে না। (দুই অনুচরে মিলিয়া আগাইয়া গিয়া গামছা দিয়া তাড়াতাড়ি চন্দ্রার মুখ বাঁধিবার কালে চন্দ্রা ধস্তাধস্তির ফাঁকে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—)

চন্দ্রা। কে আছ, রক্ষা করো, রক্ষা করো—বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। (অনুচরদ্বয় বন্দিনী-চন্দ্রাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া পালাইয়া গেল)

(ছদ্মবেশী সাধুজীর প্রবেশ)

সাধুজী। চীৎকারটা যেন এই দিকেই শোনা গেল, আর, মেয়েদের গলার স্বরের মতোই লাগল শব্দটা। কিন্তু কাউকে তো কোথাও চোখে পড়ছে না। বাড়িটা ছাড়া-ভিটের মতো শূন্য প'ড়ে আছে, ঘরের দোরটাও খোলা।—কে আছ গো, ভিতরে কে আছ? (এদিক-ওদিকে খোঁজা) কেউ তো সাড়া দিচ্ছে না। দুর্ভিক্ষে দেশের যা অবস্থা হয়েছে তাতে দিনের পর দিন টাকা-লুট শস্য-লুট, এবার মানুষসুদ্ধ লুট হতে লাগল না কি?

(চাষী-কুঞ্জলালের প্রবেশ)

কুঞ্জলাল। (সাধুজীকে) এ কী? আপনি কে? ভর্-সন্ধ্যায় এ-বাড়িতে? কী মনে ক'রে? কেউ কি ঘরে নেই?

সাধুজী। (কুঞ্জকে) পথ দিয়ে যেতে হঠাৎ এদিকে একটা মেয়েগলার চীৎকার শুনলাম—তাই, কী হল খুঁজতে এসেছিলাম—

কুঞ্জলাল। (সাধুজীকে প্রণামান্তে) কী বলছেন? একটা মেয়েলি-গলার চীৎকার! তাই,—খোঁজাখুজি! সে কী! চন্দ্রা, চন্দ্রা! (স্বগত) তাইতো! মানদাই-বা কোথায় গেল? ঘরে কি তবে কেউ নেই?—এটাই বা তবে কেমনতরো! (চিন্তাবিহ্বল হওয়া)

(আনাজপাতি কোঁচড়ে লইয়া মানদার প্রবেশ)

মানদা। (লোকজন দেখিয়া মাথায় আধঘোমটা টানিয়া কুঞ্জকে) কী হয়েছে, অমন চেঁচাচ্ছ কেন? আর কেউ কি ঘরে নেই? আমি তো এইমাত্র চন্দ্রাকে ঘরে রেখে সাঁঝটা দিতে ব'লে একটু পাড়ায় গিয়েছিলাম। চন্দ্রা, চন্দ্রা! (ফিরিয়া কুঞ্জকে) চন্দ্রা ঘরে নেই? গেল কোথায়?

কুঞ্জ। আমি কী জানি? শূন্য মাঠটা একবার দেখে নিয়ে পাড়ায় ওদের বৈঠকে ছুটো কথা বলেই এই-তো-মাত্র সবে ঘরে ফিরছি।

মানদা। ঐ পাড়ায়-ঘোরা, আর, তোমার,—'ওদের' বলতে গাঁয়ের যত ঐ চাষীমজুরদের নিয়ে বৈঠকের পর বৈঠক-করা আর যত জোট-পাকানো!—এই-তো দেখছি আজকাল তোমার যা কাজ হয়ে উঠেছে!

কুঞ্জ। (চারিদিকে ঘুরিয়া দেখা ও ডাকাডাকি) চন্দ্রা, বোন, কোথায় গেলি? (হঠাৎ আঁৎকাইয়া) তবে কি বোন বেরিয়ে গেল? কোথায় যাবে?—ভিক্ষায়?

মানদা। পাগল না কি? একা যাবে বাইরে?—এই ঘোর-সন্ধ্যায়?

কুঞ্জ। যেমন শুনছি,—আশ্চর্য কী? লোকচক্ষু এড়িয়ে কাছাকাছি যদি কোথাও গিয়েই থাকে! দিনের-বেলায় ভিক্ষায় বেরুলে লোকে বলবে কী? মান যাবে না?—সেই লজ্জাভয়েই বোধ হয়—

মানদা। মান তো না-হয় আজ বাঁচালে কিন্তু কাল থেকে প্রাণ বাঁচাবে কী দিয়ে? তাইতেই তো বলছি—আমাকেও বুঝি ভিখ্-মাগতেই পথে নামতে হয়!

কুঞ্জ। কী, তুইও তুলছিস সেই ভিক্ষার কথাই? আবার বলবি তো—(মানদার চুলে ধরিতে যাইবার উপক্রমে সাধুজী আগাইয়া কুঞ্জকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—)

সাধুজী। কী করছ বাবা! ছিঃ ছিঃ—এ কী মানুষের কাজ? ঘরের লক্ষ্মী!—তাকে কি দুঃখ দিতে আছে! একটু ঠাণ্ডা হও বাবা, ঠাণ্ডা হও।

কুঞ্জ। গরম হই কি সাধে? শুনলেন তো? ঘরের বউ হয়ে যেতে চাচ্ছে ও ভিক্ষায়? বাইরে বেরুলে কি আর মেয়েদের ইজ্জত থাকে?

সাধুজী। বাইরে থেকে যা শুনে এসেছি, আর, এসেই যে-ব্যাপার দেখছি—তাতে অরাজকতার শুরু হতে আর বাকি কী? আকাল যে মানুষকে বেপরোয়া ক'রে তুলে তার সমাজ-সংসার গুঁড়িয়ে দিয়ে ঘর-বার-সব এক ক'রে দিচ্ছে। ক'দিন ঘুরে-ঘুরে এই তো দেখছি,—ঘরে ব'সে কি আর ভাত জুটবে কারো?

কুঞ্জ। যা বলেছেন বাবা, দু'মুঠো অন্নের জন্য কী হেনেস্তাটাই-না আমাদের হচ্ছে! ভাই-বোন, এমন-কি, ঘরের-বৌ পর্যন্ত সবাই আমরা ঘেয়ো-কুকুরের মতো দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছি! সংসারে, যে সমাজে তবে আর আমাদের রইল কী (নতচোখ-হওয়া)!

সাধুজী। এত উতলা হলে কি চলে? বোন তোমার যাবে কোথায়?

কুঞ্জ। হ্যাঁ, ঠিক-ঠিক, মনে পড়ছে বটে, ছুদিন ধ'রে দেখছি শিলাদিত্যের চর-ছুটোকে, আর, ঐ-যে গাঁয়ের চোরা-বাজারের চালের-দালাল, ঐ যে গো!—আমাদের মহাজন-বেটাকেও! গাঁয়ের আশেপাশে-ই ওরা যে ঘুর্-ঘুর্ করছে! এদিকে আবার রাত হয়ে যাচ্ছে,—সকলকে নিয়ে বোনের খোঁজে এখুনি বেরুতে হবে।—আসি তবে প্রভু!

সাধুজী। এসো-গে বাবা! আমি তো বাইরের লোক, আমিও চলেই যাচ্ছি, তবে, একটা কথা না-বলে পারছি না—বৌমা-বেচারিকে তুমি কখনো অযত্ন কোরো না, বিপদে বিচার-বিবেচনা হারিয়ে বুঝতে পারোনি,—যে,—বৌমা সংসারের কতখানি!

কুঞ্জ। তা কি আর বলতে হবে? তবে, জানেন কি বাবা, একে তো ওকে ভালো-মতো ছ'টো খেতে-পরতে দিতে পারিনে, তাতে সারাদিনই ও খেটে মরছে, তার উপর ও যাবে আবার ভিক্ষায়?—এই লজ্জা-ছুঃখ-অপমানের জ্বালায় মাথাটা আমার হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল। (মানদাকে ডাকিয়া) বৌ, তুই কিছু মনে করিস-নে; তুই এখন পাশের বাড়ি গিয়েই থাক্—আমি আর দেরি করতে পারছি-নে—চললাম। আসুন সাধুজী (উভয়ের প্রস্থান)

মানদা। (প্রস্থান-পর কুঞ্জলালদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ আঁচলে অশ্রু মুছিয়া ফোঁপাইয়া স্বগত বলিয়া উঠিল) আমিও যে আজ ভিক্ষাতেই বাইরে গিয়েছিলাম, গো! চাল মেলেনি, কেবল ছুটো আনাজপাতি কুড়িয়ে নিয়ে এলাম—ভাগ্যিস সে-কথা ব'লে ফেলিনি—বললে কি আর আমার রক্ষে থাকত? বুঝি মিনুসে এতক্ষণে কেটেই ফেলত!—হায় ঠাকুর-ঝি, এই সাঁঝ-বেলায় কেন তোমাকে বোন, ঘরে একা রেখে গিয়েছিলাম গো!

(ঘরে তালা দিয়া আসিয়া বাইরে বেরুবার মুখেই হঠাৎ কুঞ্জলাল দিশাহারার ভাবে দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া দুয়ার হইতেই বলিয়া উঠিল)

কুঞ্জ। বৌ, বৌ, ঘরে আছিস তো?

মানদা। কেন গো, এই-না গেলে! এরি মধ্যে আবার ফিরলে কেন? কী হয়েছে? তোমার মুখ-চোখ যে কেমন দেখাচ্ছে?

কুঞ্জ। ওরে, সর্বনাশ হয়েছে। তুই শিগ্‌গির বৌ, পাশের বাড়িতে চলে যা—আমি কখন্ ফিরি ঠিক নেই। জানিস?—আমাদের সেই বারোয়ারি-বৈঠকের চণ্ডীমণ্ডপটাতেই কারা আগুন লাগিয়ে পালিয়েছে। এতক্ষণে বুঝিবা সব ছাই হয়ে গেল। তুই সাবধানে থাকিস, আয়, আমিই তোকে ও-বাড়িতে রেখে আসি—আজ

কোথা দিয়ে আরো কী ঘটে!—তা-তো বলা যায় না! আয়, আয়, চলে আয়—আমার পিছে-পিছে-ই চ'লে আয়।

মানদা। (স্বগত) এখন কী করি!—সঙ্গেই যাই। হায় ভগবান! (কুঞ্জের অনুগমন)

দৃশ্য ৮

[বুধকোট । প্রাক্‌সন্ধ্যা । বস্তি-অঞ্চল । পথ]

(মাথার ঘাম মুছিতে-মুছিতে মহাজনের প্রবেশ)

মহাজন। (পিছনে চাহিয়া) যাক্, খুব বেঁচে গেছি। শুধু নগরেই নয়, গাঁয়ে-গাঁয়েও লোক জোট বাধছে, কথায়-কথায় লুটপাটে ছুটছে, গঞ্জে-গঞ্জে আগুন লাগাচ্ছে—মানুষ অবধি গুম্ করছে, মাথা কাটছে!—থাক্ প'ড়ে মফঃস্বলে এসে আমার এই চোরাবাজারী চাল-কেনা।—আগে তো প্রাণটা বাঁচাই!

(ছেলে-হারুকে লইয়া গেরস্ত-বউ সরলা আসিয়া সহসা পথের মধ্যে দুইহাতে মহাজনের দুই-পা জড়াইয়া ধরিয়া)

মহাজন। এই বাজারে, ভিখিরিগুলোর জ্বালায় দেখ্‌ছি পথ-চলা দায়-হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি শহরে ফিরতে হবে—ঘরে বৌটা-যে জ্বরে কাতরাচ্ছে দেখে এসেছি!—তার মধ্যে এদিকে এ-সব কী-উৎপাত রে বাবা! (চলিতে উদ্যত)

সরলা। (মহাজনকে) একবার বাবা, এই ছেলেটার দিকে একটু ফিরে চাও-না গো!

মহাজন। (ব্যঙ্গস্বরে) ফিরে চাও-না গো! ভিখিরিগুলোরও কী ফন্দী!—নাকে-কাঁদুনি গেয়ে-ই চলছে। এ-সব-ই ভিখ্-আদায়ের নতুন জুলুম! (টাকার থলেটাকে তাড়াতাড়ি কাপড়ের তলায় লুকানো)

সরলা। (ফোঁপাইয়া) ভিখিরি নই গো! একদিন ছিলাম আমি গেরস্তরই ঘরের-বৌ। পোড়া-কপালে নিরুপায় ক'রে পথে নামিয়েছে! এখন এরকমই পথে-ঘাটে যত লোকের-কথা শুনি, মার খাই! মুখ বুজে সবই সইতে হয়! কী আর করব! ঘরে যে আমার আরো-কটি কাচ্চা-বাচ্চা আছে! দোহাই বাবা,—এই-একটিকে অন্তত তুমি নিয়ে যাও—আকালে কালের-হাত থেকে বাঁচাও।

মহাজন। (চোখ কপালে তুলিয়া) কী বললে? ঘরে আরো-ক'টা আছে? তা-ও বলি-বাছা, বছরে-বছরে এইগুলোকে বেহিসাবে অমন জন্ম-দিয়েছিলে কেন?

তখন মনে ছিল না? এখন কেন, 'বাবা-বাবা' ক'রে পথের-লোককে এই হেনেস্তা করছ! পথ ছাড়ো বলছি,—পথ ছাড়ো। ছাড়বেই না?—তবে এই চললাম! (মহাজনের পায়ের-ঠোকায় পথের উপর মুখ-থুবড়াইয়া পড়িয়া সরলার কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্থানপর মহাজনকে—)

সরলা। ওগো, তুমি কেমন মানুষ? পায়ে ঠুকে দিয়ে চলে গেলে? (পড়িয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কান্না)

হারু। (মা'র কপালে রক্ত দেখিয়া আঁৎকাইয়া) মা, মা, তোর কপাল কেটে রক্ত পড়ছে যে!—কী হবে?

সরলা। (আঁচলে রক্ত মুছিয়া মহাজনের প্রস্থানপথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাসে হারুকে) বাবা হারু, একটু দাঁড়া, আমি ওই-বাড়ি-থেকে কপালের রক্ত-ধুয়ে ভিখ্‌টা নিয়ে আসি।

হারু। দেরি করিস-নে কিন্তু! মা,—বাবা কোথায় গেছে? অনেকদিন তো হল, —তুই যে বলেছিলি শিগ্‌গিরই ফিরে আসবে!

সরলা। আসবে রে আসবে! বেঁচে থাকলে আসবে বৈ কি! চাকরির খোঁজে গেছে কিনা। (প্রস্থান-মুখে ঊর্ধ্বে চাহিয়া)—দিনে-দিনে এদের না-খেয়ে-খেয়ে-মরা চোখের উপর আর-যে দেখতে পারছিনে, ঠাকুর! এরা তোমার-দেওয়া,—তুমিই এদের দেখো। বাঁচাতে হয় বাঁচিয়ো – নয়তো—(চোখে আঁচল দিয়া প্রস্থান)

(বড়ো-একটা বস্তা-হাতে সন্তর্পণে ছেলে-ধরার প্রবেশ)

হারু। (স্বগত) বড্ড খিদে পেয়েছে,—মা আবার খাবার আনবে তো? (ছেলেধরাকে দেখিয়া) ঐ লোকটা কে?

ছেলেধরা। (উৎসাহে স্বগত) এই তো,—মিলেছে!—ছেলেটা কী সুন্দর! আহা, মুখটি একেবারে শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে-গো! (হারুকে) খিদে লেগেছে? কিছু খেয়ে নাও বাবা! (মোয়া হাতে দিয়া) নাও, মোয়াটা খেয়ে নাও।

হারু। (কান্না) অ্যাঃ অ্যাঃ,—কে তুমি? না, না, খাব না। আগে মা আসুক। মা, মাগো,—দেখে যা, এ কে এসেছে!

ছেলেধরা। আমি তোর মামা-রে। তোর মা-ই তো আমাকে এই মোয়া দিয়ে পাঠিয়ে দিলে!—এই মোয়া খাইয়ে তোকে তার কাছে নিয়ে যেতে বললে তো সে-ই।

হারু। বড্ড খিদে পেয়েছে মা, তুই শিগ্‌গির করে আয়। (মোয়াটা অন্যমনে একটু-একটু খাওয়া) মাকে তুমি ডাকো-না গো।

ছেলেধরা। ডাকব কেন, তোকে তো তার কাছেই নিয়ে যাব। এখন মোয়াটা খেয়ে-নে দেখি। (স্বগত) তাই-তো!—ঐ-যেন কে আসছে!—এসে পড়ল যে! সেরেছে! ওরে বাবারে, এ-যে দেখছি—সেই বাঘা-প্রহরীটা! তবে,—(হারুকে) চললাম রে খোকা,—আমার জরুরি কাজ আছে কি না। ঐ যে, ডাকতে লোক আসছে! তোর মাকে আমি পাঠিয়ে দেব গে—তুই কাঁদিস-নে বাছা।

প্রহরী। (কাছে আসিয়া) বেটা বদমাস, ও-পাড়া থেকে তাড়া খেয়ে এখানে এসে তুমি ফের্ তোমার সেই ব্যবসা ফেঁদেছ?—দেখাচ্ছি মজা!

ছেলেধরা। (প্রহরীকে ব্যঙ্গ) বলি, কে হে তুমি সোনার চাঁদ? তুমি গ্রেপ্তার করবে আমাকে? জানো,—আমি কার লোক?

প্রহরী। পিছে তোদের কত বাবাই তো ঘাটে-পথে থাকে অমন মুরুব্বি—ডাক্-না তাদের দু'-একটাকে, একবার দেখে-নিই তাদেরও।

ছেলেধরা। শুনিস্‌নি? –এ রাজ্যে-র এখন যে আসল-কর্তা—সেই অমাত্য—শিলাদিত্যেরই যে লোক আমি! কাঁধে তোর ক'টা মাথা যে, আমাকে তুই ধরতে আসিস্? ভেবেছিস্ এর পরেও তোর চাক্‌রি থাকবে?

প্রহরী। রাখ্ তোর বাহাদুরি।—ও-সব বোলচাল্ আমাদের জানা আছে! বেটা বাটপাড়, ধাপ্পাবাজ!—জারিজুরি দেখাস তুই রাজদরবারে গিয়ে—দেখবি তখন আরো কী মজা! (কোমরে দড়ি বাঁধিতে আগাইতেই হঠাৎ ছেলেধরা প্রহরীকে ছুরি মারিয়া দৌড় দিল—জামা বাগিয়া রক্ত পড়িলেও প্রহরীও ছেলেধরাকে অনুসরণ করিয়া দৌড়াইল। দুইজনের প্রস্থান)

হারু। (কিছুক্ষণ হতবাক্ থাকিয়া চীৎকারে) মা, মাগো, এ-কী হোলো? তুই কোথায় গেলি মা, এখান থেকে আমায় শীগ্‌গির নিয়ে যা। আমার যে ভয় করছে!

(মানদার প্রবেশ)

মানদা। (স্বগত) ছেলেটা কার? এমন ক'রে একা-একা পথে দাঁড়িয়ে কাঁদছে কেন্। কেউ ওর নেই নাকি? থাক্ এখন আমার তেল নুন-কেনা, তাই তো, ব্যাপারটা তো একটু দেখতে হচ্ছে।

হারু। (মানদাকে মা ভাবিয়া গভীর আবেগে) মা, মা, তুই এতক্ষণে এলি! কোথায় ছিলি? আমি এত যে তোকে ডাকছি!—

মানদা। (কাছে গিয়া হারুর কাঁধে হাত রাখিয়া) কে রে বাছা? কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে তোর?

হারু। (মানদাকে মা নয় বুঝিয়া) এ কী? তুমি তো মা নও! আমার মা কোথায়? (সজোরে কান্না) মামা গেল, সেও-যে এল না!

মানদা। কে রে তোর মামা?

হারু। একটু আগে একটা-কে-এসে যে মামাকে ধরতে গেল আর মামা-ওদিকে দৌড়ে চলে গেল। উঃ, বড্ড খিদে পেয়েছে! এখনো এলিনে মা?

মানদা। বাছা, তোর মা কোথায় গেছে রে?

হারু। এদিকেই যে কোথায় গেল! মামাকে মা পাঠিয়েছিল আমাকে নিয়ে যেতে—মামা-ই যে এই মোয়াটা দিয়েছিল! আর খেতে পারছিনে। দূর ছাই—তিতো লাগছে—গা ঘোলাচ্ছে—(হাতের মোয়া পথে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পথে-পড়া)

মানদা। (স্বগত) ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেল!—এখন এই ছেলেকে নিয়ে আমি কী করি! বুকে তুলে ঘরে নিয়ে যাব? (দ্বিধা) নাঃ, থাক্! এখানেই প'ড়ে থাক্। (এক-দৃষ্টে হারুকে দেখিতে-দেখিতে) না-জানি, কার বাছা গো! পথে এমনি পড়ে থেকে দেরিতে-না মরেই যায়! না-হয়, আবার ঐ ছেলেধরাই-না এসে চুরি করে নেয়। আজকাল এই তো সব হচ্ছে শুনছি! (সাশ্রু-চোখে) না, না, তা কি হয়? সঙ্গে নিয়েই যাই—যা হয় হবে! (বুকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান)

দৃশ্য ৯

[বুধকোট। রাত্রি। শিলাদিত্যের কক্ষ]

(বন্দিনী চন্দ্রাকে টানিয়া লইয়া অনুচরদ্বয়ের প্রবেশ)

চন্দ্রা। (কক্ষে ঢুকিতে-ঢুকিতে অনুচরদের প্রতি) তোমাদের সর্দার কোথায়? কখন্ যে চলে এসেছি! ওদিকে ঘরে-দোরে সব যে পড়ে আছে। আর কতক্ষণ আমাকে এখানে এভাবে পড়ে থাকতে হবে?

(শিলাদিত্যের প্রবেশ)

চন্দ্রা। (শিলাদিত্যকে সকাতরে) ওগো, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের কী ক্ষতি করেছি? এ আমায় কোথায় এনেছ?—কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছি না।

শিলাদিত্য। (চন্দ্রাকে দেখাইয়া দিয়া অনুচরদের প্রতি) ওকে মুক্ত ক'রে দে। (অনুচরেরা চন্দ্রাকে মুক্ত করিলে তাহাদের প্রতি) হ্যাঁ, এখন দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তোরা সরে যা। কাছেই থাকিস—ডাকলে যেন পাওয়া যায়। (অনুচরদের প্রস্থান। চন্দ্রাকে গম্ভীরস্বরে) তুমি যেন কী বলছিলে—এবারে বলো।

চন্দ্রা। (কাতর-কণ্ঠে অনুনয়ে) দোহাই, আমাকে ছেড়ে দাও।

শিলাদিত্য। ছেড়ে দেব? (সহাস্যে ব্যঙ্গস্বরে) তোমায় তো ছেড়ে-দেবার জন্যে আনিনি সুন্দরী!—তা কি আবার বলতে হবে? এসো, কাছে এসো। দ্বিধা কেন? অত কী ভাবছ? (চন্দ্রার দিকে আগানো)

চন্দ্রা। (শিলাদিত্যের পায়ে পড়িয়া) বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে।

শিলাদিত্য। (হাসিয়া) বলি, মারলাম কখন, যে, বাঁচাব? তুমি বড্ড ভয় পেয়েছ দেখছি। (গম্ভীর হইয়া) হ্যাঁ, ঠিক আছে—ছেড়ে দেব, কিন্তু বলো-তো—কোথায় কুঞ্জলাল? এত-সব মিঠে-কথা শুনলে! তাতেও একটু মন ভিজল না? শক্ত আছ দেখছি! হবে না কেন, দাদারই তো বোন!

চন্দ্রা। কার কথা বলছ—আমার দাদার?

শিলাদিত্য। (বিরক্তিতে) হ্যাঁ, হ্যাঁ!—তোমার সেই গুণধর-দাদাটির কথাই বলছি। সেই অবাধ্য-জানোয়ারটাকে শায়েস্তা করবার জন্যই তো তোমাকে এখানে এত ক'রে ধরে-আনা।

চন্দ্রা। কেন, দাদা-আমার কী করেছে?

শিলাদিত্য। আবার শুধোচ্ছ কী করেছে? একটা গুণ্ডার-দল জুটিয়ে সে আমার এই অঞ্চলে শাসনের কাজের ব্যাঘাত করে চলেছে যে! বলো তো, কোথায় একসঙ্গে তার সেই দলের সব-কটাকে ধরা যায়? তাদের আড্ডা সেই চণ্ডী-মণ্ডপ-টাকে তো পুড়িয়ে দিয়েছি। সে বেঁচে থাকতে আমার শান্তি নেই। সে-ই তো দলের পাণ্ডা! ঘরে তাকে পাই-নে। বাইরে কারো কাছ-থেকেই তার খবর মিলে না। তার কাছে কারা-কারা কবে কখন্ আসে বলো তো।

চন্দ্রা। আমি এসবের কিছুই জানি-নে।

শিলাদিত্য। জানিসনে? জানিস ঠিকই!—তবে, বুঝেছি—বলবি-নে। সহজে মুখ খুলবি-নে দেখছি। (হঠাৎ চাবুক মারিয়া) বল্ এবার, সব খবর বল্।

চন্দ্রা। (আর্তনাদ) আঃ। জ্বলে গেলাম! বলছি, বলছি, বেত রাখো! (দৃঢ়-কণ্ঠে) নাঃ, নাঃ! মরে গেলেও নাঃ,—কিছুতেই কিছু বলব না, নাঃ, নাঃ। (আড়ে-আড়ে চারদিকে বাইরে-যাওয়ার দরজা-খোঁজা)

শিলাদিত্য। (চীৎকারে) এখনো বললি না? কুঞ্জটাকে যে আমার চাই-ই। কোথায় তাকে মিলবে এখনো বল্—নয়তো তোদের কারোরই রক্ষে নেই। (খপ্ করিয়া চন্দ্রার হাত ধরিয়া হেঁচ্কা-টান মারিতেই অমনি চন্দ্রাও শিলাদিত্যের হাতে প্রচণ্ড জোরে কামড় দিয়া অনুচরদের প্রস্থানের দরজা দিয়া পালাইয়া গেল)

শিলাদিত্য। (যন্ত্রণায় হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে) উঃ কালনাগিনী, ছোবল মেরে পালিয়েছে। ঠিক আছে, তোমার বিষদাঁতে যে কত বিষ আছে নাগিনী, তা ভালো করেই দেখে নেব—এই তবে তার শুরু। (বাহিরে চীৎকার—ওরে, তোরা কোথায় যাচ্ছিস? ওদিকে নয়,—ওদিকে নয়!) আরে, এ সময় আবার কোথা থেকে কারা এসে পড়ল! কী বিভ্রাট! সেই গেঁয়ো-চাষাটা নয়-তো? (নেপথ্যের উদ্দেশে) কে? (দরজার দিকে আগাইতেই "এই যে আমরা-ই"—বলিয়া সশস্ত্র-কুঞ্জলালের প্রবেশ—পিছনে গ্রামবাসীরা।—শিলাদিত্য তাহার অনুচরদের ডাকিয়া) ওরে, কে আছিস?

কুঞ্জলাল। নেই, আর কেউ নেই—আছি আমরাই—আমার বোন কোথায়, শীঘ্র বলো।

শিলাদিত্য। ওঃ! গেয়ো সেই ভূতগুলো?—তোদের এক-একটাকে ধ'রে-ধ'রে জ্যান্তই এবার গর্তে পুঁতব।

কুঞ্জলাল। দেখো-না একবার চেষ্টা ক'রে।

শিলাদিত্য। (নেপথ্যে অনুচরদের আরো-জোরে ডাকিয়া) এই! কে আছিস?

কুঞ্জলাল। কেউ নেই, কেউ নেই, বাইরে ওদের যে এখন তোমার মতোই বন্দী-দশা! শিগ্গির বলো, চন্দ্রা কোথায়?

শিলাদিত্য। তোমার বোন,—তুমিই তো জানবে তার খবর। তা নিয়ে আমার কী মাথাব্যথা? (ঘৃণা ও ক্রোধে) একটা চাষার বোন বইতো নয়, আর, আমি হচ্ছি অমাত্য-শিলাদিত্য! যত বড়ো মুখ নয়, তত বড়ো কথা? ছোটো লোকগুলির বড়ো বাড় বেড়েছে দেখছি!

কুঞ্জলাল। কথাগুলি যে-জিহ্বায় বললে, এখুনি তা টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম, দিতাম তোমার এই ঘরদোর সব পুড়িয়ে-ছাই ক'রে!—কেবল, তাতে বোনকেও বুঝি তবে এ-জন্মের মতো একেবারেই আগুনের মুখে দিতে হোতো। বোনকে কোথায় রেখেছ এখনো বলো!

শিলাদিত্য। বলেইছি তো,—এখানে নেই। বিশ্বাস না হলে খুঁজে দেখো গে। তবে, নিতান্তই যখন এসে পড়েছ,—মাথাটা অন্তত রেখে যেতে হবে। (কোষবদ্ধ তরোয়াল উঠাইয়া হত্যায় উদ্যত হইতেই কুঞ্জলাল হাতের লাঠির আঘাতে

শিলাদিত্যের তরোয়ালকে ভূমিসাৎ করিল। শিলাদিত্য নিরুত্তরে ফুঁসিতে লাগিল)

কুঞ্জলাল। (সঙ্গীদের প্রতি) এ-ঘরে তো কেউ নেই দেখছি, চলো, বাইরে আরো খুঁজে দেখি-গে। (সদলে প্রস্থান)

শিলাদিত্য। ভূতগুলো তো ঐ চলে গেল। এবার একবার দেখে আসতে হয়, ওদিকে আমার হতভাগা-ছুটোর কী দশা হল! (প্রস্থান)

দৃশ্য ১০

[বিদর্ভ। রাজোদ্যান। প্রাক্‌সন্ধ্যা]

(উদ্বিগ্না রানী-ঐন্দ্রিলার পায়চারি)

ঐন্দ্রিলা। সন্ধ্যা হয়ে এল। কিন্তু সুবন্ধু ঠাকুর গেল কোথায়! কার কাছ-থেকেই-বা রাজ্যের খবরটা পাই।

(মাথা-বাঁধা উত্তেজিত কুঞ্জলালের প্রবেশ)

কুঞ্জলাল। (খুঁজিতে খুঁজিতে) ঠাকুর, ঠাকুর! (সম্মুখে রানীকে দেখিয়া) আপনি—রানীমা? (প্রণাম)

ঐন্দ্রিলা। বৎস, তুমি কে?

কুঞ্জলাল। আমি কুঞ্জলাল,—ঠাকুরের লোক।

ঐন্দ্রিলা। ঠিক আছে, কোনো ভয় নাই তোমার, কী বলতে চাও, আমার কাছে বলো।

কুঞ্জলাল। জাত নেই, জোত নেই—অন্নহারা গৃহহারা—অবস্থার-চাপে আমরা উদ্বাস্তু হা-ঘরে!—কোনোমতে বেঁচে-থাকা—আজ এই একমাত্র আমাদের পরিচয়। কিন্তু, এমন অবস্থাও আছে, যখন বেঁচে-থাকার মতো দুঃখ আর নেই। মেয়েদের বিপদ ঘটছে প্রতিদিন। না-খেতে পেয়ে আমার ছোটবোনটি বেরিয়েছিল ভিক্ষায় —কিন্তু মা, হতভাগিনী আজো ঘরে ফেরেনি। তারপর মাগো—(দ্বিধা)

ঐন্দ্রিলা। সর্বনাশ, বলো বলো, ভয় কোরো না।—তারপর?

কুঞ্জলাল। তারপর, জানি-না, সে-অভাগিনী অমাত্য-শিলাদিত্যের হাতে পড়েছে কিনা!

ঐন্দ্রিলা। শিলাদিত্য?—এ সমস্তই কি শিলাদিত্যের জ্ঞাতসারে? সে কি এসব জানে?

কুঞ্জলাল। শুনি, তার ইচ্ছাক্রমেই নাকি এসব ঘটে থাকে।

(সুবন্ধুর প্রবেশ)

সুবন্ধু। (কুঞ্জকে) তোমার আবেদন হল? এখন যাও—ঐ আমার কুটীরে গিয়ে বিশ্রাম করো। তাই তো! তোমার ঐ মাথা ফাটাল কে? এ-ও কি শিলাদিত্যের অত্যাচার?

কুঞ্জলাল। দিনরাত্রি বোনের সন্ধানে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ি ফিরছি। কিছুটা দূরে থাকতেই মাথায় লাঠি পড়ল। পিছনে ফিরে আবছায়ায় দেখি কালিঝুলি-মাখা দুটো লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। বাড়িতে ঢুকে ঘরদোর আর দেখতে পেলাম না—তখন পুড়ে সব ছাই হয়ে গেছে। (রানীকে, কাতর দৃষ্টিতে) চললাম মা। (প্রস্থান)

সুবন্ধু। (রানীকে) দয়াময়ী, কতটুকুই-বা শুনলে! সবটা কানে উঠলে তুমি আপনি বধির হয়ে যেতে। যে-নিঃসহায়দের সামনে বিচারের সকল দ্বার রুদ্ধ, তাদের কণ্ঠও রুদ্ধ থাকে, তাই-তো আছি আমরা আরামে। বাধা আজ অল্প-একটু বুঝি সরেছে, তাই, গুমরে-ওঠা দুঃখ-সমদ্রের ধ্বনি যা-এই-একটু শোনা গেল।

ঐন্দ্রিলা। ঠাকুর, আমাকে নিয়ে চলো ঠাকুর, ওদের মাঝে নিয়ে চলো।

সুবন্ধু। মহারানী, তোমার নিজের জায়গায় থাকলেই ওদের বাঁচাতে পারবে। তোমার আসন যেখানে তোমার শক্তিও সেইখানেই। যদি ক্ষমা করো-তো বলি, দোষ আর-কারো নয় রানী, দোষ তোমারই। রানী হয়ে তুমি রাজার কাছে কিছু চাইলে না, কিছু নিলে না। তোমার মন-পাবার জন্যে শেষে একদিন আপন রাজ্যটাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছড়িয়ে ফেলে দিলেন রাজা তোমার দেশের ওই লোকগুলির হাতে—রাজ্যের অঞ্চলে-অঞ্চলে এক-একজনকে-তাদের বসিয়ে দিয়ে মনে করলেন তোমাকেই সব দেওয়া হোলো।

ঐন্দ্রিলা। আমি তার কিছুই জানতেম না।

(বিদর্ভরাজের প্রবেশ)

বিদর্ভরাজ। (সক্রোধে) মহারানী, এই নিভৃতে তোমাদের দুজনে এমন কী গূঢ় পরামর্শ চলছে?

ঐন্দ্রিলা। পাপের মূর্তি দেখে ভয় পেয়েছি।

বিদর্ভরাজ। পাপের মূর্তি ?—পাপের মূর্তি কী দেখলে ?

ঐন্দ্রিলা। এ রাজ্যে কোনো প্রতিকার নেই।

বিদর্ভরাজ। এ সংবাদ কে দিলে ?

ঐন্দ্রিলা। যারা মর্মান্তিক পীড়িত, তাদেরই একজন।

বিদর্ভরাজ। কে অভিযোগ এনেছে, কার নামে অভিযোগ ?

সুবন্ধু। বুধকোট থেকে প্রজা এসেছে। অমাত্য-শিলাদিত্যের নামে অভিযোগ।

বিদর্ভরাজ। (সুবন্ধুকে) আমাকে লঙ্ঘন ক'রে রানীর কাছে কেন এই অভিযোগ ?

সুবন্ধু। আমিই তাদের তোমার কাছে নিয়ে গিয়েছি—মন্ত্রী সাহস করেনি। সেদিন দেখিনি কি বিচারকালে ক্ষণে-ক্ষণে তোমার ভ্রূকুটি ? দণ্ড তোমার কতবার উদ্যত হয়েও দুর্বল-দ্বিধায় নিরস্ত হয়েছে, সে—কথা কি স্বীকার করবে না ?

বিদর্ভরাজ। সাবধান! আমি দুর্বল ? কাদের ভয়ে ? কিসের ভয়ে আমি দুর্বল ?

সুবন্ধু। শিলাদিত্যকে যে-শক্তি নিজে দিয়েছ, আজ তার প্রতিরোধ করা তোমার নিজের পক্ষেও দুঃসাধ্য, এই-কারণেই তোমার দ্বিধা! তুমি নিজেই ওদের ভয় করতে আরম্ভ করেছ—আমাদের ভয় সেইখানেই।

বিদর্ভরাজ। অসহ্য তোমার স্পর্ধা। অনুতাপের দিন তোমার আসন্ন। পুরোহিত-ঠাকুর সাবধান! সীমা ছাড়িয়ো না—বিপদ হতে পারে। (রানীর ও সুবন্ধুর প্রতি ক্রূরদৃষ্টিতে চঞ্চল-চাহনি)

ঐন্দ্রিলা। মহারাজ, আমাদের দণ্ড-দেওয়া সহজ, সেজন্য রাজশক্তির দরকার হবে না। কিন্তু শিলাদিত্যের বিচার আজই চাই।

বিদর্ভরাজ। রানী, এমনি ক'রেই তুমি আমাকে অহরহ কেবল যন্ত্রণা দিয়ে চলেছ। 'আমাদের' বলতে তুমি আর-কার-কার সঙ্গে জোট বেঁধেছ ? ভেবেছ অন্তরা তোমার রক্ষাকবচ ? (প্রস্থান)

সুবন্ধু। যত-ই যা বলো রাজা, রানীর প্রশ্নটায় তবু তুমি নিরুত্তরই রইলে ? ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা!

ঐন্দ্রিলা। আর ধিক,—আমি এ রাজ্যের রানী। কিন্তু কী করি, কোথায় যাই। আজ আপন বলতে কেউ যে কোথাও আমার নেই! তবে, কার-কাছেই বা যাব! (—চিন্তামগ্ন,-হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া) না না, একী-সব ভুল বকছি! আমার সব আছে, যতক্ষণ আছে আমার এ রাজ্যের প্রজা-সাধারণ!

সুবন্ধু। ঠিক, ঠিক, ঠিক বলেছ মা,—ছেলে কাঁদলে মা কি তার দূরে থাকতে পারে—এই তো মায়ের কাজ। জয় মা জননী, দুঃখ-নিস্তারিণী, জয় মা!

(উভয়ের প্রস্থান)

দৃশ্য ১১

[বিদর্ভ রাজধানী। পথের ধারে বটতলা। প্রাক্-সন্ধ্যা। দূরে স্বর্ণমন্দির-শীর্ষ দৃশ্যমান]

(জীর্ণ-শীর্ণ, পথে-পাওয়া-শিশু হারুর হাত ধরিয়া মানদার-প্রবেশ। মাসির আঁচল টানিতে-টানিতে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হারু ক্রুদ্ধস্বরে)

হারু। মাসি, জিভ্ যে শুকিয়ে গেল। পেট জ্বলে গেল যে।

মানদা। চল্ বাছা—ঐ মন্দির দেখা যাচ্ছে, আর-একটু এগিয়ে চল্। দেখি, ওখানে যদি কিছু মেলে।

হারু। (কান্না) অ্যাঁ-অ্যাঁ, ওসব শুনব না, তুমি আমায় খেতে দিচ্ছ না, খুব খারাপ তুমি। কেন তুমি পথ থেকে আমাকে কুড়িয়ে আনলে? আমি তোমার কাছে থাকব না, খুঁজে-খুঁজে মার কাছেই চলে যাব। দেখো যাই কিনা! (পথের পাশ হইতে এঁটো-পাতা তুলিয়া নিতে-নিতে সোৎসাহে সহাস্যে) মাসি, দেখো, দেখো—এই-যে খাবার!

মানদা। (এঁটোপাতা হারু মুখের কাছে নিতেই তাহাকে এক চড় মারিয়া) হায়রে রাক্ষস, তা ব'লে পথের এঁটো খাবি? ফেলে-দে, বলছি, ফেলে দে—

হারু। (মার খাইয়াও পাতা চাটিতে গিয়া হঠাৎ মাসির দিকে চাহিয়া হতাশায় কাঁদ-কাঁদ-মুখে) মাসি, দ্যাখ্, পাতায় একটুও নেই!

মানদা। (হারুর হাতের পাতা ছিনাইয়া নিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া সক্রোধে) তবে রে নচ্ছার। যেখানে যা পাবি তাই খাবি? (আবার চড়) যা, আঁস্তাকুড়ে যা—আরো কত পাবি,—খা-গে রাক্ষস, পেট ভ'রে খা-গে।

হারু। তুই এমন ক'রে আমায় মারলি মাসি? মাসি নোস্, তুই রাক্ষসী! (হিচ্‌কাইয়া কান্না) তুই ডাইনি।

মানদা। (ক্রোধে) কী বললি?—আমি রাক্ষসী? আমি ডাইনি? এটুকু ছেলের মুখে এত কথা? তবে দেখবি আমি কেমন ডাইনী, আয় আয়। আয় তোর রক্ত চুষে খাই। (আগানো)

হারু। (মানদাকে আগাইতে দেখিয়া ভয়ে পিছাইয়া) ও কী মাসি, আমাকে তুই মেরে ফেলবি না কি?

(সাধুজীর প্রবেশ)

সাধুজী। (মানদাকে) মা, ছেলেটাকে একটু ছাখ্। রাজ্য ভ'রেই তো আকাজে কী টানাটানি চলছে। তা-ব'লে ছেলেমেয়েগুলিকে তোরাও যদি একটু না-দেখিস!

মানদা। কী করব? ছেলেটাকে নিয়ে যে একেবারে বেসামাল। আর যে সইতে পাচ্ছিনে!

সাধুজী। এদিকে আঁধার হয়ে এল যে! এবার কোথায় যাবি? বাড়িঘর তো কোথায়-সে ফেলে এসেছিস্।

মানদা। (কঠোর-কণ্ঠে) বাড়িতে গিয়ে কী করব? কী খাব? সেখানে কি কিছু মিলবে?

হারু। মাসি, তুই অমন করছিস কেন? খেপ্‌লি নাকি? আমার যে বড্ড ভয় করছে!

সাধুজী। (মানদাকে) তা চলো-না-হয়, আমি তোমাদের এগিয়ে দিই। এরাজ্যে নূতন এসেছি—পথঘাট তো সব চিনিনে, যেদিকে যেতে হয়, চলো।

মানদা। না না, যেতে হবে না, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। (হারুকে) আয় চলে হতভাগা, চল্,—এবারে তুইও ঠাণ্ডা হবি, আমারও জ্বালা জুড়বে, চল্। (হারুর হাত ধরিয়া টানিয়া প্রস্থান)

নেপথ্যে হারু। (চীৎকারে) মাসি, মাসি, তুই আমাকে পথে ফেলে রেখে কোথায় পালালি? কে আছ গো, মাসি আমাকে একা ফেলে কোথায় চলে গেল! (চাপা-ক্রন্দনে) মাসি, মাসি, আর আমি খেতে চাইব না, আর আমি কাঁদবও না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যা, নিয়ে যা মাসি!

সাধুজী। (স্বগত) তাই তো, এখন কী করি।—তা, দেখি ওদিকে কী হল!

(প্রস্থান)

(সৈনিকবেশে রানীর প্রবেশ)

ঐন্দ্রিলা। সন্ধ্যায় মন্দিরে পূজা-দেওয়া আজ আমার সব ব্যর্থ হল! সেই মুখই যে কেবল থেকে-থেকে মনে পড়ছে! (ভাবনা) না, না, সব পিছে পড়ে থাক্, যখন সংকল্প করেছি – তখন চলেই যাব।

(নেপথ্যে পথিক পুরুষ ও স্ত্রীর কথাবার্তা শুনিয়া রানী উৎকর্ণা)

স্ত্রী। (পুরুষকে) কী বলছ? দুর্দশার কথা কাকে জানাব? রানীকে? ওগো ওই রানীই যে রাজাকে জাদু করে রেখেছে!—আমাদের রাজা ভালো। ঐ রানীই তো শুনি রাজার কাছে বসে-বসে সারাক্ষণই প্রজাদের নামে যত লাগায়!

পুরুষ। যা জানিসনে, তা মুখে আনিসনে। বলি, বড়লোকদের ঘরের-কথায় আমাদের কাজ কী? চুপ!—ঘরে চল্।

ঐন্দ্রিলা। (সচকিতে) লোকের মুখে এসব কী শুনছি? (প্রস্থান)

(শিলাদিত্য, জয়সেন, উদয়ভাস্কর ও মিহির গুপ্তের সহিত আলাপ-রত সুবন্ধুর প্রবেশ)

শিলাদিত্য। (সুবন্ধুকে) যাক্, পথে-দেখা হয়ে ভালোই হল।—মন্ত্রী তোমাকে আর-কিছু বলেনি? আর কা'কে কা'কে তুমি রাজার পরামর্শ-সভায় নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছ।

সুবন্ধু। এ রাজ্যে বিদেশী-তোমাদের যে যেখানে আছে সকল-অমাত্যকেই ডাক পড়েছে। কেউ বাদ যাবে না। (স্বগত) হুঁ, হুঁ,—তলে-তলে বিদ্রোহের সলা হচ্ছে? তোমরা ভেবেছ এরাজ্য লুটবে?—সে-গুড়ে বালি, সে গুড়ে বালি! রানী সব জেনে গেছেন। কারো আর কোনো জারিজুরি খাটছে না—শিগ্‌গিরই তোমাদের এখন পাত্‌তাড়ি গোটাতে হচ্ছে!

জয়সেন। (সুবন্ধুকে) নেমন্তন্ন করা তো হোলো, যাও এবারে আর-যেখানে যেতে হয়।

সুবন্ধু। যাচ্ছি, তবে, তোমরাও-সব কিন্তু মনে ক'রে সভায় যেয়ো। (প্রস্থান)

শিলাদিত্য। মিহির গুপ্ত,—সমস্ত অবস্থাটা বুঝলে তো?

মিহির গুপ্ত। সে আর বুঝিনে?—রাজার মতলব সুবিধের নয়!

শিলাদিত্য। নিশ্চয়, রাজা কিছু আঁচ পেয়েছেন। জরুরি পরামর্শের নাম ক'রে, সব বিদেশী-অমাত্যদের রাজসভায় পুরে নিয়ে বেড়াজালে, মাছ-ধরার মতো একসঙ্গে সবাইকে-আমাদের বন্দী করে ফেলবেন। তার আগেই তেমনি, আমাদের দিক থেকে-ও চাই—রাজধানী-আক্রমণ করা।

মিহির গুপ্ত। যে আজ্ঞে।

শিলাদিত্য। যুদ্ধে জয়লাভটা হোলো আগে, রাজ্যের বিধিব্যবস্থা হোলো তার পরে। আগে থেকে তাই সকলকে বলে নিচ্ছি, একমন হয়ে এখন প্রাণপণে জয়ের চেষ্টাই করতে হবে। হেরে গেলে কিন্তু মাথা যাবে জেনো সকলেরই।

(সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ১২

(বিদর্ভ-রাজবাড়ি। মন্দির-প্রাঙ্গণ। সন্ধ্যা)

ভক্তদল (শঙ্খ-ঘণ্টা-বাদনের সহিত) গান

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ-দাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ।
দূর করো মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ॥
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত।
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র-তেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে
প্রস্তর-শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ॥ (প্রস্থান)

(উক্তিরত বিদর্ভ-রাজ ও সুবন্ধুর প্রবেশ)

বিদর্ভরাজ। এখানেও তো নেই!—রানী তবে গেল কোথায়?

সুবন্ধু। কেন?—রানী কি অন্তঃপুরে নেই?

বিদর্ভরাজ। না। পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল, রাজ্য যায়-যায়! এক-সঙ্গে সেও গেল? (স্বগত) ঐ যে কঞ্চুকী আসছে। কঞ্চুকী,—রানীকে দেখেছ?

কঞ্চুকী। আমিও যে তাঁকেই খুঁজছি মহারাজ।

বিদর্ভরাজ। কিন্তু কেন?—কেন রানী চলে গেল? তোমরা কেউ জানো না?

কঞ্চুকী। (নিরুত্তর হইয়া চাহিয়া থাকিয়া) আমি কী করে বলব মহারাজ!

বিদর্ভরাজ। বুঝেছি! তবে, সে বুঝি আর এখানে ফিরবে না!

কঞ্চুকী। এমন সাক্ষাৎ-লক্ষ্মী!—মা যাবে কোথায়? (কান্নায় ভাঙিয়া-পড়া)

সুবন্ধু। মহারাজ!—

বিদর্ভরাজ। (উত্তেজনায়) থামো পুরোহিত,—না, না, ও-প্রসঙ্গ আর নয়। স্বপ্ন, স্বপ্ন,—সবই ছিল স্বপ্ন! এতদিন ভুলের-স্বর্গে বাস করেছি! আজ স্বপ্ন ছুটে গেছে—সব ভুলও টুটে গেছে! কে ছিল রানী?—সব ভুলে যাও!

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। মহারাজ, সংবাদ পেয়েছি দল-বেঁধে অমাত্যেরা রাজ্য-জয়ে যুদ্ধে নামছে।

বিদর্ভরাজ। অমাত্যেরা করবে যুদ্ধ? আর, কিনা-যুদ্ধ করবে এই রাজ্য কেড়ে

নিতে? এত বিশ্বাসের এই পুরস্কার? (সুবন্ধুর প্রতি ক্রুর-কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া) ভেবেছ কি আমি এতই দুর্বল? সেনাপতি, অবিলম্বে সৈন্যদল প্রস্তুত করো!

সেনাপতি। যে আদেশ মহারাজ! (কুণ্ঠিত-স্বরে) কিন্তু মহারাজ, যদি অভয় দেন তো বলি—সৈন্যদলেও যে বিদ্রোহীদের হাত পড়েছে।

বিদর্ভরাজ। (সক্রোধে) কী বললে? সৈন্যদল বিপক্ষে চলে যাচ্ছে, তবে তুমি-সেনাপতি এতদিন কী করছিলে?

সেনাপতি। তাদের ফেরাবার চেষ্টাতেই তো ছিলাম।

বিদর্ভরাজ। চেষ্টা?

সেনাপতি। হাঁ, মহারাজ!

বিদর্ভরাজ। তারপর—

সেনাপতি। আজ আর কোনোদিকে কোনো ভরসা পাচ্ছিনে!

বিদর্ভরাজ। আমাকে আগে জানাওনি কেন?—জবাব দাও! জানাওনি কেন? কেন, জানাওনি।

সেনাপতি। জানাতে সাহস পাইনি, কারণ, মূলে যে এর নেতা রয়েছেন স্বয়ং-অমাত্য-শিলাদিত্য।

বিদর্ভরাজ। বিদ্রোহীর দল বাড়ছে? তবে কি রানীও সেই দলেই গিয়ে যোগ দিল? (স্বগত) নারীকে যে বিশ্বাস নেই—তা আজ ভালো করেই জানা গেল।

সুবন্ধু। এত বিচলিত হোয়ো না রাজা! রানী কখনোই তোমার-বিরুদ্ধে যাবে না। শীঘ্রই সে ফিরে আসবে দেখো। তখনই সব জানতে পারবে।

বিদর্ভরাজ। না, না, আর জানাজানি নয়।—আজই আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ১৩

[বিদর্ভের রাজধানী। বটতলা। সন্ধ্যা]

(আলুথালুবেণী চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। (দূরে মন্দিরের চূড়ার দিকে চাহিয়া) ঐ যে মন্দির।—ওখানেই যাই, আর হাঁটতে পারি না! ওখানে গেলে কি গরীবদের একটু আশ্রয় মিলবে না? (চলিতে পা-বাড়ানো)

(সন্তর্পণে পা-টিপিয়া পিছন হইতে অনুচরদ্বয়ের প্রবেশ ও পরস্পরে ইশারা

বিনিময় করিতে করিতে চকিতে চন্দ্রার মুখ-চোখ বাঁধিয়া ফেলিয়া ধ্বস্তাধ্বস্তির সহিত তাহাকে টানিয়া নিতে-নিতে)

অনুচর ১। কী গো মেয়ে, আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে খুব তো সেদিন পালিয়েছিলে, গা-ঢাকা দিয়ে দু'টো দিন হেথাহোথা কাটিয়েও দিলে! চারদিক আঁধারে ঘিরছে—বলি, এখন যাবে কোথায়? (সকলের প্রস্থান)

(শিলাদিত্যের প্রবেশ)

শিলাদিত্য। লোকগুলো গেল কোথায়? আঁধারে ছাই-যে ভালো দেখতে-ও পাচ্ছি-নে। ঐ-যে কে-একটা যেন এদিকে আসছে (সাধুজীর প্রবেশ। সাধুজীকে) তুমি আবার কে হে? ওদিক থেকে এলে যে, পথে-পথে কোথাও কাউকে দেখলে?

সাধুজী। আমি এ রাজ্যের কীই-বা চিনি, আর, কাকেই-বা দেখব! (স্বগত) লোকটার গলাটা যেন কী-রকম একটু লাগছে।

শিলাদিত্য। কাউকে না-দেখে-থাকো তো বেশ!—তুমি নিজেই এখন এদিক থেকে একটু ভেগে-পড়ো তো বাপু! দেখছ-না?—এদেশে যে যুদ্ধ বেধে যাচ্ছে! (স্বগত) বেটা তো ভালো-ফ্যাসাদ বাধাল দেখছি। এখন যদি কোনোদিক থেকে ধ'রে মেয়েটাকে শেষে ওরা এদিকেই নিয়ে আসে, তবে তো একেবারে হাতে-নাতেই এর কাছে বমাল ধরা পড়তে হবে।—(সাধুকে শাসাইয়া) এখনো ভেগে পড়লে না? চারদিকে সামাল, সামাল—

সাধুজী। কী বলছ তুমি? ভেগে পড়ব? কোন্‌দিকে ভেগে পড়ি বলো তো?—সাধুসন্ন্যাসী-মানুষ-আমাদের সবদিকটাই যে ভগবানের রাজ্য! ভেগে যাব কোথায় বলো? আর কার ভয়েই-বা ভাগব? তা-ও বলি,—একি তোমার নিজের রাজ্যি বাবা?

শিলাদিত্য। তবে, তুমি ভাগবেই না বুঝি? (স্বগত) তাও তো বটে,—এরা ভাগবে কেন? এরা যদি সদলে ষড়যন্ত্র ক'রেই বেরিয়ে থাকে? হয়তো আমারই পেছনে লেগেছে!—এসব নিশ্চয় ঐ পুরুত-ব্যাটার কাজ! আচ্ছা, মজা দেখাচ্ছি! (সাধুজীকে) তাহলে, যাবেই না? (তরবারি কোষমুক্ত করা)

সাধুজী। (শিলাদিত্যকে তাহার-নিজেরই পিছন-দিকে চাহিতে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া) ওহে, যা-ই করো—একবার পেছনটা দেখে নিজেকে আগে সাম্‌লে নিলে হয় না? দেখো না, তোমার কাছে কে আসছে যে!

শিলাদিত্য। কী বলছ! কে আবার আসবে? (১ম অনুচরের প্রবেশ)

১। হুজুর, হুজুর!

শিলাদিত্য। (পিছনে ১ম অনুচরকে দেখিয়া লইয়া) কী হয়েছে ? ষাঁড়ের মতো অমন চেঁচাচ্ছিস কেন ? (স্বগত) কী-সব হাঁদা-গঙ্গারাম-নিয়েই না পড়েছি ! মূর্খটা দিলে সব পণ্ড ক'রে। রাজার গুপ্তচরটাকে কেমন বাগিয়ে এনেছিলাম।

১। (উদ্বেগে) সেই ওড়া-পাখিটা হুজুর ধরা পড়েছে। এখনই আপনি ওদিকে না গেলে সব ভেস্তে যাবে।

শিলাদিত্য। (সাগ্রহে) তাই নাকি ?—ধরা পড়েছে ?—যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি ! (স্বগত সহর্ষে) মেয়েটাকে তাহলে পাওয়া গেছে। যাক্,—একটা উদ্বেগ কাটল। (১কে) ভালো ক'রে দেখে নে, সাধুটাকে চিনে রাখ্, এখন থেকে ওকে চোখে-চোখে রাখবি, বুঝলি তো ? চল্ তবে। (অনুচর-সহ প্রস্থান)

সাধুজী। ব্যাপার কী ? সবটাই যেন একটু কেমন-কেমন ঠেকছে ? যুদ্ধের বাজার !—তা-ও তো বটে, এখন তো কত দিক দিয়েই কত কী ঘটবে। কিন্তু, লোকটা অমন উত্তেজিত হয়েছিল কেন ?—আমাকে শত্রু ভেবেছে ?—কেন ?

(ভাবিতে-ভাবিতে প্রস্থান)

দৃশ্য ১৪

[বুধকোট। প্রান্তর। সন্ধ্যা]

(গাহিতে-গাহিতে সশস্ত্র-জনতার প্রবেশ)

গান

জনতা। হো, এল এল এলরে দস্যুর দল।
গর্জিয়া নামে যেন বন্যার জল।—এল এল॥

(সৈনিকের বেশে মুক্ত-কৃপাণধারিণী সূক্ষ্ম-মুখাবরণে-চোখমুখ-ঢাকা রানী-ঐন্দ্রিলার প্রবেশ, সঙ্গে কুঞ্জলাল)

ঐন্দ্রিলা। (জনতাকে) লক্ষ-লক্ষ বুভুক্ষুর সম্মুখের একমাত্র গ্রাস, কেড়ে নিয়ে ঐশ্বর্যের অমিত-উচ্ছ্বাস,-প্রকাশিতে সদা যারা যূথবদ্ধ ষড়যন্ত্রে রত,—তাহাদেরে ক্ষমা করা ভুলেও ভেবো-না পুণ্যব্রত।

কুঞ্জলাল। গান

আমরা এবার মরব, না-হয়, গড়ব স্বাধীন সোনার দেশ,
এই আমাদের মনের কথা, এই আমাদের কথার শেষ।
এখন শুধু গড়ার কাজ,—নয় বৃথা আর কথার সাজ ;
কণ্ঠে তোলো এক আওয়াজ—"আরাম হারাম, ছাড়ো আয়েস !"

প্রকৃতি কিংবা মানুষই হোক, রুখবে যে এই গড়ার রোখ্
তাদের গুঁড়িয়ে ফেল্‌তে এক-পলক !—এতে নাই দয়া-মায়ার লেশ ॥
হুঁশিয়ার থেকো নওজোয়ান, হুঁশিয়ার যত শঠ্-সেয়ান,
হোক সকলেরই এক ধেয়ান—"জয় স্বাধীনতা, জয় স্বদেশ ॥"

ঐন্দ্রিলা ও সকলে।

গান

সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।—আ-আহা ॥
মুক্ত করো ভয়—আপনা-মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয় ॥
—আ-আহা !

দুর্বলেরে রক্ষা করো দু'র্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো,
মুক্ত করো ভয় – নিজের 'পরে করিতে ভর
না রেখো সংশয় ॥—আ !—আহা !

ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়—দুরূহ কাজে নিজেরি দিয়ো কঠিন পরিচয় ॥
—আ—আহা !

(দামামা ও শঙ্খ-বাদন)

কুঞ্জলাল। দামামা বাজিছে গুরুগুরু। সংগ্রামের শঙ্খ বাজে, যাত্রা হবে শুরু।

জনতা। জয়-মা জননী,—আরেকটি-বার মাগো, শোনা তোর অস্ত্র-ঝনঝনি, শুনে-শুনে আরবার যুদ্ধরীতি আরো তবে শিখে-নিই অমনি।

ঐন্দ্রিলা। (জনতাকে) ধরণীর আলো-জলে, শস্যে-ফুলে-ফলে শিল্পে-জ্ঞানে জমিতে-জমাতে ধনে-জনে,—ন্যায্য নিজ-অধিকার দিতে হবে সর্বসাধারণে। মনে রেখো সকলের স্বাধীন অকুণ্ঠিত মুক্ত-প্রাণ হতে স্বতঃ-উৎসারিত শত উপলক্ষ-পথে যে-আনন্দ-জ্যোতি দেয় দেখা, সকল বাধার অন্তে সবার অলক্ষ্যে জয়-লেখা এঁকে দেবে সে-ই প্রাণে-প্রাণে।—মৃত্যু হোক নাই শোক, অমৃতের আশীর্বাদ পেয়েছি ঐক্যের জয়গানে।

জনতার গান ও রণবাদ্য।

গান

বাধল সংগ্রাম, কোথায় কার ঘরদুয়ার অন্নজল বাস
পড়ল ডাক লক্ষ-লাখ, সাজল গ্রাম-গ্রাম। যোদ্ধদল রণপাগল—কে আজ কার দাস!
ডঙ্কারব জয়গরব কুচকাওয়াজ ধুম, উঠছে রোল, খাচ্ছে দোল জয়নিশান জোর,
মৃত্যুভয় মাত্র নয়, কোথায় কার ঘুম! নাই চালক, নাই আলোক,—মুক্তি মন-ভোর।

(তালে-তালে পদক্ষেপে সকলের প্রস্থান)

(ছদ্মবেশী বিদর্ভ-রাজার প্রবেশ)

বিদর্ভরাজ। (প্রস্থানপর-দলের পিছনের-লোকটিকে ডাকিয়া) কে তুমি? শোনো,—এখানে তোমরা এতক্ষণ কী করছিলে?—বিদ্রোহের চক্রান্ত? তোমাদের দলের আগে-আগে ঐ যে মেয়েটি চলে গেল ও-ই বা কে?—দলনেত্রী?

লোকটি। উনি যে আমাদের মা-জননী (উদ্দেশে প্রণাম)। স্নেহ-বলে তিনি মাতা, বাহু-বলে তিনি রাজা।

(হাতের ইশারায় রাজাকে চুপ-থাকিতে ইঙ্গিত জানাইয়া প্রস্থান)

রাজা। (স্বগত) উনি ওদের রাজা? বুঝেছি, রাজা নয়, তবে ওদের কাছে তিনি রাজারই মতো। কে এই পুরুষবেশী রহস্যময়ী নারী। তা, সে যে-ই হোক, সব-দিকের বিদ্রোহ-বিপত্তিগুলিরই আমি একসঙ্গে মূলোৎপাটন ক'রে ছাড়ব—তবেই না আমি রাজা! (প্রস্থান)

দৃশ্য ১৫

(বুধকোট। শিলাদিত্যের প্রমোদ-কক্ষ। রাত্রি। শিলাদিত্য ও নটীদল)

শিলাদিত্য। (নটীদলকে) রাত হয়ে যাচ্ছে, তোমরা শুরু করে দাও। (চিন্তিত)

নটীদল। (সনৃত্য গান)

বাসী-ফুলে অলি ভুলে করে কি বিহার?
তা-ই জানি, (তবে)—হাতছানি কেন গো আবার?
যত নব ফুলদল রূপেরসে টলমল,
(তারা) মন নিতে চায় দিতে কত উপহার,—
কেন, আর মুখ-ভার হবে সে-সবার!
দিন-শেষে যদি এসে ঘেরেই আঁধার,
(সে-আঁধার) হোক কালো, তাই ভালো—হোক যা হবার!

রাতশেষে রোশনাই নেভে যদি দোষ নাই,
তবু কেন কোথা যেন কী রয় দ্বিধার !
—ছেড়ে যেতে, সমুখেতে পা-ফেলা যে ভার ॥

শিলাদিত্য। (গানের মাঝে-মাঝে বাহিরের দিকে চাওয়া। গান থামিলে নটীদের প্রতি) তোমরা এবার যাও।

(নটীদের প্রস্থান। শিলাদিত্য উঠিয়া দুয়ারে আসিয়া অনুচরদের প্রতি) কে আছিস ? (অনুচর-১ আসিলে স্বগত) কেবলই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

অনুচর-১। হুজুর !

শিলাদিত্য। চন্দ্রাকে একবার নিয়ে আয় তো।

(চন্দ্রাকে আনিয়া কক্ষে রাখিয়া অনুচরের প্রস্থান)

চন্দ্রা। ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও।

শিলাদিত্য। যদি ছাড়বই তবে এত কৌশলে আবার তোমাকে এখানে ধ'রে আনলুম কেন, বলো !

চন্দ্রা। আমায় নিয়ে তুমি কী করবে ?

শিলাদিত্য। তা তো ভাবিনি। তবে তোমাকে-ছাড়া আমার চলবে না— এইটুকুই জানি ! আমার কাজে তোমাকে আমার চাই-ই।

চন্দ্রা। (সরোষে) সে-আশা তোমার কোনদিনই মিটবে না, আমার ছায়াও মাড়াতে পারবে না—শয়তান !

শিলাদিত্য। (স্বগত) ওঃ এত দম্ভ, এত ঘৃণা ! মুখের উপর এমনি ক'রে আমাকে বারে-বারে অপমান ? আমাকে যখন অমন অপমান করছে ওকেও তখন অপমানের মধ্যেই থাকতে হবে। একটা টোপ দিয়ে দেখলাম—দেমাকে সে-টোপ ধরল না দেখছি !—যদি এর পরেও এখানে ও থাকে তবে—এবার ওকে হয়ে থাকতে হবে দাসী, —পরিচারিকা। নাচগান শিখিয়ে ওকে প্রমোদ-সঙ্গিনীও করা যাবে। মন্দ কী ! ঘরে-বাইরে দুদিকে-ই মেয়েটা কাজে লাগবে। (বাইরের দিকে) কে আছিস ? (১-ম অনুচরের প্রবেশ) চন্দ্রাকে নিয়ে যা। (অনুচরের চন্দ্রাকে ভিতরে লইয়া-যাওয়া। অমাত্যদের প্রবেশ) আসুন অমাত্যেরা আসুন। একদলকে পাঠিয়েছি রাজধানীতে। ব'লে দিয়েছি রাজধানীতে গিয়ে রাজপুরীতে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে, আর সেই ফাঁকেই অন্তদিক দিয়ে অন্দরে ঢুকে রানীকে গোপনে ধ'রে আনবে। যেমন কঠিন কাজ, তেমনি পাঠিয়েছি বাছা-সব কাজের-লোক দেখেই।—কিন্তু তারা যে এখনও আসছে না !— উল্টে এখন-যে ক্রমে ভাবনা বাড়ছে !—তাইতো, দৈবে যদি তারা

ধরা-ই পড়ে গিয়ে থাকে! বন্দী হয়ে মারের চোটে দরবারে গিয়ে তবে তারা আমাদেরও নাম বিচারের সময় না-বলে দেয় আর ষড়যন্ত্র-সব ফাঁসিয়ে না-দেয়।

যুধাজিৎ। অমাত্য-শিলাদিত্য, অনর্থক আপনি চিন্তিত হচ্ছেন। ফাঁসিয়ে যে দেবে ফাঁসিটা দিচ্ছে কে? এ রাজ্যে কি রাজা আছে? যা আছে সে তো একটা স্ত্রৈণ মাত্র। সে-যে থেকেও নেই। বিচারের সে কী জানে?

জয়সেন। তাই-তো—ঠিক কথা! রাজা আবার কে? (উচ্ছ্বাসে) আমরা তো সবাই রাজা। কী বলো হে ভাস্কর? রাজত্ব তো আমাদের,—রাজত্ব আমাদেরই, রাজ্য করব আমরা, কী বলো?

উদয়। সে কী! (চাপা-গাম্ভীর্যে) যা বলেছেন অমাত্য! আপনার কথায় তো ব্যাপারটা তাই মনে হয়েছিল—কাজটা খুব সহজই বটে, তবে কিনা,—ভালোয়-ভালোয় এখন আগে রাজ্যের গদীটায় তো বসা চাই। বসে নিয়ে তবেই-না বিচার-আচার! তাহলে, বসতে যাচ্ছেটা কে? দখল না পেয়েই বসা? তবে কিনা—আপনাদের সব ব্যাপার! এগিয়ে তো যান, বেদখল্ হয়ে এলেও রাজত্ব-করাটা তো আটকাবে না,—কী বলেন?

জয়সেন। ভাস্কর, তোমার সে-বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছে না কি?

উদয়। না, না, সন্দেহ আবার কী? তবে কিনা—(মাথা-চুলকানো) যতক্ষণ গদিটা হাতে না আসছে—! আর, ঐ যে কথায় বলে,—"পরের থালে রইল ভাত,—ঘন-ঘন ঢেকুর তুলে আমি পেটে বুলাই হাত।"

যুধাজিৎ। (জয়সেনকে) উদয়ের কথাবার্তাগুলো তো ঐ-রকমেরই। ওসব ছেড়ে দিন্ অমাত্য-শিলাদিত্য। লোকদের অপেক্ষায় না-থেকে তার চেয়ে নিজেরাই গিয়ে সোজাসুজি রাজপুরীটা আক্রমণ করি, চলুন। আর, রানীকে আমরাই ছিনিয়ে নিয়ে আসিগে।

উদয়। তা বটে, তা বটে! ঠিক ঠিক—কোনোরকমে একবার গিয়ে পড়লেই হয়—তবে কিনা, এখনই সেখানে যাচ্ছে কে?

(সহসা যোদ্ধবেশে কুঞ্জলালের প্রবেশ)

শিলাদিত্য। (বিস্ময়ে উঠিয়া) কে? কে ওখানে? ওঃ!—চাষার সর্দার কুঞ্জলাল? কী চাই তোমার? এসময়ে তুমি এখানে? এলে কী ক'রে? ভিতরে ঢুকতে বাধা পেলে না?

কুঞ্জলাল। বাধা দেবে কে? তোমার দারোয়ান-দুটো দূর থেকে আমাকে

দেখেই ভয়ে উধাও হল। এখন শোনো, আমাদের রাজা আসছেন, আগে আমি এলাম তাঁর দূত হয়ে মাত্র এইটুকুই জানাতে।

শিলাদিত্য। (উদ্বেগে) রাজা ? কোন্ রাজা ? কী তার অভিপ্রায় ?

কুঞ্জলাল। কোন্ রাজা, দেখলেই তা চিনতে পাবে। মনে-মনে তো এখনই বিলক্ষণ চিনে গেছ। ভেবো না।—তাঁর অভিপ্রায়টি আর-কিছু নয়, এইটি শুধু তোমাদের জানানো যে, তাঁর প্রতি তোমাদের যা অভিপ্রায় ছিল, সেটি তিনি জেনেছেন ; আর, এখন তাঁর অভিপ্রায়টিও এবারে তিনি ভালোমতোই তোমাদের বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন।

শিলাদিত্য। (বিস্ময়ে) সেকী ? আমাদের অভিপ্রায় ? এসব কী বলছ কুঞ্জ ?

কুঞ্জলাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন শুধু জেনে নাও,—রাজধানীতে আগুন লাগাবার অনুচরগুলি ধরা পড়ে গেছে। ফাঁসির-ঘরে তোমাদেরও অর্থাৎ হুজুরের-দলকেও শেষের-যাত্রায় সঙ্গী পাবার জন্য তারা প্রতি-মুহূর্তে হাপুস-নয়নে পথ চেয়ে আছে।

শিলাদিত্য। তারা ধরাই-বা পড়ল কী ক'রে, রাজাই-বা এরাত্রে এখানে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লেন কী ক'রে ?

কুঞ্জলাল। সবই সম্ভব হয়েছে, আমাদের জনতার-গড়া গুপ্ত সেই মুক্তি-বাহিনীর কাছ থেকে গোপনে সব তড়িৎ-খবর পেয়েই। রাজাও ছুটে এসেছেন,—তোমাদের একেবারে দলসুদ্ধু সবাইকে ধরে ফেলতে; আসতে দেরি হলে যে তোমরাই রাজাকে হত্যা ক'রে ফেলতে অন্য-কোনো উপায়ে।

শিলাদিত্য। (তরবারি লইয়া) তা বেশ, তবে কিনা, আমি তো অমনি-অমনি ধরা দেব না, আমাকে যুদ্ধে হারিয়ে নিতে হবে আগে !

উদয়। ধরা তো সেই দিতেই হবে, তবে আর দেরি ক'রে লাভ কী ? আমি কিন্তু এখুনি চললাম রাজাকে অভিবাদনে।

শিলাদিত্য। (উদয়কে শাসাইয়া) চুপ অমাত্য, কী-ছেলেমানুষী করছ ? সংকটেও চাপল্য ? মূর্খ কোথাকার ?—কুঞ্জলাল, তুমি আমাদের বন্দী।

কুঞ্জলাল। (হাসিয়া) আমি যে রাজার সেবক ! মুখের হুমকিতে তো আমাকেও বন্দী করা চলবে না।

শিলাদিত্য। তবে অস্ত্র ধরো।—অস্ত্রের মুখেই সব মীমাংসা হোক। (কুঞ্জলাল ও শিলাদিত্যের যুদ্ধ—কুঞ্জের ভূমিস্যাৎ হওয়া। কুঞ্জকে) কী-হে বীরবর, যুদ্ধের শখ্টা মিটল তো ? আর-তো এবারে বন্দী হতে বাধা নেই ? (অমাত্যরা সদলে কুঞ্জকে বন্দী করিতে আগাইলে তখনই "সাবধান"—বলিয়া সশস্ত্রে রাজার প্রবেশ ও যুদ্ধের উপক্রমেই মুখোসপরা মুক্তকৃপাণধারিণী রানীরও প্রবেশ। তখনই যুদ্ধ শুরু করিয়া যুদ্ধব্যাপৃত-অবস্থায় সকলের বহির্গমন)

দৃশ্য ১৬

(বুধকোট। সন্ধ্যা। বটতলায় আবছায়াতে আলাপরত ছদ্মবেশী রানী-ঐন্দ্রিলা ও কুঞ্জলাল)

কুঞ্জলাল। (রানীকে) আর যে সহ্য হয় না মা, যুদ্ধ ক'রে দেশকে বাঁচাব কী! দেশটা যে যুদ্ধে-যুদ্ধেই আরো বেশী করে ধ্বংস হয়ে গেল। ঐ যে মা, আমাদের সেই সাধুবাবা দেশ দেখে-দেখে বেড়ান!—ঘুরে ঘুরে এ-রাজ্যের সব দেখে এসে রাতে-রাতে আমাদের বলে যান। আজো শোনা যাবে ওর কাছে সব-অবস্থাটা। এদিক দিয়ে কিন্তু উনি আমাদের একটা বড়ো সহায় হয়ে কোথা থেকে এসে জুটেছেন দুঃস্থসব-মানুষের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে।

(উক্তিরত সাধুজীর প্রবেশ)

সাধুজী। গ্রাম থেকে গ্রামে, নগর থেকে নগরে—অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, নরহত্যা নারী-নির্যাতন চলছেই। তুমি ঠিকই বলেছ কুঞ্জলাল, যুদ্ধের এই-সব পাপের নেশায় পক্ষ-বিপক্ষের সমস্ত সৈন্যকেই আজ পেয়ে বসেছে—থামতে পারছে না কেউ, মাত্রা কেবলই বেড়ে চলেছে।

(উক্তিরত সুবন্ধুর প্রবেশ)

সুবন্ধু। আজ মহারাজকে নিষেধ করবার কেউ নেই, আর তা কেউ পারবেও না,—একমাত্র মা তুমি ছাড়া। এই সুতীব্র সংকট মুহূর্তে নানা দ্বিধা-সন্দেহে জল্পনা-কল্পনায় ঘুলিয়ে গিয়ে রাজার মাথায় যে কী-এক খেয়াল চেপেছে তার ঠিক নাই। কেউ না-জানুক তুমিও কি তাঁকে জানবে না? থামাবে না?

কুঞ্জলাল। অমাত্যদের বিদ্রোহদমন, আর সে-সঙ্গে মা তোমারও অনুসন্ধান—এই নিয়েই তো মহারাজের এই অভিযান। তুমি ছাড়া মা, আর, কে তাঁকে এই সময় থামাতে পারে?

ঐন্দ্রিলা। আমি জানি, রাজাকে এখন থামানো বড়ই কঠিন—কারণ ঝোঁক চেপেছে যে! তিনি যে প্রকৃতিস্থ নন। কিন্তু আমি সাক্ষাতে গেলেও'যে হয়তো উল্টো ফলই হবে।

সুবন্ধু। তবু বলছি দেবী, আজ তুমি সকল মান-অপমান সুখ-দুঃখের অতীত—তুমি পবিত্র। পাপ তোমার কাছে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হবে, তুমি এই বীভৎসের মধ্যে নির্বিকার থাকতে পার।

কুঞ্জলাল। তাহলে, তুমি গিয়ে একবার যদি রাজাকে বুঝিয়ে বলো মা। নিরীহ মানুষের এই নির্মম ধ্বংস যে বন্য-পশুদেরও লজ্জা দেবে!

সাধুজী। (রানীকে) তোমার সব-কিছু ধর্ম-কর্ম দিয়ে যুদ্ধের এই পৈশাচিক অধর্ম রোধ-করাই এখন যে তোমার বড়ো, সতীধর্ম। সকলকে সে মারছে, তুমি গিয়ে তাঁকে বাঁচাও—বাঁচাও তাঁর এই পাপের-পথ থেকে।

কুঞ্জলাল। তাই-তো যুদ্ধ বাধবার আগে কি এতটা ভাবতে পেরেছি যে যুদ্ধটা আসলে কী জিনিস!

সাধুজী। (কুঞ্জকে) আর, এটাও কি জানতে,—যুদ্ধ একবার বেধে গেলে তার জেরটা যে কতদূর কী-বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়।

সুবন্ধু। (কুঞ্জকে) ওহে কুঞ্জ, যুদ্ধের এখনই কী-আর দেখছ? নরকের বীভৎসতা, দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা, নৃশংসতার আতঙ্কময় এই যুদ্ধ!—এ যে প্রলয়ের মতো সর্বধ্বংসী, মানুষকে এতে-যে এমনই পশুর-অধম করে ফেলবে, তাতে বিচিত্র কী।

কুঞ্জলাল। চোখের উপর এসব দেখে এখন আর স্থির থাকতে পারছি না মা।

সুবন্ধু। তাও তো ভাবি, রানী যা বলছেন—রাজা আজ যেমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন, কিছু বোঝালেই তা শুনবেন-কি, না, কিছু বুঝতে চাইবেন?

ঐন্দ্রিলা। (স্থিরচিত্তে দৃঢ়কণ্ঠে) না, না—তবু আমি যাব, আর তাঁকে এখানেই নিয়ে আসব—আনব এই জনতার মধ্যেই, সকলের এক-জন ক'রেই আনব।

কুঞ্জলাল। তা ব'লে আনবে কি একেবারে বটতলার এই পথের ধুলায়?

ঐন্দ্রিলা। কেন নয়? সকলে-এখানে এসে মেলে না?

সাধুজী। ঠিক বলেছ মা, জনতার এই মিলন-আসরেই-যে জনতার-মনের-রাজার মহাসিংহাসন পাতা রয়েছে, মা। ধর্ম তোমার সহায় হউন। যত-বলেই রাজা বলী হোন, তুমি যে বলী তোমার এই লোক-সেবার ধর্মবলে। ভেবো না মা, জয় তোমার হবেই।

ঐন্দ্রিলা। বাবা, আমার প্রণাম নিন, যে-ক'রে হোক, আমার স্বামীকে আর এই আমার প্রাণপ্রিয় প্রজাদেরকেও রক্ষা আমি করবই! জানবেন, এতে প্রাণ গেলেও ফিরব না।

কুঞ্জলাল। বিশ্রামে যাও মা—রাত হয়ে যাচ্ছে। দিনকাল তো ভালো নয় তুমি- ফিরছ পাপের হাত থেকে রাজাকে মুক্তি দিতে। ওদিকে রাজার চর যে ঘুরছে তোমাকে ধ'রে বেঁধে-নিতে।

(সকলের প্রস্থান। অন্যদিক-দিয়া ছদ্মবেশী-রাজার প্রবেশ)

বিদর্ভরাজ। মুহূর্তে আবার কোথায় দলটা মিলিয়ে গেল! সেদিনকার সেই গুপ্ত

বাহিনীটা নয়-তো? রানীও কি তবে এরই মধ্যে আছে? কিন্তু কোথায় থাকে সেই নারী, স্নেহ-বলে যিনি মাতা, আর বাহু-বলে যিনি রাজা! (প্রস্থান)

(অন্যদিক দিয়া অনুচর ১-এর সঙ্গে মহাজনের প্রবেশ)

মহাজন। বলো কী হে? কাজটা কী, একবার শুনি?

১। টাকা-টাকা করছ? কাজটা ক'রে দিতে পারলে, বুঝেছ? —যত টাকা চাও!—বুঝলে তো?

মহাজন। (সাগ্রহে) আঃ, আগে বলোই না,—কী করতে হবে?

১। (মহাজনের কানের কাছে মুখ নিয়া) খবর চাই—রানীর খবর!—দিতে পার? এজন্যই তো তোমায় অমাত্য ডেকেছে! (মহাজনের আঁৎকানো)

মহাজন। বাবা রে! গর্দান! নির্ঘাত, নির্ঘাত গর্দান যাবে। রানীর খোঁজ? রাজাও যা পাচ্ছেন না, আমি তা কোথায় পাব? আর, পেলেও কাকে দেব? আবার না দিলেও কোন্ দিক থেকে কার হাতে যে গর্দান যাবে, ভাবতেও যে সবটা ভির্মি লাগছে! মাথাটা যে এখুনি ঝিম্‌ঝিম্ করছে?

১। ও-সব শোনাচ্ছ কাকে? না-বলবার জো নেই—তা তো জানই! আমি যখন ব'লে ফেলেছি আর তুমিও যখন শুনে ফেলেছ, তখন তুমি অন্যকে বলো-না-বলো, তোমার নিস্তার নেই।

মহাজন। (কাঁপিতে কাঁপিতে) হরি হে, কী সংকটে-ই না ফেললে! দু'মুখো পথ ধ'রে নিজের পায়ে যে নিজেই একদিন কেমন কুড়ুল মেরেছি,—এসব আগে কি এতটা জানতাম? এখন তো টের পাচ্ছি কিন্তু এ পথ আর ছাড়ারও যে উপায় নাই। হরিকে তো যা ডাকার ডাকলামই, এখন তারা-মাকেও একটু ডেকে রাখি! বল্,—বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!

১। ওহে মহাজন, আর দাঁড়াতে হবে না, এবার দৌড়ে পালাও—ঐ দেখো, কারা আসছে!

(উত্তেজিত জনতার প্রবেশ)

জনতা। ওখানে কারা রে? দাঁড়া বলছি—(হাঁক শুনিয়াই পলাইতে গিয়া আঁৎকাইয়া স্থূলকায়-মহাজনের কাছা খুলিয়া-পড়া, আর, সে-সব সামলাইতে গিয়া অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়াইয়া-পড়া, ওদিকে অনুচরের দ্রুত পলায়ন) ওরে, এ-যে দেখছি সেই বিদ্রোহী বিদেশী-অমাত্যদলের দালাল মহাজনটা! সেই টিকৃটিকিটা-রে! ধর্ —ধর্ ওটাকে ধর্। ওদের একটা-তো-ছাই সট্‌কেই গেল।

মহাজন। (কৃত্রিম-ক্রোধে) কী বললে, আমি বিদেশীদের দালাল? আমি

—টিকটিকি ? ওসব বললে, ভালো হবে না বলছি ! (জনতা যত আগায়, মহাজন তত পিছায়)

জনতা। বলবই তো, হাজার-বার বলব—(রঙ্গে-ভঙ্গে) টিকটিকি, টিকটিকি !—ঠিকঠিকই ঠিকঠিকই ! এইতো বললাম ! তা কী করতে পারলি, বেটা দালাল, টিকটিকি।

মহাজন। কী করতে পারি ? দেখবি ? ঐ হ্যাখ্ কে আসছে—এখুনি ধরিয়ে দিচ্ছি হাতে-হাতে ! (হাঁক) চৌকিদার—ওগো চৌকিদার-দাদা !—এদিকে, এদিকে এসো !

জনতা। (এদিক-ওদিক চাহিয়া) কোথায় তোর চৌকিদার ! ডাক্ না তোর ঐ দাদা-গাধা-যে-যেখানে আছে ! দেখে নিই তাদের মুরোদ ! (এদিক-ওদিক চাওয়া)

মহাজন। বটে ? হ্যাখ্ তবে, ডেকে আনতে পারি কিনা—ওযে আমার মামার শালা পিসের ভাইরে—হ্যাখাবে মজা ! ওগো কই গেলে গো ! ওদিকে নয়, এদিকে যে ! (দৌড়াইয়া পলায়ন)

জনতা। (হঠাৎ বিমূঢ় হইয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি) ওরে, ব্যাটা চৌকিদার না হাতি ! বেটা শয়তান, ধোঁকা দিয়ে দিয়ে আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে পালাল দেখছি। ধর্‌ধর্—ছাড়া হবে না।

পিছনো-পড়া জনতার একদল। বেটা তো কম নয়, ওর ঐ মামার শালা পিসের ভাই যে ক'রে ছাড়ল ও শেষে আমাদেরই ! (সকলের সবেগে প্রস্থান)

দৃশ্য ১৭

[বুধকোট। রণক্ষেত্র। শিবির। মধ্যাহ্ন]

(বিদর্ভরাজ ও সেনাপতি)

সেনাপতি। যুদ্ধ শেষ। শিলাদিত্য যুধাজিৎ আর জয়সেন তাদের সৈন্যদল নিয়ে পলায়িত।

বিদর্ভরাজ। সেনাপতি, তবে অবিলম্বে সেই পলায়িত-বিদ্রোহীদের পশ্চাতেই চলো। শিবির ওঠাও আজই।

সেনাপতি। যে-আদেশ প্রভু।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। মহারানী এসেছেন। সঙ্গে বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছেন যুধাজিৎ আর জয়সেনকে।

বিদর্ভরাজ। (চমকিয়া) কে এসেছেন ?

সৈনিক। মহারানী।

বিদর্ভরাজ। মহারানী !—কোন্ মহারানী ?

সৈনিক। আমাদের মহারানী।

বিদর্ভরাজ। যাও সেনাপতি, দেখে এসো, কে এসেছে। (সেনাপতি ও সৈনিকের প্রস্থান)

বিদর্ভরাজ। মহারানী ?—এসেছে বন্দী নিয়ে ? একি স্বপ্ন নাকি, এ কি রণক্ষেত্র নয় ? (বিস্ময়ে ক্রোধে) রানী এসেছে ? (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) এ কী ক'রে হবে ? তবে কি এসেছে রাজ্য কেড়ে নিতে, এবার আমাকে বন্দী করতে ? এ-ও কি সম্ভব ? (হাসিয়া) হা, হা, হা, হা,—এতক্ষণে বোঝা গেল রমণীর হৃদয়ের রহস্য কী গভীর-জটিল। না না, না, কখনো-ই না,—তার সাক্ষাৎ বা সঙ্গ আর নয়। চাই শুধু অবিরাম-সংগ্রাম, সংগ্রাম ! আর, তারই সঙ্গে চাই,—নিত্যই নিষ্ঠুর যত নব-নব-হত্যারই উৎসব, দিকে-দিকে চাই শুধু হত্যার উৎসব !—হত্যার উৎসব।

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। মহারানী এসেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে সৈন্যদল। শিবির-দ্বারে তিনি মহারাজের সাক্ষাৎ-অভিলাষী।

বিদর্ভরাজ। (তীব্র ক্রোধে) সাক্ষাৎ ? কার সঙ্গে ? রমণীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তো এ নয়।

সেনাপতি। মহারাজ—

বিদর্ভরাজ। সেনাপতি, চুপ করো। যা বলি শোনো—শিবিরের দ্বার রুদ্ধ করো। এ-শিবিরে ঐ-শিবিকার প্রবেশ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হোলো, জেনো।

সেনাপতি। যে-আদেশ মহারাজ। (প্রস্থান)

(আহত শিলাদিত্য, জয়সেন, যুধাজিৎ-আদি বন্দী-অমাত্যদের লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। কিন্তু মহারাজ, বন্দীদের কী বিধান হবে ?

বিদর্ভরাজ। ওরা আগে বন্দী-ভাবে অপরাধ স্বীকার করুক, তবে পাবে রাজ-মার্জনা। (বন্দীদের লইয়া প্রহরীর প্রস্থান) যুদ্ধ শেষ। এখন—

(সুবন্ধুর প্রবেশ)

সুবন্ধু। জয় হোক, মহারাজ, তুমি এখানে একা বসে আছ ?

বিদর্ভরাজ। তা-ব'লে-এ-সময় আবার তুমিই-বা এখানে কেন ? বলি, আরো-

কিছু ষড়যন্ত্র আছে নাকি। বলো, সে-কে?—মহিষীকে দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিয়েছিলে, বলো কে সে?—তুমি নও কি?

সুবন্ধু। মহারানীকে দুর্ভিক্ষের সংবাদ-দাতা আমি কেন হব? রাজ্যের সংবাদ রাজ্য আপনিই দিয়েছে। দুর্ভিক্ষের-উৎপীড়িত প্রজারা উর্ধ্বস্বরে পথে-পথে কেঁদে-কেঁদে ফিরছে। ফিরছে তারা নিতান্ত-নিজেদের প্রাণের দায়ে। তারা কি ভাবে—পাছে তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়? মহারাজ, যারা কাঁদছে তারা অন্য কেউ নয়, তারা যে তোমারই যত প্রজা!

বিদর্ভরাজ। প্রজা? কার প্রজা? বলিনি?—ওরা তো সংসারের প্রজা? দুঃখ, কান্না—এসব মিলেই তো সংসার। আর ওসব দুঃখের-প্রস্তাব তুলো না, দুঃখের প্রতিকার যদি কিছু জানা থাকে তা ই বলো।

সুবন্ধু। ঐ কান্না তো কান্না নয়, ও যে মহারাজ প্রাণের আহ্বান। প্রাণ যদি সাড়া দেয়, ডাক শুনে প্রাণ যদি কারো দুলে ওঠে—

বিদর্ভরাজ। (সাগ্রহে) কী, কী বললে,—প্রাণ যদি দুলে ওঠে—? তবে? তবেই কি সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য-সব দূর হয়ে যাবে? আমার দুঃখ ঘোচাতে তো প্রাণ কারো একবারও দুলতে দেখলুম না। আমি কি শুধু রাজা-ই? আমি-ও কি একজন মানুষ নই? না, রাজাকে মানুষ হতে হয় না? একটি-বারও যদি সে এসে সহজে সামনে দেখা দিত! এই তো তোমাদের সংসার? সংসারে আছ তো তোমরা সকলেই, তবু আজ রাজা হয়েও আমি একা!

সুবন্ধু। (সহাস্যে) তুমি একা হয়ে আছ তোমার মর্জিতে। যুদ্ধে যে-রকম মেতে গেছ, কে আসবে তোমার কাছে? কার কথা-ই বা তুমি ভাবো?—এমন কি, তুমি তোমার রানীকেও কি আমল দিয়েছ? স্বামী, প্রজা,—এ সবই যে তাঁর কাছে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি। সেদিকটা বুঝে তোমার ঐ অস্ত্র-শস্ত্র-সৈন্য-সামন্ত দূরে ফেলে দিয়ে তাঁর-পথে লোকের সেবাব্রত ধরো দেখি। লোক-সেবাই যে তাঁর সকল অস্ত্রের—মহাঅস্ত্র। তাই সম্বল ক'রে নিয়ে তাঁর প্রিয়-প্রজাদের রক্ষার কাজে তুমি এখনো তাঁর সঙ্গে মেলো গিয়ে দেখি! যাক্, শেয়াল হয়ে তো সিংহের গহ্বরে ঢুকে পড়েছি। এখন, রাখবে কি থাবা মেরে খাবে—দেখো ভেবে। সবই তো তোমার হাতে। তবে, আমাদের মেরে-ফেলে তুমি তোমার বীরত্বের আর বেশী কী পরিচয় দেবে? বরং, তাতে তোমার দুর্বলতার প্রমাণই তো আরো বাড়বে!

বিদর্ভরাজ। আমি দুর্বল কি সবল, তা গত-যুদ্ধ থেকেই রানী জেনে নিয়েছেন।

আর কেন সখা ?—চলো অবিলম্বে প্রজারক্ষার কাজে। রাজধানীতে গিয়ে সাধারণের এক সভা ডাকা যাক্। দেখি,—তারা খাদ্য-সমস্যার সুরাহাতে কে কী বলে।

সুবন্ধু। তবে, তাই দেখা যাক্—চলো। দেখো তো সাহস ক'রে এসেছিলাম ব'লেই তো তোমাকে ফিরে পেলাম—তুমিও যে গিয়ে তাঁকে এমনিই হয়তো পেয়ে যাবে-না, তার ঠিক কী ?

বিদর্ভরাজ। (সহাস্যে) হয়েছে, হয়েছে। আগে রানীকে হাতে পেয়ে নিই, তখন দেখা যাবে তোমার বুদ্ধির দৌড়টা। এখন চলো-তো রাজধানীতে।

সুবন্ধু। (হাসিয়া) অত লোভ দেখিয়ো না, রাজা, এখনই তো গর্দান নিচ্ছিলে ? কী বলো ? নেহাৎ, কোন্ সুক্ষণেই না এসে পড়েছিলাম, তাই রানীর নামে বেঁচে গেলাম।—যা হোক, মানুষের মূল্য তবে বুঝেছ ভাই ?

বিদর্ভরাজ। সখা-মাপ করো। আজ তোমার এই সরল প্রাণের সামান্য দুটি কথার সরস-স্পর্শ যেন মুহূর্তে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কত জ্বালা-যন্ত্রণা মুছিয়ে কালো অতীতটাকে কোথায় মিলিয়ে দিল। এই মুহূর্তেই দেখো, কোথার থেকে আবার নূতন কী-বন্যাবেগে সব ডুবিয়ে দিয়ে গোটা-সৃষ্টিটাই যেন মনের ভিতর থেকে এক অনন্ত-ক্ষুধায় গেয়ে-গেয়ে উঠছে—

গান

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ,
তব ভুবনে তব ভবনে মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান ॥
আরো বেদনা আরো বেদনা, দাও মোরে আরো চেতনা,
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ ॥
আরো প্রেমে আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক্ নেমে,
সুধাধারে আপনারে তুমি আরো আরো আরো করো দান ॥—

—বলো সখা, সে বেঁচে আছে তো ?—কোথায় আছে, কেমন আছে ?

সুবন্ধু। (সহাস্যে) সে তো তোমার প্রাণই জানবে—জানছে না কি ? এখন যে এই বিশ্বাসেরই উপর চলছে তোমারও এক প্রেমের-পরীক্ষা।

(উভয়ের প্রস্থান)

দৃশ্য ১৮

[বুধকোট। বন। সন্ধ্যা। কুটীর]

(দুয়ারে উপবিষ্টা রানী ঐন্দ্রিলা।)

ঐন্দ্রিলা। (আপন-মনে গীতরতা)

গান

আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগী।।
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন যেথা তোমার ধুলায় শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার তোমার রাগে অনুরাগী।।
আমি শুচি আসন টেনে-টেনে বেড়াব না বিধান মেনে,
যে-পঙ্কে ওই চরণ পড়ে তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি।।

ঐন্দ্রিলা। কোথায়-বা রাজাবাস, কোথায় এ বনবাস। রাজ্যের কল্যাণে এ বনবাসই আমার স্বর্গবাস। (একটু থেমে) জানি না, আমার এই রাজ-প্রত্যাখ্যানের খবর আমাদের আর-সবাই কী-ভাবে নিয়েছে। কিন্তু কাউকে যে দেখছিনে, কুঞ্জ-তো আসছে না। ঐ যে, কুঞ্জলালের বউটি দেখছি এদিকেই আসছে, দ্রুত আসছে, না জানি ওর কী হল।

(মানদার ক্রুদ্ধমূর্তিতে প্রবেশ)

কী গো বউ, তোমাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে? শরীর ভালো আছে তো? কাকে খুঁজছ?

মানদা। —নেই, তা ঠিকই জানি,—সে তো এখানে থাকবেই না। (সবেগে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বগত) আবার ভালোমন্দ সুধানো হচ্ছে! সংসারে আর কার কী ক্ষতি হবে, কপাল পুড়বে শুধু আমারই।

ঐন্দ্রিলা। কী বউ বিড়বিড় ক'রে কী এত বলে চলেছ?

মানদা। (সামনে আসিয়া ক্ষোভের সঙ্গে) বলব আর কী, বাড়িঘর গেছে, বাচ্চাটা গেছে, ঘরে ভাত-কাপড়েরও জোগাড় নেই, ঘরের লোকের-ও পাত্তা নেই। আমার আর কী আছে যে তা নিয়ে ভাবব, কে আছে-বা যে, তাকে কিছু বলব।'

ঐন্দ্রিলা। তোমার সব আছে বউ, স্বামী তো তোমাকে ত্যাগ করেনি।

মানদা। ত্যাগ করে নি, কিন্তু দেখছেই-বা কোথায়? এই তুমি, তুমিই তো

তাকে একদণ্ড ঘরে তিষ্টুতে দিচ্ছ না। কেন? আমি তোমার কী করেছি। আমার ঘর-সংসার নষ্ট ক'রে কেন স্বামীকে এমন বাউণ্ডুলে করে তুলেছ? এতটুকু মায়াদয়া নেই? এই মানুষটার ওপর যে তোমার কী চোখই-না পড়েছে!

ঐন্দ্রিলা। (চম্‌কাইয়া) এ সব কী বলছ বউ। আমার কথা কি কুঞ্জ তোমাকে কিছু বলে-নি?

মানদা। বলেছে, কত-কী বলেছে,—সে তো সব-সময়ই কত-কিছু ব'লে থাকে। আমাকে তো অমনি-একটা-কিছু বুঝিয়েই ধোঁকা দিয়ে রাখে,—সে কি আমি বুঝি-নে? আমি-বাপু মুখখু-সুখখু গাঁয়ের বউ,—ও-সব কথা আমি কী বুঝব বলো! বলে কি না—তুমি রানী,—মহারানী। বলি, এই কি রানীর ধারা? রাত-বিরেতে মাঠে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে-ঘুরে দিন কাটাবে রানী? তোমার রাজা নেই?—নিতে-সে আসে না কেন? তোমাকে কি ত্যাগ করেছে? তবে? একি, সীতার বনবাস? তাই এখানে বনে এসে তুমি ঠাঁই নিয়েছ! ভিতরের কথাটা কী, খুলে বলো-তো।—তোমার মতলবটা একবার বুঝি।

ঐন্দ্রিলা। (শুষ্ক হাসিয়া) ভিতরের কথাটা সে তো তুমিই ব'লে দিলে বউ! এখন বলো তো কুঞ্জলাল কোথায়?

মানদা। তাঁর কথা আমি কী জানি। তোমারই কাজে কোথায় সে ছুটে মরছে। তাঁর কি খাওয়া-দাওয়া আছে, শোওয়া-বসা আছে, না সে দুদণ্ড ঘুমোয়। লোকটা যে মরে যাবে!- না, না, এ আমি হতে দেব না। তাঁকে তুমি রেহাই দাও, একটু ঘরে-থাকতে দাও। আর, তুমিও তোমার ঘরে ফিরে যাও। না হলে আমি, এই তোমার সামনে আমি দাঁড়িয়ে বলছি—আমি নির্ঘাত আত্মঘাতী হব।

ঐন্দ্রিলা। (চমকিয়া) না, না, বউ, তোমাকে কিছু করতে হবে না, তোমার ঘর-সংসার-স্বামী নিয়ে তুমি সুখে থাক। আমি কালই চলে যাচ্ছি, নিশ্চয় চলে যাব।

['কোথয় যাবে মা' বলিতে বলিতে কুঞ্জলালের প্রবেশ]

ঐন্দ্রিলা। না বাবা কুঞ্জলাল, আমাকে যেতেই হবে। তোমার ঘরসংসার আছে—

কুঞ্জলাল। আমাদের ঘর কি তোমার ঘর নয় মা?

মানদা। (চাপা ক্রুদ্ধস্বরে) যাক্ না চ'লে,- আমাদের ঘর সে তো আমাদেরই ঘর,—এখানে আবার ওঁর ঘর কি?

কুঞ্জলাল। ছি ছি, কী-সব বল্‌ছিস তুই বউ? উনি যে আমাদের সেই রানী-

মা। এঁকেই তো একদিন ছুটে গিয়ে আমাদের সর্বনাশের কথা জানিয়ে এসেছিলাম। কী সব বলেছিস্ তুই এঁকে,—এ্যাঁ?

মানদা। (চম্‌কিয়া) উনি-ই সেই রানী-মা? তিনি কোন্ দুঃখে তবে রাজবাড়ি ছেড়ে এ বনে এই ভাঙা-কুটিরে এমন থাকতে আসবেন? রাজামশাই বুঝি তাহলে ছুটে আসতেন না? তুমি আমাকে বোকা পেয়েছ?

কুঞ্জলাল। আরে না না—সে অনেক কথা!—সব তুই বুঝবি নে, চুপ, চুপ!—তুই চুপ থাক্।—এক্ষুনি আগে ক্ষমা চেয়ে-নে। এটুকু জানিস্, আমাদের জন্যেই রানী-মা রাজবাড়ী ছেড়েছেন, এই প্রজাদেরই রক্ষার জন্যেই যে শাক-ভাত খাচ্ছেন। তার উপর— সহসা চুপ করিয়া গেল।—(একটু উত্তেজিতভাবে) না মা, আমরা থাকতে তোমার কোনো বিপদ নেই,—

(উক্তিরত সাধুজীর প্রবেশ)

সাধুজী। (সহাস্যে) কেন গো সর্দার, সব ঘাঁটি তোমরাই যদি আগলে থাকবে,—আমরা লাগব কোন্ কাজে? চুপিসাড়ে আড়ে-আড়ে রাত্রিদিন এই কুটীর ঘিরে ক'দিন ধরে চক্কর দিয়ে ফিরছি! আমরা থাকতে কার সাধ্য তোমাদের রানীমার কাছে ঘেঁসে!

ঐন্দ্রিলা। আপনি? আপনি কেন আবার এত কষ্ট করছেন আমার জন্য?

সাধুজী। মা,-মেয়ে ব'লে দেখেছি যে! সর্বনাশের মুখে তোমাকে ফেলে যাই—কী করে বলো?

ঐন্দ্রিলা। (কুঞ্জকে) আমার আর কী সর্বনাশ হবে?—কিসের ভয় করছ। চুপ করে রইলে-যে।

কুঞ্জলাল। আবার বুঝি যুদ্ধ বাধে মা।

ঐন্দ্রিলা। যুদ্ধ!—কাদের সঙ্গে? অমাত্যদল তো গত-যুদ্ধেই হেরে গেছে।

কুঞ্জলাল। এবার যে রাজার গতিক দেখে—

ঐন্দ্রিলা। বলো বলো—

কুঞ্জলাল। সম্মুখ-যুদ্ধে তোমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে চান কি-না ভালো বুঝতে পাচ্ছি না—এটা হয়তো হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাঁর কাছে একটা গুরুতর মান-মর্যাদার লড়াই।—

সাধুজী। ঠিক ঠিক! তাঁর বলবীর্যের পরিচয়টা যে সকলের সঙ্গে এবারে তোমাকেও ভালো করে তাঁর বুঝিয়ে দেওয়া চাই। তুমি অমনি গিয়ে সেধে রাজাকে ধরা দিলে কি সে-বীরত্বটা বোঝানো যায়?

কুঞ্জলাল। স্ত্রীর এই অপমানে কি মহারাজের লোক-হাসানো হবে না?

সাধুজী। হাসে তো লোকে হাসবে—সে-বোধ কি তাঁর এখন আছে'—যে ক'রে হোক্ সে চায় তাঁর অন্তরের অন্ধ-ক্ষোভ মেটাতে। তার চোখে যে গৃহত্যাগী-অবাধ্য রানীই তাঁর এখন সব-চেয়ে বড়ো শত্রু।

ঐন্দ্রিলা। না না—অন্তের সঙ্গে নয়, এবার সম্মুখ-যুদ্ধেই তবে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হবে।

সাধুজী। হ্যাঁ-মা, বুঝিয়ে দিতে হবে তুমিও যে-কেউ-কেটা নও,—তুমি বীরেরই সহধর্মিণী।

ঐন্দ্রিলা। তোমার এ-আশীর্বাদ আমার শিরোধার্য বাবা। তুমি নির্ভয়ে তোমার ধর্ম-কর্মে যাও, এরা থাকতে আমার জন্য চিন্তা কি?

সাধুজী। (স্মিতহাস্যে) চিন্তা আমার সেদিন দূর হবে, যেদিন দেখব রাজার পাশে আবার রানীর যথার্থ স্থান হয়েছে। আচ্ছা, তবে চলি—এদিকে এখনই একটা অনাথ রুগ্ন ছেলেকে দেখতে যেতে হবে। ধর্ম'-কর্ম' আর কী—এই নিয়েই যা আছি। (আশীর্বাদ ও প্রস্থান।

কুঞ্জলাল। আমরা তবে প্রস্তুত হই মা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) যাক্, ঐ যে আসছেন সুবন্ধু-ঠাকুর। শুনি,—তিনি আবার কী বলেন।

(সুবন্ধু-ঠাকুরের প্রবেশ)

ঐন্দ্রিলা। তোমার যাত্রার ফল কী হল—ঠাকুর? রাজার কুশল তো? রাজ্যের দুর্ভিক্ষের অবস্থা-ইবা কেমন বুঝলে? আবার কোনো দৈব দুর্বিপাক দেখা দেয় নি তো।

সুবন্ধু (সহাস্যে) কুশল মা,—সবই কুশল। তোমার নামেই সব কাজ সেরে এসেছি। কিন্তু আগেই ব'লে রাখছি,—আমি এসেছি রাজার পক্ষ হয়ে যুদ্ধের আমন্ত্রণে। আদেশ আছে—তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে সোজা রাজার পাশে। তা নইলে জীবনে আর আমি রাজাকে মুখ দেখাতে পারব না। কাল সকালেই কিন্তু আমাদের যুদ্ধযাত্রা করতে হবে রাজধানীতে।

কুঞ্জলাল। (সরহস্যে) যুদ্ধটা তা-হলে ঠাকুরমশায় কী ধরনের হচ্ছে?

সুবন্ধু। এ যুদ্ধের ক্ষেত্রটা হবে মাঠে-ঘাটে নয়, একেবারে জম-জমাট রাজ-দরবারে। আর, দেখতে পাবে মা, তোমারই অস্ত্র হাতে ক'রে নিয়ে রাজা এবার তোমাকে-ও-কেমন কায়দা ক'রে হাত ক'রে ফেলে। সারা-দেশবাসী হবে এই অভিনব-যুদ্ধের প্রত্যক্ষ-সাক্ষী।—বাস্! আর কোনো কথা নয়।

ঐন্দ্রিলা। আচ্ছা, দেখা যাবে তোমার কারসাজি। পুরস্কারটা আগাম এই নাও —এই নমস্কারে। তিরস্কারটা রইল কালকের জন্য তোলা। কী বলো?

(সুবন্ধুকে নমস্কার-জ্ঞাপন)

মানদা। (রানীর পায়ে পড়িয়া) মা-তুই, একলা যাস্‌নে, (কুঞ্জকে দেখাইয়া) ওঁকে তোর সঙ্গে নিয়ে যা।

ঐন্দ্রিলা। (সহাস্যে দুইহাতে মানদাকে বুকে তুলিয়া) আর, তুই ?—বৌ, তোর কী হবে ?

মানদা। আমি আর এমন-একটা কে ? দেশের দশের যা হবে, আমারও তাই হবে। আয় মা, এখন ঘরে।

(সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ১৯

[বিদর্ভ-রাজসভা]

[সভাসদ-সকলে স্ব-স্ব আসনে আসীন। উদ্বিগ্ন-দৃষ্টিতে স্বগত-উক্তিরত রাজার প্রবেশ।]

বিদর্ভরাজ। অন্নহারা, গৃহহারা চায় ঊর্ধ্বপানে, ডাকে ভগবানে (পায়চারি)

(দৃঢ়কণ্ঠে উক্তিরত সুবন্ধুর প্রবেশ)

সুবন্ধু। যে-দেশে সে-ভগবান মানুষের হৃদয়ে-হৃদয়ে, সাড়া দেন বীর্যরূপে দুঃখে কষ্টে ভয়ে, সে-দেশের দৈন্য হবে ক্ষয়,—হবে তার জয়!

বিদর্ভরাজ। হবে জয় ? কী ক'রে তা হয় ? অজন্মা, আকাল দেশ ভ'রে : আমার ভাণ্ডার শূন্য, দুমুঠো কারে-বা দিই ধ'রে! বুঝি না তো তবে, উপায় কী হবে!

(সভাসদ্‌গণকে) ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা, তোমরা লইবে বলো কে বা ?

সুবন্ধু। (সভাসদগণকে)—বলো বলো—তোমরা লইবে বলো কে-বা ?

(শুনিয়া মিহিরগুপ্ত মাথা হেঁট করিয়া রহিল। করজোড়ে রাজাকে বলিল—)

মিহিরগুপ্ত। (রাজাকে) ক্ষুধার্ত বিশাল-পুরী, এর ক্ষুধা মিটাইব আমি ?—এমন ক্ষমতা নাই স্বামী।

জয়সেন। (রাজাকে) যে-আদেশ প্রভু করিছেন, তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে, রক্ত দিলে হত কোনো কাজ—মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ ?

যুধাজিৎ। (কৃত্রিম-বিস্ময়ে) কী কব এমন দগ্ধ-ভাল, আমার সোনার খেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত, রাজকর জোগানো কঠিন, হয়েছি অক্ষম দীনহীন।

সুবন্ধু। (চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বিস্ময়ে স্বগত) রহে সবে মুখে-মুখে চাহি'—(সকলকে প্রশ্ন) কাহারও উত্তর কিছু নাহি? (মৌন কুঞ্জলালের সঙ্গে সহসা চোখ-মুখে-সূক্ষ্ম-আবরণ ও সর্বাঙ্গ ওড়না-ঢাকা-ছদ্মবেশের অবস্থায় ভিক্ষাপাত্র-হাতে উক্তিরতা মহারানী-ঐন্দ্রিলার প্রবেশ)

ঐন্দ্রিলা। কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা, নগরীরে অন্ন-বিলাবার আমি আজি লইলাম ভার।

বিদর্ভরাজ। (সচকিতে স্বগত) প্রান্তরে-সদলে-ফেরা, ঠিক ঠিক,—এই সেই নিখোঁজ রহস্যময়ী নারী! বিস্ময় যে ভারী!—এ কি যোদ্ধা হতে পারে?—হতে পারে খুনী—কিন্তু একী, একী!—কার এই কণ্ঠস্বর শুনি?—এযে—এযে খুবই চেনা,—কে এ নারী, কিছুতেই জানা কি যাবে না? (রানীকে তীব্র-উৎকণ্ঠায়) কোন্ অহংকারে মাতি' লইলে মস্তক পাতি' এ-হেন কঠিন গুরু-কাজ?

সকলে। (মিলিত-কণ্ঠে রানীকে) কী আছে তোমার কহ আজ!

ঐন্দ্রিলা (সনমস্কারে হাতের ভিক্ষাপাত্র সামনে আগাইয়া ধরিয়া সভাসদগণকে) মোর কাছে,—শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে। আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে, তাই তোমাদের পাব দয়া, প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া। (নমস্কার)

বিদর্ভরাজ। (সখেদে) সাধ্য কী করি এ-পুণ্য, আমার ভাণ্ডার শূন্য!

ঐন্দ্রিলা। (অঙ্গুলি-নির্দেশে সভাদগণকে দেখাইয়া দিয়া) আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে, তোমা-সবাকার ঘরে-ঘরে। তোমরা চাহিলে সবে এ-পাত্র অক্ষয় হবে, ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা, মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

বিদর্ভরাজ। (রানীকে) কে তুমি?—তোমার পরিচয়?

ঐন্দ্রিলা। (স্বগত) নয়, নয়, নয় আর ক্ষণমাত্র দেরি করা নয়। এখানেই হোক এর লয়। (মুখাবরণ ত্যাগ করা)

বিদর্ভরাজ। (বিস্ময়ে) রানী?—মহারানী আমাদের? এদেশের কথা এতদিনে মনে কি পড়েছে তাঁর ফের্!

সভাসদ্গণ। মা গো, তুই ফিরে এলি তবে? বল্, বল্, উপবাসী তোর যত সন্তানের উপায় কী হবে?

ঐন্দ্রিলা। হবে সে-উপায়। চিন্তা কী-বা তায়!

সুবন্ধু। (আগাইয়া রানীকে) এসো এসো লোকমাতা, লোকে গায় জয়গাথা! এ-রাজ্যের আর ভয় নাই।

বিদর্ভরাজ। ভরসা যে কোথায়-বা পাই! যেদিকে-ই চাই, দেখি—জুড়ে' চারিধার, শুধু মরু, শুধু হাহাকার।

সুবন্ধু। তবু দেখো, এবার কী হয়! সভাতে যে সাড়া পেলে সে কি কিছু নয়? একসূত্রে এক-কার্যে এক-মতে মিলেছে-যে সমগ্র-সমাজ, ভরসা তো সেখানেই আজ!

(উক্তিরত ক্ষ্যাপাচাঁদের প্রবেশ)

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (উত্তেজনায় সুবন্ধুকে) কোন্ কাজ পৃথিবীতে হয় চেষ্টা বিনা? দেশে-দেশে অহ্বান জানাও! —দেখি না!—সকলের সহ-অনুভবে—

সুবন্ধু। (আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে) যা বলেছ!—সে তো ঠিকই,—একেবারে কিছু কি না-হবে?

ক্ষ্যাপাচাঁদ। সকলের সাথে আছে সকল হয়ে-যে একজন, প্রাণে-প্রাণে সেই এক-এ খোঁজো দিয়ে মন। 'একতা'-র এ-মহা-উৎসবে, সকলে মিলিয়ে কণ্ঠ গাও উচ্চে তবে—

গান

ক্ষ্যাপাচাঁদের সঙ্গে সকলে।

জাগো, জাগো আছ যারা আজও অচেতন,
জানো-না কি জনে-জনে রাজে একই-জন?
কে তুমি কে ধনী-দীন, কে স্বাধীন কে অধীন,
ভুলো-না রে কোনোদিন—(ভবে) নরই নারায়ণ॥
ভাগে-ভাগে ভাবো কেন ভাগেরই ভুবন,
ছোটো-বড়ো ভুলে হও মনে এক-মন।
জাগো রে 'এক'-এর-ভাবে সমুখে দেখিতে পাবে,
জীবনে জীবন গাঁথা—কোথায় মরণ?
অনন্ত-জীবনেরই তুমি মহাজন॥

সুবন্ধু। তাই বটে মনে হয়, একথাও মিথ্যা নয়—পড়া যাক্ যতই না ফেরে, জনে-জনে মিলে' যত, মানুষই বাঁচাবে মানুষেরে!

ক্ষ্যাপাচাঁদ। যখন-ই, যত-না, হোক যত-যা-ই-কিছু, তার পিছু, কী এত ভাবনা?

ী-যে বলেছেন সেটা কি জানো-না?—জগতে সবাই এক-মানুষের জাতি; আমরা যে এ-বিশ্বের সকলেরই জ্ঞাতি। বিশ্ববাসী সবাকেই তাই, সংকটের অবস্থাটা জানানো-যে চাই। সাড়া মিলে ভালো!—না-ই যদি মিলে কিছু জনতা অন্তরে তার প্রজ্বলন্ত রেখে যাবে শুধু এই বিশ্বাসের আলো—"রাত্রি গিয়ে আসে দিন"—ছেদহীন এ ও এক নয় কি গো চিরসত্য-প্রকৃতিরই সনাতন-নীতি?

জনতা। (সমস্বরে) মরণে পেছ-পা নই, আমরাও বাঁচবই, চিরদিনই গেয়ে যাব জীবনের এই জয়গীতি।

ঐন্দ্রিলা। ঠিক ঠিক—এই জেনো, জনতাকে বাঁচাবে এ নিজেরই-প্রতিজ্ঞার অগ্নিগর্ভ-স্মৃতি।

বিদর্ভরাজ। যদি এ বাঁচার যুদ্ধে যায় কারো প্রাণ?

ঐন্দ্রিলা। কী বলছ মহারাজ—জনহিতব্রতে মৃত্যু?—সে-মৃত্যু যে জীবনেরও চেয়ে সুমহান! সে-মরণে হার নেই, সে-মৃত্যু যে মানুষেরে করে চিরজয়ী।

ক্ষ্যাপাচাঁদ। এ ধুলার পৃথিবীটা (সহাস্যে) তাদেরই গৌরব ব'য়ে হয়ে-ওঠে ধন্যা-জ্যোতির্ময়ী। সকলেই মনে রেখো, প্রভুর এ বাণী!—এই বিশ্বে মানুষেরে বাঁচাবার পথ এই জানি!

জনতা। জয় জয়, প্রভুজীর জয়! আমরাও হব জ্যোতির্ময়। আজ হতে দেশব্রতে, মনে রেখে যাব শুধু এ-শপথখানি।—'চিরমুক্তি-লোকে যেতে জাতির-ও এ পারের পারেনি।

সুবন্ধু। (ক্ষ্যাপাচাঁদকে) কে প্রভু, থাকেন কোথা, কী ক'রে বা হল পরিচয়? (স্বগত) তাইতো, তাইতো সেই কুটীরেই যেন নৈশ গুপ্ত-গণসম্মিলনে সাধুকে দেখেছি মনে হয়!

ক্ষ্যাপাচাঁদ। এই জানি, আর কিছু নন, তিনি এক সাধুবাবা উদাসী সন্ন্যাসী শুধু হন। চলাফেরা—খুশিমতো, নাম-যশে নন তো প্রত্যাশী।—বারোমাস-ই, হেথা-হোথা চলেছেন সকলের কল্যাণ সেধে; কারো সাধ্য নাই তাঁকে অনিচ্ছাতে রাখে কেউ কোনোখানে বেঁধে। এই তাঁর কথা,—সংসারেতে সহ-অনুভবে—শুধু দূর হবে সকলের সব দুঃখব্যথা।

ঐন্দ্রিলা। (সহসা উচ্চকিত হইয়া) এক্ষুণি,—একী কানে শুনি,—এ যে দেখি ঠিক সেই দৈব-বরাভয়, আমার অন্তরে গুপ্ত থেকে নিরন্তর প্রভু-আজ্ঞা রূপে বলে, "হবে জয়, হবে মাগো, সুনিশ্চিত হবে চির-জয়।"

বিদর্ভরাজ। (উৎফুল্ল-কণ্ঠে) তাই যদি হয়, এতদিনে হল তবে, মানুষেরই অনুভবে বিধির ইচ্ছার শুভোদয়। (রাজার সঙ্গে রানী) জয় জয় প্রভুজীর জয়, জয় জয় জনতার জয়।

বিদর্ভরাজ। আজ থেকে প্রতিদিন প্রতিঘরে গিয়ে কাছে কাছে, চলো রানী, সকলেরে সুধাই-গে'—কে কেমন আছে!

ঐন্দ্রিলা। ভালো, তাই চলো যাই। কার কী অভাব-দুঃখ সব-কিছু নিয়ে সংবাদ, সেবাযত্নে সাধ্যমতো সকলেরে বিলাই-গে' আনন্দের স্বাদ। আর,—মিটাই গে দুখ্। সকলেই আমাদের দেখা পেতে আছে যে উৎসুক। এ কী শুভক্ষণ এল, কী আনন্দ আজ, দু'জনে একত্রে মিলে শুরু করি চলো তবে সকলের কাজ।

(সকলের প্রস্থান)

মর্ত্য-নন্দন

দ্বিতীয় অংশ

ভুখা-ভগবান

ভুখা-ভগবান

দৃশ্য ১

[অপরাহ্ণ। বুধকোট। অমাত্য শিলাদিত্যের উদ্যান]

(অনুচরদ্বয় কাজের-মুখে আলাপরত ও এদিক-ওদিক চঞ্চল-দৃষ্টিরত অস্বস্তিগ্রস্ত)

১। ছ্যা-ছ্যা! এই নাকি যুদ্ধ!—নিজে অমাত্য, রাজা-হওয়ার জন্য তলে-তলে অন্য-অমাত্যদের নিয়ে দল-বেঁধে কী তোড়জোড়টাই-না করলেন এতদিন ধ'রে! শেষে এই বিদ্রোহের নামে কী হুল্লোড় যে একটা হয়ে গেল, ব্যাপারটা তো পরিষ্কার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কেউ তেমন লড়ে-নি, প্রত্যেকেই কেবল ভাবছিল,— লড়ে মরব আমি, আর কিনা, লুটের-মাল—ঐ রাজ্যটা বাগাবে অন্যরা—কাজ কী অত-ঝামেলায়! শেষে, এই ক'রেই তো একেবারে সবাই মিলে পস্তালো।

২। যাই বলো, লড়েছিল শুধু একজন—সে আমাদের মনিব-শিলাদিত্য! হ্যাঁ, বীর বটে তা বলতেই হবে! কিন্তু তীরটা যে এসে একেবারে বুকে বসে গিয়েই তাকে কাবু ক'রে ফেললে কি না! না হলে—

১। তবে, চিকিৎসাতে আর ঐ চন্দ্রা-মেয়েটার সেবাতে এ-যাত্রাটা অন্তত অমাত্য বেঁচে গেলেন ব'লেই মনে হয়।

২। কিন্তু যদি না-বাঁচতেন?—তবে আমাদের দশাটা কী হত?

১। কী আর হত?—সকলের মতো এই আকালে আমরাও অক্কা পেতাম। তবে, তা ও ভাবি, আকালে আমাদের তো সমস্যা শুধু পেটের খিদে নিয়ে!—তবু ভাগ্যি, রাজারাজড়া-অমাত্যদের মতো তো মনের খিদেতে এখনো আমাদের পেয়ে বসেনি!

২। মনের-খিদেটা আবার কী রে বাবা? তাতে যদি পেয়েই বসে সেটা ছাড়ে কিসে, সেটাও শুনি!

১। ওর আর ছাড়াছাড়ি নেই রে, দাদা! পেয়ে বসলেই টের পাবি,— সে কী-জিনিস।

২। কেন, ওতে কী হয়?

১। শুনবি কী হয়?—ওতে ধরাধরি, ধারাধারি, আড়াআড়ি থেকে শুরু হয়ে গিয়ে বাড়াবাড়িতে বাড়িঘরও ছাড়াছাড়ি চলে। একটু-আরো এগোলে, লাগে কাড়াকাড়ি, তারপরেই মারামারি! অমনি, মামলা বেঁধে-গিয়ে চলে—থানা-কাছারি, আরো

এগোলে ছাঁদনাতলায় পুরুতের বদলে বিচারে হয় সমন-জারি, একেবারে শেষটায়—আরো শুনবি ?

২। বল্, বল্—শুরুই যখন করেছিস—শেষ করেই ফেল্—আরো আছে নাকি ?

১। আছে রে আছে—সবুরেই যে মেওয়া ফলে।—মনের খিদেতে জ্ব'লেপুড়ে' শেষটায় মালার বদলে হয়—গলায়-দড়ি !

২। প্রেমের-ফাঁসি থেকে একেবারে গলায়-দড়ি ? ওরে !—মনের-খিদের দৌড় এতদুর ?—আমার পেটের-খিদে-সব উবে' গেছে-রে ! ভুলেও আর 'খাই খাই' করব না !

১। জানিস কি ?—এমনিতরোই,—মানুষের পেটে-পেটে যে কত-রকমেরই-না কত খিদে আছে তা কে বলবে ? সংসারটাই যে খিদেতে ভরা।

২। এ যে দেখছি সেধে-সেধে ভূতের-কীল খাওয়া রে !—তবে, বিয়ে-ফিয়ে ওসব বড়োলোকের ব্যাপার। আমাদের মতো ভুখা-সব মুটে-মজুরদের জন্যে ওসব যে দোকানে সাজানো রাজভোগ-রসগোল্লারই মতো-রে ! জিভে নয়, চোখে-চোখে শুধু চেখে-যাবারই জিনিস।

১। তা-হলে এখনো তুই ওগুলোর দিকে আসতে-যেতে চোখ বোলাস ? দাদা-আমার রসিক বটে ! আচ্ছা, বলি,—কেউ যদি আজ তোকে, ধরে নে, পেট ভরিয়ে রাজভোগই এখন খাওয়ায়,—খেতে পারিস ?

২। পারব না কেন, খেতে তো পারি, কিন্তু খাওয়াচ্ছে-টা কে ?

১। ওরে, মরবি, মরবি,—

২। মরি তো মরব ! ভালোমন্দ-দুটো খেয়েই তো মরব ? তাই-বা এমন মন্দ কী ? এমনিতেই কি আমরা বেঁচে আছি ?

১। তা, ঠিকই বলেছিস বটে !—খাওয়ার-জোগাড়েই যে আমরা খেটে-খেটে হাওয়া হয়ে যাচ্ছি ! বাজারে রাজভোগ—আমাদের কপালে দুর্ভোগ ! আরো কত-হাতের কত-মারের ভোগ যে ভাগ্যে লেখা আছে, কে বলবে !

২। ঐ দুখেই তো না-মরতেই মরে আছি দাদা ! এমন-মড়াকে আর কে ছোঁবে বল্।

১। কেন রে, মড়ার উপরেও যে খাঁড়ার-ঘা আছে, তা কি জানিসনে ? আমরা যে ভগবানের সেই খাঁড়ার-ঘারই বলির-পাঁঠা-রে !

২। রামঃ, রামঃ !

১। ছড়া

হরি হে, দিন-দুনিয়ার মালিক তুমি আচ্ছা-মহাজন!
জন্ম দিয়ে বাঁচাচ্ছ যা, কেবল সে-তো দেখতে মজা,
আখেরে কি নয় এ শুধু, আমাদেরকে মারবারই কারণ?
তোমার কাণ্ড-কারখানা সব দেখে
সেয়ানা-সব সাকরেদরা তাদের জন্ম-থেকে
মারণেরই নিচ্ছে তালিম তোমার নামটি হেঁকে!
মেরে জীবকে মুক্তি-দেবার তুমিই যে হও মূল-উদাহরণ!
—হায় গো মহাজন!

খাই-খাই আর খাওয়া-খাওয়ি এই যা-যত সেয়ানাদের কাজ,
আর-সবাইকে মেরে তারা চায় যে হতে একাই মহারাজ!
তুমি বাবা, নিজেই দোষী; কাকে তুমি কী বলবে-বা আজ?
হে দয়াময়, থাকো তুমি ওদের নিয়ে মেতে!—
চাই না কাছে যেতে,
চাই না তোমার কৃপার কণা, চাই না পেসাদ খেতে!
দূরের থেকেই হে ভগবান, পায়ে তোমার গড় করি বারবার,
যা ক'রে যা সুখ্‌দুখ্‌ পাও—থাক্ তোমার একা-র।
মার খেয়ে আর ম'রে আমরা-গোলাম-যত গেলাম চিরদিনই,
জীবনটা যা দিয়েছিলে, তাই নিয়ে যা করলে ছিনিমিনি,—
তোমার এ-কীর্তিটাই তোমায় বারে-বারে করায় যে স্মরণ,
বলো, তোমার কোন্ গুণে আর ভজ্‌বে তোমায় মন!
থাকি বাইরে থাকি ঘরে, এখন শুধু মনে পড়ে—
তোমার হাতের শেষ-মারটা মুক্তি দিতে আসবে-সে কখন!
—রক্তমুখে ম'রেও যাতে ভক্ত হয়ে অনিচ্ছাতে
"বলো হরি"-বোলের দোলায় পৌঁছে শেষটা শ্মশান-খোলায়
চিতার বুকে একান্তই-যে করতে হবে আশ্রয়-গ্রহণ॥

২। বলি, ওসব কাকে বল্‌ছিস,—ঐ বোকা-ভগবানের কি ও-সব-বোঝবার বুদ্ধি আছে? মগজে যাতে বিঁধে, একেবারে সোজা ক'রে তাই বলতে হবে—শোন্ তবে, কী বলছি—

গান

হরিহে, তুমি বাঁচাও-গে নিজেকে।

(এতদিন) সবার ছিলে ভরসা তুমি,

আর-যে তোমায়, শুধায় না কেউ ভুলেও ডেকে!

খুঁজে ধনীর মনের কোনা, (করতে) এদিক-সেদিক আনাগোনা,

(আজ-যে) ভিটেয় তোমার সরষে-বোনা দিন-দুপুরেই চলছে জেঁকে!

(সেই) কোন্ পুরুষের জমিদারি! (কিন্তু) প্রজাদলে আজ গোঁসা ভারি—

(বলে তারা), জীবনযুদ্ধে আমরা হারি, (খাঁটিতে ওহে,) তুমি এঁটে-বসো কিসের থেকে?

(গরীবদের) আপন যদি হতেই তুমি, (আমাদের) শ্মশান হয় কি বাস্তুভূমি?

(যত-পারো) নাক ডাকিয়ে যাও-না ঘুমই, ফুলচন্দন-আতর মেখে॥

(শুধু) ভেবে বলো তো ব্যাভারটা কেমন—

(তোমার) টিকিটিরও পায় কি দেখা জন্মে কোনোজন?

'বিপদেতে শ্রী-মধুসূদন!'—(জানি না) নামটি তোমায় কবে দিলে কে।

রাজ্যটা নেয় কে কোন্-ফাঁকে,—(ফিরে তা) দেখতে না তো!—সব ব্যাটাকে

(শুধু) ঘোল-খাওয়াতে ফেলে পাকে (পাপ আর) পরকালের দোহাই হেঁকে॥

(বাবা!) যা করেছ তা করেছ, ছিলে কুমীর হলে কেঁচো,

(শুনে') রাগে চোখ-মুখ যতই খেঁচো,—(বলি, ভুয়ো) দাপা-দাপিটা ক'দিন টেঁকে?

ভুখারা-যে সারবে দফা! আজো একটা করো রফা,

(দেখো) তুমিও তাতে থাকবে তোফা!—কাজ কী, নানান গোলে থেকে?

মেজে-ঘষে নাও সবার বিবেক, ছোটোয়-বড়োয় করো-গে এক,—

(তুমিও গিয়ে) মনে-মনটা (সবার সাথে) মেলাও বারেক,—

(দেখবে সে-মিলে) তোমায়ও সবাই আদরে আবার ধরবে ছেঁকে॥

১। (রসিকতার সহিত) বেটা বলে কী! মানুষের মারের—ভয়েই শেষে নাকি আজ ভগবানকে-সুদ্ধ মানুষের মনের-কুঠ্‌রিতেই এসে লুকিয়ে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে প্রাণ বাঁচাতে হবে!—তবেই হয়েছে! ওরে বুদ্ধু, তুই তাহলে ক্ষুধা ভুলে' সেই সু-দিনের স্বপ্ন-সুধাতেই মজে থাক্। কিন্তু, কেমন যেন সন্দেহ হয়,—এটা আবার ভগবানের উপর মনগড়া তোর প্রতিশোধ-নেবার ফন্দি নয়-তো? তাহলে এও মনে রাখিস, হিংসা-ঘৃণা-ভয়-রাগ এ-সবই কিন্তু আবার কু-লোকে বলে নাকি—ভক্তি-ভালবাসা-অনুরাগেরই এক রকম-ফের-মাত্র।—দেখিস আবার!—অসাবধানে ডিগ্‌বাজি খাস্‌নি যেন! তাহলে কিন্তু ভগবানের চেলা-চামুণ্ডার দল আবার হাসবে

২। হয়তো ঠিকই বলেছিস রে, সাধে কি মানুষ এম্‌নিতেই বিধাতাকে অমৃতের থেকে একেবারে বিষের মতো ক'রে আজ দেখতে চলছে ?

১। ওরে, ও-সব দেখাদেখি এখন রেখে দে! ঐ দেখ্, কে আসছে,—চল্ শিগ্‌গির বাগানের-কাজে। সন্ধ্যা হয়ে এল যে! গাছে জল দিবি নে ?

২। আসছে তো ঐ আরেক-বিধাতা, মনিব-আমাদের শিল্যাদিত্য-না ? তা চল্, যতখন বেঁচে আছি,—

১। দু' মুঠো ভাতের জন্য তো ঐ "বলো-হরি"-জাতের শিলাদিত্যদের বেবাক বিধি-নিষেধই আজ মানতেই হবে। ওদিকে সবই কবে-যে একদিন ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি। (দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত)—হায় সরলা।

২। ও কী ?—সরলা ? সরলা আবার কে ? (ম্লানহাস্যে) তবে, ছিল না কি কেউ ? তোর কথাগুলিই-বা এমন মাজা-মাজা হল কী ক'রে ?—লেখাপড়াও কিছু করেছিলি না কি ?

১। না না, কী-যে বলিস! আমাদের আবার স্ত্রী-পুত্র! আমাদের আবার লেখাপড়া! আর, কিছু ক'রে-থাকলেই বা কী ?—আকালের টানে কে কোথায় বান-ভাসির মতো ছিট্‌কে প'ড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার কি ঠিক আছে ? তবে জানিস কী ?—ওরে—ছিল তো একদিন সবই—

২। বল্, বল্, তবু একটু শুনি—আমার যে কোনো কূলেই কিছু নেইরে!

১। বললে হয়তো এখন সব বানানো মনে করবি!—সংসারের সার শিক্ষা-সহবৎ, পেয়েছিলাম-তো অনেক-কিছুই—কিন্তু ভাগ্যে যে সইল না—আকালে যে সব-আবার ছাড়িয়ে নিলে! শিক্ষিত হয়েও বেকার-আমি নানান দুয়োরে ঘুরছি—ভিক্ষেও যখন মিলল না, কপর্দকহীন বেকার-আমি অবস্থার সঙ্গে কত আর যুঝব, ছেলে-মেয়েগুলি চোখের উপরে অনাহারে দাপিয়ে মরতে লাগল!—তখন ভালোমন্দ আর ভাবলাম না, পাপ-পুণ্যও আর মানলাম না!—মান-অপমান মায়া-মমতা, সে তো বিধাতাই কবে দয়া ক'রে কেড়ে নিয়েছিল—নেমে পড়লাম একেবারে এই—গুণ্ডা-গিরিতেই! জানিস তো, আকালে প'ড়ে পেটের ক্ষুধায় একদিন পুরাণের এক মুনিও-পর্যন্ত কুকুরের পচা-ঠ্যাং খেয়ে প্রাণ-বাঁচাতে গিয়েছিল। তাই আর, আমাদের নব্য-পুরাণের এই কাসুন্দি ঘেঁটে কাজ-কী ?

২। তাই বলো দাদা! চলো, ঐ ওরা—

(পিছনে উদ্বেগে চাহিতে-চাহিতে উভয়ের প্রস্থান, আর আলাপরত চন্দ্রা ও শিল্যাদিত্যের প্রবেশ)

চন্দ্রা। (শিলাদিত্যকে) আমি আরো খুঁজে মরছি।—অসুস্থ শরীরে এমন একা উঠে এলে কেন ?

শিলাদিত্য। তবে কি তোমার কাছেই কেবল বসে থাকতে বলো ? এখন যে তোমার ছায়ার কাছ-থেকেও আমি পালাতে চাই। কেবলি মনে হয়, আমি কি আর তোমার যোগ্য হতে পেরেছি ? লুটের-মাল ঐ গুপ্ত-ঘরটায় সব জমানো রয়েছে। ওদিকে চাইলে-ও যে ঘেন্নায় গা-ঘিন্‌ঘিন্ করে। আমার কাছে আজ ওগুলো সার-গাদার-আবর্জনা। ফোটা-ফুলটি তুমি ছিলে ডালে, এখন ভাবি, তোমাকে ছিঁড়ে আনলাম কেন ? তুমি কি এখানকার জিনিস ? তোমাকে যে এখানে মোটেই সাজে না।

চন্দ্রা। ব'সে-ব'সে তবে এসবই বুঝি ভাবছ ? বলি, জমানো-মাল কি তোমার বোঝা হয়ে উঠেছে—তা-হলে বিলিয়ে দাও না। তবেই তো ল্যাঠা চুকে যায় !

শিলাদিত্য। দেব দেব, না-দিয়ে যে আর শান্তি পাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে এসব নিয়ে নিজেকে খাপ্-খাওয়াতে-ও-যে পাচ্ছি না। বিত্ত-বেসাত্ যা-আছে সবই তাই বিলিয়েই দেব। তবে কি জানো—কেবল পারব না দিতে একটি জিনিস—বলো তো সেটি কী ?

চন্দ্রা। সে আমি কী জানি ?

শিলাদিত্য। ও-গো—সে-জিনিসটি যে তুমিই (হাসি)

চন্দ্রা। (গম্ভীর-স্বরে) ও কী-কথা ? অমনি-সব বলবে তো আর এদিক মাড়াবই না।

শিলাদিত্য। শুধু বলছিলাম,—যা-ই বলো, কাউকে তোমায় প্রাণে ধ'রে দিতে পারব না।

চন্দ্রা। (স্বগত) লোকটা বানিয়ে বলছে না তো ?

(১ম অনুচরের সঙ্গে রাজার সাধারণ-বেশে প্রবেশ)

বিদর্ভরাজ। (শিলাদিত্যকে) কিন্তু বললেই তো হবে না। শুনছে কে ? আজ যে দেবারই বিলিয়ে-দিন। এ যে,—দেশের আহ্বান, দুর্গতের আহ্বান—দুর্ভিক্ষের দান-ভাণ্ডারে সকলকেই তো দিতে হবে। শিগ্‌গিরই যে দান-সংগ্রহের মিছিল বেরুচ্ছে।

শিলাদিত্য। (নমস্কারান্তে) কী সৌভাগ্য, দীনের কুটিরে আজ মহারাজের এত সত্বর সাক্ষাৎ পেলাম। যদি-বা তা পেলাম তো, আপনাকে পেলাম এ কেমন বেশে, আর পেলাম এই কোন্-আপনাকে ? রাজবেশ আপনার কোথায় ? কোথায় বা জাঁক-জমক ? আর, সঙ্গেও নেই যে সেই লোকলস্কর ! এ-আপনি যে একজন আমাদের মতোই সাধারণের একজন-মাত্র।—এঁকে তো আগে দেখিনি।

বিদর্ভরাজ। আগেও এই-আমাকেই দেখেছ—তবে দেখেছ সাজানো-রূপে। ঐ সাজেই তো আমরা ভিন্ন হয়ে তুমি-আমি ছিলাম দু'জন। নয়তো, মূলে কি আমরা প্রত্যেকেই সাধারণেরই-একজন নই? আজ রাজা সাজতে চাও তুমি, আর আমি সে-সাজ খুলে ফেলতে চাই—এই নিয়েই তো আমাদের ভূমিকার যা স্বাতন্ত্র্য। আমাদের জীবননাট্যের পরবর্তী-পর্বটা এই দু'জনের দুরকম-ভূমিকায় কেমন জমে, তাই এখন থেকে দেখা যাবে।—কী বলো?

শিলাদিত্য। কী যে বলেন মহারাজ! রাজার সঙ্গে সাজাসাজি কি আমাদের চলে? যুদ্ধে সেদিন এক-চালেই তো কিস্তিমাৎ হয়ে গেলাম!

বিদর্ভরাজ। আমিও তো এসব দেখেই সময় থাকতে চাল্-ব'দলে চল্‌ছি হে!

শিলাদিত্য। (সহাস্যে) কিন্তু এ-চালে আপনি এখন কোথাকার রাজা হবেন?

বিদর্ভরাজ। কেন,—হব মানুষের মনের-রাজা? আর,—রাজা হয়ে দরকারই-বা কী, যদি রাজা না-হয়েই বাইরে শুধু সাজটা একটু বদলে নিয়ে, কাজ দিয়ে মানুষের মনের-রাজ্যটা লুটে নিতে পারি!

শিলাদিত্য। (সোৎসাহে) আমিও যে মনে-মনে এই-রকমই কিছু-একটা পথের কথা ভাবছিলাম!

বিদর্ভরাজ। বেশ তো! ভালোই তো! শুনে খুব সুখী হলাম। এখন শীঘ্র ক'রে আগে সেরে-ওঠো দেখি। তা, যুদ্ধে আহত হয়ে এই রোগশয্যা-থেকে হঠাৎ কী ভেবে ডেকেছিলে, বলো তো।

শিলাদিত্য। কী আর বল্‌ব বলুন। শুনতে পেলাম, এবার দুর্ভিক্ষ দূর করতে নিজে আপনি রাজ্যব্যাপী দান-সংগ্রহের কাজে বেরুচ্ছেন। ডাক শুনে আমারও কেমন যেন মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। এই নিন্ মহারাজ,—আমার ঐ গুপ্তভাণ্ডারের চাবি। ভাণ্ডার আপনি দুর্গতের সেবায় সব বিলিয়ে দিন। তা না হলে আমারও যে আর শান্তি নেই।

(গুপ্ত-ভাণ্ডারের চাবি রাজার গ্রহণ)

বিদর্ভরাজ। সাধু, সাধু! অমাত্য, এতদিনে তবে স্বভাবের বদল ঘটল? যা-ই বলো, (সহাস্যে) এ-সবই বুঝি-বা ঐ (চন্দ্রাকে দেখাইয়া) কল্যাণীর কোমল হাতের সেবার জাদুতেই ঘটিয়েছে, কী বলো? ওকে কোথায় পেলে? আত্মীয়া হবে বুঝি? যাক্, দুজনে মিলে কুশলে থাকো। এবারে উঠি। (প্রণামান্তে একত্রে শিলাদিত্য ও চন্দ্রা উভয়ে রাজাকে বাহিরে আগাইয়া দিয়া আসিল। উভয়ে ফিরিয়া আসিতে-আসিতে—)

চন্দ্রা। বলো তো কর্তা, সারাক্ষণ এমনি কতদিন আর তোমার এসব রাজ্য-রাজার ভাবনা চলবে? খাওয়া-দাওয়াটাও যে ভুলে গেলে! সন্ধ্যা বয়ে যাচ্ছে! খাবার যে পড়ে আছে!

শিলাদিত্য। আর কিছু নয়, মাঝেমাঝে শুধু ভাবি, চন্দ্রা তুমি কী সুন্দর! শুধু সুন্দর নও, ওগো মেয়ে—তুমি কী সরলা! (উচ্চহাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! (স্বগত) রাজা, আরো-কিছুদিন সবুর করো, সবুর করো রাজা! তুমি জানো না তো—তোমার এই-চাল-ও যে কালের-ফেরে সব বেচাল হয়ে যাবে। (হাসি) হাঃ হাঃ হাঃ!

চন্দ্রা। এ আবার কেমন হাসি! শুনে-যে প্রাণের মধ্যে কোন্ সর্বনাশের আতঙ্ক জাগছে? তাই তো-! (শিলাদিত্যকে ভীতকণ্ঠে) বলি,—এই ভর-সন্ধ্যায় তোমাকে কর্তা ভূতে পেল না কি! এক-এক সময় ঘুমের মধ্যে যখন-তখন তুমি আজকাল "রানী, রানী" ক'রে কী-সব ব'লে ওঠো!

শিলাদিত্য। (চম্‌কানো কিন্তু তা গোপন করিয়া) কী যে বলো তার ঠিক নেই! পুরুষকে আবার ভূতে পায় নাকি? তুমিও তো তাহলে ভূতে-পাওয়া! এক-এক সময়ে চুপচাপ ব'সে একা-একা কী যে ভাবো! শত-ডাকেও তোমার সাড়া মিলে না! এগুলিই বা কিসের লক্ষণ? ভূতে-পাওয়া নয়-তো কী?—মহারাজার মেজাজ আর মতিগতিটা একটু বুঝে নিলাম মাত্র। ভাবনার ভূতটা এতেই ছেড়ে গেল যে!

চন্দ্রা। কিন্তু তোমার এসব দেখেশুনে যে ভাবনায় আবার আমার-গায়ে এই কাঁটা দিচ্ছে। তুমি ঐ যা-ই বলো-শুধু রাজা-রানীর নামটা ছাড়ো তো! ওতেই যেন কী অমঙ্গল লুকিয়ে আছে। এই তো একবার যুদ্ধ হয়ে গেল।

শিলাদিত্য। (উপহাস্যে) যত-সব বাজে কথা!—ও-সব কিছু নয়—মেয়েরা চিরকালই কলাগাছে ভূত দেখে থাকে! চলো চলো, ঘরে চলো—দেখবে ভয় কেটে গেছে।

চন্দ্রা। তাই চলো!—কী জান? কিন্তু (উদ্বেগে)—কিন্তু, রানী কে গো?

শিলাদিত্য। (চলিতে চলিতে) রানী?—, কোথাকার কে তা আমি কেমন করে বলব! এ তো ভারি ফ্যাসাদ হল দেখছি! কী?—সন্দেহ? তুমিই না-হয় ভেবে নাও একটা-কিছু—না-হলে তো তোমার ঘুম হবে না দেখছি! এক-একজনের ওরকম এক-একটা বাই থাকে বটে!—তবে, আর-যা-ই করো, বারবার আমাকে অমন 'কে গো' ব'লে জ্বালিয়ো না!

(প্রস্থান, পিছনে নীরবে চিন্তিতা-চন্দ্রার নত-শিরে চলা)

দৃশ্য ২

(বিদর্ভ-রাজপথ। মধ্যাহ্ন। দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাসংগ্রহে শোভাযাত্রার প্রবেশ। সর্বাগ্রে রহিয়াছেন রাজা-রানী। দুই জন সাধারণ-লোক ভিক্ষাবস্ত্রের চারকোণা ধরিয়া আছে। পিছনে জনতা গাহিতেছে—)

গান

জনতা। একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এককার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

(জয়ধ্বনি) জয় মহারাজের জয়।

বিদর্ভরাজ। (জনতাকে) ওরে, জয় আজ অন্য-কারো নয়,—জয় তোদেরই। এই দুর্ভিক্ষের-ভাণ্ডারও আর-কারো নয়, তোদেরই। তোদের জনতার-ভাণ্ডার তোদের হাত দিয়েই বিলি হবে।

জনতা। জয় মহারাজের জয়।

(বাদনরত ঢেঁড়াদারের প্রবেশ)

ঢেঁড়াদার। (ঘোষণা) বিদর্ভবাসী, সকলে শুনে নাও তোমরা,—পরশু-সকালে এই বারোয়ারি-বটতলাতেই অন্নদান-উৎসবে বারোয়ারি-চাল সবাইকেই বিতরণ করা হবে। রাজ-ঘোষণা এই যে, রাজ্যবাসী-সকলে এসে চাল নিয়ে যাবে।

(ঢেঁড়া-বাদকের প্রস্থান)

জনতা। জয়, জনতার জয়। (কুঞ্জের প্রবেশ)

বিদর্ভরাজ। (কুঞ্জ নিকটে আসিয়া রাজা-রানী-কে প্রণামের পর) এসো কুঞ্জলাল, দেখো এসে তোমাদের অন্নদান উৎসবের আয়োজন।

ঐন্দ্রিলা। (কুঞ্জলালকে) এসেছ? বড়ো খুশি হলাম। কিন্তু, তোমার বোন? তোমার বউ?—ওরা কোথায়?

কুঞ্জ। (নিষ্প্রভ নত-মুখে) বোন? ক'দিন ধরেই তাকে খুঁজেছিলাম। পাইনি (দীর্ঘশ্বাসে), আর, পেয়েই-বা কী হবে মা, যা-হবার তা তো হয়েই গেছে। আর কি ও ফিরে আসবে? সমাজও কি ওকে ঘরে নিতে দেবে? আর বউ? সে তার ছেলে-ছেলে করেই সারাক্ষণ পাগল!—আসবে এখুনি।

বিদর্ভরাজ। ছেলে?—ছেলে কোথায় পেলে?

কুঞ্জ। পথে-পাওয়া একটা রুগ্ন-অনাথ ছেলেকে ঘরে এনে সে পুষছিল। আবার পথেই একদিন তেমনি সে তাকে হারিয়েও ফেলল। হারাল, না, ছেলেটা পালিয়েই গেল,—কী যে হল, কে জানে! এখন, সে বেঁচে আছে কিনা—তাও তো সন্দেহ।—হয়তো মরেই গেছে!

(আলুথালু-বেশে মানদার প্রবেশ)

মানদা। (কুঞ্জকে; কী বললে?—মরে গেছে?—ছেলে তবে আমার বেঁচে নেই? তুমিও বলছ নেই? আর কি তবে আমার কাছে সে আসবে না? কার ছেলে ঘরে এনে এ কী করলাম গো!

(সামনে দুইহাত বাড়াইয়া মানদা ছুটিয়া বাহিরে যাইতে অগ্রসর হইলে—তখনই ক্ষ্যাপাচাঁদ মানদার পালিত-ছেলে হারুকে হাতে ধরিয়া লইয়া আসিয়া মানদার দিকে তাহাকে ঠেলিয়া-দিয়া)

ক্ষ্যাপাচাঁদ।—এই-যে (সস্নেহে) না-ও গো, মাসি!—ছেলে তোমার মরেনি গো মরেনি।

গান

মরলে কি আর বাঁচে ছেলে,—সোজা কথাটা ধর্—
বাঁচ্‌ল যে সে মরণ ঠেলে,—এই নিয়ে যা ঘর।

('মাসি, মাসি' বলিয়া হারু ছুটিয়া গিয়া মানদাকে জড়াইয়া ধরিল)

মানদা। (হারুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া) বাছা! বাছারে আমার!

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (মানদাকে) ছেলে ফেলে যাস্ পথের কোলে,—ছেলেটাও তার রাগ কি ভোলে?

ভুলিয়ে তাকে নানান্ বোলে (আমায়) প্রভু দেন খবর।
চালচুলো নেই খাবারও নেই, ভিখ্ মেলে না কোনোখানেই,
চলছে তখন ক'টা-দিন সেই কী জ্যান্তে-কবর!
ছেলেটাকে তো নিজেরই ঠাঁই দিলাম রেখে ক'দিন যে তাই,
কোনোমতে-বা দিনটা কাটাই, (শুধু)—প্রভুজী নির্ভর।

মানদা। তোমরা তো ওর আপন-কেউ নও, এই টানের দিনে পরের থেকেও পর হয়ে তোমরা যা করলে!—ভগবান তোমাদের ভালো করুন।

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (মানদাকে) মানুষ দেখে মানুষেরে,—পর হলেই কি পর? নোস্ তো মা তুই, 'মাসি' যে-রে (তবে কেন তোর ঐ) চোখে ঝরে নির্ঝর? চল্ মা, এবার ঘরে চল্ সত্বর (থলি উজাড় করিয়া খুদ-কুঁড়া সব রাজার ভিক্ষা-বস্ত্রের ঢালিয়া দেওয়া)

(নির্মাল্য-হাতে সুবন্ধুর প্রবেশ)

সুবন্ধু। (সহাস্যে) যেখানে দীনদরিদ্র-সবাই এসে মেলে, সেই দরাজ-জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছে সবাই। দেশের ভিক্ষাভাণ্ডারে ঐ যে আজ ভিখারীও তার দিন-ভিক্ষার খুদকুঁড়োটুকু-পর্যন্ত থলি উজাড় করে দিল। একমন হয়ে সবাই সব দিচ্ছে, আমার আর কী আছে কীইবা দেব, আমি বয়ে এনেছি দেব—আশীর্বাদী এই পূজানির্মাল্য! তাই দিলাম। (ভিক্ষাবস্ত্রে নির্মাল্য দান। ঐ সঙ্গে নানা-জনেরও নানা-দ্রব্য দান)

(ক্ষ্যাপাচাঁদ-বাদে সকলের প্রস্থান)

ক্ষ্যাপাচাঁদ। বেরিয়েছিলাম ভিক্ষায়, এখন যাই কোথায়! যাক্—সুখবর যে, শিগ্‌গিরই সকলের অন্নের-দায়টা মিটতে যাচ্ছে। (মহাজন সংকোচে অথচ সাগ্রহে আগাইয়া ক্ষ্যাপাচাঁদকে)

মহাজন। দাদা, সকলেরই তো সব হল।—এখন আমার কী করবে বলো।

ক্ষ্যাপাচাঁদ। সে কী হে, কী বলছ? আমি আবার তোমার কী করব?

মহাজন। আমি চাল চাইনে, আমাকে শুধু একটা ছেলে বা মেয়ে দাও।

ক্ষ্যাপাচাঁদ। বলো কী হে, অর্থ ছেড়ে এখন যে অনর্থ ধরেছ। কী চাইছ?—একটা সন্তান? তুমিই-না মানুষের ছেলেমেয়ে দু'চক্ষে দেখতে পারতে না? আমি সন্তান দেব কী হে? আমি কি ভগবান? আর, দেখছ না—সংসারে বেশি-ছেলেমেয়ে, আমদানি ক'রে ঘরে-ঘরে এখন কী দশা দাঁড়াচ্ছে, এতে যে সব ভুখা-ভগবানেরই-দল বাড়ছে।

মহাজন। তা বাড়ুক। আমার হিসেব উল্টে গেছে,—সবারই কি সব-সময় সব-কাজকারবার এক-হিসেবে চলে?—ওসব রাখো-তো! এখন সবাই যে বলছে,—কার মরা-ছেলেও নাকি তুমি বাঁচিয়ে দিয়েছ। আমাকেও দাও অমনি একটা, তা,—কানা খোঁড়া যা-হোক। 'মা'-ডাকতে পারলেই হোলো।

ক্ষ্যাপাচাঁদ। দুর্-দুর্! মানুষের ওসব বাজে-কথা। শোনো কেন? তবে মরা নয় জ্যান্তই একটা অনাথ-ছেলেকে পথ থেকে তুলে নিয়ে একদিন আমার আখ্‌ড়ায় রেখে দেন—আমাদের প্রভুজী।—ঘটনাটা তো হল মূলে এই।—ছেড়ে দাও ওসব। এখন বলো তো তোমার ব্যবসাটা কেমন চলছে?

মহাজন। চুলোয় যাক্ ব্যবসা। তোমার দুটি-পায়ে পড়ি, মন যে মানছে না দাদা; তা, তোমরা তো মন্ত্রতন্ত্র করন-কারণ, তুকফুক কত-কী-না জান। যাগযজ্ঞ, পুজোআর্চা, যা-হয় একটা-কিছু আমাদের দু'জনের নামে শুরু করে দাও।—শুধু একটা

ছেলের জন্য। তা না-হলে বউটা যে মরেই যাবে।—মিথ্যা বলছি না—বউটা আমার নির্ঘাৎ মরেই যাবে গো। বউ-টা যদি না-ই রইল, আমি আর বেঁচে থাকব কী নিয়ে আর, কেমন ক'রে? বার-বার—এই ব'লে গেলাম। (প্রস্থান)

ক্ষ্যাপাচাঁদ। ভালো ঝঞ্ঝাটই হল দেখছি! আমি-বা কোথাকার কে। উদাসীন এক ভিখারী, ভিক্ষামাত্র যার সার,—আমার কাছেও লোক আসছে ভিখিরি হয়ে? এখন আমার ভুখ্ নিয়ে আমি যাই কোথায়?

(সনৃত্য-গান)

ভোগ-আরতি স্তুতি-নতি জানি না করণ-কারণ,
মনের পাখি, শূন্যে থাকি' জানো না কি—কী চায় মন!
নাই-কো দেউল নাই-কো দ্বারী, মন্ত্রতন্ত্র নাই পূজারী,
প্রদীপ-জ্বালা, পুষ্পমালা, নাই কোনো রত্নাভরণ॥
মন্দ-ভালোয়, আঁধার আলোয় শুনি নূপুর-গুঞ্জরণ,
ভুবন-ভরি' মরি-মরি!—সবখানেই যে বৃন্দাবন!
যখন যেথায় যেমন থাকি, তখন তোমায় তেমনি ডাকি,
কান্নাহাসি বাজায় বাঁশি, নাই যে বোধন-বিসর্জন॥
হায়-গো প্রথম থেকে রইলে বেঁকে ফিরে-ও না ফেরাও নয়ন,
প্রাণের পাখি, ক'দিন বাকি?—আসে যে শেষ বাসর-শয়ন।
তখন তোমার অপেক্ষাতে ফিরব না আর দিনে-রাতে,
শূন্যে দোঁহে সমারোহে (অনন্তে) মিলে' করব সন্তরণ॥

(আনন্দে-আশঙ্কায়, আশা ও নিরাশায়, সন্দেহ ও শ্রদ্ধায় দোমনা-মহাজনের খুব-সন্তর্পণে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে-মারিতে পা-টিপিয়া পুনঃ-প্রবেশ)

মহাজন। (হাসিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ—! ধরে ফেলেছি দাদা—আজ সব ধরে ফেলেছি,—আর তো ধোঁকা দিতে পারবে না! জয় দাদা, জয় দাদা! (ক্ষ্যাপাচাঁদের পায়ে মাথা-ঠোকা)

ক্ষ্যাপাচাঁদ। আরে, আরে,—কী হল? এই চলে গেলে আর এরই মধ্যে চলে এসে—এ সব কী হচ্ছে? পাগল হয়ে গেলে না কি?

মহাজন। ওগো যখন হয়, তখন এমনি ক'রে মুহূর্তেই সব হয় কিনা! সত্যি,—বলো তো, এতক্ষণ তুমি কী করছিলে? ওই গান কাকে শোনাচ্ছিলে? ওই নাচও তোমার কাকে দেখাচ্ছিলে? বলি,—তুমি-মানুষটা কি এই জগতে ছিলে?

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (হাসিয়া) হয়েছে! এ যে দেখছি বদ্ধ-পাগল!—কী বলছে তার ঠিক নেই।

মহাজন। সে কী!—সোজা-কথাটা বুঝছ না? তোমার যেমন ঐ মনের-পাখি, তেমনি একটা-কিছু নিয়ে মনে হয় আমরাও মেতে থাকি! যার কাছে যত কেষ্ট-বিষ্টু-মহেশ্বর থাকুন,—আমাদের ঘরে ভগবানের ভাবময় মূর্তিটি হয়ে আছেন ঐ একটি শিশু-বস্তুই। ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান-বাঁচামরাও যত তাকে নিয়েই। আর, তার জন্যই তো এত ক'রে—আচ্ছা. দাদা, তোমাদের সেই সাধুবাবা কোথায়? তাঁকে একবার ধরা যায় না? দাদা, কী যে বলব! ঘরের মেয়ে-লোকটা যে আমার বাছুর-হারা বোবা-গাভীর মতো ব'সে কেবল চোখের জলই ফেলছে গো! খায় না, দায় না, যত-না সাধাসাধি করি,—বিছানাতেই শুধু পড়েই থাকে, ভাবছি শেষে বেচারীর মাথাটাই-না খারাপ হয়ে যায়। একবার যদি প্রভুর—

(সাধুজীর প্রবেশ)

সাধুজী। (মহাজনকে) এইতো!—ওহে মহাজন, তুমি এখানে? ওদিকে, সবাই যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! জানো-না? দুর্ভিক্ষের-মিছিল বেরিয়েছে যে। তুমি এত বড়ো-মহাজন, তুমি তাতে কিছু দেবে না?

মহাজন। বাবা, (ক্ষ্যাপাচাঁদকে দেখাইয়া) আর আমি নই মহাজন! মহাজন হচ্ছে আমার ঐ ক্ষ্যাপা-দাদা, আমার সব-কিছু এখন ওরই। আমি ভিখিরি হয়েছি একটি বংশধর দেখে যেতে। (সাধুজীর পায়ে পড়িয়া থাকিয়া) এই আমি প্রভু তোমার পায়ে প'ড়ে রইলাম—যা হয় করো বাবা!

সাধুজী। তুমি তো শুনবে না, শুনলেও মানবে না,—যা বলছি যদি করো, তোমরা দু'জনেই শান্তি পাবে। যত চাল জমিয়েছ, রাজ্যের শিশুদের জন্য সে সব রাজার দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে দিয়ে দাও গে। শিশুরা বাঁচবে, তোমরাও সন্তানের ক্ষুধার দুঃখ অনেকটা তাতেই ভুলতে পারবে। ঠাকুরের ভাবমূর্তি তো ওরাই।

মহাজন। ঠিক বলছেন প্রভু? মনে পড়ছে—সেই-কবে-একদিন এক সাঁঝে পথের এক ভিখারিনী নিজের ছেলেটিকে আকালে বাঁচাবার জন্যে পায়ে ধ'রে কেঁদে কত সাধ্য-সাধনাই না করেছিল! ছেলেটাকে আমাদের সেধেছিল—ঘরে নিয়ে আসতে। আমি তাকে পায়ে ঠেলে-ফেলে চলে এসেছিলাম। তখন কি জানি—সন্তান কী-বস্তু! তখন, ব্যবসা নিয়েই যে মেতেছিলাম! আজ সেই ভিখারিণীর কান্নাই বুকে বাজছে-গো! যা গেছে তার-তো আর কিছু করবার নেই। এখন যা করতে পারি তা করতে আর কসুর করব না প্রভু! ("জয়গুরু—জয়গুরু" বলিয়া সাধুকে আর ক্ষ্যাপাচাঁদ-কে প্রণাম করিয়া তাহাদের সহিত প্রস্থান)

দৃশ্য ৩

[সন্ধ্যা। শিলাদিত্যের গৃহ]

(অনুচর-১ ও চন্দ্রা)

অনুচর ১। (শঙ্কা ও উদ্বেগে) তুমি যেখান থেকেই লুট হয়ে এখানে এসে থাকো না,—সেবাযত্ন ক'রে কর্তাকে যুদ্ধের ক্ষত থেকে তো দিদি তুমিই বাঁচিয়ে তুললে,—সে তো আমরা বিলক্ষণ জানি। অমাত্য-শিলাদিত্যের নিজে রাজা-হওয়া নিয়ে দিনরাত এত যে যুদ্ধ, সেটা তো মিটে-ই গেল। বলতে পার,—এবারে কর্তার মতিগতি কী হবে ?

চন্দ্রা। আমি কে ! আমি আবার কী বলব ? কেউ কি আমাকে কিছু বলে, না, আমি কাউকে কিছু বলি ?

অনুচর ১। কিছুই জানো না ? দুজনে বলাবলিও কিছু হয় না ? সে আবার কেমনতরো ? তবু তুমি পড়ে আছ তার কাছেই ? সে যে এদিকে এ-দেশ ছেড়ে চলে যাবার দিন গুনছে গো ?

চন্দ্রা। যাবে তো যাক্ না।—তুমি কোথায় শুনলে?

অনুচর ১। সে যে সেদিন নিজেই আমাদের এ-কথা বললে কিনা ! এক-জায়গায় আমরা সকলে একত্রে পড়ে আছি, একই ভাগ্য নিয়ে। এতদিন থাকতে-থাকতে পরস্পর আমরা আমাদের একে-ওকে নানা দরকারের বেলায় দেখ্‌ছি তো দিনরাত। দেখতে- দেখতে তোমার উপর কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। তুমি তার জন্য এত করছ, সে তোমার জন্য কী করল,—জানবে না ? কিছু ব্যবস্থাই যদি না ক'রে চলে যায় তাহলে তখন তুমি কী করবে ? তোমার ভবিষ্যৎ ?

চন্দ্রা। তার জন্য কী-এমন করছি তা তো জানি না ! একটা মানুষ সারা-গায়ে-তার পচা ঘা নিয়ে চোখের উপর মরতে বসেছিল, তাই ক'দিন তার কাছে-কাছে থাকছি-মাত্র।

অনুচর ১। তা না-থেকে তুমি স্থির থাকবেই-বা কী ক'রে ! তোমাদের ভাইবোনের যে দয়াধর্মের ধাত্। দেখেছি তো তোমার দাদাকে ! তারও যে সেবাঅন্তপ্রাণ ! যাক্, তুমি অমাত্যকে ব'লে যা-হয় ব্যবস্থা একটা করে নিয়ো।

(প্রস্থান)

(চন্দ্রার পায়চারি-করা)

গান

চন্দ্রা। চলেছি কোথায় !—

কারে ডাকি চেয়ে থাকি, কেবা ফিরে চায় !

কী করেছি অপরাধ, ঘুচালে ঘরের সাধ,

কেন যে কাঁটার-ফাঁদ ঘিরে দিলে পায় ॥

নাই চেনা নাই জানা কারে বা জানাই।

নিজেরে বুঝাই নানা,—দিশা যে না পাই ॥

সাঁঝের আঁধার-ঘোরে আলো জ্বলে দোরে-দোরে,

ভাসানো-পিদিম ঘোরে নদীর সোঁতায় ॥

(ম্লান-হাস্যে-উক্তিরত শিলাদিত্যের প্রবেশ)

শিলাদিত্য। কেমন আছ ? তুমি কি জানো, ?—আমার তো শেষ হয়ে এল। এখানে আর ভালো লাগছে না ! এবার স্বদেশেই ফিরব। তাই, তোমার কথাটা ভাবছিলাম। সঙ্গে যাবে ? না, এখানেই থাকতে চাও ?

চন্দ্রা। আমার বলার কী আছে ? সবই তো তোমার ইচ্ছা ! ঘরের পাট তো চুকেছে,—এখন যাব আর কোথায় ?

(উক্তিরত উত্তেজিত-ছেলেধরার প্রবেশ)

ছেলেধরা। (চন্দ্রাকে) কেন ?—যাবে তোমরা যমের ঘরে ! (শিলাদিত্যকে) তার আগে আমাদের গরীব-গরবারদের পাওনাটা দিয়ে যাও দেখি, দাদা !

শিলাদিত্য। (সক্রোধে) কে তুই ? কী ক'রে তুই এখানে এলি ? কেন এলি ?

ছেলেধরা। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঘরে যা আছে শিগ্‌গির দিয়ে দাও। সুধোচ্ছ—কে আমি ? ওগো, আমি যে—তোমারই ছোট-ভাই ! চুরি-ডাকাতির বড়ো-বিদ্যায় হাত-পাকিয়ে বড়ো হয়েছ দাদা, রাজ্যের-সম্পদ জমিয়েছ তুমিও। আমাদের কি আর অত হিম্মত আছে, তাই যখন যে-সুবিধে পাই—না না, কথার প্যাঁচ এখন ছেড়ে ছাড়া-পাবার টাকাটা শীঘ্র নিয়ে এসো দেখি। এত সম্পদ রাজার-দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে যে বিলোতে পারে সে এত শীঘ্রই কি ফতুর হয় ? সময় নেই। রাজার প্রহরী যে দিনরাত পিছনে-পিছনে আমাকে তাড়া করে ফিরছে ! এখুনি এসে ধ'রে নেবে ! আমাকে মরতে হবে, কিন্তু তোমাকেও বাঁচতে দেব না তো। (আগানো)

চন্দ্রা। (ছেলেধরাকে) ওগো, ওকে ছেড়ে আমাকে মারো।

ছেলেধরা। তোমাকে মেরে ফায়দা কী হবে? যারা আমাদের হাতে-ভাতে মারছে তাদেরই আমরা এই হাতে এমনি ক'রে কুপিয়ে-কুপিয়ে মারব। (পকেট হইতে হঠাৎ ছোরা বাহির করিয়া শিলাদিত্যকে আক্রমণে উদ্যত—শিলাদিত্য খপ্ করিয়া ছেলেধরার হাত ধরিয়া ও তাহা মোচ্ড়াইয়া দিয়া ছোরা কাড়িয়া লইল এবং ছোরার মুখে ছেলেধরাকে রাখিয়া শাসাইতে লাগিল) কেমন?—হোলো-তো? ভেবেছিলে কত-কিছুই-না লুটে নেবে, এবার তোমাকেই লুটে-নেবার লোক আসছে দেখো!—কে আছিস? (সশস্ত্র অনুচরদ্বয়ের প্রবেশ) ব্যাটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহরীর হাতে দিয়ে আয়। বলবি, চুরি করতে এসে ধরা পড়েছে। আর শেষে ধরা প'ড়ে গিয়ে বাড়ির লোকদের খুন ক'রে পালাতে যাচ্ছিল।

ছেলেধরা। (কৃত্রিম-খেদে শিলাদিত্যকে) তা-হলে, কী আর বলি! যাক্, যা হবার তা হোলো। বুঝেছি,—কপাল নিতান্তই মন্দ। আকালে বউ-ছেলে ম'রে গেছে; মন্দিরে ঠাকুরের যে পেসাদটুকু জুটত, আকালে ভাগ্যে তা-ও টিকে রইল না। এখন হুজুর, আপনার প্রসাদই ভরসা।

শিলাদিত্য। (ক্রোধে) পাবে, সে-প্রসাদই পাবে! চিন্তা নাই, তারই তো পাকা ব্যবস্থা করছি! দোরে-দোরে আর ঘুরতে হবে না। রাজ-প্রসাদই মিলবে—তবে কয়েক-বছরের জন্যে, না, যাবজ্জীবন, তা, বলতে পারিনে। ওরে, দেখ—

অনুচর ১। হুজুর, আদেশ করুন। কিন্তু এখানে এ-সময়ে (ছেলেধরাকে দেখাইয়া দিয়া সবিস্ময়ে সকৌতুকে) এটা এল আবার কোথা থেকে?

শিলাদিত্য। একে চেনো?

অনুচর ২। চিনি না?—বিলক্ষণ চিনি। এ-তো দাগী চোর—ছেলেধরা—পাড়ায়-পাড়ায় চুরি ক'রে বেড়ায়। আবার কেমন গোঁফ-দাড়ি পরেছে।—এই দেখুন! (ধরিয়া টান মারিতেই অনুচর-২-এর হাতে ছেলেধরার কৃত্রিম গোঁফ-দাড়ি উপড়াইয়া চলিয়া আসিল) থানায় তো ওর নাম লেখা রয়েছে। এ-সব আমাদের চেনা।—ও বিষ-দেওয়া-মোয়া খাইয়ে শিশু-চুরি ক'রে ফিরে। ওর ওই কাঁধের ভিক্ষার ঝুলিটায় এই-দেখুন সেই মোয়া রয়েছে (ঝুলি নিয়া ঝাড়িতেই কৌটা হইতে ক'টা মোয়া মাটিতে পড়িল)

ছেলেধরা। শিলাদিত্যের পায়ে পড়িয়া সকাতরে) হুজুর!—এবার বাঁচিয়ে দিন, হুজুর—প্রাণে মারবেন না—

শিলাদিত্য। (অনুচরদের প্রতি) ওকে নগরপালের হাতে দিয়ে এসো গে।—ব'লো চুরি করতে এসেছিল।

অনুচর ১। (ছেলেধরাকে বাঁধিয়া রুলের গুঁতা দিতে-দিতে) চল্ ব্যাটা,—চল্, এবার তবে তোর স্থায়ী-অস্তানাতেই চল্—

ছেলেধরা। (অনুচরদের সঙ্গে যাইতে-যাইতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ব্যাপার হেলো উল্টা,—ফলের আশায় হাত বাড়াতে উপ্‌ড়ে গেল মূলটা। দারিদ্র্যে আর দুরাদৃষ্টে জীবনটাকে পোড়ালো, ভেবেচিন্তে আর্জিটাকে করতে গেলাম জোরালো,—আঃ মোলো, এ কী হোলো,—তা—(খুশিতে) এ-বাজারে যা মিলেছে, মন্দ কী ভাই,—এই ভালো! দু-বেলা-তো খেতে পাব, তবু কী নিশ্চিন্দি! নিত্য ভুখার অগ্নি-শলায় দেবে না পেট বিন্ধি'! পাপের বেগার খেটে-খেটে, ইহকাল তো গেল কেটে,—পরকালের পারের মাঝি ভাইরে, প্রতিহারী—চলো, চলো, যেমন কর্ম (এখন) তেমনি জমাই পাড়ি। (অনুচরদের সঙ্গে প্রস্থান)

দৃশ্য ৪

[সকাল। বিদর্ভের রাজপথ]

(হারুর সঙ্গে মানদার প্রবেশ)

মানদা। (হারুকে আদর করিয়া) এখন থেকে বরাবর ঘরে থাকবি তো হারু—কোথাও আর যাবিনে কিন্তু!

হারু। না গো না, বলছি তো—তোর কাছেই থাকব। তবু তোর ভাবনা যায় না মাসি? এদিকে পথে এসেছিলেম ঢেঁড়া শুনতে!

মানদা। আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্—দিব্যি ক'রে বল্, না-ব'লে আর কক্ষনো বাড়ি ছেড়ে বা আমাকে না-জানিয়ে কোথাও যাবিনে! আমার সোনা, আমার নয়নমণি—আবার হারালে আর বাঁচব না রে!—তুই ছাড়া যে আমার কেউ নেই।

হারু। (অদূরে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ) কিন্তু মাসি, ওই কে আসছে?

নেপথ্যে। কে, কে? ও-কে? হারু না? (আলুথালু-বেশে দ্রুত সরলার প্রবেশ) আমার হারাধন!—তুই এখানে?

হারু। মা, মা, (সরলাকে গিয়া জড়াইয়া ধরা) এতদিন তুই-ই-বা কোথায় ছিলি মা? আমি তোকে যে কত খুঁজেছি!

মানদা। (তীব্র আক্রোশে ছুটিয়া আসিয়া) চলে আয় হারু, চলে আয় বলছি! কে-না-কে ও!

সরলা। (মনদাকে ধমক দিয়া) তুই কে? ছেলেকে-আমার এত যে চোখ রাঙাচ্ছিস, বলি কেন?—কেন?—দূরহ!

মানদা। (সক্রোধে) কী বললি? আমি কে? আমি যে হারুর মাসি? হারু, শুনছিস-নে? এখনো বল্‌ছি চলে আয়! ও-বেটি কোথাকার কে, জাত না বেজাত, কোনো ঠিক্‌ঠিকানা নেই, এসেছে মা-মাসি পাতাতে? ভেবেছিস কি তুই বল্‌লেই অমনি ছেলেকে ছেড়ে দেব? সরে আয় হারু, ও-যে.ডাইনি! ও-যে তোকে যাদু ক'রে ফেলবে। চলে আয়!—শিগগির।

সরলা। (হারুকে আরো শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া) কেন চলে যাবে? আমিই হচ্ছি ওর আসল মা! মার চেয়ে যে দেখছি আজ মাসির দরদ হল বেশী? ছেলে আমার। তুই তো আঁট্‌কুড়ি!—তুই তো নকল!

মানদা। তবে রে পোড়ারমুখী, ছেলে কী করে হল তোর? আঁটকুড়ি আমি? না, তুই—তা কে জানে?—ছেলে আমারই! (হারুকে লইয়া মানদা ও সরলার টানাটানি)

হারু। (উদ্বেগে) মা, মাসি!—তোরা দুজনে মিলে এ কী করছিস? শেষে ঝগড়া বাধিয়ে দিলি? (দুই হাতে দুই জনকে ঠেলিয়া দিয়া) সরে যা, সরে যা! (সরলা ও মানদার সরিয়া গিয়া বিক্ষোভে ফোঁসানো)

মানদা। (সরলাকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বলি, বড়ো যে ছেলে-ছেলে করছিস, ওলো, ছেলে কি তুই পেটে ধরেছিলি?—না, পথে পেয়েছিলি?

সরলা। পথে পাব কেন? পথে পেয়ে-থাকবি তো তুই। আমার ছেলে আমি পেটে ধরব-না না.কি, তুই ধরবি?

মানদা। (একটু থামিয়া থম্‌কিয়া স্বগত) তবে, হ্যাঁ, তাও তো সত্যি!—না, না—পেটে ধরলে তো কাছে-এঁটেই রাখতিস?

সরলা। পোড়াকপাল আমার! পেটের জ্বালাতেই যে একদিন শেষে আবার পথেই ফেলে দিয়ে এসেছিলাম! (চোখ মুছিয়া)

মানদা। (প্রতিক্রিয়ায় হকচকিয়া উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে) তাই কি? (অসহায়-কণ্ঠে স্বগত) এ-সব ও কী বলছে? (সরলাকে) ওগো, আমিও যে ওকে পথেই পেয়েছিলাম গো! উল্টো (কাঁদিয়া) দেখছি এখন, পোড়ারমুখী যে হলাম আমিই। (চোখে আঁচল দেওয়া) ও যে আমার কুড়ানো-মানিক!

(রাজারানী ও সুবন্ধুর সহিত কুঞ্জলালের প্রবেশ-মুখে)

কুঞ্জলাল। (নেপথ্য হইতে ডাকিতে ডাকিতে) বউ, বউ—আবার কোথায়

গেলি ? (রাজা-রানীকে) মহারাজ-মহারানী, বেলা হল যে, আপনারাও এখন ঘরে যান। পাড়ায়-পাড়ায় প্রজাদের ঘরে-ঘরে ঘুরে কত আর এখন তাদের খবর নেবেন! (অদূরে মানদা, হারু ও সরলাকে দেখিতে পাইয়া, মানদাকে) সে কি বউ, কে' এ৷ এখানে ? কী করছ ?—ঘরে চলো!

মানদা। ওগো, সর্বনাশ হয়ে গেছে। তুমি ঘরে যাও, আমি আর যেতে পারব না,—আমি এই পথে-পথেই একদিকে চলে যাব।

কুঞ্জলাল। কেন ? কী হল আবার ? (সরলাকে দেখিয়া) এ-ই বা কে ?

মানদা। (সরলাকে দেখাইয়া) ওযে বলছে, ও-ই নাকি হচ্ছে—হারুর মা!

ঐন্দ্রিলা। (মানদা ও সরলাকে মৃদুহাস্যে) ছেলে পেয়েও যে ছেলের ক্ষুধা তোমাদের মেটেই না দেখছি।

সরলা। (রানীকে) হারু যে আমারই ছেলে মা! (মানদাকে দেখাইয়া) ওকেই একবার জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন,—আর, এই ছেলেও যে আর আমাকে ছাড়ছে না। ঢেঁড়া শুনে আমিও এদিকে এসেছিলাম চালের খবরে—তাতেই তো ছেলেকেও পেয়ে গেলাম।

. বিদর্ভরাজ। তাই না কি ? আসছে-পরশু হবে অন্নদান-উৎসব। সেদিন উৎসব দেখতে এসো, বেশি ক'রে চালও সেদিনই নিয়ে যেয়ো।

সুবন্ধু। (সরলাকে) ভগবানের ইচ্ছায় দেখো, তাঁর এক-চালেই ছেলে আর চাল সবই তোমার একসঙ্গে মিলে গেল। এখন, তুমি-ও সরলা একটু ভেবে দেখো, ওই মানদা যে তোমার-মতো-ক'রেই সংকটের দিনে তোমার নিরাশ্রয়-ছেলেটাকে তার ঘরে নিয়ে এতদিন লালন-পালন করেছে; তাই,—মানদা মা না হোক, মাসি তো বটে ? এখনি ওর কাছ থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে গেলে সেটা কি—

সরলা। (একটু ভাবিয়া লইয়া মানদাকে) দিদি, আমার নিজের ভুখ্ দিয়ে সন্তানের-জন্য-মায়ের-দুঃখ যে তোমার না বুঝছি, এমন নয়। ছেলেকে আমি তো শুধু পেটেই ধরেছি, তুমি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছ, তা সত্যি বটে! মায়ের স্নেহ-পাবার-ভুখ্-ও ছেলের তুমিই এতদিন মিটিয়েছ।—এ-ছেলে তোমারই। তুমিই এ-কে রাখো। বরং, আমিই এসে-এসে ছেলেকে দেখে যাব। (রানীকে) মা, আমি তবে এবার ঘরে ফিরি!

ঐন্দ্রিলা। সে কী,—এখনি যাবে ?

সরলা। ঘরে যে মা, আরো ক'টা এমনি কাচ্চাবাচ্চা পথ চেয়ে আছে। তাদেরও তো দেখতে হবে!

মানদা। (সরলাকে) বোন, তুমি আমার আর-জন্মের বোনই হবে। যা হারু, মাকে প্রণাম করে আয়।

হারু। (মাকে প্রণামান্তে সজল-চোখে ধরা-গলায়) মা, আসিস কিন্তু! (চোখ-মোছা) না-এলে আমি থাকতে পারব না, তা ব'লে দিচ্ছি!

বিদর্ভরাজ। (সরলাকে) বাঁচালে মা! যে-সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তুমি যে এতটা মানিয়ে নিতে পারবে—ভাবতে পারিনি। (সরলার সলজ্জে নতমুখী-হওয়া। সুবন্ধুকে রাজা) দেখলে সখা, একটা সাধারণ-মেয়ে, তারও কী অসাধারণ মন?

সুবন্ধু। মহারাজ, সাধারণ-মেয়ে বলছ কাকে?—ও ভিখারিনী ব'লে? সাধারণ-অসাধারণ তোমার রাজ্যে সব আজ একাকার! আর, একজনের বিপদে আরেক-জনের প্রাণ-কেঁদে-ওঠা, এই-তো সমপ্রাণতা, সহানুভূতি! (রাজা, রানী, সুবন্ধুকে প্রণাম, মানদা ও কুঞ্জলালকে নমস্কার এবং হারুকে চুমা দিয়া সরলার প্রস্থান। সরলার প্রস্থান-পথের দিকে সকলেরই সজল-চোখে চাহিয়া-থাকা)

ঐন্দ্রিলা। (রাজাকে) দেখছ তো রাজা, ঘরে-ঘরে লোকের কী দুর্দশা! দুপুর পেরুল।—আর কত ঘুরবে?

বিদর্ভরাজ। তাই তো, আজ ভাবছি রানী, এতদিন ধ'রে কী-ভুলটাই না করেছি। যুদ্ধ জয় করেছি বটে! কিন্তু—প্রজাদের এই ছোটো-ছোটো জীবনযুদ্ধের দুর্দশাটা যদি তোমার কথামতো সেই আগে থেকেই এদের মধ্যে এসে, এমনি ক'রে একবারও দেখে নিতাম! (কোমরে দড়ি-বাঁধা জেলের-আসামী ছেলেধরাকে টানিয়া নিয়া চাবুকহাতে প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। (ছেলেধরাকে চাব্‌কাইয়া ধমকাইয়া) বেটা, হাঁটতে ভুলে গেছিস? এতটুকু পথ আসতে এতক্ষণ?

ছেলেধরা। (ক্লান্তি ও হতাশায় প্রহরীকে) বেলা দুপুর গড়ায়, তাতে একটু জল পর্যন্ত না খেয়ে এই খাটুনি! আর যে পারিনে বাবা! এখানে একটু বসে নিই!

প্রহরী। (ব্যঙ্গ) বেটার আয়েস দেখো-না! (সরোষে) খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্! দেখছিসনে, সবাই দাঁড়িয়ে আছে? তুই কোন্ নবাব-পুত্র এলি রে? (বারংবার চাব্‌কানো)

ছেলেধরা। (রাজাকে কাতরকণ্ঠে) হুজুর মা-বাপ,—সকাল থেকে কিছু খাইনি। তাতে,—

(গীতরত ক্ষ্যাপাচাঁদের প্রবেশ)

গান

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (ছেলেধরার প্রতি)

হায়, ভুখা-ভগবান!

বুঝি সে, আপন ফাঁদে আপনি কাঁদে কে রাখে সন্ধান॥

যারা জানে তারাই জানে, যে-যার-মতো বোঝায় মানে,
কথায় কী আর প্রবোধ মানে ক্ষুধিতের পরান?
সংসারে কি চলছে মেলা, এ-বেলা ভোজ, ভুখ্ ও-বেলা,
একদিকেতে খরার খেলা, আরেকদিকে বান,
যেখানে যা বাজুক্ তালি জ'মে ওঠে কুট-কচালি,
(যদি) ভগবানের ভাঁড়ার খালি,—তার কী সমাধান!
ভগবানের কী-কপাল! পারের-মাঝির এ কী হাল!—
খেটেখুটে সাঁঝ-সকাল পেটের নাই জোগান!
যতই বাড়ে পারাপার, পারানি মেলে না তার,
কতই দেখা চলে আর—ভাঁটা কি উজান!
আছে কি তার ঘরের লোক, আছে কি তার দুঃখশোক,
নাই কি গো তার যতই হোক,—মাথা-গোঁজার স্থান?
কোথাও যদি কিছুই নাই, (তবে) তারে কে আর দিচ্ছে ঠাঁই!
(শুধু) ভাবনা যা—ঐ, কোথায় পাই,—এমন মুশ্‌কিলের আসান?

হায়, ভুখা-ভগবান!

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (ছেলেধরাকে দেখাইয়া প্রহরীকে) প্রহরী,—সামনে অন্নদান-উৎসবের দিন আসছে। এসময় বেচারাকে তুমি ছেড়েই দাও বাবা! সকলের সঙ্গে ও-বেচারাও আজ একটু আনন্দ করুক-না।

প্রহরী। আজ্ঞে, এ যে ছেলেধরা!—এমন পাপিষ্ঠকে ছেড়ে দেব?

ঐন্দ্রিলা। —না, না, কেউ পাপিষ্ঠ নয় বাবা,—এও যে তোমার-আমার মতো একটি মানুষ—এও যে ভাব-মূর্তিতে আরেক ভুখা-ভগবান!—ভাবনা কী? তোমরা কি ভাবছ ভিতরের মূল-মানুষটা ওর একেবারেই মরে গেছে?

প্রহরী। ছেলেধরাকে ছেড়ে দেব?—এও কি হয়, মা?

ঐন্দ্রিলা। হয় গো হয়! ওগো প্রহরী, সামনে আসছে অন্নদান-উৎসবের মহাদিন; এই আনন্দের দিনে কাউকে যে ব্যথা দিতে নেই।

বিদর্ভরাজ। প্রার্থনা করি, ভগবান যেন ওকে মানুষের হুঁশ্‌টুকু একটি দিনের জন্য অন্তত একটি-বারও দেন।

প্রহরী। যে-আজ্ঞে। (ছেলেধরাকে ছাড়িয়া দেওয়া)

বিদর্ভরাজ। (স্মিতহাস্যে ছেলেধরাকে ব্যথিত-স্বরে) আর কী করবি, কোথায়-ই-বা যাবি হতভাগা! চল্, আমাদের-ঘরেই চল্। (রানীকে) বেলা হল রানী, নাও, ছেলেপিলে তো তোমারও কিছু নাই—তোমার ঐ 'ভুখা-ভগবান'টিকে নিয়ে গিয়ে আপাতত যা-হোক, দুটি খেতে দাও!—বেচারা যে ক্ষুধায় ধুঁকছে। (ছেলেধরা রাজার পায়ে পড়িতে যাইতেছিল—রাজা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন—ছেলেধরার দুই-চোখ বাহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল)

ঐন্দ্রিলা। (রাজাকে) কিন্তু, এদিকে চাল-বিলির-ব্যবস্থায় এসে আজ সকাল থেকে না-খেয়ে মহারাজ নিজেও যে একজন ভুখা হয়েই আছেন, তা কি মনে আছে?

বিদর্ভরাজ। (রহস্যের ইঙ্গিতমূলক দৃষ্টিতে রানীকে) ওগো, সে কি হয়? সকলকে না-খাইয়ে তুমিই কি রানী, কিছু খেতে পেরেছ?—আমার কথা ভাবতে হবে না।

ঐন্দ্রিলা। তবু, তুমি এখন চলো দেখি। (সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য ৫

[বিদর্ভ-রাজধানী। বটতলা। সন্ধ্যা]

(মহাজনের দ্রুতপ্রবেশ)

মহাজন। (ভীতত্রস্ত হইয়া প্রাণান্ত-চীৎকারে) বাঁচাও বাঁচাও—কে আছ-শিগ্‌গির বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! ওগো,—আমাকে এরা গুম্ করতে এসেছে। সরিয়ে নিয়ে আমাকে শেষে খুন করে ফেলবে গো—আমার কী হবে?

(সশস্ত্র অমাত্যদলের প্রবেশ)

জয়সেন। চুপেচাপে মজা ক'রে আগে-আগে দাদনের টাকা মেরেছ, এখন সাধু সেজে লোক ডেকে বলছ—'বাঁচাও, বাঁচাও'? (বলিতে বলিতে তরবারী উঁচাইয়া অমাত্যরা মহাজনের দিকে আগাইয়া আসিল। তাহাদের পিছনেই আবার মারমূর্তিতে উত্তেজিত সশস্ত্র জনতার প্রবেশ)।

জনতা। ধর্ ধর্, খুনীদের ধ'রে জ্যান্ত কেটে ফেল্। তবে রে নচ্ছারের দল! কই

কোথায় গেল শয়তানেরা !—দিনত্বপুরে ডাকাতি ?—আমরা থাকতে ? সাবধান !—এই যে ব্যাটাদের দেখছি—

(পথের দুইধারে মুখোমুখী-দাঁড়াইয়া পরস্পর-আক্রমণোদ্যত)

মহাজন। (স্বগত) এই ফাঁকে স'রে পড়ি বাবা! নইলে ব্যাটারা আমাকে ধরতে পারলে আর আস্ত রাখবে না! (তাকে-তাকে থাকিয়া ছুটিয়া পালানো) সুবন্ধু ও উদয়ভাস্করের প্রবেশ ও বিবদমান দুইদলের দিকে দুইহাত তুলিয়া দুইজনের উক্তি)

সুবন্ধু। ওহে, থামো, থামো। বলি, এসব কী হচ্ছে ?—

উদয়। এখুনি যে রাজার সৈন্যদল এসে পড়বে! (উভয়দলের দ্বন্দ্ববিরতি)।

সুবন্ধু। (সকলকে) একে তো ভুখের আগুনে দেশ জ্বলে ছারখার হচ্ছে, তার উপরে নিজেদের মধ্যে এই কাটাকাটি ?

জনতা। (অমাত্যদের দেখাইয়া) ঐ পাপিষ্ঠ বিদেশী-অমাত্যগুলো, আমাদের দেশ-থেকে চাল-পাচার করছে বিদেশে। এরা দেশবিদেশের চোর-ডাকাতের জোটের লোক—এদের কি কোনো-দেশের মানুষের জন্য কোনো মায়ামমতা আছে ? ওদের মায়া যে কেবল ঐ নিজেদের পুঁজির জন্য। ওদের আজ নিকেশ করব। তোমরা সরে যাও। সরে যাও। বাধা দিয়ো না! জেনো—যে ওদের বাঁচাতে আসবে আমরা আজ তাকেই মারব !

সুবন্ধু। তা তো বুঝলাম। এই-সব বিদেশী-অমাত্যদের এ-দেশের প্রতি মায়ামমতা নেই বলছ ? কিন্তু, ওদের মেরে-ফেলেই কি এদেশের জন্য ওদের মনে মায়ামমতা আনতে পারবে ?—না, হিংসার পথে হিংস্র হয়ে জোর-জুলুমে লড়তে গিয়ে নিজেরাই শেষে ওদের জাতের সামিল হয়ে যাবে তোমরাও,—সেটা একটু তলিয়ে দেখেছ কি ?

জনতা। (সক্রোধে) শুনব না, আমরা শুনব না। তোমাদের ওসব বাজে-কথা এখন রেখে দাও। দেশ থেকে ওদের তাড়িয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব।

সুবন্ধু। একই-মানুষ হলেও তো স্বভাবে সকলে সব-সময় সমান হয় না—ভাখো না, এদেরই আরেকজন,—এই যে অমাত্য-উদয়ভাস্কর,—শোনো, সে যে কী-আশ্চর্য-এক কাজ ক'রে এসেছে !—তবে সেই কাজটা—

জনতা। না, না, না,—উদয় হোক আর অস্তই হোক—এখন আমরা কিছুই শুনব না। যতই বলো, লুটপাটে ওরা-বিদেশীরা সবাই একজাত—আর—সে-জাতটি হচ্ছে বজ্জাত!

সুবন্ধু ও উদয়ভাস্কর। (জনতা ও অমাত্যদের মধ্যে গিয়া মাথা পাতিয়া দিয়া) আমরা বেঁচে থাকতে ওসব মারামারি চলবে না তো!

জনতা। (রক্তদৃষ্টিতে একে-একে অমাত্যদের প্রতি) যা, যা—হতভাগারা, খুব বেঁচে গেলি। মুশকিল ক'রে ফেললে কিনা আমাদের দেশের ঐ আমাদের আপনজন পুরোত-ঠাকুরটি আর তোদের-ও দেশের ঐ ক্ষুদে-অমাত্যটিতে মিলে'। তাইতো! এদেরো তবে দেখছি—দেশবিদেশ নেই—এরাও তবে সব-দেশেরই একরকমের এক-মতের এক-জাত! (অমাত্যদের প্রতি) কিন্তু সাবধান, আবার কোনো বেচাল দেখলে কারো বাধাই আর টিকবে না, দেখবে ঠিকই,—তোমাদের কারো ধড়ে আর মাথা থাকবে না,—মাথাটি থাকবে ঐ-(পথের ধুলার প্রতি ইঙ্গিত করা ও হঠাৎ সকলে সুবন্ধু-উদয়ের প্রতি ফিরিয়া) চলো, চলো তোমরা, এবার শুনব গিয়ে তোমাদের আশ্চর্য-কাণ্ডটা,—চলো চলো!

(অমাত্য শিলাদিত্যের প্রবেশ)

শিলাদিত্য। (সকলকে) কী হচ্ছে এখানে? বলি, এত লোকের ভীড়ই বা কেন?

জনতা। (একে-একে) অমাত্য শিলাদিত্য, যতই বলো, আমরা আর এদেশে থাকছি না—দেশেই চলে যাব। দেখছ না?—এখানে আমরা শুধু অবাঞ্ছিত নই, আমরা যে এদের চোখে এখন চোর-ডাকাত হয়ে গেছি! পথেঘাটে আমাদের এরা কুকুর-বেড়ালের মতো ক'রে তাড়া করে ফিরছে! তোমার সঙ্গে আমরা এদেশেরই ভালোর জন্যে কত-কী ভালো-ভালো কাজ করে চলছি—তা-তো তোমার অজানা নয়—কিন্তু আমরা এমন কী করেছি যে, তাড়া খেতে হবে?

(রহস্যের হাসিতে উক্তিরত-ক্ষ্যাপাচাঁদের প্রবেশ)

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (অমাত্যদের প্রতি কৃত্রিম-দরদে) ঠিক, ঠিক!—অন্যায়ই তো বটে। তোমাদের কুকুর-বেড়ালের মতো ভেবে তাড়া-করা! জানো কি?—এ-দেশের লোকের রুচিটাই ঐরকমের! তার জন্য তোমরা ক্ষোভ কোরো না। তবে ভেবে দেখো,—বিদেশে এসেছ দু'পয়সা কামাতেই তো? তা,—দিয়ে-থুয়েই তো ব্যবসাতে খেতে হয়। দিতে পারলে এখান থেকেই দেখো আবার নিতেও পারবে। সেই বুঝে পথটা একটু শোধন ক'রে নিয়ো। তবেই হবে—(শিলাদিত্যকে) কী বলো অমাত্য?

শিলাদিত্য। (কৃত্রিম-উৎসাহে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! এই তো ঠিক কথা। আমিও তো তাই বলি! এ দেশের এই সংকটের সময় সবারই একটু বুকে

চলা উচিত। যেখানে এসে পড়েছ, সে-দেশের ভালোমন্দটাই তো আগে দেখে চলতে হয়! দেখো-না, তাই তো, মহারাজের হাতে আগে-থেকেই আমি দুর্ভিক্ষের অন্নদান-ভাণ্ডারে সবকিছু আমার বিলিয়ে দিয়েছি।

গান

ক্ষ্যাপাচাঁদ। মতে-মতে কথা হ'তে মাতামাতি,—শেষে রণ!
দাদা, বহু হল বাঁকা-পথে,—সোজাতে এসো এখন॥
হাতে-হাতে লাঠি-সোটা মাথা নিতে পিছু-ছোটা!
বনের স্বভাব ওটা,—মনে আনো কী-কারণ?
মানুষের মন ও-যে মমতার মধুবন,
ব্যথিত সেথায় খোঁজে সমব্যথী-পরশন।
মেরে নয়, নাও জিতে, দেখাও এ-পৃথিবীতে—
বিরোধীরে ক'রে মিতে জিতে-নেওয়া সে-কেমন!
(রাজা-বাদশাহদের ক'রে দিয়ে বিতাড়ন—
'কোতল্') নয় কি ফের বাদশাহী-আচরণ?
পার শুধু প্রাণ নিতে!—পার প্রাণ ফিরে দিতে?
তবে মানুষের এ-অহিতে কেন এত উন্মাদন?
যাকে মারো জনতারও সে-যে হয় একজন,
বাঁচার বিধান তারও রয়েছে তো আমরণ।
আছে তারো জরু-গরু বালবাচ্চা তৃণতরু,
হবে-যে শ্মশান-মরু এক-বিনে (তার) ত্রিভুবন!
আসলে, ক্ষমতার দাপাদাপি! - তাই-তো এ অঘটন।
মান নিয়ে মাপামাপি,—কত উঁচু কার আসন!
শিশু কাঁদে মা'র পিছু তাতে কি সে হয় নীচু?
মানামান নাই কিছু যেখানে মিলে আপন॥
বড়োদের এই ধারা!—বাকি যারা অভাজন
রয় প'ড়ে সর্বহারা পারে যেথা যে-যেমন।
তারা চায় বেঁচে-থাকা, কোনো-মতে লাজ-রাখা,
জানে-যে নছিব বাঁকা, (তাই তারা) চায় না অনেক ধন॥
অন্ন নেই, (এদিকে) শুধু শোনা—'সবুরে মেওয়া-ফলন',—
দোরে-দোরে আনাগোনা, (তাদের) হল এ-যে অসহন!

(পানীয়ের থালাহাতে সুসজ্জিতা চন্দ্রার প্রবেশ)

শিলাদিত্য। এসো চন্দ্রা। সেদিন এত ক'রে এঁরই কথা তোমাকে বলেছিলাম —আজ আমাদের এই ভাস্কর-দাদারই জয়োৎসব। দেখো, আসরটা জমে যেন। ওকে আগে সরবৎ দিয়ে নাও।

(সকলকে চন্দ্রার পানীয়-পরিবেশন)

যুধাজিৎ। এবারে একটি গান ধরো দেখি। অতিথির মনটিকে একেবারে রসিয়ে-থিতিয়ে বসিয়ে দেবে, সে যেন আজ আর উঠে-যাবার নাম না করে। বুঝেছ তো ?

চন্দ্রা। (নতমস্তকে) যে আজ্ঞে হুজুর !

গান (স-নৃত্য)

দেখা যদি হল বঁধু, চেয়ে দেখো-না,—
কাছে তো যাব না, তবে কী-বা ভাবনা ॥
জনম-জনম ভ'রে পথে-পথে দোরে-দোরে
চলেছে স্বপন-ঘোরে কী-আনাগোনা,—
মন বলে, এই তো রে,—মনের সোনা ॥
পাতিয়া রূপের ফাঁদ আসিনি ধরিতে চাঁদ,
দেখা হতে সাধে বাদ চোখের কোনা ;
চোখ ভ'রে আসে জলে কী জানাব কী যে ব'লে,—
পাই না যতই গোলে যত বেদনা,—
মরমে মরিবে জ্ব'লে মনোবাসনা ।।
আজ এ যে হল দেখা, পড়ে থেকে একা-একা—
দিন যাবে, ফুরাবে না এ-দিন-গোনা,
আর হবে মনে-মনে আসন-বোনা,—
তবে দেখো !—আনমনে মনে হোলে,—মনে রেখো না ।।

যুধাজিৎ। (উচ্ছ্বাসে) বাঃ বাঃ, ধরো দেখি এমনি আরেকটা নাচের গান।

উদয়। এ গানের পরে নাচ ? রাত হয়েছে, ওকে অন্ততঃ নাচের থেকে ছুটি দাও। এর পরে নাচতে বললে ওর প্রতি অবিচার হবে। ও ভাববে— আমরা অরসিক।

যুধাজিৎ। (উদয়কে সহাস্যে) তবে,—মজেছ ? আচ্ছা যাও চন্দ্রা, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করো গে। তারপরে আমাদের ডেকে নিয়ে যেয়ো।

(নমস্কারান্তে চন্দ্রার প্রস্থান)

উদয়। এই তো হোলো! আবার কী?--আসি তবে।

শিলাদিত্য। এখনই 'আসি' কী হে?—আজ যে রাতটা তোমায় এখানেই কাটাতে হবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে, ব'সে-ব'সে একটু গল্প-গুজব করব না? তার-পরে তাও কি ভুলে গেলে!—তোমার চন্দ্রাও যে হে, আছে রাত জেগে! এতদিন তো যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে কী-গোলমালেই-না কাটল! কাল আবার চাল-বিলোবার মহোৎসব।

যুধাজিৎ। যা করেছ ভাই, দেখো-না, তোমাকেই কাল মহারাজ তাঁর মনের খুশিতে তোমার গৌরব বাড়াতে গিয়ে রাজা খেতাবই-না দিয়ে বসেন!

(অনুচরের সহিত সুবন্ধুব প্রবেশ, অনুচরের প্রস্থান)

সুবন্ধু। ঠিক বলেছেন অমাত্য। মহারাজ সেজন্যেই আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে পাঠালেন এই মহোৎসবে আপনাদের সাদর-আমন্ত্রণ জানাতে। আপনারা অমাত্যবর্গ অবশ্যই তাতে যোগদান করবেন। এই তাঁর একান্ত ইচ্ছা।

শিলাদিত্য। অতি আনন্দের কথা,—নিশ্চয়ই যাব! মহারাজকে আমাদের অভিবাদন জানাবেন পুরোহিত। আমরা তাঁর আমন্ত্রণে ধন্য হয়েছি, আমরাও এতে গৌরব বোধ করছি। ভাস্কর তো আমাদের মাথার মণি। দেখুন-না, আমরাও ওকে আজ বরণ করতে এখানে ডেকে এনেছি।

সুবন্ধু। শুনে খুশি হলাম,—এও আপনাদের সৌভ্রাত্র আর মহত্বেরই এক পরিচয়। আচ্ছা, এবারে চলি।

(চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। (যুধাজিতকে) অমাত্য, আহার প্রস্তুত।

শিলাদিত্য। তাহলে এসো যুধাজিৎ, পুরোহিতকে আমরা সদর-দ্বারে পৌঁছে দিয়ে আসি। চন্দ্রা, তুমি ভাস্করকে দেখো, ও-তো তোমার গানের একজন সমজদার হয়ে পড়েছে দেখছি, আমরা ফিরে আসতে-আসতে ওকে আরো দু'একটা গান শুনিয়ে দাও-না।

(সুবন্ধুকে লইয়া শিলাদিত্য ও যুধাজিতের প্রস্থান)

উদয়। চন্দ্রা, তুমি শুধু সুন্দর নও, বড়ো সুন্দর ক'রে গানটি গাইলে। ইচ্ছা হয়, তোমাকে সব দিয়ে ফেলি,—কিন্তু সঙ্গে আজ তো আমারও কিছু নেই,—সবই যে দেশের দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে দিতে মহারাজের হাতে তুলে দিয়েছি। তুমি আমার মনের খুশিটুকুই আজ নাও।

চন্দ্রা। (নতমস্তকে) অমাত্য, খেতে না-পেয়ে পরিচারিকা হয়েছি,—নাচ-গান দিয়ে নটীর কাজও আজ করতে হচ্ছে। যত ছোটোই হই, তা ব'লে আপনার এই খুশির মূল্য কি আমি জানি না?—কিন্তু এত সৌভাগ্য, ভাবতেও যে আমার সংকোচ হচ্ছে। আমার কথা ছেড়ে দিন, এ-জন্মে তো আর-কিছু হবার নয়, আপনি এতো বড়ো কাজ করেছেন, আপনাকে দেখতে পেলাম—এই থাকল মনে। (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উদ্বিগ্ন চাপা-কণ্ঠে) বেশি বলবার সময় নেই—সাবধান হুজুর! সাবধান! ভীষণ ষড়যন্ত্র! এখানে ঢুকবার পথে একটু আগে আমি দরজার আড়ালে বারে-বারে এসে গোপন থেকে সব শুনেছি। এ রাত্রি কাল-রাত্রি! সত্যই এ কাল-রাত্রি! (এদিক-ওদিক চাহিয়া একটু আগাইয়া চাপা-গলায়)—আর কারো নয়, আপনারই কালরাত্রি!

উদয়। (চম্‌কাইয়া) অ্যাঃ—এ কী বলছ?

চন্দ্রা। হ্যাঁ অমাত্য! শুনে রাখুন, আজ অমাবস্যায় বাইরে যেমন কালো,—প্রাসাদের এই ভিতরটাতেও ষড়যন্ত্রের কালো-পাহাড় তেমনি জমে উঠেছে। খুব সাবধান। কোনোমতেই যেন ওরা কিছু টের না পায়! আমি তবে গাইছি—আপনি এখন বেশ সহজ হয়ে থেকে হাত-মুখ-চোখ নাড়িয়ে গানে মেতে-যাওয়ার মতো ভান করুন। তাহলেই ওরা বুঝবে,—আপনি আমোদে মজে গেছেন। আজ যদি আপনি বেঁচে যান, তবেই জানব, অধীনীর এ-তুচ্ছ জীবন জন্মজন্মের মতো সার্থক হল—সেই হবে আমার ভাগ্যের বড় পুরস্কার। আর, ওদিকে আমার যা করবার,—এরই মধ্যে আমি সে-সব করে রাখব। সাবধান, মনে থাকে যেন,—গভীর রাতে শোবার-সময় একটু আগে গিয়ে অমাত্য যুধাজিতের বিছানায় আপনি শুয়ে পড়বেন। আর অসাড় ঘুমের ভান করে থাকবেন (স্বগত) লোকটা কী বলল?—রানীকে তার চাইই? তাকে চাই, তাই কিনা, সরাতে হবে পথের বুনো-কাঁটা এই চন্দ্রা-মেয়েটাকে? অ্যাঃ?—আচ্ছা! আমিও তাহলে দেখে নেব শয়তান!

চন্দ্রা। (গান ধরা,—ঐ সঙ্গে উৎসাহের ভঙ্গীতে উদয়ের হাত-মুখ-চোখ নাড়িয়া চন্দ্রাকে কৃত্রিম উৎসাহ দিয়া চলা)

গান

অনুগত-জনে কেন করো এত প্রবঞ্চনা,
তুমি, মারিলে মারিতে পারো রাখিলে কে করে মানা।
ক'রে থাকি অপরাধ, প্রেমডোর দিয়ে বাঁধো,
বিনা-অপরাধে বধো এ কিরে তোর বিবেচনা॥

(শিলাদিত্য ও যুধাজিতের প্রবেশ)

শিলাদিত্য। বেশ জমেছে তো। চন্দ্রা, তুমি উদয়কে এবার খাওয়ার-ঘরে নিয়ে যাও, ওর হাত-মুখ ধুয়ে নিতে-নিতে আমরাও আসছি। (চন্দ্রা ও উদয়ের প্রস্থান-মুখে উদয় শিলাদিত্যকে বলিয়া উঠিল)

উদয়। তারিফ করি অমাত্য, এমন চন্দ্রবদনীকে আপনি কোথা থেকে কেমন ক'রে জোটালেন। এর গান শুনবার সুযোগ দিয়ে আপনি আমাকে ধন্য করেছেন। গান আর-একখানা কি হতে পারে? কবে যে আর এ-জীবনে এমন গান শুনতে পাব!

শিলাদিত্য। তা বেশ, তা বেশ! গাও-না চন্দ্রা আর-একখানা।

চন্দ্রা। (গান) কিসে কী হয় হোক না, তাতে কী-বা আসে-যায়।—
যারে দিলাম ভালো-মন্দ, সব যে তারই দায়॥
কে ফিরে যে কিসের পিছে আজ তা নিয়ে ভাবনা মিছে,
সে উঠুক উঁচোয়, পড়ুক নীচে আমার কী-বা তায়॥
বেলা বয়ে যায়—
দিনের আলো সাঁঝের কালো মিলে চলে কালের-যমুনায়।
ঐ যমুনার কালো-জলে টানে যে মন কোন্ অতলে,
এবার ডুবলাম তারে পাবার ছলে, পরান যারে চায়॥

উদয়। (আবিষ্টভাবে) এসো চন্দ্রা, এবার আমরা তবে যাই। (চন্দ্রার পিছনে যাইতে-যাইতে ফিরিয়া শিলাদিত্যকে) আবার একদিন এসে গান শুনতে পাব তো?

যুধাজিত। (হাসিয়া) দিনের কথা কে বলতে পারে ভাই, তবে ভালো যখন লেগেছে চন্দ্রাকে তুমি একেবারে নিয়েই যেয়ো-না! আমরা-সব অরসিক, এর মর্যাদা অরসিক-আমরা কী বুঝব—গুণীর মর্ম গুণীতেই জানে, সমাদরও সেই-ই করতে পারে। (উদয় ও চন্দ্রার প্রস্থান)

শিলাদিত্য। (সেইদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া যুধাজিৎকে নিষ্ঠুর-দৃষ্টিতে চাপাকণ্ঠে) আজই রাত্রে কাজ অনেকটা আগিয়ে রাখতে হবে। কাল সকালে আমি একবার যাব,—রাজার সঙ্গে দেখা করব। তুমি এদিকটা দেখো, ফিরে এসে সব বলব।—পরামর্শ করতে হবে।

যুধাজিৎ। সত্যই তো, উদো রাজা হয়ে যাবে? আমাদের তো তাহলে এর পরে ধ'রে-ধ'রে কচুকাটা করবে।

শিলাদিত্য। (যুধাজিৎকে) নাও অমাত্য,—সুরায় মনটা তাতিয়ে নাও,—

চন্দ্রাকে দিয়ে উদোটাকে ঐ রসে বেহুঁশ ক'রে দেওয়া চাই। গানে-গানে আজ চন্দ্রা ওর মন কেড়েছে—ওষুধটা দেখছি ধরেছে তবে ঠিকই। তুমি এবার উদয়ের কাছে যাও, অনেক রাত গেছে, গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমিও আসছি। (যুধাজিতের প্রস্থান)

শিলাদিত্য। তাইতো!—হঠাৎ মাথাটা যে কেমন ঝিম্-ঝিম্ করছে! (সুরাপান) উঃ রাতটা কী অন্ধকার! (সুরাপান) ঠিক আছে। একটু ওরা ঘুমুক! রাতটা আরো নিশুতি হোক—রাতের শেষদিকটাই তো কালরাত্রি! (সুরাপানে টলিতে টলিতে প্রস্থান)

৭

[সকাল। বিদর্ভ-রাজধানী-পথপ্রান্তে উৎসব-আয়োজনে সজ্জিত বটবেদী। একধারে বাঁশী-বাদনরত একজন রাখাল।]

(মন্ত্রোচ্চারণরত সাধুজীর প্রবেশ)

মন্ত্র

সাধুজী। (মন্ত্রোচ্চারণ) নমো জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥
(সূর্য-প্রণাম)

(বেদীর তলায় বসিয়া) সকালটি কী সুন্দর, আর কী মিষ্টি। কাঁচা-রোদে যেন দেশের মাঠে-ঘাটেও সোনার বান ডেকেছে। (চারিদিকে চাহিয়া) পথে-পথে যেন কোন্ রাজরথ নেমেছে। দেশটি তো এমনিতে সোনার দেশই একদিন ছিল, কোথা থেকে সর্বনাশা-আকালে এক খরা নেমে এসে-ই-না দেশটাকে শুকিয়ে কালো-শ্মশান করে দিয়েছিল। আবার সেই পোড়া-মাটির দেশেই আজ উৎসব হচ্ছে—তেমনি চারিদিকও সঙ্গে-সঙ্গে যেন হেসে উঠেছে। (সনিঃশ্বাসে)—তবে, কাঁদতেই-বা কতক্ষণ?—সবই তোমার সাধের খেলা ঠাকুর। তুমি আমাকে-দিয়েও তো কত-কী-না ওলট-পালট করলে! জানি-না, আরো কী করাবে! (তন্ময়চিত্তে)

গান

অসীম ধন তো আছে তোমার তাহে সাধ না মেটে,
নিতে চাও তা আমার-হাতে কণায়-কণায় বেঁটে॥

দিয়ে তোমার রতনমণি আমায় করলে ধনী—
এখন দ্বারে এসে ডাকো, রয়েছি দ্বার এঁটে ॥
আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে—
বিশ্ব-ভুবন মাত্‌ল যে তাই হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ওই রথে, নামবে ধুলা-পথে
যুগ-যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে-হেঁটে ॥

(গানের মাঝখানে নীরবে খালিপায়ে বিদর্ভরাজ ও রানী-ঐন্দ্রিলা আসিয়া সাধুজীর দুইপাশে দুইজনে নিবিষ্ট হইয়া গান শুনিতেছিল—এইবারে সাধুজী বিদর্ভ-রাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন) কহ বৎস, কী তব প্রার্থনা?

বিদর্ভরাজ। প্রভু, আর কিছু নহে-শুধু—

ঐন্দ্রিলা। চরণের ধূলি এক-কণা। (সাধুজীকে উভয়ের প্রণাম ও আশীর্বাদ গ্রহণ)

সাধুজী। (রাজরানীকে মৃদুহাস্যে) শুধু এইটুক্? আর কিছু সাধ বা অসাধ,—সুখ-দুখ্?

রাজারানী। (সাধুজীকে)

গান

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ ভুলেছি ও-কর-পরশে,
যা-কিছু দিয়েছ, তাই পেয়ে নাথ, সুখে আছি, আছি হরষে।
জননীর স্নেহ সুহৃদের প্রীতি শতধারে সুধা ঢালে নিতি-নিতি,
জগতের প্রেম মধুর মাধুরী ডুবায় অমৃত-সরসে ॥
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ, দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,
শোক-তাপ সব হয় হে হরণ তোমার চরণ-দরশে।
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালোবাসা প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিয়াসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা নব নব নব বরষে ॥

বিদর্ভরাজ। নিজেদের কথা কী-ই বা আছে, আর কী-ই বা বলব। সাধ-অসাধ—সুখ-দুখ্, এই যা বললে, ক্ষুদ্র-আমাদের—সে-সবই হয়েছে এখন রাজ্যের সকলের সব সুখ-দুখ্ নিয়ে। জগতের সব প্রেম-মাধুরীর ঐ অমৃত-সরসে মন তো আমাদেরও সারাক্ষণ ভাবের আনন্দেই ডুবে থাকতে চায়! হায়, সংসারটা যদি তাই হতো—সদা-সর্বত্র অমনি ভাবে-ভরাই থাকত! কিন্তু, এ-রাজ্যে দুর্ভিক্ষের মার খেয়ে অন্নের অভাব-দুঃখটা যে ভুলতে গেলেও এখানে আজ ভোলা যাচ্ছে না।

ঐন্দ্রিলা। তবে কিনা, অভাবে যা এতদিন শূন্য হয়েই প'ড়ে ছিল, সেই শূন্য-ভাণ্ডারই কেমন ক'রে যে হঠাৎ কোথা দিয়ে অন্নে আবার ভ'রেও উঠল—তা, এ সবই তো প্রভু তোমার কৃপা ?—তার থেকেই তো দেখছি এ-দেশে আজ অন্নোৎসবও হচ্ছে! আর, উৎসবে এখুনি যে রাজ্যবাসী সবাই এসে পড়বে!—এ সৌভাগ্য কি ভাবা যায় ?

বিদর্ভরাজ। তাইতো, প্রভুর মহিমা স্মরণ ক'রে আজকের এই শুভদিনে শুভক্ষণে (রাজা আগাইয়া গিয়া সাধুজীর হাতে একখানি পত্র দিয়া প্রণামান্তে বলিল—) পত্রে আছে নিবেদন সব!

সাধুজী। (সাগ্রহে) দেখি দেখি, কী লিখেছ ? (বিস্ময়ে) এ কী ? এ কী—করেছ কী ? এ যে দেখি আরো এক দান-মহোৎসব!—পুত্র, কহ শুনি,—রাজ্য যদি মোরে দেবে, কী কাজে লাগিবে এবে, কোন্ গুণ আছে তব গুণী ?

বিদর্ভরাজ। (করজোড়ে সাধুজীকে) তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান!

সাধুজী। (রাজাকে) অন্যথা না হবে এতে কভু ?

বিদর্ভরাজ ও ঐন্দ্রিলা } (সাধুজীকে নয়, নয়) প্রভু!

সাধুজী। (রাজার হাতে ভিক্ষা-ঝুলি দিয়া) বৎস, তবে এই ঝুলি লহ নিজ স্কন্ধে তুলি'—চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।

বিদর্ভরাজ। (ভিক্ষা-ঝুলি কাঁধে লইয়া সাধুজীকে) ওগো গুরু, আজ হতে আমাদের দুজনের ব্রত হল শুরু।

সাধুজী। (রানীকে) শেষে,—তুমি-ও মা ? ভালো ভালো!—সহধর্মা এই তো সার্থক প্রিয়তমা!

ঐন্দ্রিলা। (সাধুজীকে) জানি যে গো জানি গুরু,—তোমার এ আদেশ-পালনে সুকৃতির শুরু হবে দুষ্কৃতি-ক্ষালনে। তাইতো কোথায় থেকে আসি'—নৃপতির গর্ব নাশি'—করিয়াছ পথের ভিক্ষুক!

বিদর্ভরাজ। (সাধুজীকে) প্রস্তুত রয়েছে দাস আরো কী-বা অভিলাষ, গুরু-কাছে লব গুরু-দুখ।

সাধুজী। (রাজাকে)

শোন্ শোন্ তবে শোন্, করিলি কঠিন পণ, অনুরূপ নিতে হবে ভার!
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে রাজ্য তুমি লহ পুনর্বার।

তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম, রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।
বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্বাদ-সহ আমার গেরুয়া গাত্রবাস,
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো—

(রাজাকে গেরুয়া গাত্রবাস দেওয়া)

বিদর্ভরাজ। যে-আজ্ঞে,—কৃতার্থ হল দাস। (নতশিরে গেরুয়া গাত্রাবাস গ্রহণ করা)

সাধুজী। (ঊর্ধ্বমুখী প্রার্থনায়) ওহে ত্রিভুবনপতি বুঝি না তোমার মতি, কিছুই অভাব তব নাহি—হৃদয়ে-হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি' ফিরো প্রভু, সবার সর্বস্বধন চাহি'। সকলেরে করিয়া প্রকাশ কে তুমি আড়ালে করো বাস! আমি থাকি পাদ-পীঠতলে, হে রাজন্ তব রাজ্যে তুমি এসো চ'লে। (বুকে অঙুলি দিয়া নিজেকে দেখাইয়া ঊর্ধ্বমুখী প্রার্থনায়)

গান

এ-রে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে,
হাসিতে আকাশ ভরিলে!

পথে-পথে ফিরে দ্বারে-দ্বারে যায়,
ঝুলি ভ'রে রাখে যাহা-কিছু পায়,
কতবার তুমি পথে এসে হায়,
ভিক্ষার ধন হরিলে!

ভেবেছিল চির কাঙাল সে এই ভুবনে
কাঙাল মরণে জীবনে।

ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে-ভয়ে
দিন-শেষে এল তোমারি আলয়ে—

আধেক-আসনে তারে ডেকে লয়ে
নিজ-মালা দিয়ে বরিলে॥

বিদর্ভরাজ। (সাধুজীকে) প্রভু, তোমার গানের ঐ মহারাজটি কে তা আমার জানা নেই,—কিন্তু তিনি যিনিই হোন-না, আমার মহারাজ বলতে কিন্তু আমি তোমাকেই মাত্র জানি।

সাধুজী। সে কী ?—আমাকে তোমরা কী-একটা ধরে নিয়ে কী-সব ব'লে যাচ্ছ ?—আমি রাজা ?

ঐন্দ্রিলা। (মৃদু হাস্তে) রাজাই তো ? মিথ্যা কী ? তুমি যে আমাদের গুরু-মহারাজ গো! ভয় কী—তোমার-দেওয়া গুরু-দুখ্‌-ও যে তাইতো আমাদের কাছে পরম-সুখের আশীর্বাদ, পরম-শান্তি, পরম-শক্তিও যে সেই আশীর্বাদটুকুই।

রাজা-রাণী গান

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি—
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরান দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও ভকতি ।।

সাধুজী। (ঊর্ধ্বমুখী প্রার্থনায় জোড় করে)

হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ, অন্নপূর্ণা মা-আমার লয়েছে
বিশ্বের ভার সুখে আছে সর্ব-চরাচর। মোরে তুমি
হে ভিখারী, মা'র কাছ হতে কাড়ি' করেছ আপন অনুচর।

(ঊর্ধ্বে প্রণাম)

(অন্নদান-উৎসবে জনতার প্রবেশ)

জনতা। জয় আমাদের সাধুবাবার জয়।

সাধুজী। ওহে, জয় দেবে তো দাও একমেবাদ্বিতীয়ম্ সেই শ্রীভগবানের জয়—যিনি তোমার-আমার-সকলের মধ্যেই একই-কালে স্থিত আছেন। আর, জয় দাও ঐ প্রত্যক্ষ-পুণ্যবেদীর বটতলাটিরও,—যেখান-থেকে একদিন বিদর্ভের বুভুক্ষু আর নিঃসহায় জনতা সৈন্য-সামন্ত দ্বারা তাড়িত হয়েছিল। নিশ্চিত আসন্ন-মৃত্যুর ধ্বংস-করাল হাত থেকে বাঁচবার জন্ত তারা দলে-দলে মুক্তি-অভিযানের সূচনা করেছিল। কালের কী আশ্চর্য লীলা! অনেক-কিছু ঘটনা পেরিয়ে এখানে এসেই শেষে আবার তারা অন্নদানের মহোৎসব-ও করছে। কিন্তু,—এ-অন্ন শুধু ক'টি চালই নয়, এ চালের সঙ্গে মানুষকে পৃথিবীর প্রীতির-পরমান্নই তারা বিলিয়ে দিচ্ছে!—এ-কথা-ক'টি সকলেরই কিন্তু স্মরণীয়।

বিদর্ভরাজ। প্রভু, আপনি কে? আজকের দিনটিতেও কোথা থেকে আপনি

হঠাৎ এসে প'ড়ে উৎসবটির মর্মকথা সকলের প্রাণে-প্রাণে এমন গেঁথে দিয়ে প্রকৃতই অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন করলেন।

সাধুজী। (স্মিতহাস্যে) শুধাচ্ছ রাজা,—আমি কে? তা, যে-ই হই না কেন, তা নিয়ে এমন ভাববার কী আছে! যদি বলি, আমিও একদিন রাজা, তোমার মতোই ছিলাম এক রাজপ্রাসাদের-অধিবাসী, আর, ঘটনা-স্রোতে প'ড়ে তোমারই মতো হয়েছি আজ এই একই ধুলিপথের অধিবাসী?

(সহাস্যে উক্তিরত ক্ষ্যাপাচাঁদের প্রবেশ)

ক্ষ্যাপাচাঁদ। (সাধুজীকে) সে কী প্রভু? প্রাসাদ থেকে একেবারে পথের ধুলায়?

সুবন্ধু। রাজ্যে কি তখন কোনো বিপ্লব দেখা দিয়েছিল?

বিদর্ভরাজ। (হঠাৎ চকিত হইয়া সুবন্ধুকে) সখা, গতকাল সেনাপতি তোমাকে কী যেন বলেছিল, তোমার এই বিপ্লবের কথাতে হঠাৎ সে-কথাটা মনে পড়ে গেল,—রাজ্যের আনাচে-কানাচে আবার নাকি বিপদাশঙ্কা দেখা যাচ্ছে? তোমার কাছে তার সেই কথা শুনে আমি তো তাই ভেবে রেখেছিলাম, এই উৎসব সেরেই অবিলম্বে তোমাদের নিয়ে পরামর্শে বসব। কিন্তু আশঙ্কার কারণটা কি খুবই জরুরি?

সুবন্ধু। হ্যাঁ মহারাজ, সম্প্রতি এ-রকমেরই কিছু সংবাদ এসেছে! যেন কোথাও বড়ো-রকমের কিছু-একটা দুর্যোগ ঘটবে। সেনাপতিকে সংবাদটা নিতে বলে দিয়েছিলাম আমিই। আর, আমাকে সে-ঘটনার আঁচ দিয়েছিল অমাত্য উদয়-ভাস্কর।

বিদর্ভরাজ। উদয়ভাস্কর?—সে কী? সে-যে বিপক্ষের লোক!

সুবন্ধু। বিপক্ষের লোক হলেও, সে অন্যায়পন্থী নয়। তার কাছে এ-রাজ্য সে-রাজ্য নেই। সত্য, ন্যায় আর শুভেরই সে পূজারী। দলাদলি ছেড়ে সে চায় মানুষের হিত। অমাত্য-দলের মধ্যে থেকেও সে-ই আমাকে বলেছিল—সামনে খুব কঠিন একটা সংকট আবার বেধে উঠতে পারে··· গতিক ওদের ভালো নয়।

(সহসা বাঁ-হাতে রক্তাক্ত-থলে ডানহাতে উদ্যত-রক্তাক্ত তরবারি লইয়া রক্তাক্ত জামাকাপড়ে অবিন্যস্ত-চুলে উগ্রমূর্তি ও উদভ্রান্ত-দৃষ্টিতে অমাত্য শিলাদিত্যের প্রবেশ)

শিলাদিত্য। মহারাজ!—কোথায় মহারাজ?

বিদর্ভরাজ। একী অমাত্য, এ-অবস্থায় তুমি এসময়ে এখানে?

শিলাদিত্য। দর্শনী এনেছি মহারাজ, এই দেখুন! বিশ্বাসঘাতক, রাজ্যলোভী

উদয়ভাস্কর! দুশ্চরিত্র সেই ক্রূরকে আর দ্বিতীয়বার রাজবিদ্রোহের জাল-বিস্তারের সুযোগ দিইনি। ষড়যন্ত্র জানা-মাত্র নিজেই শেষ-রাত্রে আমি এই হাতে তাকে নিকেশ করেছি। আর, এই সকালে সবটা জানাতে ছুটে এসেছি এখানেই।

বিদর্ভরাজ। কী করেছ?

শিলাদিত্য। হত্যা করেছি।

বিদর্ভরাজ। হত্যা?—অমাত্য উদয়ভাস্করকে?

সকলে। একী শুনছি? উদয়ভাস্করকে হত্যা?

ঐন্দ্রিলা। (বিস্ময়ে) উদয় নেই?

শিলাদিত্য। আছে, আছে,—থলেতে আছে তার কাটামুণ্ড। রাজার বিচারের অপেক্ষা করিনি।—পাছে, সময় পেয়ে কুচক্রী তার নিজের ষড়যন্ত্র-মতো রাজহত্যা ঘটায়।

(মহাজনের প্রবেশ)

মহাজন। অমাত্য উদয় করবে রাজহত্যা? আমাদের ধুকে-মরা ভুখের-দেশকে যে নিজের দেশের চাল এনে দিয়ে এমন ক'রে বাঁচালো!—তার মতো মানুষ ক'টা আছে?

শিলাদিত্য। (ব্যঙ্গ) চাল দিয়ে সে তোমাদের বাঁচালো বলছ? এতেই সে একেবারে মহাপুরুষও হয়ে গেল? আরে, সে নিজে যে একটা বাচাল! আর, ঐ তো,—ঐ তো—তার কুটচাল। ঐ চাল-এনে-দেওয়ার এক-চালেই সে তোমাদের মাৎ করেছে। অমাত্য যুধাজিৎকেও মূর্খ-উদয় তার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে ভজাতে চেয়েছিল।

জনতা-সকলে। কী! এত বড়ো শয়তান এই উদয়ভাস্কর?—আর, তাকেই আমরা কিনা এত ক'রে মাথায় তুলে রেখেছি?

সুবন্ধু। ওহে, অমাত্য-শিলাদিত্য, উদয় যুধাজিৎকে মারবে কী ক'রে?—যদি তুমিই তাকে আগে-থেকে-গিয়েই মেরে এসে থাকো?

শিলাদিত্য। মেরে আসব কী করে, আর, কেনই বা মারব?

সুবন্ধু। মেরেছ উদয়ের সেবা-মাহাত্ম্যের ফলাও-জয় দেখে,—তার এই ব্যাপক জন-প্রতিষ্ঠার হিংসায়! আর মেরেছ—কী ক'রে?—তবে শোনো,—উৎসবের আনন্দের নামে, ষড়যন্ত্র ক'রে ডেকে এনেছিলে যুধাজিৎ আর উদয়কে। সে-সঙ্গে শোবার ব্যবস্থাটাও করেছিলে দু'জনের জন্য একই-কক্ষে। যুধাজিৎকে নানা-কথায় ভুলিয়ে কিছুতেই জানতে দাওনি—তোমার পৈশাচিক উদ্দেশ্য। শেষে, অধিক-রাত্রিতে পানোন্মত্ত হ'য়ে শুতে গিয়ে অন্ধকারে শয্যা-বদল ঘ'টে যায় উদয় আর যুধাজিতের মধ্যে। তারপর যখন কাজ সারতে তুমি নিষুতি-রাত্রে সে-কক্ষে ঢুকে

পড়ো—দারুণ উৎকণ্ঠা-উত্তেজনার সঙ্গে, সুরামত্ততার বিহ্বলতায় আর তড়িৎ-ক্ষিপ্রতায়—তখনই ঘটিয়ে আস এই বিভ্রান্তিময় হত্যাকাণ্ড!—হলো তো?

শিলাদিত্য। এ তোমার বানানো যত জল্পনা-কল্পনা!—তোমারই ষড়যন্ত্রের এক জঘন্য কাহিনী। তা, যা-ই বলো, বলি, এসবের সাক্ষ্য কোথায়?

সুবন্ধু। সাক্ষ্য? জীবন্ত সাক্ষ্য যে সে-ই!—যার জীবন নিয়ে তুমি তোমার ঘরে ব'সেই এতদিন ছিনিমিনি খেলেছ! কিন্তু এবিষয়ে আর আমার কিছু বলতে হবে না,—আশা করি,—ধর্মের ঢাক আপনিই বাজবে!

শিলাদিত্য। (শুষ্ককণ্ঠের পরিহাসে) হাঃ হাঃ হাঃ,—কী বললে মূর্খ-পুরোহিত? যা-ই বলো, একবার ঘটনা-স্থলেই চলো-না—তুমিই বলো, সাক্ষ্যপ্রমাণহীন তোমার বানানো-কথাগুলো, যত-না চমকপ্রদ হোক, তা বিশ্বাস্য হবে কী ক'রে। বিচারে কথাগুলো ধোপ-দুরস্ত হতে হবে তো! তোমার তো মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি—কী বলতে সব কী বলছ? খুন যুধাজিৎ হবে কেন, বলছি খুন হয়েছে উদয়ভাস্করই।

সুবন্ধু। আমি তো ভাই মূর্খ-মতিচ্ছন্নই, কিন্তু ওহে বুদ্ধির-সাগর,—বাছা,—বলি একবার ঝাড়ো-না দেখি তোমার ঐ ঝোলাখানা!

শিলাদিত্য। (ফ্যাকাশে-মুখে) বলেইছি তো, কতবার বলব—ঝোলাতে আছে উদয়ভাস্করের কাটামুণ্ডই!

সুবন্ধু। যা বলো তাই বলো, কেবল দেখো-না একবার,—দেখাওই-না তোমার ঐ ঝোলাটি ঝেড়ে। সেটাতে দেরি কেন? তবে কি,—ভয় হচ্ছে? দ্বিধায় ধরেছে? তাহলে ভেবে দেখো তো,—ঈর্ষার থেকে উদয়কে খুন করতে গিয়ে যাকে তুমি জরুরিতে খুন ক'রে ফেলেছ, ঝোঁকের মাথায় প'ড়ে খুনের পরেই মুণ্ডটা লুকাবার-বুদ্ধিতে অমনি সেটা ঝোলায় ভ'রে ফেলেছিলে কি না? তখন দেখোনি,—এখন তুলে দেখো-না একটু ভালো ক'রে। এখুনি তাহলে সব-কিছুরই তো প্রত্যক্ষ-ফয়সলা হয়ে যাবে, আবার অনর্থক ঘটনাস্থলে যাওয়া কেন?

(উক্তিরত উদয়ের প্রবেশ)

উদয়। (মৃদু-বক্রহাস্যে) ও কী অমাত্য! ও কী! হাত কাঁপছে কেন? তবে কি এতক্ষণ প্রমাণ-ছাড়া ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছিলে? (রক্ত-চক্ষুতে একবার উদয়ের দিকে চাহিয়া-নিয়া কাঁপা-হাতে শিলাদিত্য ঝোলাটা উপুড় করিয়া ফেলিতেই মুণ্ড একটা মেঝেতে পড়িল)

কৌতুহল-উত্তেজিত জনতা। (চমকিয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে) তাই-তো তাইতো, একী? এ-যে অমাত্য যুধাজিতেরই মুণ্ড! বলি, তাহলে, উদয়ের মুণ্ডটা রইল কোথায়?

সুবন্ধু। এবার সত্য-মিথ্যা-সব ঠিক হোলো তো? দাও, দাও—

উদয়। দাও অমাত্য, রাজাকে তোমার সাধের-উপহারটা এগিয়ে দাও, দেরি কেন ?

জনতা। পুঁতে ফেলো, পুঁতে ফেলো, শিলাদিত্যকে জীবন্ত পুঁতে ফেলো। আর, সবাই এখন দেখো যেন শয়তান না পালায়।

(শিলাদিত্যের লজ্জায় মুখ নত-করা)

বিদর্ভরাজ। সবটাই যে দেখছি একটা নিঃশ্বাস-নিরোধী রহস্য। তোমরা এখন একটু থামো দেখি। আর, মুণ্ডটাকেও সরিয়ে নাও। (একজন আগাইয়া আসিয়া মুণ্ডটা সরাইয়া নিয়া প্রস্থান)

জনতা। থামব কী মহারাজ, ও-যে আমাদের দেশের শত্রু—ওকে আপনি দেশবাসীর হাতেই ছেড়ে দিন—পাপীকে তার পাপের শাস্তি পেতে দিন। (ধ্বনি) জয় অমাত্য উদয়ভাস্করের জয়। শিলাদিত্যকে আক্রমণোদ্যত)

ঐন্দ্রিলা। (জনতাকে) এ কী ?—একবার তোমরা ভেবে-দেখো,—শিলাদিত্য পাপী বটে, কিন্তু পাপীও তো মানুষ। (শিলাদিত্যকে) শিলাদিত্য, তুমি আর এদেশে থেকো না।

জনতা। ও যাবে কোথায় মা, ওকে ওর দেশের মানুষরাই কি রক্ষা করবে ? ও যে আজ দেশবিদেশের সকল-মানুষেরই শত্রু। ও যে সারা-সংসারেই কলঙ্ক।

ঐন্দ্রিলা। শোনো শিলাদিত্য, সকলে কী বলছে। বলো তো, এ কী করলে ! —এ কি মানুষের কাজ ?

শিলাদিত্য। না, না, রানী, আমি নই, আমি নাই,—তোমরাই মানুষ—চিরদিন মানুষের মতোই থেকো। মানুষের ভালো কোরো, ভুখ্ মিটিয়ো। যার জন্যে আমি এমন অমানুষ হয়েছি, যা-ই করে থাকি, কারো কাছে কোনোদিন তাকে খাটো করিনি। কী করব ! পুণ্যের পদ্মফুল জোটেনি, স্বভাবে যা পেয়েছিলাম —বুনো সেই বিষফুলেই তাকে মনে-মনে পূজা করে গেছি। কোন্ ভুখের জ্বালায় যে আমি জ্বলছিলাম, কোনো দিন কেউ কি তা বুঝেছ ?

(উক্তিরতা উন্মাদমূর্তি চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। (শিলাদিত্যকে) শঠ, শয়তান, প্রবঞ্চক ! তা-ব'লে তুমিও কি কোনোদিন বুঝেছিলে কারো মনের জ্বালা ? আজ নিজে বিধাতা তোমাকে তা বুঝিয়েছেন—(হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। রানী কিম্বা ভিখারিনী কেউ যাতে তোমার ছলনায় কোনোদিন আর না-ভোলে, তারই ব্যবস্থা এই—(ছুরি উচাইয়া শিলাদিত্যকে খুন করিতে গিয়া হঠাৎ ভাবান্তর ঘটিয়া কম্পিত হাতের ছুরি মাটিতে পড়িয়া

গেল) নাঃ, পারা গেল না ! যিনি ওকে প্রাণ দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর হাতেই ওকে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু আমিই-বা এখন আর বেঁচে কী করব ? (হঠাৎ ছুরি তুলিয়া লইয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইলে শিলাদিত্য তাড়াতাড়ি গিয়া ছুরি কাড়িয়া লইল)

শিলাদিত্য। না, না,—তোমার আর মরা হয় না চন্দ্রা, আমি যে স্পষ্টই দেখছি, কী-নিয়ে আমি কোথা থেকে কোন্-অতলে হয়েছি আজ নিপতিত। তাই, তোমার নয়, আমারই চাই মৃত্যু। (নিজের বুকে ছোরা মারিতে গেলে সাধুজী আসিয়া ছোরা কাড়িয়া নিলেন)

সাধুজী। (শিলাদিত্যকে) এ-কী করছ অমাত্য, এ-যে মহাপাপ ! জীবনযুদ্ধে এভাবে বিদায়-নেওয়া,—এ কি তোমার যোগ্য ? মরবে কেন বাবা ? এক-জীবন চলে গেল তো আরেক জীবনে নবদিনের প্রভাত-সূর্যের মতো নবীন হয়ে জেগে-ওঠো।

শিলাদিত্য। জেগে উঠব ?—এর পরেও ? রাজবিচারে প্রাণদণ্ডের চেয়ে আজ আত্ম-বিচারে এই মৃত্যু-বিধানই শ্রেয়।

সাধুজী। না, না, মৃত্যু নয়, তার চেয়ে আত্মশোচনায় শুদ্ধ হয়ে ওঠো।—দেখো, একদিন তুমিই এক নূতন স্বর্গরাজ্য গ'ড়ে তুলতে পারবে এই ধুলার বাস্তবেই। মৃত্যু কি তোমাকে জীবনের সেই রাজ-গৌরব আর কখনো দিতে পারবে ? (বিদর্ভরাজকে) না, না মহারাজ, তোমাদের বিচার যা-ই হোক, আমি সানুনয়ে শিলাদিত্যকে চাইছি, তোমরা তো ওকে নির্বাসনেই পাঠাচ্ছিলে ! আমার সঙ্গে ওকে যেতে দাও, আমরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাব দূর-দেশান্তরে।

শিলাদিত্য। তবে রানী, (চন্দ্রাকে দেখাইয়া) অসহায়া নিরাশ্রয়া এই মেয়েটিকে আমি রেখে যেতে চাই তোমার কাছে !—ভোরের শুভ্র অনাঘ্রাত তাজা-ফুলএর মতোই জেনো ও পবিত্র ; আর, জেনো—এ-ই হচ্ছে তোমাদের কুণ্ডলালের হারানো-বোন কুমারী চন্দ্রা।

বিদর্ভরাজ ও ঐন্দ্রিলা। এই সেই হারানো মেয়েটি ?—চন্দ্রা, চন্দ্রা ! (চন্দ্রা গিয়া রাজা-রানীকে প্রণাম করিল। রাজরানী চন্দ্রার মাথায় আশীর্বাদে হাত বুলাইল)

শিলাদিত্য। (রানীকে) পারো যদি রানী, ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ো, নয়তো, তোমার কাছেই রেখো।

সাধুজী। (শিলাদিত্যকে) রাখা-রাখির আর কাজ কী বাবা,—কন্যাটি তো দেখছি তোমার সঙ্গেই থেকে আসছে, ওকে সঙ্গে নিয়েই চলো-না ! সেবায়-সাহচর্যে তোমার জীবনকে দেখো ও কী-সুন্দর আর সার্থক করে তোলে।

শিলাদিত্য। এ আপনি কী বলছেন?—বিয়ে করব চন্দ্রাকে? না না, তা হয় না। কিছুতেই আর-কিছু হবার নয়। ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ কী। একমুখো একরোখা আমার এই মনটাই যে আর ঘর-সংসারে ফিরতে চাচ্ছে না। মিছিমিছি মেয়েটাকে কেন দুঃখকষ্টে ডোবানো? চন্দ্রা, পার যদি তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। কী করব বলো! তবে, এখন তোমার সুখশান্তির একটু ব্যবস্থা হলেই আমার যা সান্ত্বনা। আর, এখানে এটাই আমার শেষ-কাজ।

সাধুজী। এ কী বলছ?—চন্দ্রাকে তুমি সঙ্গে নেবে না?

শিলাদিত্য। না, না, প্রভু, আমাকে আর ও-কথা বলবেন না। আমার সব-কিছু বদলে গেছে। বেশ বুঝেছি,—চন্দ্রার মনের-গভীরে কোনোদিনই আমার ছায়া স্থান পায়নি। আমার জন্য যখন-যে-টুকুই সে করেছে সে শুধু বিচিত্র অবস্থা ও সংস্কারগত কর্তব্য-বোধের চাপে প'ড়ে। শুধু-শুধু শুষ্ক দুটো দুর্ভাগ্য-জীবকে একত্রে জুড়ে দিয়ে ওর প্রতি আর নিষ্ঠুরতা করা কেন? তার-চেয়ে একদিন সত্যি যাকে ওর ভালো লেগেছিল, মনে- মনে যাকে মুগ্ধ ওর-মন একটু চেয়ে-ও ছিল,—তার হাতেই ওর হাত মিলিয়ে দিন।

সাধুজী। কিন্তু, কার কথা তুমি বলছ বাবা? কে সে?

শিলাদিত্য। বলছি—বিগত-ভয়ংকর-কালরাত্রিতে জীবন-পণ ক'রেই চন্দ্রা এগিয়েছিল যাকে বাঁচাতে—

বিদর্ভরাজ। বলো বলো অমাত্য, খুলে বলো – সে কে?

শিলাদিত্য। আজ মহারাজ, তাকেই তো ক'রে দিয়েছেন চন্দ্রার নূতন কর্ম-সঙ্গী, এখন কেবল জীবন-সঙ্গীও করে দিন তাহলে ওরা দুটিতে মিলে সুখী হবে। আমার বৈশালী-যাওয়ার আগে ওদের দুটির এই মিলন দেখে যেতে মন বড় ব্যাকুল হয়েছে, তা না-হলে, আমি নিশ্চিত জানছি আমার পাপতাপের আর শান্তি হবে না, এমন কি, ঐ অনুতাপেই আমার মৃত্যু অবধারিত।

ঐন্দ্রিলা। পাত্রটি কে? তুমি কি অমাত্য উদয়-ভাস্করের কথা বলছ?

শিলাদিত্য। আমার আর-কিছুই বলবার নেই।—এবার তোমরা যা করো। (সাধুজীকে) এবার চলুন প্রভু, যেখানে যেতে হয়,—আমি প্রস্তুত।

ঐন্দ্রিলা। (শিলাদিত্যকে) বললে না তো কে তুমি?

শিলাদিত্য। নিতান্তই শুনবে?—তবে যাবার আগে শোনো রানী আমার আসল-পরিচয়।—আমি তোমার বাল্যসঙ্গী বৈশালীর-মন্ত্রীপুত্র সেই নিখোঁজ-সুরজিৎ। তোমাকেই একদিন পেতে চেয়েছিলাম কিন্তু পাবার সোজা-পথ নেই জেনেই সব

ছেড়ে এই বাঁকা-পথে নামলাম। তোমরা ভেবেছিলে—নিখোঁজ হয়েছি, তা নয়; তোমার অনুগামী হয়েই এসেছিলাম এই বিদর্ভে, এসেছিলাম তোমাকে লাভ করারই প্রতিজ্ঞা-পূরণে। তারপর থেকে যা-কিছু করেছি তোমাকে পেতেই।

ঐন্দ্রিলা। এত কাছে থেকেও এতদিনে তুমি দেখা দিলে ভাই? তা যা-ই করো আর যেখানে থাকো, আমাদের এই দু'জনের কাছে আগেকারই মতো আপনজন হয়ে থাকবে তুমি চিরদিন-ই।—

শিলাদিত্য। আর, এত কাছে থাকলেও কী হবে!—রাজা হয়ে তোমাকে জয় করে নেব—আমার এ-প্রতিজ্ঞা-ই যে আমাকে তোমার কাছ থেকে স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসনে দূরে সরিয়ে রেখেছিল—এ-জন্যই তো শত-সুযোগ থাকলেও আমার কাছে সে-সবই ছিল বৃথা। তাই একেবারে অচেনা হ'য়ে থাকতে সেধে-নিয়েছিলেম এত দাড়ি-গোঁফ, আর ছদ্মবেশের এই আবরণ! আর, মুখের এই বাঘের-থাবার ক্ষত-বিকৃতিটা-ও যে সেইদিকে আমাকে আত্মগোপনের কাজে আমার বন্ধুর মতোই সাহায্য করে আসছে। (ছদ্মবেশ-পরিত্যাগ)

ক্ষ্যাপাচাঁদ। নিয়তির কী নিষ্ঠুর খেলা।—কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। তবে, যা করলে যা হয়, তা করলে তাই তো হবে, বাবা! এ-বিধান কি খণ্ডাবার জো আছে? দয়াময়, তোমারই ইচ্ছা! তা, ভগবান, তুমি-ও তো ঠাকুর-টি নিজেই চিরদিন এই ভবের-খেলায় গড়িয়ে-গড়িয়েই চলছ!

গান

হায়, ভুখা-ভগবান!

বুঝি আপন ফাঁদে আপনি কাঁদে কে রাখে সন্ধান!

সুবন্ধু। (সাধুজীকে) এই খুনাখুনি-হানাহানি-ময় ধ্বংসের পথ এড়িয়ে শান্তি-প্রীতিতে সৃষ্টির কাজে এগিয়ে যেতে সংসারে কী পথ আছে বলুন প্রভূ!

সাধুজী। আছে, পথ নিশ্চয়ই আছে। ধ্বংস যত বড়োই হোক, সংসারে সৃষ্টির শক্তি ও সম্ভাবনা তার চেয়েও বড়ো! অনন্ত-অফুরান তার গতি—তাই, নিরাশা নয়, চাই, —সবকিছুর উপরে সহানুভূতি ও সহযোগিতা। সব-সময় এ-দুটি রক্ষা ক'রে চললে তারই ফলস্বরূপ ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে—ক্রমে, এই ক'রে ব্যক্তি-ছাড়িয়ে সমগ্র সমাজে ও দেশে-দেশে,—আপনা থেকেই গড়ে উঠবে এক মহা-মিলন আর, সে-মিলন থেকেই দেখা দেবে একতা!—মানে, একের-অনুভব কি না, পরকেও আত্মবৎ-দেখা-শুধু ভাবে নয়, প্রতি-কাজেও সেটাই চাই আগে,—এই তো পরমাত্মীয়তা। এ-তে ধ্বংস নয়, হবে সৃষ্টির সমৃদ্ধি। আজ-কাল পৃথিবীতে অনেক রাজ্যও চলেছে এই মিলনের পথ ধ'রে।

বৈশালীতে থাকার-সময় আমি এই গণতন্ত্রী-সমাজবাদী-নীতির-ভিত্তিতেই সেখানে পঞ্চায়েতী-রাজ প্রতিষ্ঠা করে আসি। বংশানুক্রমিক রাজা-হওয়ার রীতি ছেড়ে, সেখানে এখন মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র-ব্যবহার-জ্ঞানগুণ-বিচার-বিবেচনার শক্তির-তৌলে সর্বজনীন নির্বাচনে যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিরূপিত হয় তাকেই দেওয়া হয় রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও সম্মানিত ভূমিকা। হত্যা নয়, ধ্বংস নয়, তার বদলে সংগঠন-শক্তিতে উন্নততর এক মহাজাতি-গঠনের পরিচালক-রূপে নূতন ক'রে আত্মপ্রকাশের জন্য বৈশালীর-সন্তান বাবা-শিলাদিত্য তোমাকে আমি তোমার জন্মভূমি সেই বৈশালীতেই আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। স্মরণ হয় কি, একদিন তোমাকেই আমি রাজ্যভার দিতে গিয়েছিলাম? আজ থেকে 'লোক-প্রেমে' আর 'আত্মপ্রতিভা'য় সেখানেই তুমি সেবা-ক'রে ক'রে একদিন হয়ে উঠবে বিশ্বস্রষ্টা-ভগবানেরই মতো স্থষ্টির-মিলনভুখা নবযুগের নবীন আর-এক স্রষ্টা-ভগবান। ভগবান কি আলাদা একটা কিছু? বিচ্ছিন্ন-বিচিত্রের সমষ্টি নিয়ে সমগ্র-স্থষ্টির একত্র-একটিসত্তার ভাবমূর্তি বোঝাতেই 'ভগবান' শব্দের উৎপত্তি। বৎস, মানুষের থেকে সাধনা-ক্রমে ভগবান-হয়ে-ওঠার এই মহৎ-স্বপ্ন আমার সার্থক করবে না কি, সুরজিৎ?

শিলাদিত্য। (স্বগত) বৈশালীর হয়ে এতকিছু বলছেন—ব্যাপার কী? (প্রকাশ্যে সাধুজীকে) সে তো বুঝলাম, কিন্তু বুঝলাম না শুধু এখনো,—আপনি কে প্রভু? তবে কি আপনিই—

সাধুজী। এখনো দ্বিধা? বৎস,—আমিই সেই বৈশালীরাজ। ছিলাম একদিন রাজাই। কিন্তু তুমি চলে এলে-পর মেয়েটারও বিয়ে হয়ে গেল; নিঃসঙ্গ-গৃহে আর মন টিকল না। শেষ-বয়সের সেই শূন্য-জীবনে, একদিন এক পথিকের গানে কী যে মনে হলো, তখুনি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে মানুষের মিলন-রসের ক্ষুধায় দেশ-বিদেশের পথ ধ'রে ভুখা-ভগবানের মতোই আমিও হয়ে গেলাম এক ভুখা-ভিখারী-পরিব্রাজক।

ঐন্দ্রিলা। (চকিত-আর্তনাদে) বৈশালীর রাজা? এবারে চিনেছি—বাবা—বাবা! (দুই হাত বাড়াইয়া আগাইয়া গিয়া প্রণাম করা—রাজারও কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করা)

সাধুজী। (হাত ধরিয়া রানীকে উঠাইয়া) বেটী, ধরেই ফেললি তবে? ঐ 'বাবা'-ডাকটার মায়াই যে আমি ছাড়তে চাই!—কিন্তু পারলাম কই? ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়েছিলাম—অমনি একবার মনে হোলো—দেখেই যাই, তোরা-দুটিতে মিলে' কী-রকম রাজ্য চালাচ্ছিস! বাইরে থেকেই রাজ্যে নানা গোলমাল শুনছিলাম, আমিও তাই সব-ব্যাপারটা জেনে-নেবার জন্য আত্ম-গোপনে এই ছদ্মবেশই ধরেছিলাম। দেখা তো হল, এবারে আর কী?—চলি তবে?

ঐন্দ্রিলা। তা কি হয়! (রাজার আগাইয়া গিয়া সাধুজীকে প্রণাম করা—রাজাকে সাধুজীর আশীর্বাদ করা)

সুবন্ধু। প্রথম থেকেই আমি তাই ভাবছিলাম বৈশালীর প্রজা-পঞ্চায়েতের নিকট চিরকুট পাঠিয়ে এই বিদর্ভের জন্য এত চালের ব্যবস্থা এমন তড়িতে কে করে দেবে? তিনি যে অদৃশ্য-ভগবানের মতো আমাদের সকলের মধ্যে থেকেই সব-কিছু ক'রে চলেছেন—এর ভিতরকার সেই রহস্য কি আর বুঝতে পেরেছি? প্রভু, প্রণাম গ্রহণ করুন (প্রণত হওয়া) এতটা দিন একসঙ্গে চলে আমিও কি কিছু বুঝতে পেরেছি?

বিদর্ভরাজ। সকলে শোনো,—আজ শুধু অন্ন-বিতরণ নয়; এর সঙ্গে হবে আশ্রয়-বিতরণও। ভেবে দেখলাম, যারা নিরাশ্রয় হয়ে এখনো রাজ্য-ছাড়া হয়ে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা স্বদেশে ফিরে এসে থাকবে কোথায়?—তাই তাদের গৃহের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তারা সকলে এই রাজবাড়ি-অঞ্চলেই সরকারী-ব্যবস্থায় বাস করবে।—সকলকে তা জানিয়ে দিয়ো কুঞ্জ! অমাত্য উদয়ভাস্করের সঙ্গে তুমিও সহকারী হয়ে এই বিভাগ চালাবে।

(কুঞ্জ ও মানদার প্রবেশ)

রাজারানীকে নমস্কারান্তে কুঞ্জ। তাব'লে মহারাজ, একেবারে রাজবাড়িটাই ছেড়ে দেবেন?

ঐন্দ্রিলা। (হাসিয়া) দেবেন না? তুমিই-বা কী বলছ হে? এতকাল প্রজাদের দানেই তো চলে আসছে সব রাজ্য-রাজগিরি! আজ প্রজা যখন বিপন্ন, তখনও রাজার রাজৈশ্বর্য-ভোগ মানুষের প্রাণের কাছে কি রাজবাড়ির মূল্য?

সুবন্ধু। ঠিকই তো, ওহে কুঞ্জ, বলো তো পাখীর বাসাটা চাই আগে, না, তার সোনার খাঁচাটা আগে?

বিদর্ভরাজ। প্রজাদের দরকারের বেলায় আমরা ওসব ঘরবাড়ি আজ আটকে রাখি কোন্ অধিকারে বলো? দিন যে বদ্‌লে গেছে! মানুষের বোঝাবুঝিটাও কি আর তেমনি একঘেয়ে মামুলি থাকবে? আগে চাই,—ঘরে-ঘরে মানুষের মতো মানুষ, সৃষ্টি আর চাই ঐ মানুষের সেবাযত্ন ও শিক্ষাব্যবস্থা।

ঐন্দ্রিলা। (মানদাকে) বৌ, লোকজন ঘরে না থাকলে সত্যিই তো ঘর কিসের? তা, তোর মতো আমারও তো ঘরে কেউ নেই। চলে আয়, কাছাকাছি থাকলে পরস্পরের মধ্যে দু'জনেই কথা-বলার-লোক পাব। কী বলিস?

সকলে! জয় আমাদের রাজা-রানীর জয়।

সাধুজী। (জনতার প্রতি) ভগবান তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন। তোমাদের

এই দেশ-সংগঠনচেষ্টা সার্থক হোক।——জয় জনতার জয়। চরম-সংকটের দিনে জনতার এই ঐক্যের চেতনাই যে আজ সকলের পরম সম্পদ।

জনতা। জয় জনতার জয়, জয় ভুখা-ভগবানের জয়। (সকলে প্রস্থানোন্মুখ)

(সোৎসাহে সানাই ও টিকারা বাজাইয়া সকলের প্রস্থানমুখে, শিলাদিত্যের অনুচরদ্বয়ের প্রবেশ)

১। কই ?—শুনলাম বিয়ে ?—বরযাত্রার আর কত দেরি ? দারোয়ানি ছেড়ে এখন আমরা দুইজনে মিলে বাজনাদারিরই কাজ করছি—হুজুর-মশাইরা !—(নমস্কার করিয়া) দরকার হলে কাজের সময় যেন অধীনদের দয়া করে ডাকবেন।

২। আমরা আরো ছুটে এলাম, পাছে বিয়ের এমন ভোজটায় না বাদ পড়ি। কিন্তু,—

(সরলার প্রবেশ)

সরলা। (অনুচর-১ কে দেখিয়া বিস্ময়ে) এ কী, তুমি এখানে ? এতদিন ধ'রে এত ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

১। (বিব্রত হইয়া) আরে তুমি ? হঠাৎ এখানে ?

সরলা। বুঝতে পাচ্ছ না ? এসেছি অন্নের জোগাড়ে। এখানে আজ অন্নদান-উৎসব চলছে যে।

২। (অনুচর-১ কে সরলাকে দেখাইয়া সাগ্রহে ' ও কে ? ওকে যে অনেকদিন পথে-পথে নানা জায়গায় ভিখ্ মাগতে দেখেছি !

সরলা। (রাজারানীকে প্রণামান্তে) রানীমা, (অনুচর-১ কে দেখাইয়া) ঐ যে হতভাগীর স্বামী।

ঐন্দ্রিলা। (সরলাকে দেখাইয়া অনুচর ১ কে) সরলা যা বলছে, তা কি সত্য ?

অনুচর ১। (রানীকে নমস্কারান্তে) হ্যাঁ মা, সবই সত্য। আকালে ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে না পেরে একদিন পালিয়ে গিয়েছিলুম। সে-কথা বেশি কী আর বলব মা ! (নতমুখ হওয়া)

ঐন্দ্রিলা। (অনুচর-১ কে) যাও, সরলাকে নিয়ে ঘরে যাও এবার।

২। (অনুচর-১ কে) এই তোমার স্ত্রী সরলা ? তবে তোমার হায়-হুতাশের কারণটা ছিল সেদিন এ'কে-ই নিয়ে ? নাও, এখন তো পেলে ?—দু'জনে ঘরে গিয়ে নূতন ক'রে আবার সংসার পাতো গে।

মহাজন। (আগাইয়া আসিয়া) রানী-মা, অনুমতি হলে সরলাদের ভার আমি-ও নিতে পারি।

সরলা। সে কী-ক'রে হবে বাবা ?

মহাজন। (সরলাকে মৃদু হাস্যে) হবে না কেন মা ? তোমার শিশুগুলি যে, ধ'রে নাও-না কেন, (রুদ্ধকণ্ঠে) এই আঁটকুড়োরই (সরলাকে দেখাইয়া) মেয়ের-ঘরের নাতিনাতনী গো। তারা না-হয় দাদুর-বাড়িতে দু'টো দিন এখন বেড়িয়েই গেল !

২। (অনুচর-১ কে) না ভাই, ও-সব কিছু নয়, তার চেয়ে চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই ;—আমারও তো ঘরদুয়োর নেই, (রুদ্ধকণ্ঠে) তিনকুলে কেউ নেই, কোথায়-বা যাই এখন !—মনিবেরও সব-কিছু তো দুর্ভিক্ষেই দান হয়ে গেল,— এসো দু'জনে মিলে খেটেখুটে তোমাদের নড়বড়ে গেরস্থালি-টাকেই নূতন করে গড়ে তুলি। (স্মিতহাস্যে মহাজনকে) মহাজন দাদা তো মুরুব্বি হয়ে পেছনে আমাদের আত্মীয়-একজন রইলেনই !

ঐন্দ্রিলা। (সরহস্যে) আমরাও কিন্তু সঙ্গে আছি।—ভুললে চলবে না !

বিদর্ভরাজ। (মানদাকে) দূরে আছি ব'লেই যেন দূরের ভেবো না মা ! তবে এখানে-ওখানে কেন আর যাবে, সবাই এসে পড়ো রাজবাড়িতে ঐ 'গৃহাশ্রমে'ই। ওতেই তো সব চুকে যায়।

মহাজন। (রাজাকে দলিল দান) তাহলে মহারাজ, এই নিন আমার দানপত্রের দলিল, সব-কিছু আমার দিলাম আমি দেশের যত শিশু-শিক্ষার কাজে। দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে এটা জমা ক'রে নিলে সেও আমার নাতি-নাতনিদেরই তো দেওয়া হল।

সকলে। (জয়ধ্বনি) সাধু, সাধু, সাধু !

বিদর্ভরাজ। এ তো ভালোই হল। ওহে, অন্নদানে তো শরীর বাঁচবে, মানুষের মনকে যে বাঁচাতে চাই—শিক্ষাদীক্ষা-ই ! সেদিকেও যে আজ, ভুখের মার চলছে সমানেই। নিশ্চিন্ত থাকো—সব ব্যবস্থাই হবে। একদিকে পেয়েছিলাম উদয়ভাস্করকে, আরেকদিকে পেলাম আজ মহাজন-তোমাকে—এই তো চাই। জনই যে জনতার সহায়। সংকটে শক্তি আর সাহায্যও আসবে জনতারই জনে-জনের ভিতর থেকে।

উদয়ভাস্করের সঙ্গে সকলে। (সমস্বরে) সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

উদয়ভাস্কর। নূতন সৃষ্টি আর পরস্পরের সহানুভবের আগ্রহই সংসারের আদি-শক্তি আর প্রধান সম্বল। এখানে এসে—সাধারণ-মানুষ মহাজন আর অনুচরদের এইসব কথার থেকেও আজ আরো সেই বিষয়ে বিশ্বাস দৃঢ় হল।

বিদর্ভরাজ। অমাত্য উদয়ভাস্কর, শুনে রাখো—কিছু আগেই যা বলেছি,— কুঞ্জলাল আর তুমি নেবে আজ থেকে এই রাজ্যের সংগঠন-ভার। আর, এসঙ্গে

মহাজনও শোনো, তুমি নেবে রাজ্যের খাগু আর বাণিজ্য-ভার,—উৎপাদন বাড়িয়ে আর সঞ্চয় রেখে সুষ্ঠুভাবে সমবণ্টনে সব-ব্যবস্থা করবে, তবেই প্রকৃতির বা কারো মারেই আর কাউকে কখনো কোনো দিক দিয়ে ভুখা-বন্‌তে হবে না।

সাধুজী। (জনতার প্রতি) ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। এবার তবে তোমাদের কাছে আমার সেই শেষ-কথাটা বলে যেতে চাই।—

("জয়গুরু, জয়গুরু" বলিয়া তড়িৎবেগে জয়সেনের প্রবেশ)

জয়সেন। যেতে চাও? বলি, কোথায় যাচ্ছ তুমি? বিদর্ভবাসীকে বৈশালীর চাল জুগিয়ে দিয়ে কৌশলে যে তুমিই আমাদের রাজ্যলাভের সব কৌশল ভেস্তে দিয়েছ,—সে কি আমরা জানিনে ভেবেছ? যাবেই যদি একেবারে নিয়েই যাও তোমার এই কাজের পুরস্কার। (বক্ষাবরণীর তলা হইতে ছুরি বাহির করিয়া চরম আঘাতে উদ্যত হইতেই ছুটিয়া আসিয়া মহাজন জয়সেনের হাত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইল)

সাধুজী। (সহাস্যে) ওহে, জয়সেন, তোমার অস্ত্রই যে তোমাকে হাতে-নাতে আসামী সাজিয়ে দিলে। (প্রহরী জয়সেনকে বন্দী করিতে আগাইয়া আসিতেই তাহাকে হাত নাড়িয়া বাঁধিতে নিষেধ জানাইয়া) থাক্‌, থাক্‌—

জয়সেন। এখন মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি যে সাধু বেঁচে গেলে, এ যে হল আমার মৃত্যুর চেয়েও বেশি! বেঁচে-মরার থেকে এখন মরেই বাঁচতে চাই। কে আছ, মেরে ফেলেই আমাকে মুক্তি দাও, আমাকে মুক্তি দাও।

সাধুজী। ওহে অমাত্য, আমাকে যে অমন ক'রে মারতে এলে বাবা, আমার মধ্যে তোমরা তোমাদের শত্রুতার কী দেখেছিলে? আমি কি তোমাদের কাউকে মারতে গেছি। মানুষ যদি একবার প্রাণে-মারাই গেল তবে এর চেয়ে মনুষ্যত্বের চরম-ব্যর্থতা আর অপমান কী হতে পারে? ভেবে দেখো,—এই রকমই নখদন্তের অস্ত্র নিয়ে হিংস্র বনের-পশুরাও যে হত্যার জন্যই মানুষকে তাড়া ক'রে ফেরে। মানুষ থেকে পশু-হওয়াই কি হল শেষে তবে মানুষের আধুনিক ধর্ম?

জয়সেন। মানুষ-অমানুষ বুঝিনে; আমরা চাই—আমাদের অমাত্যদের প্রাপ্য—এই রাজ্যটা।

সাধুজী। বেশ তো, রাজ্যটা চাচ্ছ?—চাচ্ছ তুমি বাবা, কিসের অধিকারে?—গায়ের জোরে? না, ন্যায়ের জোরে? সেটা তো বলতে হবে?—গায়ের জোরের চেয়ে মানুষের মনের-জোরের মাহাত্ম্যই তো ইতিহাসে বেশি। সেই মানবিক-আত্মশক্তির

যুক্তি আর প্রেরণার সাহায্যেই বিরোধী-পক্ষের মানুষকে ক্ষয় না ক'রে তাকে জয়-ও তো করতে পারতে অমাত্য ?

সুবন্ধু। তা ছাড়া-ও সেটা যে হোতো শৌর্যে-বীর্যে-মহত্বে তেমনি বল-বীরত্বেরই বড়ো-পরিচয়।

সাধুজী। যা শুনলে, এ সব কি নিজের থেকে একবারও কখনো মনে জেগেছে বাবা ?

জয়সেন। তা জাগেনি, বরং মনে হয়েছে, ঐ ছুরিই আমার শ্রেষ্ঠ সহায়।

সাধুজী। কিন্তু, তোমার ঐ অস্ত্রটির কাছেই তুমি যে সারাক্ষণ কত অসহায়, দেখবে তার সাক্ষাৎ-প্রমাণ ? তাহলে,—তাহলে, দাও দেখি তোমার ছুরিটি এখনি একবার আমার হাতে। আছে সে সাহস ? (মহাজনকে) মহাজন, ছুরিটি অমাত্যকে ফিরিয়ে দাও তো। (মহাজনের, হাতের-ছুরিটি এবার জয়সেনকে ফিরাইয়া দেওয়া। বিস্ময় ও ইতস্ততের সহিত সেটি দেখিতে-দেখিতে জয়সেন)

জয়সেন। (সাধুজীকে) আমার এই হাতের ছুরি তোমাকে দিতে পারি, তোমারও এমনি লুকানো-অস্ত্রটি তুমি যদি এখুনি আগে আমার হাতে একবার বিশ্বাস ক'রে দিতে পারো।

সাধুজী। (জয়সেনের কাছে আগাইয়া হাসিতে থাকিলে জয়সেনের সভয়ে "ও কী !" বলিয়া পিছু-হটা আর আত্মরক্ষায় হাতের ছুরিটি উপরে তোলার উপক্রমেই তাহাকে গিয়া সহাস্যে সাধুজীর কোলে-জড়াইয়া-ধরা) অমাত্য, আমার অস্ত্রটি নিতে চাচ্ছিলে না ? সকল অস্ত্রের সেরা-অস্ত্র যে আমার মনের-মায়ায়-গড়া এই আলিঙ্গনের যাদু-অস্ত্রটি। ঠিকই তুমি ধরেছিলে বাবা, এটি লুকানোই থাকে, আর থাকে একেবারে অন্তরের অন্তর-কোঠাটিতেই। তোমার অস্ত্র তুমি নির্ভয়ে-একবারও তোমার হাত-ছাড়া করতে পার না, কিন্তু দেখলে তো, আমার অস্ত্রটি আমি হাজারবার হাজার-জনকে এরকমই অনায়াসে সানন্দে উপহার দিতে পারি। তাহলে বলো,—এখন তুমি কী করছ ?

জয়সেন। (অবাক-দৃষ্টিতে সাধুজীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া নীরবে নিজের হাতের ছুরিখানা সাধুর পায়ে রাখিয়া দিয়া প্রণামান্তে উঠিয়া করজোড়ে সাধুজীকে) মারতেই এসেছিলাম বটে, কিন্তু এভাবে যে উল্টা মরে যেতে হবে, তা তো একবারও ভাবিনি প্রভু ! আর-কিছু চাইনে—আমাকে আমার হিংসার হাত থেকে বাঁচাও !

সাধুজী। (হাত ধরিয়া তুলিয়া উঠাইয়া) ওঠো বাবা, একে অন্যকে হিংসা-করবে কেন ? হিংসায় যে প্রতিহিংসাই ডেকে আনে। তখনই তো বাধে কুরুক্ষেত্র। সে তো

মনুষ্যত্বের শত্রু, আর সেটা যে ধ্বংসের পথ। সংসারের সকল-জনকেই নিজের-জন ক'রে দেখো বাবা। তাহলেই কখনো আর-কোনো জাল-জঞ্জালে জড়িয়ে পড়তে হবে না, আর তার থেকেই জেনো আসবে নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি আর সৌহার্দ্যের অনন্ত জোগান।—তবে আর ভাবনা কী?

বিদর্ভরাজ। (জয়সেনকে) অমাত্য জয়সেন, ভুলে যাও তোমার পাপে-ভরা মিথ্যার অতীত। ঐ শিলাদিত্যের সঙ্গে তুমিও তোমাদের স্বদেশে গিয়ে বৈশালীর রাজা সন্ন্যাসধারী ঐ পূজ্যপাদ-সাধুজীর-দেওয়া সৃষ্টি, সাম্য ও শান্তির মন্ত্র জনে-জনের মধ্যে বিতরণ করো।

জয়সেন। (চমকিয়া) সাধুজী আমাদের বৈশালীরাজ? মহারাজ, তবে আপনি আমাদের সম্মুখেই উপস্থিত? (প্রণাম করিয়া) অধম সেবক ক্ষমা চাইতেও আজ অক্ষম প্রভু।

সাধুজী। (হাসিয়া সস্নেহে) ক্ষমা কিসের বাবা? মিলনমুখী-সৃষ্টির কাজ ক'রে নূতন জীবন লাভ করো। এ পথে ক্ষমা তো নয়, চাই প্রমা, মানে চাই,-সত্য-জ্ঞান। এই মিলন যেচে (ঊর্ধ্ব চাহিয়া) চিরকাল তিনি আসছেন আমাদের দিকে, তেমনিই আমাদেরও যে যেতে হবে তাঁর দিকে। দু'দিক থেকে এই মিলন-আকর্ষণী যোগসূত্রটিই যে হচ্ছে সৃষ্টির পরম সুধা আর সেটিই যে-হচ্ছে ঐ ক্ষুধা। কবিও যে তাঁর গানে-গানে দু'দিকের এই বিচিত্র মিলনলীলা-রহস্যের কথাই গেয়ে এসেছেন।

জয়সেন। প্রভু, মিলনমুখী যে সৃষ্টির কাজ করতে বলছেন, কিন্তু কী করব প্রভু, প্রতিক্ষণ ঐশ্বর্য আর ক্ষমতার ক্ষুধাই যে ভিতরে-ভিতরে বেড়ে-বেড়ে উঠে মনকে অশান্তিতে অস্থির করে ফিরছে।

সাধুজী। সেখানেই তো চাই বিচার-বিবেচনা আর সংযমে মনকে স্থির ক'রে রাখা। এইবার শোনো কবি-গাথায় সেই ভক্ত-ভগবানের লীলা-রহস্য:

গান

(১)

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কোথা থেকে,
তোমার চন্দ্র, সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে॥

(২)

প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ-হাত রেখো না ঢাকি',
এসেছি তোমারে হে নাথ পরাতে রাখী॥

যদি বাঁধি তোমার হাতে পড়ব বাঁধা সবার সাথে
যেখানে যে আছে কেহই র'বে না বাকি॥

আজি যেন ভেদ নাহি রয় আপনা-পরে,
তোমায় যেন এক দেখি হে বাহিরে ঘরে,
তোমার সাথে যে-বিচ্ছেদে ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
যারেক তরে ঘুচাতে তাই তোমারে ডাকি ॥

এবার তোমরা—যার-যার নবজীবনের যাত্রা-পথে নূতন-নূতন-জয়াভিযানে নেমে-পড়ো দেখি। মনে নিয়ে যাও এর যাত্রামন্ত্র, কবির সুরে গাঁথা এযে মানুষের চিরদিনেরই দীক্ষামন্ত্র-ও বটে—গাও ক্ষ্যাপাচাঁদ—গাও সেই বিচিত্র সুরের গানটি—

ক্ষ্যাপাচাঁদ। গান

আরো চাই যে আরো চাই গো, আরো যে চাই,—
ভাণ্ডারী যে সুধা আমায় বিতরে নাই।

সাধুজী। গান

মিলে আছ মিল-অমিলে ভুল-ভাবনা-ভালোবাসায়
মিলে আছ সবার মাঝে তোমাতেও যে সবাই রাজে,
আছ আমার সকল কাজে নিঁদ্-জাগরণ কাঁদা-হাসায় ॥
বাদ-বিবাদের মর্ম্মদাহে পোড়াও-না!—মন তাই যে চাহে,
আবার বাঁধবে বুকে?—নারাজ নাহে (তা ব'লেই) মাত্‌বে না মন আরো-আশায় ॥

এতদিনে মন বুঝেছে পাখির মন তার রয়-যে বাসায়,—
নীলাকাশের হাত্‌ছানি তায় ভাসাক্-না-কো যেথায় ভাসায়।
'তুমি আমার'—এই যে আশা, এই আশাতেই মনের বাসা,
যেথায় নে'যাক্ যেই পিপাসা, কী হয় সে-সব যাওয়া-আসায়?
কী যায়-আসে আমার তাতে (শেষে) ভাগ্য যদি সবই ফাঁসায়,
পাই-বা-না-পাই,—সে-ও যে কী সুখ! বলি কারে তা সে-কোন্ ভাষায়!
বাইরে যদি ফেরাই দৃষ্টি সেখানে-ও যে তোমার সৃষ্টি,
অন্তরে হয় সুধাবৃষ্টি—(তোমার) ভুখ্ যে আমায় তবু শাসায়।
বাধায় সে কী-অনাসৃষ্টি, (তোমায়) কখন পাব সে-প্রত্যাশায়।
থেকে-থেকে বাড়াও তৃষা এ তুমি কোন্ সর্বনাশায়!
অভাব-দুখে বিঁধে যদি, (আরো যে) উথ্‌লে ওঠে ভাবের নদী,
আমি হয়ে যাই তুমি দরদী (তখন) আর ঢাকে সুখ কোন্ কুয়াশায়?

(শিলাদিত্যের অনুচরদ্বয় টিকারা ও সানাই বাজাইতে লাগিল)

সাধুজী। এসো চন্দ্রা, এসো উদয়, এই বারোয়ারি বটতলার পুণ্যবেদীতে দুটিতে প্রণাম ক'রে সংকল্প গ্রহণ করো। (উদয় ও চন্দ্রার একত্রে বেদীর নিকট আগমন ও প্রণাম করা) একে-একে বলো,—আজ হতে আমার হৃদয় তোমার হোক আর তোমার হৃদয় হোক আমার।

উদয় ও চন্দ্রা। (সমস্বরে পরস্পরের প্রতি) আজ হতে আমার হৃদয় হোক তোমার আর তোমার হৃদয় হোক আমার। (সাধুজীকে উভয়ের প্রণাম করা, পরে বিদর্ভরাজ, ঐন্দ্রিলা, সুবন্ধু, কুঞ্জ, মানদা, শিলাদিত্য ও ক্ষ্যাপাচাঁদকে প্রণাম করা আর উভয়ের প্রতি সকলের আশীর্বাদ জ্ঞাপন করা)

চন্দ্রা। ধর্মাধর্ম বলতে জেনে এসেছি শুধু একটি জিনিস—সেবা করা। তাই ক'রেই যেন সকলকে সুখী করতে পারি, এই চাই।

উদয়। আমারও ঐ একই কথা, সকলে আশীর্বাদ করুন—দুজনে মিলে যেন দেশ ও দশের সেবাতেই জীবন কাটাতে পারি।

সাধুজী। (সস্নেহে শিলাদিত্যকে) এখন তবে চলো বাবা, আমরা আমাদের বৈশালীর পথে বেরিয়ে পড়ি!

শিলাদিত্য। চলুন প্রভু!

উদয়। প্রভু, আমরা দুজনে-ও সঙ্গে যাব। আপনাদের দু'জনকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসব, ঐ সঙ্গে আমাদের দেশটাও চন্দ্রাকে দেখিয়ে আনব।

বিদর্ভরাজ। (হাসিয়া উদয়কে) তা-ব'লে ভুলো না যেন—নব-সংগঠনের কত কাজ এদিকে পড়ে রইল।

ঐন্দ্রিলা। আর বিয়ের যত-সব উৎসব-অনুষ্ঠান সে-সই কিন্তু বাকি প'ড়েই রইল। আমাদের সকলকে তা ব'লে ফাঁকি দিলে চলবে না অমাত্য উদয়।

উদয়। সে-সব এসে হবে। কেবল এখন মনে হচ্ছে—আমাদের (শিলাদিত্যকে দেখাইয়া দিয়া) দাদাটিকে যদি ঘর-নেওয়াতে পারা যেত তবেই আজ সবটা কত সুখের হত। যাক্, প্রভুজী যখন ওকে সঙ্গে নিচ্ছেন তিনি সবই দেখবেন। এই রইল ভরসা যে—শেষে তারও সব ভালোই হবে।

শিলাদিত্য। (মৃদু হাস্যে) সব ভালো সব-সময় ঘ'টে-ওঠে কি ভাই! অমন-সূর্যেও যে গ্রহণের কালো-ছায়া লাগে। স্বভাবের এই সত্য মেনে নিয়েই সংসারে চলতে হয়। নিজের সাধ পূর্ণ না হোক, এখন তো সকলের সাধ পূর্ণ করার কাজ নিয়েই চললাম—

তবে তারও ফলের দিকে মোহ না রাখাই ভালো—এটাই হল গত-জীবনের অভিজ্ঞতার দান। কী আর বলব। (সাধুজীর সঙ্গে শিলাদিত্য প্রস্থানোদ্যত)

ঐন্দ্রিলা। (চোখ মুছিয়া সাধুজীকে) আরো দু'দিন থাকলে না, বাবা? আমাদের দুজনাকে তো দেশ-গড়ার কাজে বেঁধে এখানেই ফেলে রেখে গেলে। ওখানে তোমাকে আজ-কাল দেখবারই-বা তেমন কে আছে, ঘর বলতেই-বা কী আছে—তাইতো আরো ভাবনা!

সাধুজী। (সহাস্যে দুই হাত তুলিয়া চলিতে চলিতে ঐন্দ্রিলাকে) ভাবনা কী মা? যত ভাবতে হয়, তুই তোর রাজ্যের প্রজাদের কথা ভাব্। দেখিস্, ওদেরই ঘরে-ঘরে পাবি, আমাকে তোকে-সকলকেই।—সবটা মিলিয়ে—সেই যে হবে **মর্ত্ত্য-নন্দন**। আমার জন্য আর ভাবিস্‌নে মা।

(আবৃত্তির সঙ্গে ছায়াচিত্রে ব্যঞ্জনা)

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে-দেশে মোর দেশ আছে আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে-দুয়ারে চাই, তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়ে সেথা প্রবেশিতে পাই সন্ধান লব বুঝিয়া,
ঘরে-ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।
রহিয়া রহিয়া নব-বসন্তে ফুল-সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফিরে হিয়া মিলন-বিহনে মিলনের শুভ-লগনে।
আপনার যারা আছে চারিভিতে পারিনি তাদের আপন করিতে
তারা নিশিদিশি জাগাইছে চিতে বিরহ-বেদনা সঘনে!
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে ফিরে প্রাণ সারা গগনে!
তৃণে-পুলকিত যে-মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে, কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে-ধূলির তলে যুগে-যুগে আমি ছিনু তৃণে-জলে,
সে-দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে।
ধন্যরে আমি অনন্তকাল, ধন্য আমার ধরণী।
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর তারকা হিরণ-বরনী।
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বলো কারে।
আছে তাঁরি পায়ে তাঁরি পারাবারে বিশাল ভুবনতরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি, ধন্য এ মোর ধরণী।

(সকলের প্রস্থান)

যবনিকা

জনগণমন-অধিনায়ক

শুভেচ্ছা